ত্রিপুরার আদিবাসী

সম্পাদনা

নরেশচন্দ্র দেববর্মা

বিমান ধর

কুমুদ কুণ্ডচৌধুরী
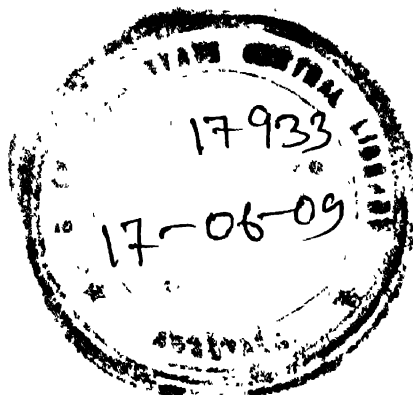
ত্রিপুরা দর্পণ

প্রথম প্রকাশ : আগরতলা বইমেলা ২০০৯
প্রকাশক : রীনা রায়, ত্রিপুরা দর্পণ
আগরতলা, ত্রিপুরা
প্রচ্ছদ : ইমানুল হক
অক্ষর বিন্যাস : দে প্রিন্টার্স, সঞ্চিতা দে (দেব)
মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা

ISBN : 81-89311-29-8
TRIPURAR ADIBASI
A collection of essays on Adibasis of Tripura
Rs. 250.00

রাজ্যের আদিবাসীদের উদ্দেশে

সূচীপত্র

সম্পাদকদের কথা

কোলকাতার বনেদী প্রকাশনা এ. মুখার্জী এন্ড কোঃ-এর একটি পেটেন্ট প্রবচন হল "আমরা বই ছাপিনা বিষয় ছাপি"। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজ ও তাঁদের সংস্কৃতি বিষয়ে যখন সবিস্তার লেখ্য ভাষ্যের চিন্তা আসে তখন ঐ বিশেষ শব্দ বন্ধনই সামনে চলে আসে। লিখব, ছাপব, তবে তা নিছক বই যেন না হয়। বইটি হতে হবে বিষয় সমৃদ্ধ। অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্তে এলাম যে আমরা "বিষয়ই" ছাপব। ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজ ও তাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির বিষয়ে ইতিমধ্যে বহু গবেষক গবেষণা করেছেন তাঁদের চর্চা লব্ধ উপলব্ধিকে অক্ষর বিন্যাসে সাজিয়ে পাঠক ও পরবর্তী গবেষকদের জন্য রেখে গেছেন। অধিকাংশ গবেষণাই হয়েছে এক একটি সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে। এতে পৃথক পৃথক ভাবে সম্প্রদায়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু দুই মলাটের ভিতর রাজ্যে বসবাসকারী সম্প্রদায়কে এক সঙ্গে পাবার উপায় নেই। সম্মানিত গবেষক সুরেন দেববর্মা মশাই "ত্রিপুার আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতি" শিরোনামে সম্প্রদায়গুলিকে দুই মলাটে এঁনেছেন। তাঁর ঐ প্রচেষ্টা ব্যাপক পরিসরে হলেও সর্ব ব্যাপক বা সম্পূর্ণ হয় নি কারণ তাঁর কথায় বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত দশটি জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সমাজ, জীবন, সংস্কৃতি, ধর্মীও আচরিত জীবনকেই তিনি তাঁর গবেষণা কর্মে আবদ্ধ রেখেছেন। যে দশটি জনগোষ্ঠী তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন ত্রিপুরী, জমাতিয়া, রিয়াং, হালাম, চাকমা, মগ, কুকী, লুসাই, উচই ও গারো। শ্রদ্ধেয় সুরেন দেববর্মার বীক্ষণ চৌহদ্দীতে বারো হালামের সকলের স্থান ও হয়নি যেমন কাইপেং, মলছম, রাঙ্খল, ডার্লং, বংচের-রা বাদ পড়েছেন। সম্ভবতঃ তাঁর আলোচনাকে তিনি বৃহৎ উপজাতি জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্বেচ্ছায় সীমিত রেখেছেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করা মুস্কিল। কাব্যে উপেক্ষিত ইত্যাকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা স্বল্পতা, অর্থাৎ প্রভাবিত করার ক্ষমতা খুবই কম, এবং তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও থাকতে পারে যে কালক্রমে ঐ জনগোষ্ঠী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পূর্ণ সমর্পণের লীন হয়ে যাবে। হয়তো কারণ এটাই ইতিমধ্যে ভাষার বা ডায়লেকট-এর ক্ষেত্রে সমর্পণের ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। পুরান ত্রিপুরা, নূতন ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া, মুড়াসিং, উচই, কলয় ও রূপীনি এদের সম্প্রদায়গতভাবে পৃথক সনাক্তকরণ হয়েছে। আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এঁরা সকলেই ককবরক ভাষাভাষী। সংখ্যাপুষ্ট সম্প্রদায়ের ভাষা ককবরক; সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলির কাছেও কিন্তু অবোধ্য নয় বা অব্যবহৃত নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি তাঁদের কৃষ্টি সংস্কৃতির স্বতন্ত্রতা সম্প্রদায় হিসেবে এখনো বজায় রেখে চলেছে। এখন বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মনোযোগ সীমায় চলে আসায় তাদের চূড়ান্ত বিলুপ্তির সম্ভবনা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন জাত্যাভিমান, বা বলা ভাল সম্প্রদায় স্বাভিমানে এঁরা উচ্চকিত, উজ্জীবিত; তাকে বর্ণময়, অর্থময় ও উপস্থাপন গৌরব উজ্জ্বল করে তোলার সাধনায় এরা লিপ্ত। স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবি অংশ এই কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের নিযুক্ত করেছেন; করতে চাইছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ ভাবনার সময় সর্বাগ্রে এই কথাটিই আমাদের মনে এসেছে। প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ সাংস্কৃতিক বিজয়ের জন্যে কোন আগ্রাসনকেই আমরা প্রশ্রয় দেব

না ঠিক করেছি। প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীকেই আমরা যথাযথ গুরুত্ব দেব। ফলে আমরা নিজেদের কোন ভাবেই বৃহৎ দশে আবদ্ধ রাখতে চাইনি। দেবরাজ ইন্দ্রের কৌলীন্য - ছায়াকে পাথেয় করে, হিমালয় কোলে আবদ্ধ জলরাশিকে মুক্ত করে আর্যাবর্তকে সুফলা করার চেষ্টা করেছি, ফলে আমরা রাজ্যে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকেও গ্রন্থভুক্ত করেছি। কেবল চৌহদ্দী বা সীমানা বৃদ্ধি নয়, আমরা আরো বেশী সত্যনিষ্ঠ, তথ্যনিষ্ঠ, প্রাণোজ্জ্বল এবং গবেষণামুখী হওয়ার চেষ্টাও করেছি। লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আমরা উচ্ছিষ্ট ভোজে অংশগ্রহণ সজ্ঞানে বর্জন করে, কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কোন একজন বিশেষজ্ঞর হাতে রচনার কাজ, গবেষণার কাজ ন্যস্ত করিনি। আমরা লেখক খুঁজেছি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যাঁরা নিজ সম্প্রদায়ের জীবনচর্চায় নিষ্ঠ, তাঁদের জীবনঅভিজ্ঞতা, তাঁদের অনুভূতি যে অনেক বেশী সত্যনিষ্ঠ এবং তথ্য নির্ভর হবে এ ব্যাপারে আমাদের কোন সংশয় নেই। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরা, যাদের আমরা দায়িত্ব দিয়েছি তাঁরা কেউ প্রতিষ্ঠিত বা ব্যাকরণসম্মত গবেষক নন কিন্তু সম্প্রদায়কে তুলে ধরার আগ্রহ তাঁদের এতটাই দায়িত্বশীল করেছে যে কার্যত: তাঁরা হয়ে পড়েছেন গবেষক। তাঁরা সমাজের সঙ্গে বার বার বৈঠক করেছেন। তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য যাচাই করেছেন। সংগৃহীত তথ্যকে আবার যুক্তি ও বিজ্ঞানের বীক্ষণাগারে ফেলে যুক্তি সম্মত করেছেন। আসলে গোটা সম্প্রদায়কেই এরা গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই অর্থে এরা গবেষক হলেও কার্যত: অনুলেখক। প্রশ্ন হবে কেন এই লেখার প্রয়োজনীয়তা? উত্তরে আমাদের বক্তব্য এটাই যে আমরা গোটা উপজাতি সমাজকে, তাঁদের সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বতন্ত্রতা ও নৃতাত্ত্বিক রূপরেখাটি তাঁদের মুখ দিয়ে তাঁদের মতন করে গ্রন্থনার চেষ্টা করেছি, আর এই কারণে, আমরা পাঁচ বা দশে সীমাবদ্ধ না রেখে "সকল সম্প্রদায়কেই বীক্ষণ সীমায় নিয়ে এসেছি। এতদিন যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা কতিপয়ের ইন্টারভিউ আর আলাপচারিতার বিবরণ দিয়েছেন মাত্র যার মধ্যে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার প্রাধান্য ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এতে তাঁদের উপস্থাপন হাঁসজারু হয়েছে এতটা বলার ধৃষ্টতা আমাদের নেই। কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যে যেমন মূল সাহিত্যের আস্বাদ নেই, দুধে জল মেশানো হলে স্বাদের যেমন তারতম্য ঘটে তেমনই তাঁদের গবেষণা আসল থেকে খানিকটা দূরেই থেকেছে সংকোচে এই কথা বলা যাবে নিশ্চয়ই। মিশেল বাদ দিয়ে আসল বস্তুকেই আমরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের হাত দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছি। অন্ততঃ উচ্ছিষ্ট ভোগী না থাকার প্রয়াসে একশত ভাগ নিষ্ঠ থেকেছি। ছেঁকে নেওয়া নয় আনকোরা। তা এই কারণে যে, গণিতশাস্ত্র সম্মত সতঃসিদ্ধ হলেও অংশ কখনো সমগ্রের সমান নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মূলের অনুবাদ মাত্রেই মূল থেকে খানিকটা কম। এ ঘাটতি না রাখার বিবেক নির্দেশেরই ফলশ্রুতি হল আমাদের গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াস। তবে উদ্যম ও প্রচেষ্টা সত্বেও "বংচের" অতি ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রাকে আমরা তুলে ধরতে সক্ষম হই নি। এঁরা সংখ্যায় অত্যাল্প। বড়মুড়া পাহাড়ের পাদদেশে বৈশ্যমনি কলয় পাড়ায় কলয়দের সঙ্গেই সহবাস করছেন। গ্রামে মাত্র ২৫/৩০ টি পরিবার। এটাই এঁদের সর্ববৃহৎ গুচ্ছ সমাহার। প্রায় আদিম জীবনযাত্রা একশত ভাগ জুম নির্ভর এই উপজাতি ক্লান কলয়দের সঙ্গে সহ অবস্থান সত্বেও নিজেদের ভাষা সংস্কৃতির পূর্ণ বিলয় ঘটায়নি। ভিন্ন ডায়লেক্ট রয়েছে। যার নৈকট্য লুসাইদের ভাষার কাছাকাছি। সংখ্যায়

হাজারেরও কম, দুর্বলতর অর্থনীতি, আধুনিকতা তাদের ধারে কাছেও নেই; তাদের কাছে আধুনিকতা মানে, দূরের পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টি আগুনে শীত নির্বাহ্ করা। পাশেই যে কলয়দের বাস, তাদের সামাজিক কাঠামো রয়েছে, সামাজিক রীতি-নীতি, অনুশাসন অবাক করে দেবার মতন। গ্রীক সমাজের আদি গণতন্ত্রের কাঠামোটিকে কলয় সমাজের গণতান্ত্রিক বন্ধনে চাক্ষুস করতে অসুবিধা হয় না। এই সমাজে মধ্যবিত্তের বিকাশও ঘটছে। এমন একটি উন্নততর জনরীতিকে প্রত্যক্ষ করেও কেন এখনো তারা আদিমতম জীবন যাত্রায় রয়েছেন, এর কারণ অনুসন্ধানে আমরা অপারগ রইলাম। ভবিষ্যতের গবেষকরা নিশ্চয়ই এর কারণ খুঁজে পাবেন। এই জনগোষ্ঠীকে উন্নততর জীবন যাত্রায় উত্তরণের দায়িত্ব সরকারের। " উপজাতিদের জন্য উন্নত জীবনের" প্রতিশ্রুতি পর্বে এরা উপেক্ষিত থাকবে না আমরা এই প্রত্যাশাই করব। তাদের আনন্দ, তাদের বেদনা, সুখ, তাদের হতাশা ও উচ্চাশার সঠিক উপস্থাপন এঁরাই করতে পারতেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও তেমন কোন বার্নিয়ার মেগাস্থিনিস বা ফা -হিয়েনকে ঐ সমাজে খুঁজে পাই নি যারা অন্ততঃ নিজের আর্বিভাব ও টিকে থাকার কথা বলতে পারেন, গুছিয়ে নয়, অগোছালভাবে হলেও। এখন বৃহত্তর সভ্য সমাজের দায় তাঁদের যুগপোযোগী করে দ্রুত গড়ে তোলা। আমরা একটি নীতিতে নিষ্ঠ থেকেছি বলে ওদের মধ্যে কথা বলার লোক না পাওয়ায় গ্রন্থের ত্রুটিও অসম্পূর্ণতাকে মেনে নিলাম। পরবর্তী সংস্করণকালে আমরা তাদের মধ্যে তেমন কাউকে খুঁজে পাব কেবল এই প্রত্যাশাতেই 'বংচেরদের ব্যাপারে ইতি টানলাম।

যে সব সম্প্রদায়ের কথা ওদের নিজেদের লেখনীতে এসেছে দেখা যাচ্ছে অর্থনীতি ওপ্রথাগত শিক্ষায় অনেকটাই পশ্চাৎপদ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামাজিক কাঠামোটি বৈজ্ঞানিক ও যুক্তি নির্ভর। সংখ্যা গুরু থেকে সংখ্যা লঘু হয়ে পড়ার এই বিপ্রতীপ অভিমুখেও প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ই নিজেদের সামাজিক কাঠামো ধরে রাখতে পেরেছেন। বৃহতের ভারেও নুজ্য হয়ে পড়েন নি। এই লড়াই যেমন উপজাতি অউপজাতির তথা সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর মধ্যে প্রচ্ছন্ন দড়ি টানাটানির, তেমনি ক্ষুদ্রতর উপজাতি সম্প্রদায়টিও কিন্তু স্ব-জাতির বৃহতের ভারেও নুইয়ে পড়েন নি। বংচের সম্প্রদায়ের টিকে থাকাই হল এর সবচাইতে বড় উদাহরণ।

• জাতির ইতিহাসের মধ্যে জাতির অতীত যেমন বিধৃত হয় তেমনি ভবিষ্যৎ স্বপ্নও প্রচ্ছন্ন থাকে যা গবেষকদের টেনে আনতে হয়। পাশাপাশি সমাজের অগ্রণী অংশ সেই স্বপ্ন সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কাজেও এগিয়ে যায়। সমাজের রথের চাকা এইভাবেই সামনে এগোয়। কৃষ্টি সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষা, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য, তথা নান্দনিক বিকাশ ধারাও সমৃদ্ধ হতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠে। সমাজের বুদ্ধিজীবিদের বিকাশ সম্ভবনাও উন্মুক্ত হয়। সমাজ শত পুষ্পের সমারোহে সুবহ ও সুগন্ধ যুক্ত হয়। এই পুষ্প বিকাশ সমারোহই জাতির প্রকৃত বিজ্ঞাপন। প্রতিটি সম্প্রদায়গত নিবন্ধ বা ইতিহাস রচনায় এখানেও স্বপ্ন সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়েছে। সামগ্রিক পর্যালোচনায় যা বেরিয়ে এসেছে তাতে স্পষ্টতই ত্রিপুরার উপজাতিদের সার্বিক বিকাশ ধারা উপনিষদ ঋদ্ধ "চরৈবেতী" এই আপ্ত বাক্যকেই মান্যতা দিচ্ছে, উপ-এই উপসর্গ কে এখন এরা বাহুল্য মনে করছেন এবং একটি চেতনা সমৃদ্ধ জাতিতে রূপান্তরের সন্ধি লগ্নে এঁরা পৌঁছে গেছেন। এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের মতন ঋষির কণ্ঠধ্বনিকেই

যেন ত্রিপুরার উপজাতিদের রণধ্বনি বলে মনে হয়।

" তোমার প্রকাশ হউক কুহেলিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
রিক্ততার বক্ষ ভেদী আপনারে করো উন্মোচন;
ব্যক্ত হউক জীবনের জয়—
ব্যক্ত হউক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়।"

কী নেই এই উপজাতিদের? ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, তাঁদের সমৃদ্ধ। সমাজে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি নির্ভর লোকেরা সংখ্যায় বাড়ছে। জুম চাষ থেকে এঁরা সমতল চাষে এসেছেন। ব্যবসা বাণিজ্য, সরকারী দপ্তরখানায় এরা দক্ষতার কখনো অতি দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ্, সাংবাদিক নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবান। জাতীয় আর্ন্তজাতিক ফোরামে এঁরা উপস্থিত। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ জীবনচর্চা থেকে গবেষণাগার কোথায় এঁরা নেই? আর যাঁরা জাতি তাদের অধিক কী রয়েছে? বৈষয়িক বিত্ত সম্পদ, স্মার্টনেস ব্যবসা-বাণিজ্য আর সামাজিক সম্পদের সিংহভাগের দখল এই পঞ্চমাত্রিক অলঙ্কারই মাত্র অগ্রসর জাতির পুচ্ছে সাঁটা। তার বেশী কী? হ্যাঁ ভাষার অহঙ্কার। সাহিত্যের অহঙ্কার। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ। ককবরকও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তবে বাংলার সমউচ্চতায় নয়। ককবরকের নিজস্ব লিপি নেই। বাংলা হর্‌ফ না রোমান হরফ এই নিয়ে বিতর্ক চলছে। কেবল মগ ও চাকমাদের পৃথক ভাষা। উভয় ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রয়েছে। রয়েছে সমৃদ্ধ লোক সাহিত্যও। প্রতিকূলতার কারণে জাতিতে উত্তরণ আটকে যাবে? ককবরক ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, কবিতা এসবের মান কী বাংলায় লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতার মানের চাইতে কম? বা সব চাইতে পেছনে চলতে শুরু করেও কি তারা খুব বেশী পশ্চাৎগামী? বা উৎকর্ষে ন্যূন? হ্যাঁ; কথা উঠবে উপজাতিদের অন্যান্য ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য নিয়ে। এই নিয়েই বা কথা উঠবে কেন? বাংলা ভাষাতেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ডায়ালেকট রয়েছে। সেই সব কথ্য ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টিও হচ্ছে। সাহিত্য তো ভাষা প্রকাশের মাধ্যম। তা হলে অসুবিধা কোথায়? সমৃদ্ধি, সংখ্যা ও ব্যাপকতায় ককবরকই এগিয়ে। সমগ্র উপজাতি সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় ভাষা। সম্প্রদায়গত ভাবে নিজ নিজ কথ্যরীতি বজায় রেখেও সকলেই ককবরক বলতে পারেন, বুঝতে পারেন। উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টিও ককবরকেই।

ভাষার বহমানতা থাকুক। কিন্তু সকলের সংযোগভাষাও একটি চাই। জাতির গ্রন্থনার জন্যেই এর প্রয়োজনীয়তা। তবে তা বাস্তবতা পায় ব্যবহারের মাধ্যমে। ভাষার প্রতিবন্ধকতাও দূর হচ্ছে; রাজ্যের উপজাতি সম্প্রদায় সমূহের সমাহারে জাতি বিকাশের কাজটি দ্রুত এগোচ্ছে। এখন উপ- উপসর্গ খসিয়ে দিয়ে একটি জাতির জন্ম কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই যুগসন্ধিক্ষণেই ত্রিপুরার ককবরক ভাষাগোষ্ঠী ও হালাম গোষ্ঠীর আত্মবিকাশ বিজ্ঞাপনের উপযুক্ত সময় বলে আমরা মনে করেছি। গ্রন্থটি ঐ তাগিদেরই ফসল। বই- এর কলেবর বৃদ্ধির বিষয় চিন্তা করে আমরা প্রকল্পটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। ১৯ টি উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মোঙ্গলয়েড গোষ্ঠীভুক্তদের প্রথম খন্ডে স্থান দেওয়া হয়েছে। অষ্ট্রিক গোষ্ঠীভুক্ত উপজাতি সম্প্রদায়গুলির

বিবরণ দ্বিতীয় খন্ডে ছাপানো হবে। যাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কথা লিখলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী নিরঞ্জন চাকমা ব্যতীত সংখ্যাগরিষ্ঠরাই অপেশাদার। এই প্রথম লিখছেন। তাঁদের লেখা অবিকৃত রাখা হয়েছে যাতে বুঝতে অসুবিধা না হয় যে তাঁদের মেধাও পেশাদারী গবেষকদের মতনই ধারালো। ও লেখকেরাই উৎসাহ নিয়ে আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছেন, উৎসাহ দেখিয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন। পরিশেষে দেখা গেল, তাঁদের লেখা যখন শেষ হল, তাঁরা প্রত্যেকেই একটি মূল্যবান গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছেন। নূতনদের আবিষ্কার করতে পেরে এবং তাঁদের সাফল্যে আমরা গৌরব বোধ করছি। লেখকদের কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমাদের নেই।

তবু বলব, অপূর্ণতার ক্রটি মেনে নিয়েই বলব, আমরা পৃষ্ঠা খুলে দিলাম যার কিছু অংশ বর্ণমালায় সাজানো; কিছু রইলো খোলা পাতা সাদা যা ভবিষৎ প্রাপ্তিকে পূর্ণ করবে। এই পর্বে প্রথম খন্ডের মঙ্গলাচরণ।

কর্নেল চৌমুহনী
আগরতলা, ত্রিপুরা
২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ ইং

নরেশচন্দ্র দেববর্মা
বিমান ধর
কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী

পুরান ত্রিপুরা

উত্তর পূর্ব ভারতের প্রত্যন্ত ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় মোট ১৯টি জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাস। এদের মধ্যে পুরান ত্রিপুরারা বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী নিজেদের তৗইপ্রা (Twipra) তাইপ্রাসা অথবা বরক হিসেবেই পরিচিতি দিতে বেশী পছন্দ করেন। তৗইপ্রা শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থে তাই - মানে জল অথবা নদী এবং প্রা বা বুপ্রা অর্থে সঙ্গমস্থল বুঝায়। তাই + প্রা = অর্থাৎ নদীর সঙ্গমস্থলে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরাই "তৗইপ্রা" জনজাতি হিসেবে পরিচিত।

জনসংখ্যা

২০০১ সালের সেন্সাস অনুসারে রাজ্যে সর্বমোট ৫,৪৩,৮৪৮জন তৗইপ্রা জনজাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৭.৭৪জন। এর মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা ২,৭৫,৭৮৭জন, স্ত্রীলোক ২,৬৮,০৬৪জন। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সংখ্যার হার শতকরা ৯৭জন।

গত একশত বছরে তৗইপ্রা জনজাতিদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিম্নরূপ ঃ-

১৯০১ - ৩৮,৩০৮জন	১৯৭১ - ২,৫০,৫৪৫জন
১৯৩১ - ৭৭,৫৮০জন	১৯৮১ - ৩,৩১,৮৪২জন
১৯৫১ - ১,৫০,৯৭১জন	১৯৯১ - ৪,৬১,৫৩১জন
১৯৬১ - ১,৮৯,৭৯৯জন	২০০১ - ৫,৪৩,৮৪৮জন

পুরান ত্রিপুরাদের জনবিন্যাস

রাজ্যের বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে সারা রাজ্যেই এই জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সর্বাধিক। তারপরেই দক্ষিণ ত্রিপুরা ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা (অধুনা ধলাই জেলাসহ)।

১৯৯১ সালের সেন্সাস অনুসারে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় এদের জনবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ-

সর্বমোট	পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	উত্তর ত্রিপুরা জেলা
৪৬১৫৩১	২,৮৩,৬১৮	১০৫৮২৮	৭২০৮৫

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমা, খোয়াই মহকুমা, সোনামুড়া মহকুমা এবং ধলাই জেলার কমলপুর ও আমবাসা মহকুমায় এই জনগোষ্ঠীর বসবাস সর্বাধিক।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও অন্যান্য জেলাতেও ত্রিপুরা জনজাতি গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

ত্রিপুর ক্ষত্রীয়

ত্রিপুরার রাজবংশ ক্ষত্রিয় রাজবংশ হিসেবে পরিচিত। ত্রিপুরার মহারাজা ত্রিলোচনের সমসাময়িক কাল থেকেই এই ক্ষত্রিয় রাজবংশের উন্মেষ।

রাজমালায় উল্লেখ রয়েছে -

"ত্রিলোচন ঘরে বার পুত্র উপজিল

বার ঘর ত্রিপুর নাম তার খ্যাতি হৈল"

- রাজমালা- ত্রিলোচন খণ্ড পৃ- ২৫

ত্রিলোচনের কাল থেকে ত্রিপুর ক্ষত্রিয়রা "বার গরিয়া" নামে পরিচিত। কালের বিবর্তনে এই "বার গরিয়া"র অনেক শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয়েছে। ত্রিপুরার মহারাজাদের নিকট আত্মীয় স্বজন- পরিবার পরিজনগণ- কর্তা, ঠাকুর ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হতেন। সম্মান ও প্রতিপত্তিতে রাজার পরেই তাঁদের স্থান ছিল। রাজতন্ত্রের অবসানে কালানুক্রমে তাঁদের সেই সম্মান ও প্রতিপত্তি ক্রমশ: ম্লান হয়েছে সন্দেহ নেই।

ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পুরান ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, রিয়াং ও নোয়াতিয়া। রাজন্য আমলেই "হালাম" সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকেও পঞ্চত্রিপুরী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সম্প্রতি গত শতকের ৮০-এর দশকে দেশী ত্রিপুরা বা লস্করদের পঞ্চ ত্রিপুরী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই থেকে দেশী ত্রিপুরা বা লস্কর সম্প্রদায় আর তপশীলভুক্ত জনজাতি সম্প্রদায় নন।

পুরাতন ত্রিপুরা

পুরান ত্রিপুরা পুরুষ ও মহিলা

ত্রিপুরার স্বাধীন রাজাদের সুদীর্ঘ শাসনে ত্রিপুর ক্ষত্রিয়দের পরেই পুরাতন ত্রিপুরাদের স্থান। রাজসরকারী বিভিন্ন কাজের জন্য পুরাতন ত্রিপুরাদের বারটি হদায় বিভক্ত করা ছিল ঃ

বার হদা (হুদ্দা = উপাধি)-র তালিকা নিম্নরূপ ঃ -

(১) বাছাল (২) শিউক (৩) কোয়াতিয়া (৪) দৈত্যসিং (৫) হুজুরিয়া (৬) শিলটিয়া (৭) আপাইয়া (৮) ছত্রতুইয়া (৯) দেওরাই বা গালিম (১০) সুবে নারান

(১১) সেনা (১২) জুলাই

বার হুদার দায়িত্বভাগ

(১) বাছাল	-	রাজদরবারে ও রাজ অভিযানে পান ও পাঞ্চা বহন, রাজবাড়ীতে পার্বতী প্রথায় পূজা-পার্বণে দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতীক প্রস্তুতি, পূজামণ্ডপ নির্মাণ, রাজ পরিবারের বিবাহ উৎসবে বেদী নির্মাণ এবং "হসম ভোজন" আয়োজন করা। (বি: দ্র: হসম ভোজন প্রতি বছর বিজয়াদশমী উপলক্ষে প্রজা-প্রতিনিধিদের নৈশ ভোজ)
(২) শিউক	-	শিকারীর কাজ। রাজ পরিবারে আহারার্য পশু-পক্ষী শিকার ও অন্যান্য দায়িত্ব।
(৩) কোয়াতিয়া	-	পান-সুপারী বাহক, রাজ দরবারে ফুলের মালা যোগান, রাজ সিংহাসন সাজানো ইত্যাদি।
(৪) দৈত্য সিং	-	পূজাপার্বণের সময় শ্বেত পতাকা বহন, দেবতার কাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।
(৫) হুজুরিয়া	-	রাজা ও রাজ পরিবারের সর্বসময়ের জন্য।
(৬) ছিলটিয়া	-	ফাই-ফরমাস খাটা, পূজার্চনা কালে ভোগপাত্র বহন ইত্যাদি।
(৭) আপাইয়া	-	রাজ পরিবারের জন্য মাছ কেনা ও জ্বালানী কাঠ যোগাড় ইত্যাদি।
(৮) ছত্র তুইয়া	-	ছত্র বাহক।
(৯) দেওরাই বা গালিম	-	দেবতার পূজারী। অতি সম্মানীয় দায়িত্ব পালন।
(১০) সুবে নারান	-	পূজা অর্চনা ও হসম ভোজনের জন্য প্রস্তুতির দায়িত্ব পালন।
(১১) জুলাই	-	দাসদাসীর কাজ করা।
(১২) সেনা	-	বার হুদা বা সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি যদি সামাজিক অনুশাসন ভঙ্গ করে তবে ঐ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সমাজচ্যুত হন। এই সাময়িক সমাজচ্যুত ব্যক্তি ও পরিবার পরিজনদের নিয়েই সেনা হুদা গঠিত। এই হুদার দায়িত্ব হল- হসম ভোজনে পাকশালের প্রস্তুতি, ঠাকুর লোকদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার ও হসম ভোজনে রান্না প্রস্তুতি শেষে ঢাক ঢোল বাজিয়ে আমন্ত্রিতদের পংক্তি ভোজে আহ্বান। এছাড়া খার্চি পূজার সময় ঢাকঢোল বাজনা ও তাদেরই দায়িত্ব।

উপরিউক্ত বার দফা ছাড়াও জুলাই দফাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য ১১টি উপদফায় চিহ্নিত ছিল। যথা:- (১) দাস পাইয়া - তরকারি বিক্রেতা (২) মনারায় - ময়নাপাখি সংগ্রাহক (৩) তোতারায় - তোতাপাখি সংগ্রাহক ও পালক (৪) মামি প্লাকছা - বিন্নী চাউল সংগ্রাহক (৫) মাইছা প্লাক্সা - জুমধান চাউল সংগ্রাহক (৬) গোলছড়ি - গোলমরিচের চারা সংগ্রাহক ও রোপণকারী (৭) চোলংরায় - ক্ষারজল প্রস্তুতকারক (৮) মছারায় - মরিচ পেষক (৯) অদ্‌রায় (১০) জিৎরায় (১১) সিমকাছা - শেষোক্ত তিনটি উপ-দফার দায়িত্ব সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট

তথ্য নেই।

পুরান ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা ও উপভাষাগোষ্ঠী

পুরান ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা ত্রিপুরী, যেটি ককবরক নামেই সর্বাধিক প্রচলিত ও গৃহীত। ককবরক অর্থাৎ কক = ভাষা; বরক - মানুষ = ককবরক মানুষের ভাষা। ককবরক ইন্দো-মঙ্গোলয়েড ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তর পূর্ব ভারতে বড়ো, ডিমাসা, লালুং ইত্যাদি বহু ককবরকের সহোদরা উপ-ভাষা গোষ্ঠী বর্তমান।

যাইহোক যে কোনো ভাষার যেমন বিভিন্ন উপভাষা গোষ্ঠী রয়েছে - ককবরকেরও তেমনি অঞ্চলভেদে মোট ৭ (সাত)টি উপভাষা গোষ্ঠী বিদ্যমান -

(১) বেরী, (২) ডোনা, (৩) দাস্পা (৪) লখপতি (৫) গোলছড়ি (৬) দক্ষিণ এবং (৭) সরবং

উপভাষা গোষ্ঠী		বসবাসের এলাকা
১) বেরী	-	খোয়াই মহকুমার খোয়াই নদীর পূর্বতীর থেকে আঠারোমুড়া পাহাড় অতিক্রম করে কমলপুর মহকুমার বিভিন্ন মৌজা।
২) দোনা	-	খোয়াই মহকুমার খোয়াই নদীর পশ্চিমাংশ এবং বড়মুড়া পাহাড় অতিক্রান্ত করে সদর মহকুমার (সদর উত্তর) বিভিন্ন জনপদ ও মৌজা।
৩) দাসপা	-	কমলপুর মহকুমা- কৈলাসহর ও ধর্মনগর মহকুমার পুরান ত্রিপুরা অধ্যুষিত অঞ্চল।
৪) লখপতি	-	সদর মহকুমার পুর্বাংশ ও উত্তর পূর্বাংশ।
৫) গুলছড়ি	-	খোয়াই মহকুমার পশ্চিম দক্ষিণাংশ।
৬) দখিন	-	বিশালগড় মহকুমার বিশালগড়, গোলাঘাটি, টাকারজলা ও সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত ত্রিপুরী জনপদ।
৭) সরবং	-	সদর মহকুমার পূর্ব-দক্ষিণাংশ, জিরানীয়া, মান্দাই ইত্যাদি জনপদ।

উল্লেখ থাকে যে, সামাজিক বিবর্তনে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমশ: উন্নতিক্রমে এবং বিবাহ-বন্ধন ও সামাজিক বৃহত্তর বন্ধনে ধীরে ধীরে এই উপভাষা গোষ্ঠীগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ: ক্ষীণ হচ্ছে।

পুরান ত্রিপুরাদের পদবী (Surname)

ত্রিপুরার রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রূপে পরিচিত ছিল। মহারাজা কিংবা মহারাজ উপাধি গ্রহণের পূর্বে "ফা" উপাধি ধারণ করতেন। (যুঝারু ফা, ডাঙ্গর ফা ইত্যাদি) পরবর্তী যুগে ত্রিপুরার রাজাগণ মাণিক্য - মহামাণিক্য উপাধিতে ভূষিত হন। উত্তর আধুনিক ত্রিপুরা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ত্রিপুরার মহারাজাগণ "দেববর্মণ" উপাধিতে ভূষিত হন। সম্ভবত: "দেববর্মণ" এই উপাধি থেকেই দেববর্মণের উৎপত্তি।

পুরান ত্রিপুরাদের নামের সাথে উপাধির সংযুক্তির প্রকৃত সময়কাল গবেষণা সাপেক্ষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজ শাসনের দলিল দস্তাবেজে পুরান ত্রিপুরাদের নামের সাথে উপাধি প্রায় ছিলই না। বড়জোর "দেব" অথবা স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে 'দেবী' উপাধি প্রয়োগ হত।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পুরান ত্রিপুরীগণ "ত্রিপুরা" উপাধিতেই ভূষিত হতেন। সমসাময়িক দলিল দস্তাবেজ বিশেষত: জমির মালিকানা সর্ত সম্বন্ধীয় দলিলেও পদবী হিসেবে "ত্রিপুরা"-ই ব্যবহৃত হতো। যেমন কুলচন্দ্র ত্রিপুরা পিতা * রবিলোচন ত্রিপুরা ইত্যাদি।

যেহেতু উত্তর অধুনিক ত্রিপুরায় মহারাজাগণ 'দেববর্মণ' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, সেই হেতু রাজ পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্ট নিকট আত্মীয় স্বজনও নিজেদের 'দেববর্মণ' উপাধিতে ক্রমশ: পরিচিত হন। অপরদিকে পুরান ত্রিপুরাগণ পদবী হিসেবে 'দেববর্মা' গ্রহণ করেন। অধুনা ত্রিপুরায় ঠাকুর পরিবার বা পুরান ত্রিপুরাদের অধিকাংশই "দেববর্মা" উপাধিতেই পরিচিত হচ্ছেন।

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানাবিধ খেতাব প্রদান করা হতো। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - কর্তা, কর্তাবাহাদুর, ঠাকুর, সেনাপতি, হাজারী, কবরা, গালেম, চৌধুরী, সর্দার, জমাদার, দলপতি, দফেদার, নায়েক ইত্যাদি। পুরান ত্রিপুরাদের গ্রাম- পাড়া- মহল্লাগুলো এখনও রাজাদের দ্বারা ভূষিত উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নামেই জনপদগুলোর নাম সুপরিচিত ও সরকারী নথিভুক্ত হয়েছে।

কয়েকটি উদাহরণ :-

(১) শরৎ ঠাকুর পাড়া (২) উদয় জমাদার পাড়া (৩) গোবিন্দ সেনাপতি পাড়া (৪) লক্ষ্মণ সর্দার পাড়া (৫) সুবল কবরা পাড়া (৬) বিনন হাজারী পাড়া (৬) গামছা কবরা পাড়া, (৭) ক্ষীরুজু নায়েক পাড়া (৮) শরৎ চৌধুরী পাড়া ইত্যাদি।

পুরান ত্রিপুরাদের সামাজিক পরিকাঠামো

ত্রিপুরাধিপতি (মহারাজ)

↓

কর্তা / কর্তাবাহাদুর

↓

হাংকর / পরগণা

↓

মণ্ডল / ময়াল

↓

গ্রাম

↓

পাড়া-মহল্লা-কামি

উল্লেখিত সামাজিক পরিকাঠামোর সর্বনিম্নে পাড়া, মহল্লা বা কামিগুলোতে পুরান ত্রিপুরাদের সুসংবদ্ধ সমাজ জীবনে বসবাস। প্রতিটি পাড়া এবং কামিগুলোতে

(১) পাড়া চৌধুরী (২) অচাই (৩) বারুওয়া (৪) খান্দল (৫) কারবারি (৬) বারিফাং নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিগণ সামাজিক অনুশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পুরান ত্রিপুরাদের সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী জীবনে এক একটি পাড়ায় ন্যূনপক্ষে ৩ পরিবার এবং

সর্বাধিক ১২৫ থেকে ১৫০ পরিবারের বসবাস। প্রতিটি গ্রাম বা পাড়াতেই উল্লেখিত নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তিগণ বা সংশ্লিষ্ট পাড়ার অধিবাসীদের সামাজিক অনুশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। যেমন :-

১) পাড়া চৌধুরী	-	সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সর্বোচ্চ সম্মান অধিকারী ও নিয়ন্ত্রক।
২) অচাই	-	পাড়ার অধিবাসীদের বিভিন্ন পারিবারিক অথবা সামাজিক পূজা পার্বণ ও অনুষ্ঠানের পুরোহিত।
৩) বারুওয়া	-	অচাই এর সর্বদা সহকারী
৪) খান্দল	-	রাজ্যশাসনের প্রশাসনিক অধিকারী অথবা রাজ কর্মচারীদের সাহায্যকারী।
৫) কারবারি	-	পাড়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিচারসভা ইত্যাদির আহ্বায়ক।
৬) বারিফাং	-	রাজ কর্মচারীদের সংশ্লিষ্ট পাড়ায় আসার সময়ে অতিথি আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন।

পুরান ত্রিপুরাদের পারিবারিক পরিকাঠামো

পুরান ত্রিপুরাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জীবন। সুতরাং সর্ব বয়োজ্যেষ্ঠ-পুরুষই সংশ্লিষ্ট পরিবারের কর্তা ব্যক্তি। পরিবারের প্রতিটি সদস্য/সদস্যার প্রতিপালন, অন্ন, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ- এক কথায় সামগ্রিকভরণপোষণের দায়িত্ব গৃহকর্তার। গৃহকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী পরিবারের সদস্যগণ পরিচালিত। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠা বা গৃহিণী পরিবার পরিচালনায় গৃহকর্তাকে সদা সর্বদা সহযোগিতা ও উপযুক্ত পরামর্শ দান করেন।

পরিবারের সমস্ত সদস্যদের উপার্জন বা রোজগার সাধারণত: গৃহকর্তার কাছেই গচ্ছিত রাখার প্রথা। অবশ্য সাবালক পুত্র কন্যারা নিজ নিজ আয় উপার্জনের কিছু অংশ নিজেদের কাছেই রাখাতে কোন বাধা নেই। গৃহ কর্তা গার্হস্থ্য কাজ অথবা কৃষি কাজ সব ক্ষেত্রেই প্রত্যেব সদস্যদের বা একাধিক সদস্যদের মধ্যে দৈনন্দিন কর্ম বন্টন করেন এবং সেটা সকলেই সাগ্রহে পালন করেন।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাবালক পুত্র/পুত্রগণ পারিবারিক কাজকর্মে গৃহকর্তাকে সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং অনুরূপভাবে সাবালিকা কন্যা/কন্যাগণ গৃহকর্ত্রীকে নানাবিধ পরামর্শ ও গার্হস্থ্য কর্মে সহযোগিতা করেন।

পরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যু অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিধবা মহিলা এবং তার সন্তানগণও সংশ্লিষ্ট পরিবারেই প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন না।

সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে পুরান ত্রিপুরা পারিবারিক জীবনেও একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার ক্রমশ: ছোট পরিবারের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। তার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে NUCLEUS FAMILY সৃষ্টি হচ্ছে।

সামাজিক রীতিনীতি ঃ পুরাতন ত্রিপুরী প্রধানত: হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাঁহাদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান তাই হিন্দুধর্মানুশ্রিত।

জন্ম উৎসব ঃ কোন পরিবারে সন্তান জন্মানোর পূর্বেই গর্ভবতী মা ও ভাবী সন্তানের মঙ্গল

কামনায় বিশেষত: সন্তান প্রসব কালে কোন বাধা বিপত্তি যাতে না হয় তার জন্য সন্তান জন্মের ৫ পাঁচ বা সাত মাস আগেই "ফাঁড়া টিন্‌মা" (বিঘ্নহর) পূজা করা হয়। সেই পূজা অচাই বারওয়া সহযোগে হাঁস অথবা পাঁঠা বলির মাধ্যমে থুমনাইরগ বানরগের পূজা দেওয়া হয়। পূজাস্থল গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে কোন এক জঙ্গলাকীর্ণ স্থলে নির্বাচন করা হয়। পূজার প্রসাদ ইত্যাদি বাড়িতে নিয়ে আসা নিষেধ।

সন্তান সম্ভবা মায়ের জন্য সাধারণত: আগে থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট ঘর থাকে। প্রসব বেদনা ওঠার সাথে সাথে প্রসূতিকে ঐ নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ির এবং পাড়ার প্রতিবেশী বয়স্কা মহিলারা প্রসূতির দেখাশুনা ও সেবা শুশ্রূষা করেন। তদুপরি এলাকার নির্দিষ্ট "কুমাজীক (ধাত্রী) কে তলব করা হয়। ধাত্রী এসে প্রসূতির সাহায্য করেন।

প্রসবে বিলম্ব হলে প্রয়োজনে পুনরায় থুমনাইরগ বনিরগ পূজা দেওয়া হয়।

সন্তান প্রসব হলে ধাত্রী নবজাত শিশুটি উষ্ণ জলে স্নান ও পরিষ্কার করেন ও নাড়ী কাটেন। সন্তান জন্মের পর মা ও শিশুকে সেই ঘরেই রেখে দেওয়া হয়। সদ্য প্রসবিণী মাকে বাড়িতে প্রবেশ ও বিশেষত: রান্নাবান্নার কাজ থেকে নিষেধে রাখা হয়। পাড়ার কোন পরিবারে নতুন শিশু জন্মালে ঐ শিশুর 'আবুল ছোনা' পর্যন্ত অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক সূর্যদর্শন উৎসব না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক দেবদেবীর পূজা স্থগিত রাখা হয়।

সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী শুকিয়ে ঝড়ে গেলে শিশুটি পুত্র সন্তান হলে ৯ দিন পর এবং কন্যা সন্তান হলে ৭দিন পর 'আবুল ছোনা' উৎসব করা হয় এবং মা ও সন্তানকে অশৌচের শুদ্ধিকরণ করা হয়। তবে এই আবুলছোনা উৎসবের দিন নির্ভর করে নাড়ী শুকিয়ে ঝরে যাবার সময়ের উপর। সে ক্ষেত্রে জোর তারিখ বাদ দিয়ে বিজোড় তারিখে 'আবুল ছোনা' উৎসব করা হয়।

আবুল ছোনা উৎসবে অচাই-বারওয়া ও পাড়া চৌধুরীসহ পাড়ার বয়স্ক নারী পুরুষ ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের উভয় অংশের আত্মীয় স্বজনগণ নিমন্ত্রিত হয়ে উৎসবে যোগদান করেন। লাম্প্রা পূজার মাধ্যমে পূজার পবিত্র জল সিঞ্চন করে মা ও শিশু এবং পরিবারের ঘরদোর শুদ্ধিকরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় উপাচার সহযোগে শিশুটির সূর্য দর্শন ও নামকরণ করা হয়।

অবুল ছোনা উৎসব শেষ হবার পরই মা ও শিশুকে গৃহ-প্রবেশ করানো হয় এবং সামাজিক পূজা-পার্বণও আবার যথারীতি উদ্‌যাপন করা হয়।

পুরান ত্রিপুরা সমাজে বিবাহ

পুরান ত্রিপুরা সমাজে বিবাহের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধারা বিদ্যমান:-

(১) চা-মারী (ঘর জামাই) তুলে বিবাহ

(২) কন্যাপণ আদায় দিয়ে বরের স্বগৃহে বিবাহ

(৩) যুবক-যুবতীদের মধ্যে পরস্পর ভালবাসার মাধ্যমে বিবাহ।

(৪) যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে বিবাহ।

চা-মারী তুলে বিবাহ ঃ এই বিবাহ প্রথায় ভাবী বরকে বাধ্যতামূলক ভাবী শ্বশুরগৃহে গিয়ে ঐ পরিবারের সাথে বসবাস করে সাংসারিক যাবতীয় কাজ কর্মে অংশীদার হতেই হবে।

চা-মারী তোলা প্রথাও তিনটি পৃথক শ্রেণী রয়েছে - (ক) চা-মারী অম্পা- স্বল্পকালীন (বিবাহের

পূর্বে) চা-মারী তোলা । (খ) চা-মারী কড়া - সুনির্দিষ্ট বছরের জন্য চা-মারী তোলা। (গ) চা-মারী অমর- সারাজীবনের জন্য ঘর-জামাই হয়ে থাকা।

(ক) চামারী অম্পা ঃ বর ও কনের উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে ঐক্যমত হবার পর হবু বরকে স্বল্প মেয়াদীদের জন্য শ্বশুর গৃহে জামাই খাটা। যেমন - বিবাহ যদি ফাল্গুন মাসে ঠিক হয় তবে ভাবী জামাইকে অগ্রহায়ণ মাস নাগাদ ভাবী শ্বশুর গৃহে জামাই উঠতে হয়। অত:পর যথাসময়ে বিবাহের পর নতুন বছরের প্রথমদিকে নতুন বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে নিজের পরিবারে ফিরে যাওয়ার রীতি।

পুরাণ ত্রিপুরা-বিবাহ উৎসব

(খ) চা-মারী কড়া ঃ বর ও কনে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে অলোচনার পর ভাবী জামাইকে সুনির্দিষ্ট বছরের জন্য শ্বশুর গৃহে থাকার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। সেই বাধ্যতামূলক থাকার মেয়াদ চুক্তি অনুসারে ৩ বছর বা ৫ বছর হয়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই মেয়াদ ভঙ্গ করা যাবে না। অন্যথায় সামাজিক ভাবে বিচারে যে রায় দেওয়া হবে সেই রায়কে কার্যকর করা উভয়ের পক্ষে বাধ্যতামূলক।

(গ) চা-মারী অমর ঃ উভয় পক্ষের বৈবাহিক চুক্তি অনুসারে ভাবী জামাইকে বিবাহের পূর্বেই শ্বশুর গৃহে জামাই উঠতেই হবে। অত:পর বিবাহ সম্পন্ন হবার পর বর ও কনে বাপের বাড়িতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন। অবশ্য দীর্ঘ ৫/৭ বছর শ্বশুর বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে বসবাসের পর ঐ দম্পতিকে নিজস্ব নতুন পরিবার গণ্য করে পৃথক বাসস্থান ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রদান করা হয়।

(২) যুবক-যুবতী উভয়ের পারস্পরিক ভালবাসায় বিবাহ ঃ যদি কোন যুবক ও যুবতীর মধ্যে

প্রেম-ভালবাসা গাঢ়তর লাভ করে সেই ক্ষেত্রে বর ও কন্যাপক্ষের অভিভাবকগণ পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও পাড়া- চৌধুরী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মতি নিয়ে যুবক-যুবতীর বিবাহ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বিবাহের পূর্বে জামাই-খাটা বা কনের বাপের বাড়িতেই বিবাহ অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক নয়। সেই বিবাহ প্রতিপক্ষ নিজেদের বাড়িতেও আয়োজন করতে পারেন। সাধারণভাবে অনুরূপ বিবাহে কন্যাপণ বা যৌতুকাদি দেওয়া উভয়ের পক্ষে বাধ্যতামূলক নয়। বিবাহিত দম্পতি হয় স্বামীর পরিবারে নয়তো বা স্ত্রীর পরিবারে দম্পতির ইচ্ছানুসারে বসবাস করেন।

(৩) কন্যাপণ আদায় দিয়ে বিবাহ ঃ এইরূপ বিবাহে- বিবাহের পূর্বেই পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মাধ্যমে অলোচনাক্রমে স্থির হয় (১) ভাবী বরকে জামাই উঠতে হবে না (২) পরিবর্তে একসাথে কন্যাপণ পাত্রীপক্ষকে দিতে হয়। কন্যাপণ সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) কুড়ি বা ১২০্ টাকা পর্যন্ত ধার্য্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে বিবাহ বিষয়ে পাত্রীপক্ষের দায় দায়িত্ব প্রায় সবই পাত্র পক্ষকেই বহন করতে হয়। বিবাহের দিন ধার্যের পর শুভ-বিবাহের একদিন আগে ভাবী কনেকে পাত্রপক্ষ এসে তুলে নিয়ে যান এবং পাত্রীপক্ষ থেকেও যথারীতি আত্মীয় স্বজন ভাবী কনের সাথে বিবাহ আসরে অংশগ্রহণ করেন।

(৪) চুরি করে বা বলপূর্বক তুলে নিয়ে বিবাহ ঃ অনুরূপ বিবাহ সাধারণত: বিরল ঘটনা। তথাপি কোন যুবক যদি তার দলবল নিয়ে কোন অনুঢ়া কন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন সেই ক্ষেত্রে পাত্রপক্ষ বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট যুবক যুবতীকে সামাজিক বিবাহের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেন। এই ক্ষেত্রে পাত্রীপক্ষ অনুরূপ বিবাহে সম্মতি নাও দিতে পারেন এবং শুভ বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতেই পারেন।

স্বাভাবিক কারণেই এই ধরনের বিবাহে বিবাহের পূর্বেই সামাজিক বিচারের দ্বারস্থ হতে হয় এবং সামাজিক বিচারের রায় উভয় পক্ষকেই বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে হয়।

উপরি উক্ত চারটি শ্রেণীর বিবাহ ছাড়াও প্রথমাস্ত্রীর বর্তমানে কোন কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহও করেন। কিন্তু সেটা নির্ভর করে ঐ পুরুষের সামাজিক ও আর্থিক প্রতিপত্তির উপর এবং সামাজিক অনুমোদনের উপর। একাধিক মহিলাকে বিবাহ বিরল ঘটনা কিন্তু সমাজে প্রচলিত।

ত্রিপুরার অন্যান্য জনজাতি গোষ্ঠীর মতো পুরান ত্রিপুরী সম্প্রদায়েও বিধবা বিবাহ সুপ্রচলিত এবং সমাজ গৃহীত। কিন্তু প্রাথমিক ও প্রধান সর্ত এই যে, পুরুষ ও মহিলা উভয়েই স্ত্রীহারা এবং স্বামীহারা হতেই হবে। আবার কোন পুরুষ স্ত্রীর মৃত্যুর পর অথবা কোন মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর অবিবাহিতা বা অবিবাহিত কোন যুবতী বা যুবকের সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হওয়া নিষেধ।

পুরান ত্রিপুরাদের বিবাহের অনুষঙ্গিক ধাপ

(১) বিবাহযোগ্য ঃ বিবাহযোগ্য যুবক যুবতীদের বিবাহের দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পিতামাতা বা অভিভাবকদের। পুরান ত্রিপুরা সমাজে উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সন্ধানের দায়িত্বও তাঁদেরই।

অত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে চলে সেই প্রক্রিয়া। আবার কোন কোন এলাকায় বিশেষ

বিশেষ ব্যক্তি আছেন যাঁরা পাত্রপক্ষ ও কন্যাপক্ষের কাছে দূতিয়ালীর কাজ করেন। তাঁদেরকে 'রাইবাই' (ঘটক) বলা হয়। সুনির্দিষ্ট পাত্র বা পাত্রীর খোঁজখবর উভয় পক্ষে যোগাড় হবার পর এক বা একাধিক ব্যক্তি অথবা 'রাইবাই' উভয় পক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা পরস্পরকে জানান। এরপর ভাবী পাত্র ও পাত্রীকে পরস্পরের সাক্ষাৎ-এর ব্যবস্থা করা হয় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে।

এই প্রাথমিক প্রক্রিয়া শেষে দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিত হয় কক সীংমা পান্দা।

কক সীংমা পান্দা ঃ পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ দূতিয়ালী বা রাইবাই মারফৎ কক সীংমা পান্দার দিনক্ষণ ঠিক করেন। সাধারণত এই পান্দা কন্যার পিতৃগৃহেই অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে নির্দিষ্ট তারিখ মতো পাত্রের পিতামাতা অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজন ৫, ৭, ৯ অর্থাৎ বিজোড় সংখ্যায় ভাবী কনের পিতৃগৃহে যান এবং অনুরূপভাবে কন্যাপক্ষ থেকেও পিতামাতা এবং পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সেই পান্দায় অংশগ্রহণ করেন। বিবাহ-দান সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে আলোচনার পর উভয় পক্ষে সহমত হলে- সামাজিকভাবে বিবাহ পদ্ধতি নির্ণয় করা হয়।

পুরাণ ত্রিপুরাদের বিবাহ বেদী

কক জড়া রিমা ঃ সাধারণত: কক সীংমার পর হবু জামাই শ্বশুরালয়ে চা-মারি কানা (জামাই উঠা) শুরু করেন। এরপর আবার ও দূতিয়ালী বা ঘটকের মারফৎ বিবাহের দিন তারিখ ধার্য্য করার জন্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মের জন্য ককজড়া রিমা পান্দা অনুষ্ঠিত হয় একই ভাবে কন্যার পিতৃগৃহেই।

ঐ পান্দাতে বিবাহের তারিখ, লগ্ন, যৌতুকাদি আনুষঙ্গিক খরচের বাজেট ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা হয়। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ বিবাহের দায়িত্ব ভাগ করে নেন। এর পরই পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখে শুভ বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়।

মৃত্যু ঃ পুরান ত্রিপুরা সমাজে কারো মৃত্যু হলে পাড়া প্রতিবেশী অত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই মৃতের বাড়িতে চলে আসেন এবং প্রত্যেকেই মৃতদেহ সৎকারের জন্য সর্ববিষয়ে সহায়তা ও অংশীদার হন।

হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে সমাজে কারো মৃত্যু হলে মৃত দেহ নির্দিষ্ট শ্মশানে দাহ করা হয়। শ্মশানস্থান, সাধারণত: নিকটস্থ কোন নদী বা উপনদীর তীরেই নির্দিষ্ট করা হয়। মৃতদেহ যথারীতি স্নান করানোর পর পবিত্র নতুন বস্ত্র পরিধান করানো হয়। মৃতদেহের উদ্দেশ্যে একটি মোরগ উৎসর্গ করে সেই মোরগের মাংস ও ভাত নিবেদন করা হয়।

অত:পর সম্ভবস্থলে হরি সংকীর্তন সহযোগে শ্মশান যাত্রা করানো হয়। শ্মশানে পৌছে আনুষঙ্গিক অন্যান্য উপাচারের পর মৃতদেহ চিতায় তোলা হয় এবং মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পুত্রগণ অথবা নিকট আত্মীয়- মুখাগ্নি করেন। এরপর শ্মশানে উপস্থিত সমস্ত নারী পুরুষ চিতায় অগ্নি সংযোগ করেন। মৃতের দাহ কার্য সম্পূর্ণ হলে তার পরদিন "থাপ্‌লা খিবি" বা চিতা ধোয়ার কাজ করা হয়। সেই সময়েই মৃত ব্যক্তির কপালের হাড়ের অংশবিশেষ 'অস্থি' হিসেবে নির্দিষ্ট বাঁশের কৌটোয় ভরে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং শ্রাদ্ধের আগের দিন পর্যন্ত "সাই তথা" নিবেদন করা হয়।

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কার্য

প্রাচীন ত্রিপুরা সমাজে শ্রাদ্ধকার্য তিন প্রকার

(১) ত্রি-রাত্রি শ্রাদ্ধ

(২) হরচিনি শ্রাদ্ধ

(৩) ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধ

ত্রি-রাত্রি শ্রাদ্ধ

যদি কোন শিশুর মৃত্যু হয় (পাঁচ বছরের কম বয়সী) সেই ক্ষেত্রে মৃত্যুর তিন দিন পর তার পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি করা হয়।

অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্কের মৃত্যুতে ও মাতৃপক্ষের নিকট আত্মীয়গণ ত্রি-রাত্রি শ্রাদ্ধই করেন। যেমন পিতা বা মাতার মৃত্যুতে কন্যা-জামাতা বা কন্যা-জামাতাগণ মৃত ব্যক্তির জন্য ত্রি-রাত্রি শ্রাদ্ধ করাই সামাজিক বিধি।

হরচিনি শ্রাদ্ধ

হরচিনি অর্থে হর (রাত্রি) চিনি/ছিনি (সাত) অর্থাৎ মৃত্যুর তারিখ থেকে সপ্তম রাত্রির শেষে শ্রাদ্ধাদি কার্য। প্রাচীন কালে এই শ্রাদ্ধকার্য্যই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল।

ত্রয়োদশ দিবস শ্রাদ্ধ (তেরোদিন)

মৃত্যুর তারিখের ত্রয়োদশ দিবসে যে পূর্ণাঙ্গ শ্রাদ্ধাদির কাজ সম্পন্ন করা হয় তাহাই তেরদিন অথবা ত্রয়োদশ দিবসীয় শ্রাদ্ধ।

এছাড়াও যদি কোন ব্যক্তির অপঘাতে মৃত্যু ঘটে যেমন - বজ্রাঘাতে মৃত্যু, জলে ডুবে মৃত্যু, ফাঁসিতে মৃত্যু, হিংস্র বন্যজন্তুর আক্রমণে মৃত্যু ইত্যাদি অপঘাতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে উপরিউক্ত তিন শ্রেণীর শ্রাদ্ধের পরিবর্তে কোন এক অমাবস্যা তিথিতে শ্রাদ্ধাদিকার্য সম্পাদন করাই সামাজিক রীতি।

পাঁচ বছরের বেশি যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে শবদেহ দাহ করা হয়। কিন্তু পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মৃতদেহ মাটিতে সমাধিস্থ করা হয়। অতি অবশ্যই নির্দিষ্ট শ্মশানঘাটেই এই সমাধি দেওয়া বাধ্যতামূলক।

পুরান ত্রিপুরা সমাজ ও খৃষ্ট ধর্ম

ত্রিপুরার বিভিন্ন আদিবাসী জনজাতি সমাজে খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব এবং ঐ ধর্মাবলম্বী জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি হচ্ছে - এটা অনস্বীকার্য। বিশেষভাবে নতুন প্রজন্মের যুব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ

এই মুহূর্তে খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট। অগামী দিনে এর প্রভাব বৃদ্ধি অনিবার্য।

খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও সামাজিক উৎসবাদী ত্রিপুরায় ঐ ধর্মের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গই সুপরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু এতে শাক্ত ধর্মীদের সাথে তাঁদের কোন বিরোধ নেই।

অস্থি বিসর্জন

যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে মৃতের অস্থি সংগ্রহ করে সেই অস্থি একটি ছোট্ট চালাঘরে রেখে নিত্যদিন পূজা করা হয়। সাধারণত: পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে অস্থি-বিসর্জন করা হয়। বিসর্জন প্রাচীনকালে যে কোন নিকটস্থ নদীতে নতুবা সম্ভব ক্ষেত্রে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে পবিত্র গঙ্গানদীতে অস্থি বিসর্জন করাই সামাজিক রীতি।

অতি সাম্প্রতিক কালে ডম্বুর তীর্থে, মেলাঘরের রুদ্র সাগরে, কিংবা তেলিয়ামুড়ার নিকটস্থ খোয়াই নদীর চাকমাঘাটে অস্থি বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে।

মকর সংক্রান্তিতে অস্থি বিসর্জনের পরবর্তী ধাপে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে মহাবিষুব সংক্রান্তির পবিত্র তিথিতে মৃত-আত্মার উদ্দেশ্যে শেষ ভোগ নিবেদন করা হয়। খুম্‌পলা নামীয় একটি ফুলগাছের পাতা ভোগদানের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে দু'টি ভাগে ছিঁড়ে দিয়ে মৃতের আত্মার সাথে চির বিচ্ছেদ বা বিদায় জানানো হয়।

ইদানীং কোন কোন এলাকায় হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করার রীতিও ক্রমশ: প্রচলিত হচ্ছে। তদুপরি মৃত ব্যক্তির নামে মৃতের কয়েক বছর পর "লোকভোজন" অনুষ্ঠান করাও সামাজিক বিধি।

পুরান ত্রিপুরা সমাজে মৃত্যু ও তার পরবর্তী কার্যক্রম সম্পূর্ণতই হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী "শাক্ত" জনসাধারণের কর্তব্য। কিন্তু এই সমাজে এক উল্লেখযোগ্য অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে বৈষ্ণবী আচার আচরণ পালন করে আসছেন সেই মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল থেকেই।

বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিদের মৃত্যু ও পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পূর্ণতই বৈষ্ণব ধর্ম অনুসৃত। এ ছাড়াও প্রাচীন ত্রিপুরী সমাজে কেউ কেউ সন্ন্যাস ধর্মও অবলম্বন করে থাকেন - সেই ক্ষেত্রেও মৃতদেহ সৎকার ও পারলৌকিক ক্রিয়াদি সেই সেই সন্ন্যাস ধর্মেরই অনুসারী।

সামাজিক লোক উৎসব, পূজা-পার্বণ ও লৌকিক আরাধ্য দেবদেবী

আবহমান কাল থেকে চলে আসা পুরান ত্রিপুরা সমাজের জীবন- শৈলী সহজ সরল অনাড়ম্বর ও আরণ্যক প্রকৃতির ছন্দ তরঙ্গে আলোড়িত। ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনে সংবৎসরেই সমস্ত ঋতুচক্রেই উৎসবানন্দের উপস্থিতি।

পুরান ত্রিপুরা কৃষি নির্ভর সমাজ। সেই কৃষি কাজ চলে জুম চাষ প্রথায়। সুতরাং সামাজিক উৎসব ও পূজা পার্বণ স্বাভাবিকভাবেই জুম চাষ কেন্দ্রিক। বাৎসরিক জুম চাষের সূচনা "হুক নাইমা" অর্থাৎ নতুন এলাকায় জুম চাষ এলাকা নির্বাচন। সেই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। অানুষ্ঠানিকনতুন জুম চাষ এলাকা নির্দিষ্ট হবার পর শুরু হয় "হুক হক্‌মানি" জুমচাষের এলাকায় জঙ্গল কাটা। সেই নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং জানুয়ারীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত। জানুয়ারী- ফেব্রুয়ারী ও মার্চের প্রথমভাগ পর্যন্ত জঙ্গলকাটা শুকিয়ে যাওয়ার প্রতীক্ষা। মার্চের দ্বিতীয়ভাগে নতুন জুম এলাকা পুড়িয়ে দেওয়া তারপরই নতুন জুম ক্ষেতে চাষবাস সূচনা। জুম চাষের বৃত্তই (Cycle)

জুমিয়া জীবনে উৎসব আনন্দের পঞ্জী (Calender).

(১) মামিতা উৎসব

আশ্বিন মাসের শেষ এবং কার্তিক মাসের প্রথম ভাগ।

মামিতার গানে উল্লেখিত হয়েছে

"রাজা বা কাইঅ অশানি মৌতাই

কাঙাল মামিতা রিঅ।।

রাজা বা থারু মিসিপ্ মথৌনা

কাঙাল তাখুমচা থারু।।

আশ্বিনে দুর্গোৎসব রাজা মহারাজা আনুষ্ঠানিক পূজা পার্বণ ও উৎসবানন্দের আয়োজন করেন। দুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে মহারাজা ধুমধাম সহকারে মহিষ-মিথুন ইত্যাদি উৎসর্গ করেন। প্রজাবৃন্দ বিশেষত: পুরান ত্রিপুরা সমাজ একই সময়ে মামিতা উৎসব আয়োজন করেন। জুমিয়া-দরিদ্র প্রজা মামিতা দেবীর উদ্দেশ্যে হাঁস- মোরগ উৎসর্গ করেই এই উৎসব আয়োজন করেন।

(খ) বলং সুরিমা

সাধারণত: নতুন নতুন বন এলাকায় পরবর্তী জুমচাষের জন্য স্থান নির্বাচন করা হয়। সেই হেতু নতুন জুম চাষ এলাকায় প্রকৃতি পুঞ্জের বিশেষত: বন দেবীর আশীর্বাদ কামনায় এই বলংসুরিমা পূজা অনুষ্ঠান করা হয়।

(গ) মাইকৌতালচামা (নবান্ন উৎসব)

ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জুম ধান কাটা, মাড়াই ঝাড়াই এবং টংঘরে নতুন ধান গোলাজাত করার পর আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই মাইকৌতালচামা পান্দা অনুষ্ঠিত হয়। এই পান্দায় শুধু নিজেরাই উৎসবানন্দ করেন না। সাথে সাথে জুম চাষের জন্য ব্যবহৃত যথা দাও, কাঁচি, কুড়াল, খন্তা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রির উদ্দেশ্যেও নতুন চালের ভোগদানের নিয়ম রয়েছে।

(ঘ) পাড়া কেরমা

পুরান ত্রিপুরার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনে প্রত্যেকটি পাড়ার তপশীল চৌহদ্দি নির্দ্ধারিত থাকে। এই চৌহদ্দির ভিতরে যাতে অশুভ শক্তির দৃষ্টি প্রতিরোধ করা যায় তার জন্যে এবং সর্বোপরি পাড়ার অধিবাসী সকলের মঙ্গল কামনায় এই "পাড়াকেরমা" পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পাড়াকেরমা পূজায় বাঁশের অগ্রভাগে বিশেষ ধরনের কঞ্চি বেঁধে দিয়ে সজোরে ঘুরানো হয় তাতে বোঁ বোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসে। কের পূজাকালীন কোন অশৌচের সংশ্লিষ্ট পাড়ায় বসবাস কিংবা অন্য পাড়া এলাকা থেকে অশৌচ অবস্থায় ঐ পাড়ায় প্রবেশ নিষেধ।

(ঙ) হাংগ্রাইতের

পৌষ পার্বণ উৎসব। অন্যান্য হিন্দু ধর্মাবলম্বী জাতিগোষ্ঠীর মতোই পিঠে পুলি ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য রন্ধন ও প্রস্তুতি সহকারে ধুমধামে হাংগ্রাইতের পালিত হয়।

পুরান ত্রিপুরা সমাজের সামাজিক প্রথায় পাড়া চৌধুরীর বাড়িতে পাড়ার সমস্ত অধিবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা এক সাথে সম্মিলিত হন এবং প্রতিটি পরিবার নিজ নিজ বাড়িতে প্রস্তুত পিঠেপুলি

ও আহার্য্য নিয়ে এসে একত্রীভুক্ত সমস্ত আহার্য্যবস্তু প্রত্যেককে কলাপাতায় পরিবেশন করা হয়। প্রতি জনে জনে কুশল বিনিময় এবং বয়স্ক নমস্য ব্যক্তিদের প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মদিরা পান একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ বিশেষ। বয়স ভেদে পৃথক পৃথক আসর গড়া হয়।

হাংগ্রাইতের এর বিশেষ দিক হচ্ছে সেই পুণ্য তিথিতেই সারা বছরে যাঁরা পরলোক গমন করেছেন- তাঁদের পুণ্য সলিলে অস্থি বিসর্জন করা হয়।

(চ) বুইসর তের

চৈত্র-সংক্রান্তি- মহাবিষুব সংক্রান্তি দিবসটি পুরান ত্রিপুরা সমাজে "বুইসর" নামে উদ্‌যাপিত হয়। অন্যান্য উৎসবের মতো সেই দিনেও পিঠে পুলি ও নানাবিধ আহার্য্য বস্তু রন্ধনের ও প্রস্তুতির মাধ্যমে সাড়ম্বরে ভোজ বা পংক্তি ভোজন করাই সামাজিক প্রথা।

বুইসর উৎসবে বিগত বছরে যে সমস্ত নিকট আত্মীয় স্বজন ইহলোক ত্যাগ করেছেন- তাঁদের প্রত্যেকের অমরাত্মার উদ্দেশ্যে শেষ ভোগ নিবেদন করা হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেই মৃতব্যক্তির আত্মার সাথে পরিবার পরিজনদের চিরতরে বিচ্ছেদ (খুমপৗলাপাতা ছেদনের মাধ্যমে) পরোক্ষে ঘোষিত হয়।

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পুরান ত্রিপুরা সমাজের অন্যতম বৃহত্তম উৎসব "গরিয়াপূজা" সেই মহাবিষুব সংক্রান্তির প্রভাতেই প্রতিষ্ঠা ও পূজারম্ভ করা হয় এবং তা চলে পরবর্তী বৈশাখ মাসের ৭ম দিবস অবধি।

(ছ) সেনা-তের

সেনা তের গরিয়াপূজার শেষতম বা বিসর্জন দিবসীয় উৎসব। বৈশাখ মাসের ৭ম দিবসে গরিয়াপূজার সমাপ্তি ও বিসর্জন। সেনা তিথিতে গরিয়াদেবের উদ্দেশ্যে মোরগ, হাঁস, শূকর বা পাঁঠা বলিদানের বিধি প্রচলিত।

মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন থেকে সেনা- তের পর্যন্ত সাত দিনে যে কোন দেবদেবীর পূজা দেওয়া সমাজে নিষিদ্ধ। উক্ত সময়ে পরিবারে কারও অসুখ বিসুখ হলে তার নাম গরিয়া দেবের প্রতি মানস করা হয় এবং সেনা-তের দিবসে মোরগ ইত্যাদি গরিয়াদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে মানসভাঙ্গা হয়।

উল্লেখ থাকে যে, বি বুইসর এবং সেনাতের উৎসব চলাকালীন নববিবাহিত দম্পতি পিতৃগৃহে এবং শ্বশুরালয়ে (যেখানে যেটা প্রযোজ্য) অনুষ্ঠানিকভাবে বেড়াতে আসার শুভ মুহূর্ত। নববিবাহিত দম্পতি ও তাঁদের পরিবার পরিজন সেই শুভ মুহূর্তের জন্য অনেক আগে থেকেই প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

সেনা-তের পালনের পরবর্তী দিন থেকেই ন ?ন বছরে নতুন উদ্যমে নতুন জুম ক্ষেত্রে বীজ বপন এবং অন্যান্য কৃষিকাজের শুভ সূচনা করা হয়।

(জ) বালকামানি তের

সাধারণভাবে জৈষ্ঠের শেষভাগ অথবা আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে বালকামানি তের অনুষ্ঠিত হয়। এই তের সম্পূর্ণই জুম-উৎসব।

যখন নতুন জুম ক্ষেতে বিভিন্ন ফসল ফলা শুরু হয় যথাক্রমে - থারচুমু (চিনারা) মম্‌দল

(তরমুজ), দরমসাই, শশা, ভুট্টা এবং লুবিয়া (লতা সই) ইত্যাদির ফলন শুরু হয় তখনই সেই উৎসব। উৎসবের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে - নতুন জুম ক্ষেতের নতুন ফলফলারী বালকামানি তের এ আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক নিবেদনের পূর্বে কারও খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমন কি অবুঝ কিশোর কিশোরী এবং শিশুদের ক্ষেত্রেও এই নিষেধ সম্পূর্ণভাবেই প্রযোজ্য। স্বাভাবিকভাবেই নতুন ফলমূলের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি থাকলেও সেই নিষেধের কারণে শুধু দর্শনেই তৃপ্তি পেতে হয় - কিশোর কিশোরী বা পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিদের।

বালাকামানি তের এ আবারও আরাধ্য দেবদেবী ও বনদেবীর পূজা অর্চনা করা হয়। সমস্ত রকমের নতুন ফলমূল ও সব্জি সেই পূজায় দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই বালকামানি দিন থেকেই জুমের ফসল উপভোগের সূচনা হয়।

(ঝ) লেবাং বুমানি তের

শরৎকালে একদিকে জুমের ধানকাটা অন্যদিকে তিল-কার্পাস ইত্যাদি ফসলের প্রস্তুতির সময়ে জুম ক্ষেত্রে একপ্রকার পোকামাকড় ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করে। ইহাই লেবাং পোকা। লেবাং পোকা সাধারণতঃ জুম ফসলের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু ঐ পোকার আকৃষ্টে বিভিন্ন বুনো পাখি জুমে এসে তিল-কার্পাসের ফুল নষ্ট করে। সেই হেতু যুবক যুবতীরা একত্রে প্রত্যেকে হাতে দুটো কাঠি নিয়ে নাচের মাধ্যমে লেবাং পোকা ধরে এবং মেরে ফেলে।

সেটাই রূপান্তরিত হয়ে লেবাং বুমানি নৃত্যে পরিণত হয়েছে।

পুরান ত্রিপুরা লৌকিক দেবদেবী

অন্যান্য আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর মত পুরান ত্রিপুরা সমাজ প্রকৃতি উপাসক এবং পূজক। বিরাট বিরাট বৃক্ষরাজি এবং পাথরের পাদদেশে পূজা অর্চনাই সামাজিক প্রথা।

১) লামপ্রা ওয়াথপ

পারিবারিক এবং সামাজিক পূজা। পরিবারের অমঙ্গল প্রতিরোধ ও মঙ্গল সুস্থ নীরোগ কামনায় সময়ে সময়ান্তরে প্রতি পরিবারে লাম্প্রা পূজা প্রচলিত। তা ছাড়াও যখন কোন পরিবারে জন্ম মৃত্যুজনিত অশৌচ পালন অবশ্যক হয় তখন সেই অশৌচ অবসানে লাম্প্রা পূজা দেওয়া বাধ্যতামূলক।

সামাজিক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে প্রতিটি পাড়ার মঙ্গল কামনায় লাম্প্রা পূজা দেওয়ার রীতি রয়েছে। বারোয়ারী লাম্প্রা পূজা পাড়া চৌধুরীর অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই পূজায় প্রতিটি পরিবার বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করেন।

২) লামাবুমানি

এই পূজা অনেকটা কের পূজা সদৃশ। একটি পাড়ার চৌহদ্দির শেষ সীমানায় ঐ পাড়াতে প্রবেশ ও বর্হিগমনের রাস্তার সীমানায় লামাবুমানি পূজার সুনির্দিষ্ট স্থান বা খলা থাকে। ঐ নির্দিষ্ট স্থানেই প্রতি বছর একাধিক বার লামাবুমানি পূজা দেওয়ার রীতি। সাধারণতঃ শনিবার অথবা মঙ্গলবার দিবসে এই পূজা দেওয়া হয়। পূজার দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই বাঁশের একটি বিশেষ প্রতীক প্রোথিত করে পাড়ার ভিতরে ভিন্ন পাড়ার লোকদের প্রবেশ নিষেধ রাখা হয়। লামাবুমানি পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ অন্য পাড়াগ্রাম থেকে সেই পাড়ায় প্রবেশ করা মানেই ঐ

পূজার বিঘ্নপ্রাপ্তি বুঝায়। এ ক্ষেত্রে পুনর্বার পূজা দিয়ে তা সংশোধনী করা হয়। সুনির্দিষ্ট বক্তি যিনি সেই প্রথা অমান্য করেন তাঁকে অর্থদণ্ড দিতে হয়।

রাজ কর্মচারীগণও এই প্রথা মানেন এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে না জেনে সেই নিয়ম ভঙ্গ করলে তাঁদেরকেও অর্থদণ্ড দিতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে চিফ্ কমিশনারের শাসনকালে জনৈক চিফ কমিশনার কের পূজার বিধি ভঙ্গ করেছিলেন - রাজধানী আগরতলা শহরের কের পূজার দিনগুলিতে।

সেই চিফ্ কমিশনারও অর্থদণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলেন!

৩) বুড়াছা মীতাই পূজা

বুড়াছা পূজা সর্বাধিক প্রচলিত পূজা। লোকবিশ্বাস যে বুড়াছা দেব গৃহস্থে- বনে বনান্তরে সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখান। তাতে গৃহস্থের অমঙ্গল এবং ভীতি প্রদর্শিত ব্যক্তির নানারকম রোগ শোক হতে পারে। সেই থেকে পরিত্রাণের জন্যই বুড়াছাপূজার বিধি। এই পূজার জন্য বিশেষ দিনক্ষণ ধার্য্য করার প্রয়োজন নেই। যে কোন দিনে বা প্রহরে বুড়াছা পূজা নেওয়া যায়।

৪) থুমনাইরগ বনিরগ পূজা

থুমনাইরগ এবং বনিরগ দুই ভ্রাতা। তাঁদেরকে যমরাজের দুইজন দূত হিসেবে লোকবিশ্বাস রয়েছে। কোন ব্যক্তি পাড়ার ভিতরে বা বাইরে একলা বা সঙ্গীহীন হিসেবে চলাফেরা কালে ভ্রাম্যমান থুমনাইরগ বনিরগের সম্মুখে পড়ে যেতে পারে। এতে ঐ ব্যক্তির উপর উক্ত দেবদূতদের কুনজর পড়ে। ফলে ঐ ব্যক্তি নিদারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে এমনকি মৃত্যুও হয়। এটাকে পুরান ত্রিপুরা সমাজে "থুমনাইরগ বনিরগ বক্নাঙু" নামে অভিহিত করা হয়।

তার প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত অচাই বারুওয়া সহযোগে থুমনাইরগ-বনিরগের পূজা দান সমাজে প্রচলিত।

৫) সৗকাল মীতাই পূজা

এক কথায় ডাইনী পূজা। সমাজের মধ্যেই কোন কোন মহিলাকে ডাইনী বলে সন্দেহ করা হয়। ঐ সব মহিলার চলন-বলন সব সময়ই অন্য লোকজনদের সুতীক্ষ্ণ নজরে থাকে। সুতরাং ঐ সব মহিলা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যদি কোন বিসদৃশ আচরণ করে তাহলে ঐ আচরণকে "তৗইমারমজাগু" বলা হয়।

পরিবারে বা পাড়ায় কারোর অসুখ বিসুখ হলে বিশেষত: শিশু ও কচি কাচাদের বিভিন্ন অসুখে "সৗকাল কলবখা" বা ডাইনী ভর করেছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

সেই ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধারের জন্য উপযুক্ত অচাই ও বারওয়াদের দ্বারা নিশিকালে পূজা দেবার প্রথা প্রচলিত।

৬) মহাদেব মাদেব পূজা

গার্হস্থ্য পূজা। মূলত: মহাদেবেশ্বরকে সামাজিক রীতি অনুযায়ী বাঁশের দ্বারা নির্মিত প্রতীকেই পূজানুষ্ঠান। পূজাতে হাঁস অথবা পাঁঠা উৎসর্গ করাই বিধি।

৭) তাইনি সাংগ্রং

জল দেবীর পূজা। পাড়া বা এলাকার নিকটস্থ কোন নদী, ছড়ার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট নদী/ছড়া বক্ষেই পূজা দেওয়ার রীতি। গার্হস্থ্য এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই এই পূজা দেওয়া হয়ে থাকে।

৮) মাইলুমা পূজা

মাইলুমা লক্ষ্মীদেবীর পূজা। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার বিশেষ তিথি ছাড়াও সংবৎসরের অন্যান্য সময়েও মাইলুমা দেবীর পূজার্চনা করা হয়। মূলত: গার্হস্থ্য পূজা। পরিবারের স্বচ্ছলতা, ধন/ধান্য বৃদ্ধির কামনাই এই পূজার উদ্দেশ্য।

৯) খুলুমা পূজা

বস্তুত: মাইলুমা এবং খুলুমাদেবীকে যুগপৎ পূজার্চনা করা হয়। খুলুমা তিল কার্পাস এবং অন্যান্য অর্থকরী ফসলের জন্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

১০) নাকরি পূজা

গার্হস্থ্য বা পারিবারিক পূজা। এক কথায় নাকরি হচ্ছেন রক্ষক দেবতা। একটি পরিবারের মঙ্গলামঙ্গল এবং বিভিন্ন বিপদ আপদ রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষার জন্যই এই নাকরি পূজা। নাকরিপূজার সুনির্দিষ্ট স্থানে গৃহ অঙ্গনে স্থাপিত হয় এবং সুরক্ষিত বেড়া দিয়ে রাখা হয়।

১১) নকসুমীতাই

নকসুদেবী গার্হস্থ্য পূজা। শয়নঘরের উত্তর পূর্ব কোণে তাঁর আসন সুনির্দিষ্ট থাকে। আসনের প্রতীক হিসেবে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে একটি বেদী নির্মিত হয়। নক্সুদেবী সাধারণত: সংশ্লিষ্ট পরিবারে অথবা পাড়ার কেহ জ্বর ও অসুখ বিসুখ হলে নকসু দেবীর "দৃষ্টি" লেগেছে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং মোরগ উৎসর্গ করে রোগ নিরাময়ের কামনায় নকসু দেবীর পূজার্চনা করা হয়।

১২) বদর মোকাম পূজা

বদর মোকাম ইসলাম ধর্মীয় সুনির্দিষ্ট পূজা আরাধনার পবিত্র স্থান। মূলত: ইস্লামী ধর্ম সম্পর্কিত হলেও বদর মোকাম জাগ্রত দেবতা হিসেবে পুরান ত্রিপুরা লোক সমাজে প্রগাঢ় বিশ্বাস। হিংস্র বন্যজন্তুর দ্বারা আক্রমণ কিংবা আক্রমণের আশঙ্কা থেকে পরিত্রাণ এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীর চুরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বদর মোকামের "মানত" করা হয় এবং মোকামস্থলে গিয়ে পাঁঠা, হাঁস বা মোরগ উৎসর্গ করা হয়। সেই পূজার্চনা ও উৎসর্গ সংশ্লিষ্ট মৌলভির দ্বারাই পরিচালিত হয়।

১৩) হাংকরনি পূজা

হাংকর বা ময়াল অর্থে একটি সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলো পাড়া বা গ্রামের সমষ্টি বুঝায়। সংশ্লিষ্ট হাংকর বা ময়ালের সমস্ত পাড়ার অধিবাসীগণ একযোগে বাৎসরিক সামাজিক বা পূজা অনুষ্ঠান করেন। এ ক্ষেত্রে হাংকর বা ময়ালের সর্দার ও তার সহকর্মীদের পরিচালনায় এবং প্রতিটি পাড়া চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীদের নিয়ে এই হাংকর পূজার আয়োজন করা হয়।

বাৎসরিক হাংকর পূজা সাধারণত: ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়। নিকটস্থ নদ/নদীকে

পাঁঠা ও মহিষ উৎসর্গ করে ব্যাপক জনসমাগমে এই পূজা দেওয়ার বিধি।

১৪) দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী পূজা

একান্ন পীঠের অন্যতম উদয়পুর মাতাবাড়ীতে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর আরাধনা সর্বজন আচরিত। পুরান ত্রিপুরা সমাজে উদয়পুরে দেবীর পীঠস্থলে না গিয়েও গার্হস্থ্য পরিবেশে অথবা পাড়ান্তরে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর বাঁশের প্রতীক সহযোগে এবং পাঁঠা ইত্যাদি উৎসর্গের মাধ্যমে পূজা দেওয়া আবহমান কাল থেকে প্রচলিত।

এছাড়াও রক্ষিয়াকালী, নিশুকালী ইত্যাদি নামেও কালীমায়ের পূজার্চনা করা হয়।

১৫) পালিমা পূজা

বৃহত্তম গার্হস্থ্য পূজা। সাধারণভাবে সমাজে সচ্ছল পরিবারগণই এই পূজানুষ্ঠান করেন বা করতে সাহস/সমর্থ হন।

পালিমা - পালাইনাইমা অর্থাৎ প্রতিপালিকা জননী রূপিণী। পালিমা পূজা পুরান ত্রিপুরা সমাজের যেন দুর্গাপূজার সমারোহ। অসংখ্য পূজা উপকরণ ও উপাচার। তার সাথে সাথে প্রতিটি আলাদা ভোজের জন্য এক একটি হাঁস উৎসর্গের বিধি। তৎসঙ্গে রয়েছে প্রচুর সংখ্যক হংসডিম্ব নিবেদন।

পালিমা পূজা ২(দুই) দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়। যেমন সাধারণ অচাই বারুওয়ারা এ পূজা দিতে সাহস পান না। তেমনি যে কোন সচ্ছল গৃহস্থও এই পূজা স্বগৃহে অনুষ্ঠানে কিছুটা সংশয় বোধ করেন। কেননা পূজার যে কোন স্তরে বা যে কোন উপকরণে যদি কোন বিচ্যুত্তি ঘটে তা হলে গৃহস্থের মঙ্গলামঙ্গল এর পরিবর্তে অমঙ্গল অঘটন হবার অশংকা।

পালিমা পূজা দানে সক্ষম এ রকম বিশেষ প্রবীণ ও দক্ষ অচাই বারুওয়াদ্বারা পালিমা পূজা অনুষ্ঠানের বিধি। পালেমা পূজার সুনির্দিষ্ট অনূঢ়া বা এয়োস্ত্রীলোকদের "জগালিয়া" নির্বাচন করতে হয়। পূজার প্রথমভাগ থেকে সমাপন পর্যন্ত এই জগালিয়ারা সারাক্ষণ ঐ পূজা বাড়িতে উপস্থিত থাকেন। পালেমা পূজার রাতিভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে পূজা স্থলে পবিত্র মশাল প্রজ্জ্বলনের রীতি। লোক বিশ্বাস এই যে, পালিমা পূজার মশালের আলোর চরিত্রই পূজার সাফল্য বা বিফলতা এবং মঙ্গলামঙ্গলের প্রতীকী হিসেবে দেখা দেয়। সেই প্রজ্জ্বলিত মশাল দেখেই অভিজ্ঞ অচাই এবং প্রধানগণ সব কিছু বুঝতে পারেন।

পুরান ত্রিপুরাদের সামাজিক জীবন ও সামাজিক অনুশাসন

অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীও সামাজিক পরিকাঠামোয় বসবাস করেন। ত্রিপুরার ভু-প্রকৃতি কয়েকটি সুউচ্চ পাহাড় এবং অবশিষ্ট উঁচুনীচু টিলা ভূমি ও সমতল এলাকা। পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সুউচ্চ পাহাড়ের উপর বসতি স্থাপনের চাইতে পাহাড়ের পাদদেশে এবং উঁচুনীচু টিলাভূমিতে বসতি স্থাপন করেন। কোন নদী বা ছড়া বা স্রোতস্বীনি নিদেনপক্ষে নির্ঝর নিকটবর্তী স্থানে স্থায়ী বসতি দেখা যায়।

বিগত দেড়শত বছরে জুম কৃষি থেকে স্থায়ী স্থল কৃষিতে জীবিকা রূপান্তরের সাথে সাথে পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমতল অঞ্চলে এবং শহর ও শহরতলীতে স্থায়ী বসবাসের আগ্রহ

ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী কয়েকটি পরিবার (গৃহস্থ) একত্রীভুক্ত হয়ে এক একটি পাড়ায় বসবাস করেন। প্রতিটি পাড়াতে ন্যূনতম ৩টি পরিবার এবং সর্বাধিক ১০০ থেকে ১৫০ পরিবারও রয়েছে।

পাড়া স্তরে সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে প্রতিটি পাড়াতেই একজন পাড়া চৌধুরী, একজন অচাই, দুই বা ততোধিক বারওয়া, খান্দল, কারবারি এবং বারিফাং একজন করে মনোনীত অথবা নির্বাচিত হন। পাড়া চৌধুরী সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি। অচাই পাড়ার প্রতিটি পরিবারের পূজা আচ্চা এবং সামগ্রিকভাবে গ্রাম পূজার দায়িত্বপ্রাপ্ত। বারুওয়া বা বারুওয়াগণ পূজা অর্চনায় সব সময় অচাইকে সহায়তা করেন। খান্দল- চাঁদা সংগ্রহ ও তহবিল রক্ষক। আর কারবারি রাজশাসন পরবর্তীতে সরকারী শাসনে প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করেন। অর বারিফাং পাড়ায় সরকারী কর্মচারী বা অনুরূপ কোন সরকারি অতিথির আগমন হলে তাঁদের আদর আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করেন।

উপরিউক্ত দায়িত্ব বন্টন সংবছরের প্রারম্ভে কোন একটি গ্রাম পূজা বা উৎসবে নির্বাচিত অথবা মনোনীত হন। দুর্ভাগ্যবশত: দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে অথবা পাড়া থেকে অন্যত্র বসবাস স্থানান্তর করলে পাড়ার অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।

যেহেতু পাড়া চৌধুরী সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। সেইজন্য সাধারণত: চৌধুরী স্বইচ্ছায় পদত্যাগ না করলে অথবা মৃত্যু না হলে অনির্দিষ্ট সময়কালের জন্য দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিবাহ বিচ্ছিন্ন অথবা পুনর্বিবাহিত কোন দম্পতি চৌধুরীর দায়িত্ব পালনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পাড়া চৌধুরী নির্বাচন বা মনোনয়নের পর যদি সংশ্লিষ্ট পাড়ায় ক্রমান্বয়ে অসুখ-বিসুখ, দৈব দুর্ঘটনা চলতেই থাকে - সে ক্ষেত্রেও চৌধুরীর দায়িত্ব পরিবর্তিত করাই সামাজিক রীতি।

অনেকগুলো পাড়ার সমষ্টিতে ময়াল গঠিত হয়ে থাকে। ময়ালের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ময়াল চৌধুরী ও বিভিন্ন পাড়ার বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ময়াল কমিটি গঠন করা হয়।

বিগত ১৯৩০ সালের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় গ্রাম্য মণ্ডলী অইন কার্যকর হওয়ায় ময়াল কমিটির দায়িত্ব মণ্ডল সভাগুলোই পালন করেন।

বিভাগীয় ভিত্তিতে হাংকর বা পরগণা কমিটি প্রচলিত ছিল - কিন্তু তাদের কার্যাবলী গ্রাম্যমণ্ডলী গঠনের পর অনেকটাই লঘু হয়ে যায়।

পুরান ত্রিপুরার সামাজিক অনুশাসন এবং রীতিনীতির নির্দ্ধারক ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ এবং কেন্দ্রীয় (সর্বোচ্চ) স্তরে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি।

এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী গ্রাম্যমণ্ডলী আইন দ্রষ্টব্য।

পুরান ত্রিপুরা সামাজিক বিচার ব্যবস্থা

গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনে দৈনন্দিন কলহ, বিবাদ, ছোটখাটো অপরাধ এবং নারীঘটিত কোন অপরাধের সালিশী এবং বিচার ব্যবস্থা প্রতিটি পাড়ায় চৌধুরী ও তার সহযোগীদের উপর ন্যস্ত।

পরবর্তীকালে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোরের রাজত্বকালে ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজ সংক্রান্ত নিয়মাবলী সংশোধন ও কার্যকর করার পর সামাজিক বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামো ছিল নিম্নরূপ ঃ-
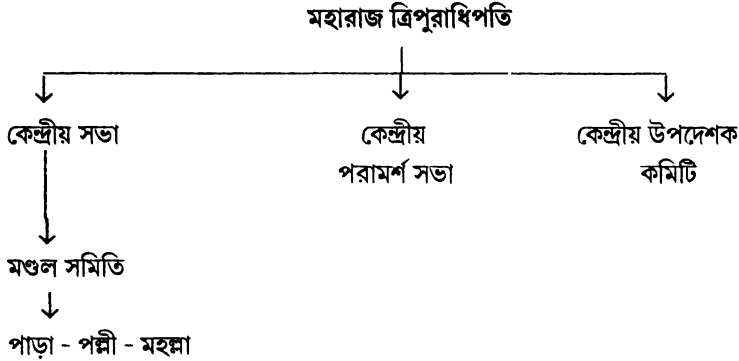
১) পাড়া ঃ- চৌধুরী, অচাই, বারওয়া, খান্দল, কারবারী, বারিফাং
(নির্দিষ্ট সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই)

২) মণ্ডল সমিতি ঃ-
(ক) মণ্ডল সম্পাদক - একজন
(খ) মণ্ডল সমিতির সভ্য - ৯ (নয়) জন
(গ) মণ্ডল ভলান্টিয়ার - ১০ (দশ) জন

৩) কেন্দ্রীয় সভা ঃ-
(ক) কেন্দ্রীয় সম্পাদক - ১ (এক) জন
(খ) কেন্দ্রীয় সভার সভ্য - ১১ (এগার) জন
(বি. দ্রঃ - কেন্দ্রীয় সভা প্রতি ৩ বৎসর অন্তর পুনর্গঠিত হয়)

৪) কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা - ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট

৫) কেন্দ্রীয় উপদেশক কমিটি - ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট

সামাজিক বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়

রাজন্য শাসিত স্বাধীন ত্রিপুরার বিচার ব্যবস্থায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত ছাড়াও আর এক শ্রেণীর আদালত প্রচলিত ছিল - সেই আদালত "পাহাড় আদালত" নামে খ্যাত।

পুরান ত্রিপুরা সহ পার্বতীয় প্রজা সাধারণের ব্যক্তি ও সমাজ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিবাদ, অপরাধ সংক্রান্ত কোন ঘটনা এবং স্থাবর অস্থাবর সংক্রান্ত কোন বিষয়ের বিচার সাধারণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে না হয়ে সেটা করা হতো পাহাড় আদালতে। পাহাড় আদালতে অন্যান্য বিচারালয়ের মতোই উপযুক্ত সংখ্যক বিচারক ও অন্যান্য কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন।

যেহেতু পার্বতীয়া প্রজাগণ শিক্ষার অভাবে পড়াশুনা বা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় (বিশেষত: বাংলা ভাষা) নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে অপারগ ছিলেন, সেইহেতু পাহাড় আদালতে "ত্রিপুরী বা ককবরক ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকেই পাহাড় আদালতে বিচারপতি নিযুক্ত করা হতো। পাহাড় আদালতে বাদী ও বিবাদী পক্ষ উভয়েই ককবরকে নিজ নিজ বক্তব্য বিষয় মাননীয় বিচারালয়ে উপস্থাপিত করার সুযোগ পেতেন তার ফলে সঠিক ও সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হতো।

এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে ১২৮৯ ত্রিং সনে (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) এক আদেশ বলে (১৩ই আষাঢ় - ১২৮৯ ত্রিং সেহা নং - ২২) পাহাড়ী আদালত তুলে দেওয়া হয়। পাহাড়ী আদালতের সমস্ত বিচার্য্য বিষয়গুলি সাধারণ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতগুলোর দ্বারাই সমস্ত বিচার কার্য সম্পাদনের আদেশ করা হয়।

জনজাতি গোষ্ঠীর প্রতি বিচার ব্যবস্থা আরও গ্রহণীয় ও বিশ্বস্ততা বৃদ্ধির জন্য পৃথক পাহাড়ী আদালত না হোক প্রতিটি মহামান্য বিচারালয়েই দো-ভাষী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরান ত্রিপুরা সমাজে সামাজিক আদালতে বিচার্য্য মোকদ্দমার শ্রেণী বিন্যাস

১) বিবাহ সংক্রান্ত বিশেষত: কন্যা অপহরণ এবং জোরজবরদস্তিমূলক কন্যা উঠিয়ে নিয়ে বিবাহের ক্ষেত্রে এবং উভয়পক্ষের অভিভাবকদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিবাহ দান ও জামাই উঠার নির্দ্ধারিত সময়ের খেলাপ হলে। বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত।

২) অসামাজিক কার্যকলাপ ঃ- ব্যভিচার, সামাজিক রীতিনীতি লঙ্ঘন, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, শ্লীলতাহানি, শান্তিভঙ্গ, দায়িত্ব পালনে অনীহা।

৩) দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধীয়

৪) ভরণপোষণ/ প্রতিপালন

৫) নাবালক ও তাদের অভিভাবকত্ব

৬) অন্য গৃহস্থের স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি

৭) সামাজিক উচ্ছৃংখলতা বিশেষত: অত্যধিক মদ্যপান ও নেশাগ্রস্তের কারণে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি ইত্যাদি

৮) দাঙ্গা-হাঙ্গামা

দেওয়ানী মোকদ্দমা

১) সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ক।

২) জুম চাষ ও জুমক্ষেত্র নির্বাচনে কোন বিরোধ।

৩) কৃষি জমি ও দখলীয় জমি সংক্রান্ত বিরোধ।

৪) আর্থিক বা অন্য কোন মূল্যবান সামগ্রীর লেনদেন সংক্রান্ত বিরোধ।

৫) পারিবারিক অথবা সামাজিক সম্পত্তির মালিকানা বিরোধ ইত্যাদি।

পুরান ত্রিপুরা সমাজ জীবন ও জীবিকা

অনাদি কাল থেকে পুরান্ ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর এক এবং অন্যতম জীবিকা জুম চাষ। মানব সভ্যতার উষালগ্ন (প্রস্তর যুগে) মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বন্য পশুপাখি, জীবজন্তু মৎস্য বা জলচর বা উভচর প্রাণীর শিকারই ছিল একমাত্র জীবিকা। সভ্যতার বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনের শুরু। তারই অংশ বিশেষ হিসেবে জুম চাষ।

প্রাকৃতিক অরণ্য সম্পদে ভরপুর জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে জুম চাষ যোগ্য নিবিড় বনভূমির প্রাচুর্য্যতা পুরান ত্রিপুরা সহ আদিম জনজাতি গোষ্ঠীর জন্যে ছিল সৃষ্টিকর্তার সীমাহীন আশীর্বাদ। কিন্তু কোন জনজাতিগোষ্ঠী যুগের অগ্রগতির সাথে সাযুজ্য রেখে যদি উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা গ্রহণে অপারগ হয় তাহলে অন্যান্য অগ্রসর জনগোষ্ঠী থেকে পিছিয়ে পড়া বাধ্যতামূলক।

পুরান ত্রিপুরাসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী'কে যাযাবর প্রথায় জুমচাষ থেকে স্থায়ী হাল কৃষিতে (Wet laxd Agriculture) উত্তরণের জন্যে প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে। বিশেষত: মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে। পার্বত্য প্রজাগণের মধ্যে হালচাষ প্রথা প্রবর্তনের প্রচেষ্টার উদ্যোগ হিসেবে তা তদানীন্তন রাজমন্ত্রী মোহিনী মোহন বর্দ্ধন স্বাক্ষরিত একটি মেমো বা সার্কুলার জারী করা হয় ১লা আষাঢ়, ১২৯৮ ত্রিং অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে।

উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনামা নিম্নরূপ

(১) রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টগণ যার যার নিয়ন্ত্রিত পার্বত্য পল্লীগুলো সফর করে পল্লীবাসীদের হালচাষ দ্বারা কৃষি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং উৎসাহদান।

(২) উপযুক্ত ক্ষেত্রে হালচাষ দানে হাতে কলমে শিক্ষাদানের জন্য সমতল এলাকা থেকে বাঙালি কিংবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের দক্ষ হালচাষীকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিয়ে গিয়ে চাষাবাদের শিক্ষাদান।

(৩) স্থান বিশেষের বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় হালচাষের জন্য হালের বলদ, মহিষ এবং লাঙ্গল, জোয়াল-মই ইত্যাদি কেনার জন্য সরকার থেকে আর্থিক সাহায্য দান।

(৪) যে সমস্ত পাড়া বা এলাকায় প্রজাগণকে কৃষি কাজের মাধ্যমে ধানচাষের জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান আবশ্যক তার তালিকা প্রস্তুতি এবং নির্দিষ্ট কোন কৃষককে কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া যায় তার সুপারিশ করা।

৫) যদি কোন বিশেষ এলাকায় বা পাড়া সমূহে কৃষি কাজের উৎসাহদানের জন্য সরকারী খামার গড়া প্রয়োজন- সেই সব ক্ষেত্রে আদর্শ সরকারী খামার গড়ে স্থানীয় প্রজাদের হালচাষের উপকারিতা সম্পর্কে উৎসাহিত করা।

পুরান ত্রিপুরা, জমাতিয়া জনগোষ্ঠীদের মধ্যে জুম কৃষি থেকে হালকৃষিতে উত্তরণের প্রক্রিয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকেই সূচনা তার নিদর্শন পাওয়া যায় তদানীন্তন বৃটিশ শাসনের পক্ষে ত্রিপুরায় নিযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্টদের বার্ষিক প্রতিবেদনেও।

নিদর্শন

Annual Report of 1887 (relating to Tripura State) submitted by Baboo Umakanta Das Asstt. Political Agent to the Magistrate of Tippreah and Ex-Officio Political Agent of Hill Tippearh vide no-407 dated 7th July, 1887.

Para graph - 20

"The tribes live on low hills in the interior and carry on this cultivations under Jhuming system. This number as the whole is about 50,000 families. The remaning part of the population of the State lives in the plain areas and carries on cultivations by means of plough. It consist of the Manipuris- mostly Hindus and partly Mohamedens and Bengalies who are mostly of lower castes. The great middle classes, who are in every country forms the most important part of its population are entirely vnknown (non- existant) in the Maharajas dominion.

Some of the Jamatias near Udaipur have commenced to dwell in the houses similar to those Bengalies, leaving their national manchas. They have also began to take plough cultivation forsaking the jhuming cultivation system. They are thus becoming more settled in their habitation then the other Hill people".

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা প্রধানত: জুম চাষ নির্ভর হলেও উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই মণিপুরী ও বাঙালি কৃষকদের অনুকরণে তাঁরাও ক্রমশ: স্থায়ী কৃষিকাজে উত্তরণ হয়েছেন সন্দেহ নেই।

১৯০১ সালের ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরণীতে পুরান ত্রিপুরাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল ৩৮,৩০৮জন। এর মধ্যে পুরুষ- ১৯৪৮১ এবং স্ত্রীলোক ১৮৮২৭জন। ঐ আদম সুমারিতে পুরান ত্রিপুরা সহ জুমিয়া ছিল সর্বমোট ৪৬০২৭ এবং তাদের পরিজনের সংখ্যা ছিল ৩৪,২৪৮জন। এই ৪৬০২৭টি জুমিয়া পরিবারের মধ্যে ৯২৬০টি পরিবার আংশিকভাবে জুমচাষ ও হালচাষে জীবিকা অর্জন করেন বলে নথিভুক্ত হয়েছে।

যদিও ১৯০১ সালের সেন্সাস বিবরণী বিভিন্ন দিক থেকেই অসম্পূর্ণ তথাপি ঐ সেন্সাসে এটা প্রমাণিত যে ১৯০১ সালে কমবেশি দশ হাজার পুরান ত্রিপুরা ও জমাতিয়া পরিবার স্থায়ী হালকৃষিকেই নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এর পরবর্তী সেন্সাস বিবরণীতে অর্থাৎ ১৯৩১ সালের পূর্ণাঙ্গতর সেন্সাসে পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ছিল ৭৭৫৮০জন। পুরুষ - ৩৯৬৩৫ এবং স্ত্রী ৩৭৯৪৫জন।

এঁদের পেশাগত অবস্থান ছিল নিম্নরূপ

মুখ্য পেশা	গৌণ পেশা
জুমচাষ - কৃষি - অন্যান্য	জুমচাষ - কৃষি - অন্যান্য
৬২২৮-৮৪৮৯ -১৩১২	১০,৫৮৩ - ৪৭০৬ - ৮৯৮৭

অর্থাৎ পুরান ত্রিপুরার সর্বমোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১৬,৮১১ পরিবার জুমচাষকে প্রধান ও

গৌণ পেশা হিসেবে এবং ১৩,১৯৫ পরিবার হালকৃষিকে প্রধান ও গৌণ পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

দেশভাগ, স্বাধীনতা উত্তর ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির পর ১৯৫১ সালের সেন্সাসে পুরান ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৫০,৯৭১জন। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে ব্যাপক গণ-আন্দোলন এবং আইন শৃংখলাজনিত কারণে পূর্ণাঙ্গ সেন্সাস করা যায়নি।)

যাইহোক ১৯৫১-৫২ সালে সর্বমোট জুমিয়া পরিবার কমবেশি ২০,০০০ ছিল বলে সরকারী তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্বাসনের সূচনা ১৯৫৪ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে। ১৯৫৪ সালের ২৭-২৯ শে মে বিলোনীয়া মহকুমার কাঁঠালিয়াছড়া এলাকায় সর্বপ্রথম জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে ১১৯টি জুমিয়া পরিবারকে নিয়ে ৫ (পাঁচ)টি কলোনী স্থাপন করা হয়।

কিন্তু ১৯৬১ সালের সরকারী তথ্যে দেখা যায়, জুমিয়া পুনর্বাসন শুরু হলেও জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা হ্রাস তো হয়ইনি বরং তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩,২৯২ পরিবার।

১৯৮১ সালে মোট জুমিয়া পরিবার ছিল ২১,৫৭৬ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে জুমিয়া পরিবার ছিল - ১৬১৫০টি।

১৯৯৯ সালে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর দ্বারা সমীক্ষায় হাডকোর জুমিয়া পরিবার দেখানো হয়েছে ৪৯৮০০ পরিবার এবং আংশিক জুমিয়া ছিল ১৬৪৫ পরিবার। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বন দপ্তরের সমীক্ষায় মোট জুমিয়া পরিবার দেখানো হয়েছে ২২ হাজারেরও কিছু বেশি। অর্থাৎ একই রাজ্য সরকারের অধীন দপ্তর ওয়ারি জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা নির্ণয়ে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

যাই হোক ত্রিপুরায় জুমিয়া পুনর্বাসন অর্থাৎ পুরান ত্রিপুরাসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে জুম-চাষ থেকে স্থায়ী হালচাষে উত্তরণের প্রক্রিয়া ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্ব থেকে শুরু হলেও একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসেও এখনও শেষ হয়নি।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে পূর্ণাঙ্গভাবে জুমচাষ থেকে স্থায়ী কৃষি জীবিকায় নিয়ে আসতে আর কত শতক প্রয়োজন তার উত্তর ভবিষ্যৎই দিতে পারে।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কৃষি ব্যতীত অন্যান্য জীবিকা

১৯৩১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে কৃষিকাজ ভিন্ন অন্যান্য উপজীবিকায় নিযুক্ত পুরান ত্রিপুরার জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে মোট ৮৯৮৭ পরিবার। যেহেতু মহারাজাদের রাজ্য শাসনে পুরান ত্রিপুরাগণ রাজ কার্যের এবং রাজ অন্দর মহলের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতেন সেইহেতু এই সম্প্রদায়ের একটি অংশ গ্রাম পাহাড়ে জুমচাষের পরিবর্তে স্বল্প মজুরীতে অথবা বিনা মজুরীতে রাজ্য শাসনে ও রাজ অন্দর মহলে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া রাজ কর্মচারীদের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সরকারী দায়িত্বে ভ্রমণকালে তাদের সাহায্যের এবং আপ্যায়নের জন্য তিতুন প্রথায়ও শ্রমিক নিযুক্ত হতো।

এখানে তিতুন প্রথা সমন্ধে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ইদানীং তিতুন প্রথাকে রাজন্য

শাসনে প্রজাদের বেগার খাটানো প্রথা বলে প্রচার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নাটক মঞ্চস্থ করেও তার বিরূপ প্রচারণার চেষ্টা চলছে।

প্রকৃতপক্ষে 'তিতুন' কাজের জন্য কাউকে নিযুক্ত করা হলে মাথাপিছু পুরুষদের জন্য ।. (চারি আনা) এবং স্ত্রীলোকদের জন্য ৯ (তিন আনা) মজুরী দেওয়া হতো। এ বিষয়ে তদানীন্তন রাজমন্ত্রী উমাকান্ত দাসের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি সার্কুলার জারী হয় - ১৩১১ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯০১ সালে, সার্কুলার নং- ৪০। পরবর্তী সময়ে ১৩১৭ ত্রিং সনের ৫ই মাঘ সার্কুলার নং- ১১ জারীর মাধ্যমে তিতুন কাজে শ্রমিক নিযুক্তির ক্ষেত্রে কিছু সংশোধনী করা হয়। তিতুন প্রথায় কাহাকেও নিযুক্ত করা হলে একদিনে দুই প্রহরের বেশি সময়ের নিযুক্তির জন্য পূর্ণ পারিশ্রমিক অর্থাৎ । চার আনা এবং তার কম সময়ের জন্য দিনের আংশিক ভাতা নিযুক্ত হলে অর্দ্ধেক পারিশ্রমিক দেবার আইন চালু ছিল।

সুতরাং তিতুন প্রথা কোন মতেই " বেগার খাটানোর" প্রথা ছিল না।

পুরান ত্রিপুরা সমাজে জুম চাষ প্রধান জীবিকা ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জুম চাষের সাময়িক বিবতির সুযোগে অর্থ্যাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জুমধান কাটা শেষে পরবর্তী অর্থকরী ফসল তিল এবং কার্পাস ফসলের অপেক্ষার সময়ে অর্থাৎ আশ্বিন-কার্তিক মাসে পুরুষেরা বনের বাঁশ, ও মূল্যবান বৃক্ষ কেটে নদীতে বোর বেঁধে ভাসিয়ে নিয়ে সমতলের বাজার বা গঞ্জে ঐ বাঁশ অথবা গাছ বিক্রি করতেন। তার জন্য সমতলের "মহাজন" দের সাথে তাদের বোঝাপড়া থাকত।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার বিবর্তন

আবহমান কাল থেকে পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী আদিম কৃষিকাজ তথা জুমচাষে জীবিকা নির্বাহ হলেও সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে জুমিয়া জীবন থেকে স্থায়ী হালকৃষি জীবনে প্রবেশ করেছে সেই ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকেই।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে ধীরে ধীরে গ্রাম-পাহাড়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ প্রসার হেতু মোটামুটিভাবে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত অংশ সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হয়ে কৃষি জীবিকা থেকে চাকরির পেশায় প্রবেশ করেছে।

রাজণী ত্রিপুরায় রাজবাড়ি ও রাজপরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত কিছু ব্যক্তি শিক্ষার সুযোগে রাজ্যশাসনের বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীকালে নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ পায় সেই গত শতকের ষাট ও সত্তর দশক থেকে।

ষাটের দশকের গ্রামীণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নীচ পদগুলোতে বিশেষত: চতুর্থ শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর চাকরীতে পুরান ত্রিপুরীদের প্রবেশের সুযোগ ঘটে।

ধীরে ধীরে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের সাথে সাযুয্য রেখে ক্রমশ: চাকুরীর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতেও তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়।

গত শতকের আশির দশক বা তার পরবর্তী সময়ে পেশাগত ও কারিগরী শিক্ষা, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার পদেও তাদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে State Civil Services, i.e, TCS-gr-II, TCS gr-I, বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ পদেও পুরান ত্রিপুরীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়তে থাকে।

পুরান ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমান শতকের প্রথম দশকে শিক্ষক, শিক্ষিকা, কেরানী, সিভিল সার্ভিস, ইঞ্জিনীয়ার, মেডিকেল, আইনজীবী, নার্সিং, নমিনেটেড অই এ এস, আই পি এস, সরাসরি আই এ এস এমনকি বিমানের পাইলট, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিছু পদেও পুরান ত্রিপুরীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত।

Table No- 1
EMPLOYMENT
31/3/2005

Total - 1,24,308
S/C - 15,147
S/T - 26,379

	S/T	S/C
Gr-A	18.70%	16.54%
Gr-B	24.55%	16.17%
Gr-C	26.32%	14.48%
Gr-D	29.19%	17.79%

UNEMPLOYMENT
30/6/2005

S/T - 75,733

Madhyamik - 14673	B.Com - 151	B.E (Civil) - 32	MBBS - 07
H.S (+2) - 2614	MA - 141	B.E (Elect) - 35	
B.A - 1757	M.Sc - 12	B.E (Mech) - 25	
B.Sc - 156	M.Com - 5		

VACANT POSTS (31/3/2005)

	S/C	S/T	UR	Total
	3195	6549	6173	15,914
Backlog	1102	3037		
	4297	9586		

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হাল হকিকৎ

পুরান ত্রিপুরাসহ ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠী সমূহের শিক্ষার হাল গত বিশ শতক পর্যন্ত অত্যন্ত করুণ। ১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পঞ্চ ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর সর্বমোট ৭৫৭৮১ জনের মধ্যে পুরান ত্রিপুরাদের সংখ্যা ছিল ৩৮,৩০৮জন। সমগ্র পঞ্চত্রিপুরা পুরান ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ও দেশী ত্রিপুরা (লস্কর)দের শিক্ষাদীক্ষা বা সাক্ষরতার হার প্রতি শতে নয় প্রতি হাজারেরও একজনের ভগ্নাংশ মাত্র ছিল।

১৯০১ সালের সেন্সাস বিবরণীতে আদিবাসীদের শিক্ষার করুণ চিত্র ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১) ত্রিপুরা (পঞ্চ ত্রিপুরা)	-	পড়ালেখা জানা লোক	- ১০৭জন
২) চাকমা	-	ঐ	- ১০জন
৩) কুকি	-	ঐ	- ০৪
৪) মগ	-	ঐ	- ১৩৭জন

এরপর ১৯৩১ সালের সেন্সাস বিবরণী ছিল ৭৭৫৮০জন। এরমধ্যে পড়ালেখা জানা ছিল মাত্রই ২০৮৩জন। অর্থাৎ শতকরা ৩জন।

রাজগী ত্রিপুরার শিক্ষার ইতিহাসে রাজ্যে আধুনিক প্রশাসনের প্রবর্তন সেই মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ্বে। কিন্তু দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম থাকায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত: রাজধানী আগরতলা ও বিভাগীয় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় প্রথম বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় - মেমো নং ৫০ তারিখ ২০শে ভাদ্র ১৩৪১ ত্রিং অর্থাৎ ১৯৩১ সালে।

যেহেতু দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পঠন পাঠন এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থী যোগাড় অত্যন্ত কষ্টসাধ্য সেইহেতু রাজধানী আগরতলা ও মহকুমা শহরগুলোতে উচ্চবিদ্যালয় বা Middle English স্কুলগুলোতে ছাত্রাবাস নির্মাণ করে পার্বতীয় প্রজ্ঞা সাধারণের সন্তান সন্ততিদের পড়াশুনায় আগ্রহ আনার প্রচেষ্টা করা হয় - মহারাজা বীর বিক্রমের রাজত্বকালেই।

মহারাজার সেই নীতি নির্দেশনা অনুসারেই আগরতলা ও বিভিন্ন মহকুমায় বেশ কয়েকটি বোর্ডিং হাউস প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৯৪৬ ইং সালে অনুরূপ ছাত্রাবাসের সংখ্যা ছিল মোট - ১৩টি। যথা -

১) ঠাকুর বোর্ডিং হাউস, আগরতলা
২) ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস, আগরতলা
৩) লস্কর বোর্ডিং হাউস, আগরতলা
৪) কুকী রাজকুমার বোর্ডিং হাউস, আগরতলা
৫) ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস, খোয়াই
৬) মণিপুরী বোর্ডিং হাউস, খোয়াই
৭) ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস, ধর্মনগর
৮) লুসাই বোর্ডিং হাউস, ধর্মনগর
৯) হিন্দু বোর্ডিং হাউস, বিলোনীয়া
১০) মুসলিম বোর্ডিং হাউস, বিলোনীয়া
১১) ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস, উদয়পুর
১২) স্কুল বোর্ডিং হাউস, সোনামুড়া
১৩) স্কুল বোর্ডিং হাউস, কৈলাসহর

প্রকাশ থাকে যে, উপরিউক্ত বোর্ডিং হাউসগুলোতে শিক্ষার্থীদের খাওয়াপরার খরচ নিজেরাই বহন করতে হতো। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে ১৯৫১-৫২ ইং সনেও ঐ সমস্ত বোর্ডিংগুলোতে থাকা খাওয়ার জন্য ছাত্র পিছু প্রতি সপ্তাহে ৫ সের চাউল ও ২্ টাকা দিতে হতো।

তবে এটা অনস্বীকার্য্য এই যে, উপরিউক্ত ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসগুলিতে পুরান ত্রিপুরা ছাত্ররাই থেকে পড়াশুনার সুযোগ পেতেন।

প্রসঙ্গক্রমে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বিগত শতকের প্রথমভাগে বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের "ছাত্র-বৃত্তি" প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। ১৩১৪ ত্রিং বা ১৯০৪ ইং সনে সরকারী এক আদেশে মাইনর, উচ্চবাংলা, নিম্নবাংলা ও পাঠশালায় অধ্যয়নরত মোট ১৯জন ছাত্রছাত্রীকে ছাত্রবৃত্তি মঞ্জুরের এক আদেশ জারী করা হয়েছিল (সার্কুলার নং ৩- ১৩১৩) ঐ ১৯জন মেধাবী বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খোয়াই এর পাঠশালায় অধ্যয়নরত জনৈক গোবিন্দচন্দ্র ত্রিপুরা মাসিক ২্ টাকা হারে দুই বৎসরের জন্য ছাত্রবৃত্তি পান।

পুরান ত্রিপুরা সমাজে বিশেষত: দুর্গম পার্বত্যপল্লী অঞ্চলে শিক্ষার আলো সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের জনশিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা ত্রিপুরার শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগেব সূচনা করে। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ও সম্প্রসারণের সামগ্রিক দায়ভাগ ও কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে মহারাজাদের প্রশাসনিক দায়িত্বে ও নিয়ন্ত্রণে। ১৯৪৫ সালে গঠিত জনশিক্ষা সমিতি ছিল সম্পূর্ণতই জনগণের এবং জননেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে। সেই বছরের ১১ই পৌষ কতিপয় শিক্ষিত যুবক (সকলেই প্রাচীন ত্রিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত) যথাক্রমে সুধন্বা দেববর্মা, দশরথ দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, দীনেশ দেববর্মা, ধর্মরায় দেববর্মা, হরিনাথ দেববর্মা, শশাঙ্ক দেববর্মা ও অন্যান্য কয়েকজন শিক্ষিত পুরান ত্রিপুরা যুবক সদর মহকুমার দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় জনশিক্ষা সমিতি গঠন করেন। সদর, খোয়াই ও কমলপুর মহকুমায় অতি দ্রুতগতিতে সমিতির কার্যক্রম প্রসারিত করেন। বলা বাহুল্য উপরিউক্ত তিনটি মহকুমায় প্রধানত: পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বসবাস। সেইভাবে শুধুমাত্র এক বৎসরেই জনশিক্ষা সমিতি মোট ৪৪৮টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপনে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে ঐ সমস্ত বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলো সরকারী অনুমোদন লাভ করে। জনশিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহের সরকারী অনুমোদন লাভের কৃতিত্ব সম্পূর্ণতই তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার "ব্রাউন" সাহেবের।

গত শতকের পঞ্চম দশকে ও তার পরবর্তী সময়ে পুরান ত্রিপুরা অধ্যুষিত জনপদ সমূহে যারা ঐ সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন তারাই পরবর্তী সময়ে সরকারী চাকরী বাকরী এবং গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব দানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এক কথায় জনশিক্ষা আন্দোলনের সমসাময়িক পুরান ত্রিপুরা যুব সম্প্রদায়ই সমাজে শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত প্রথম প্রজন্ম। স্বাভাবিকভাবেই ঐ প্রথম প্রজন্মের পরবর্তী বংশধর ও সন্তানসন্ততিরাই ও উচ্চতর শিক্ষা, মেডিকেল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ অধিকতর গ্রহণে সক্ষম হয়েছে এবং সমাজে ও রাজ্যে শাসনে অংশীদার হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

যাই হোক গত দেড়শত বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার সামগ্রিক অগ্রগতির নীরিখে পুরান ত্রিপুরাসহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ এখনও আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি।

এ বিষয়ে সরকারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ-

সাক্ষরতার হার (২০০৮)									
	সারা ত্রিপুরা			এস সি			এস টি		
ক)	পুরুষ	মহিলা	মোট	পু:	ম:	মোট	পু:	ম:	মোট
	৮১.০%	৬৪.৯%	৭৩.২%	৮১.১%	৬৭.২%	৭৪.৭%	৬৮.০%	৪৪.৬%	৫৬.৫%

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি

শিক্ষার স্তর	সর্বমোট	ছাত্রী	এস সি	এস টি
১) প্রাথমিক (১ম থেকে ৫ম)	৪৯৩১৬৯	২৩৫৯৬৬	৯৩.৪৪৩	২,০২৫১০
খ) ২) মধ্যস্তর (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম)	২০৪৩৫৬	৯৯৬৯১	৪৩৬৭৬	৬৪৪৩৫
৩) মাধ্যমিক (৯ম - ১০ম)	৯১২৩৫	৪২৬০২	১৬৭৯৯	২৫১৮০
৪) উচ্চ মাধ্যমিক (১১-১২)	৩৬৬৭৯	১৪৭২৪	৬৭৫৭	৬২৩০
সর্বমোট -	৮২৫৪৩৯	৩৯২৯৮৩	১৬০৬৭৫	২৯৮৩৩৫৫

সর্বমোট	ক (১)		
১৯৪১-৭.৯০%	এস সি	এস টি দের বিভিন্ন দশকে সাক্ষরতার হার	
১৯৫১-১৫.৫০%	N/A	N/A	
১৯৬১ -	২০.২৪%	১৩.৪২%	১৯৬১ - ১০.০১%
১৯৭১ -	৩০.৯৮%	২০.৫১%	১৯৭১ - ১৫.০৩%
১৯৮১ -	৪২.১২%	৩৩.৮৯%	১৯৮১ - ২৩.০৭%
১৯৯১ -	৬০.৪৪%	৫৬.৬৬%	১৯৯১ - ৪০.৩৭%
২০০১ -	৭৩.২০%	৭৪.৬৮%	২০০১ -৫৬.৪৮%

ড্রপ্ ও আউটের হার

	সর্বমোট	এস সি	এস টি
১) প্রাথমিক (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী)	- ১১.৬০%	- ১০.৩৪% -	১৩.৮১%
২) ইলেমেন্টারী (১ম থেকে ৭ম)	- ২১.৪২%	- ২০.৬৬% -	২৭.৫৯%
৩) মাধ্যমিক (১ম থেকে ১০ম শ্রেণী)	- ৬১.০৪%	- ৬০.৭৩% -	৬৬.৪৮%

স্নাতক পর্যায়ে ভর্তির হার (২০০৬-০৭)

সাধারণ	এস সি	এস টি
পুং মহিলা মোট	পুং মহিলা মোট	পুং মহিলা মোট
১১৭২৪ -২৯৭৪ =২০৭০২-	১৯৪২-১৪০২=৩৩৪৪	১৮০২ -১৩৩২ ৩১৩৪

স্নাতকোত্তর পর্যায়

১৮৮৩ -১২৯৮ = ৩১৮১ -	১৪৫-৯৯= ২৪৪	১৬০ -১১৭ -২৭৭

উপরের সারণীগুলো থেকে ত্রিপুরায় পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সহ সামগ্রিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হাল প্রস্ফুটিত হচ্ছে। সমগ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গড় সাক্ষরতার হার ৫৬.৫%। যেহেতু পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাইতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর। সেইহেতু এই সমাজের সাক্ষরতার হার ৬০% এর কাছাকাছি হবে বলে অনুমান করা যায়। এটাও লক্ষ্যণীয় যে এস সি জনগোষ্ঠী ১৯৯১ সালে ৫৬.৬৬% সাক্ষরতার হারে পৌছেছে কিন্তু সেই ৫৬% এস টিদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে আরও দশ বছর পরে অর্থাৎ ২০০১ সালে আর স্কুল ছুটদের হার শতকরা ৬৬.৪৮জন (এস টি দের মধ্যে) (প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত) যা তুলনামূলকভাবে সর্বাধিক।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পুরান ত্রিপুরাসহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এস টি ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতির হার এখনও অতীব শোচনীয়। প্রাথমিক স্তরে এস টি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০২৫১০জন। শিক্ষার সর্বোচ্চ সোপানে অর্থাৎ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি মাত্রই ২৮৮জন।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী কৃষ্টি-সংস্কৃতি

ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের মতো ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশ পুরান ত্রিপুরীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা লেখ্যরূপে উত্তরণের পূর্বে যুগ যুগ ধরে এক পুরুষ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম এবং এক মুখ থেকে অন্য মুখে কৃষ্টি সংস্কৃতির উপাদানগুলো বহতা নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এই প্রবহামনতা এখনও চলছে।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সাথে অরণ্য প্রকৃতির চিরায়িত সম্পর্ক। অরণ্য প্রকৃতি ও আদিবাসী জনজীবন একে অপরের পরিপূরক। সেই হেতু এই জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতিও প্রাকৃতিক উপাদানে পরিপুষ্ট।

জুমচাষ কেন্দ্রিক ব্যক্তি পরিবার ও সমাজজীবনের চালিকা শক্তিই হচ্ছে তাঁর লোক সঙ্গীত, লোক নৃত্য, লোক গাঁথা, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদি। প্রকৃতির সাথে চিরায়ত সম্পর্কহেতু সমাজের প্রতিটি নারী পুরুষ স্বাভাবিকভাবেই লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে পারদর্শী।

পুরান ত্রিপুরী সমাজের মাতৃভাষা ককবরকের অঞ্চলভিত্তিক উপভাষাকে কেন্দ্র করেই ত্রিপুরী লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্রতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই লোকসঙ্গীতে উপভাষা ভেদে অঞ্চলভেদে তার বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়।

ককবরক উপভাষা ভিত্তিক ত্রিপুরী লোকসঙ্গীতকে প্রধানত: নিম্নলিখিত উপ-বিভাগে চিহ্নিত করা হয়।

১) ভোর রাগিণী

২) দোনা রাগিণী

৩) দাসপা রাগিণী

৪) লখপতি রাগিণী

৫) গোলসরি রাগিণী

৬) দক্ষিণ রাগিণী

পুরান ত্রিপুরী লোকসঙ্গীত যেন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের সার্থক দর্পণ। মানবজীবনের প্রেম, বিরহ, ভালবাসা, স্নেহ, মায়া মমতা সহ নিসর্গ নির্ভর (ঋতু প্রশস্তি), ভাগ্য বিলাপ উপদেশাত্মক, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, অতীত স্মৃতিচারণা, জীবন ও জীবিকা, গার্হস্থ্য জীবন চর্য্যা, সংসার ধর্মপালন আধ্যাত্মিকতা, পিতৃমাতৃ ভক্তি, আত্ম জিজ্ঞাসা, আত্মবিলাপ ইত্যাদি লোকসঙ্গীতের প্রতিটি ছত্রে এবং সুরের মায়াজালে প্রতিবিম্বিত।

লোকসঙ্গীতের অপর পীঠ বাদ্য যন্ত্রসঙ্গীত। পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর যন্ত্রসঙ্গীতগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১) সারিন্দা - সারেঙ্গী পরিবার ভুক্ত।

২) সুমুই - বাঁশি।

৩) চংপ্রেং - বাংলার দোতারা শ্রেণীভুক্ত।

৪) ডাংদু - দক্ষিণ ভারতীয় "মরসিং" যন্ত্রসঙ্গীতের সাথে সামঞ্জস্য যুক্ত।

৫) খাম - দোলক জাতীয় বাদ্য।

৬) ওয়াথপ - একটি বিশেষ জাতীয় বাঁশদ্বারা প্রস্তুত।

৭) তংতুং - ডুগডুগি শ্রেণীর।

ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পুরান ত্রিপুরা সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের পদক্ষেপ শুরু হয়। এই সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষালাভে পদাবলী কীর্তন, হরি সংকীর্তন ও নৃত্যও সমাজে সমাদরে গৃহীত।

অপরাপর প্রতিবেশী জাতি গোষ্ঠীর সাথে সংযোগ সাধনে অন্য ভাষাগোষ্ঠীর সঙ্গীত ও নৃত্যকলাও পুরান ত্রিপুরা সমাজে বিশেষত: আধুনিক ত্রিপুরায় বিশেষ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গীত ও নৃত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাদ্যযন্ত্র সমূহ ক্রমশ: ত্রিপুরী সমাজে সমাদর পেয়ে এসেছে।

উত্তর আধুনিক ত্রিপুরায় ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করায় স্বাভাবিক কারণে খৃষ্ট ধর্মীয় সঙ্গীত (বাইবেল কেন্দ্রীভূত সঙ্গীত) গ্রাম পাহাড়ে দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিন গণ মাধ্যম আকাশবাণী ও দূরদর্শন পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকসঙ্গীত পুনরুজ্জীবন, ব্যাপক প্রচার প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশ শতকের শেষ দশকগুলো থেকে বেসরকারী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রিত বৈদ্যুতিন গণ মাধ্যমের দৌলতে চিরায়ত লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য সমূহ ক্রমশ জৌলুসহীন এবং জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রক্ষায় ব্যর্থ হচ্ছে। এটা সত্যিই উদ্বেগের।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকনৃত্য

লোক সঙ্গীতের মতই লোকনৃত্য সমানভাবে আদৃত। লোকায়ত সমাজ জীবনের দর্পণ লোক নৃত্যেও প্রতিফলিত। পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোকনৃত্যগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :-

১) গরিয়া নৃত্য - গরিয়া পূজা ও উৎসব উপলক্ষে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন থেকে সেনা অর্থাৎ ৭ (সাত) দিন ব্যাপী এই নৃত্য পরিবেশিত হয়। খাম, দোলক ও সুমুই যন্ত্রানুসঙ্গে সমবেত যুবক-যুবতীদের নৃত্য। গরিয়া নৃত্যের সঙ্গীতাংশে কিছু কিছু অশ্লীল শব্দাবলীও গ্রহণযোগ্য। তার বিশ্লেষণ আলোচনা সাপেক্ষ।

গরিয়া নৃত্যের মোট ৫২টি তাল রয়েছে এবং স্বর্গীয় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য বিশেষজ্ঞ মহেন্দ্র দেববর্মা দ্বারা সংগৃহীত ও সংকলিত।

২) মামিতা নৃত্য :- জুম চাষে জুমধান কাটা, ঝাড়াই, মাড়াই এবং গোদামজাত করার পর মামিতাদেবীর পূজার্চনা ও নবান্ন নিবেদন সম্পর্কিত নৃত্য।

সমবেত নৃত্য। আবাল বৃদ্ধ বণিতা মিলেই এই নৃত্য পরিবেশনা।

জুম নৃত্য

৩, লেবাং বুমানি নৃত্য :- আশ্বিন- কার্তিক মাসে জুম ক্ষেতে এক ধরনের ছোট ছোট পোকার উপদ্রব দেখা যায়। এই পোকা সাধারণত. জুম ফসলের কোন ক্ষতি না করলেও ঐ পোকার আকর্ষণে অন্যান্য বুনো পাখি জুম ক্ষেতে ভীড় জমায় তাতে তিল কার্পাস ফল ও ফলের ক্ষতির কারণ হয়। লেবাং পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্যই যুবক-যুবতীরা সমবেতভাবে সেই পোকাকে দুটি বাঁশের কঞ্চিদ্বারা মেরে ফেলা বা তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

সেই লেবাং পোকা মারা বা তাড়ানোর নৃত্য ভঙ্গিমায় প্রদর্শিত হয়।

৪) হজাগিরি নৃত্য ঃ- মূলত: হজাগিরি নৃত্যে রিয়াং জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য। কিন্তু পুরান ত্রিপুরা সমাজেও এই লোক নৃত্য সমানভাবে আদৃত ও পরিবেশিত। .

প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য উড়িষ্যার ছৌ নৃত্যের মত হজাগিরি নৃত্যও এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ও উচ্চ প্রশংসিত।

৫) মসক সুমানি নৃত্য ঃ- এক কথায় হরিণ শিকারের নৃত্য। এই নৃত্যের সাথে সুনির্দিষ্ট কোন পূজা-পার্বণের সংস্রব নাই। সামাজিক উৎসবানন্দেই এই নৃত্য আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই পরিবেশিত হয়।

মসক সু-মানি নৃত্য

৬) মাইনাক্ মানি নৃত্য ঃ- জুম চাষে জুমের ধান কাটার পর সংগৃহীত শীষ যুক্ত ধান জুমের টংঘরে স্তুপীকৃত করা হয়। সেই স্তুপীকৃত ধান টংঘরের একটা বড় বারান্দার মতো অংশে সমবেত যুবক যুবতী খাম ও দোলক সহযোগে নৃত্যের তালে তালে পায়ে ধান মাড়াই করেন। সেটিই মাইনাক মানি নৃত্য।

৭) হংতাংমানি নৃত্য ঃ- জুম [illegible] ‘হয়াণ্ডল খিল” (বদলী মজুরী) প্রথার মাধ্যমে [illegible] এক পাড়ার সমস্ত কর্মক্ষম বয়স্ক, বয়স্কা সমবেতভাবে এক একটি পরিবারের [illegible] আগাছা পরিষ্কার করেন। এই ইয়াণ্ডলপ্রথায় চক্রাকারে (Rotational Basis) এক জুম ক্ষেত থেকে অন্য জুম ক্ষেতে এক সমবেতভাবে কাজ করা হয়। জুম ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কারের কাজেও খাম দোলক বাদ্য বাজিযে এবং লোকসঙ্গীতের (বিশেষত: চাপান উত্তর সঙ্গীতের মাধ্যমে) পরিবেশন সহযোগে কাজ করা হয়। এতে ক্লান্তি ও শ্রমের লাঘব হয়।

৮) জুম চাষের বিভিন্ন নৃত্য ঃ- ইদানীংকালে জুম চাষকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন লোকনৃত্য পরিবেশিত হচ্ছে বিভিন্ন শিল্পী বা শিল্পীগোষ্ঠীর মাধ্যমে। এই লোকনৃত্যগুলো মূলত: মনোরঞ্জনের জন্যই।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর উপরিউক্ত লোকনৃত্য সমূহ ক্রমশ: নিজস্ব বৈশিষ্ট্যতা হারাচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার এমেচ্যার শিল্পীগোষ্ঠী বিশেষত: শহর কেন্দ্রিক শিল্পীগোষ্ঠী লোকনৃত্যের নামে নিজেদের খেয়াল খুশিমত নাচ-তাল প্রয়োগ করে নৃত্য উপস্থাপনা অজকাল আকছার চলছে। বিশেষভাবে লোকনৃত্য শিল্পীদের পোষাক পরিচ্ছদ বা অঙ্গসজ্জা দৃষ্টি নন্দনের পরিবর্তে অনেক সময় পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছে।

তার জন্য প্রয়োজন বিশেষ "স্কুল" বা নৃত্য বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে লোকনৃত্যসমূহের সঠিক চর্চা ও উপস্থাপনা।

পুরান ত্রিপুরা সমাজ- লোক গাঁথা, কেরাংকথমা (Folk Tale), রূপকথা
কল্পকাহিনী (Folk lone) ইত্যাদি

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে মুখে মুখে বাহিত হয়ে লোক গাঁথা, রূপকথাগুলো আজও অম্লান রয়েছে। রূপকথা বা লোকগাঁথাগুলোর মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ।

পুরাণ ত্রিপুরা লোকগাঁথার নাট্যরূপ

পুরান ত্রিপুরা সমাজে বহুল প্রচারিত এবং অদরণীয় লোকগাঁথা, রূপকথা সমূহ ঃ-

১) লাঙ্গাইরাজানি রীচাব মুং ঃ

ত্রিপুরাধিপতিদের কুষ্টীরাজ্য জয়ের কাহিনী মানবিক আবেদনে সম্পৃক্ত লোকগাঁথা।

২) মামলামীসা চামানি ঃ

অরণ্য কন্দরে জুমের টংঘর থেকে দয়িতাকে হিংস্র ব্যাঘ্রের আক্রমণ ও নিহতের করুণ কাহিনী।

৩) ডুঙ্গুর নিরাইসক তান মানি ঃ-

পিতৃহীন বিধবা মায়ের পুত্র কিশোর বালকের গভীর অরণ্যে বেতবাঁশ সংগ্রহে নিদারুণ বিপদগ্রস্ত হওয়ার এবং বিধবা মায়ের করুণ বিলাপ এই লোক গাঁথার উপজীব্য।

৪) আমাতি থাংমানি ঃ- স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা দয়িতার করুণ বিলাপ ও আত্মহননের কাহিনী।

৫) রিসার খাগ্রা ঃ-

রাজাদেশে সদ্য বিবাহিত যুবকের যুদ্ধ যাত্রাকালীন নব বিবাহিতা পত্নীর বিলাপ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই লোকগাঁথার সঙ্গীতের অংশ ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার ত্রিপুরার স্মৃতি পুস্তকের শেষাংশে সন্নিবেশিত।

৬) সংদারীছা ঃ-

সহোদর সহোদরা বিহীন একটি কিশোর বালকের জীবন সংগ্রামের কাহিনী।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রূপকথা

স্নেহ, মায়া, মমতা, বাৎসল্য, নিকট আত্মীয়ের মঙ্গলামঙ্গল কামনা মানবিকতার উৎকর্ষ গুণাবলী। মানব শিশুর কাছে ঠাকুরমা-ঠাকুরদার সান্নিধ্য সবচাইতে কাম্য। অন্যদিকে নিজেদের নাতি-নাতনীদের প্রতি অপরিসীম স্নেহবোধ মানবিকতার বৈশিষ্ট্য। সেটাই মানবিকতার চিরায়ত ট্রেডিশন। উত্তর আধুনিক যুগে ছোট পরিবার গঠনের লক্ষ্যে অবশ্য এই চিরায়ত ট্রেডিশন ক্রমশ: ম্লান হচ্ছে। তথাপি এই ধারাবাহিকতা সহসা থেমে শেষ হবার নয়।

ছোট শিশুদের রূপকথার কল্প কাহিনী আকর্ষণে সমস্ত মানবগোষ্ঠীতেই রচিত হয়েছে রূপকথা, উপকথা-কল্প কাহিনী। প্রাচীন ত্রিপুরা সমাজে তার ব্যতিক্রম নেই।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জনপ্রিয়তম ও সর্বাধিক প্রচলিত রূপকথাগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১) ইয়ামরক ছানি কেরাং কথমা - জনৈক বাউণ্ডুলে পুরুষের মানবিক ও অতিমানবিক কার্যকলাপ।

২) চিবুক হাসিকিরি - বিরাট গোঁসাপের চলাফেরা ও মানুষের সাথে একাত্মার সরস কাহিনী।

৩) মাযুং কুফুর - শ্বেত হস্তীকে নিয়ে কল্পকাহিনী।

৪) মীখারাছানি কেরাংকথমা - কোন এক বানরের লৌকিক অলৌকিক কার্য্যক্রমের কাহিনী।

৫) মারে মারাই নি কেরাং কথমা - দুইজন মহিলার অন্তরঙ্গতার সই (বান্ধবী) সম্পর্কের কাহিনী।

৬) নওয়াই নি কেরাং কথমা - নওয়াই পাখির সরস গল্প।

৭) রাঙ্গিয়া-যাঙ্গিয়া নি কেরাং কথমা - রাঙ্গিয়া ও যাঙ্গিয়া নামক দুই সহোদর ভাইদের নিয়ে কল্পকাহিনী।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর ঘুম পাড়ানী গান (Lullaby)

মাতৃ-জঠর থেকে ভূমিষ্ঠের পর সন্তান সন্ততিকে পরম আদর যত্ন সহকারে পালন পোষণ

পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়স্বজনের পবিত্র কর্তব্য ও দায়িত্ব। সন্তান জন্মের প্রাক্‌লগ্ন থেকেই শুরু হয়ে যায় তার প্রস্তুতি।

পুরান ত্রিপুরা সমাজে প্রতি গৃহস্থ পরিবারে দোলনা (ওয়ারিং) থাকছেই । এমন কি কোন নূতন দম্পতি নূতন সংসার শুরু করলে এবং ভাবী পুত্রকন্যা জন্মের সূচনা হলে ওয়ারিং যোগাড় করা অত্যাবশ্যক। ওয়ারিং বাঁশ ও বেতের দ্বারা নির্মিত শিশুদের শয়ন উপযোগী একটি আধার।

কোলের শিশুকে সযত্নে দোলনায় শুইয়ে দিয়ে শিশুর মা অথবা দিদি/ঠাকুরমা বা বয়স্কা নিকট আত্মীয়া "ওয়ায়িং খিলিমা" সঙ্গীতের মাধ্যমে শিশুকে ঘুম পাড়ান।

লে - লে- লে- লে
সাজীরা জরা - তকমা -তগ্‌লা কতক মা
জরা - মৌনাই থুনানি জরা
(সূর্যদেব ক্রমশ: মধ্যগগনে উঠে এসেছে
গৃহপালিত মোরগগুলো ডেকে উঠেছে এখনই
সোনামণির ঘুমের সময়)
বাবু ব থাঙখা - রাজানি সেবুক
মায ব - থাংখা -বাজানি ধাইজুক
সা- বলে বাইনানায় তংছি?

(শিশুর) বাবা রাজ দরবারে সেবকের কাজ নিয়ে চলে গেছে মাও রাজপরিবারে ধাত্রী হিসেবে কাজ করছে ছোট্ট সোনামণিকে কে দেখভাল করবে?)

মৌখাং বাতাসা সাতুং নাংগানু
ফেরাঙ্গী ছাতি হংদি ....
(ছোট্ট সুন্দর মুখশ্রীতে রোদের তেজ
থেকে বাঁচতে ফেরাঙ্গী ছাতা খুলে দাও...........)
ইত্যাদি

পুরান ত্রিপুরা সমাজে প্রবাদ-প্রবচন

পুরান ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা ককবরক। অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষার মতোই ককবরকেরও প্রবাদ ও প্রবচনের বিরাট সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে।

কয়েকটি উদাহরণ ঃ-

১) তৌইমা নাইতৌই

রিগ্‌নাই সুতুই - নদী দেখা এবং কাপড় ধোওয়ার কাজ যুগপৎ করা। বাংলায় যেমন রথ দেখা কলা বেচা।

২) চা নাই মৌসা পগু

চা জাকনাই মৌসাই পগ্‌য়া - হিংস্র বাঘ শিকার ধরে খেয়ে ভুলে যায় কিন্তু যাকে শিকার করা হয়েছে সে ভুলে না। অর্থাৎ কেহ কারো অনিষ্ট করলে সেই অনিষ্টকারী ভুলে যেতেই পারে কিন্তু যার অনিষ্ট করা হয়েছে সে কখনও ভুলে না।

৩) ভূতুওয়া লাইখুমু দশহাত - কাউকে অপাত: দৃষ্টিতে বোকা ও নীরিহ মনে হলেও বাস্তবে ধুরন্ধর ব্যক্তি।

৪) জাইতি কীবাং মাই মা চায়া - যার আত্মীয় কুটুম্ব অনেক বেশি তার কখনও সখনও ভাত জোটে না।

৫) নখা গুরুম সাক্ ওয়াতাই ফাইয়া - যত গর্জে তত বর্ষে না।

৬) চানানি বেকেরেং খিবনানি বাহান - কোন বস্তু ফেলে দিতে গেলে লোকসান আবার ভোগ করতে হলে কষ্টসাধ্য।

৭) হলং কোসেব নি তকতায় - দুইদিক থেকে সাঁড়াশী চাপে রয়েছে এমন অবস্থান।

৮) তাইগেরেং তিয়ারী খা-অ,

তিয়ারী তাইগেরেং উংগ - দীন দরিদ্র ধনী হতে পারে আবার ধনীও নি:স্ব হতে পারে।

৯) চা নানি রাংযা চা মামা - যে বুঝে সুঝে ভোগ করতে জানে না তার ভোগের বস্তু শেষ পর্যন্ত নাও মিলতে পারে।

১০) চা মানি নি বুমুং ন তাংয়া

হামজাক নি বুমুং- ন- সংয়া - জামাই উঠা যুবক কঠোর পরিশ্রমী হলেও তাকে অলস অপবাদ দেওয়া হয়, তেমনি নূতন পুত্রবধূ গৃহস্থালীতে নিপুণ হলেও তাকে নিষ্কর্মা অপবাদ দেওয়া হয়। ইত্যাদি

ধাঁধা

ককবরকে বহুবিধ জনপ্রিয় ধাঁধা প্রচলিত। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১) নকবিছিং নকবাসা → ঘরের ভেতর ঘর - অর্থাৎ মশারি।

২) মাসাই রাংচাক খাববারাক

তখা কসম বারারাক → সোনার হরিণ যত পালাচ্ছে - কালো কাক ততই বিচরণ করছে। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জুম ক্ষেতে আগুন জ্বালিয়ে দিলে - আগুনের লেলিহান
শিখা যত দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে সাথে সাথেই পুড়ে যাওয়া কালো ছাই এর এলাকা বেড়েই যাচ্ছে।

৩) বরক খরকছা

বখরক থাইতাম → বৃদ্ধ লোককে বুঝায়। বৃদ্ধের মাথা ও দুইটি হাঁটু যেন একত্রভুক্ত তিনটি মাথা।

৪) থাং গিরি গিরি

ফাই লেথাথাং → কোন ব্যক্তির পায়খানায় যাওয়া এবং ফিরে আসা।

৫) ওম্ পুংনাই মাসায়া → হালুম ডাক বাঘের নয়। এ ক্ষেত্রে বনের একরকম পাখি 'টপথায়" এর বাঘ সদৃশ ডাককে বুঝায়।

৬) বানচাখালা বানসুমালা

দেখিয়া সোনাকালা → অজগর সাপ। (বাংলা শব্দ মিশ্রিত)

৭) গলা চমড়ক খেব্তক্য়া → কানাহীন কলসী কাঁখে নেওয়া কষ্টকর। অর্থাৎ - ডিম কে বুঝায়।

৮) মাইতাং তাংছা মায়াম পুংগ ⟶ একটি ধানের শীষ একটি গোলা ভরে দেয়। প্রদীপ - একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনেই বিরাট ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

৯) নখা নাইসা মুরিসা সোরচা ⟶ কলার থোড়।

১০) নাইসাই নুকসায়া - তাংসাই মানহরয়া ⟶ উপর দিকে তাকালে দেখা যায় কিন্তু হাতে স্পর্শ করা যায় না। ⟶ আকাশ। ইত্যাদি

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী বয়ন শিল্প

আদিবাসী জনজাতিদের পরিচিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মহিলা সমাজের বয়নশিল্পে দক্ষতা। অনাদি কাল থেকে পুরান ত্রিপুরা মহিলারা নিজেদের এবং পরিবার পরিজনদের পরিধান ও প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় উৎপাদনে স্বাবলম্বী। সেইহেতু শহর বন্দর থেকে মিল উৎপাদিত কাপড় চোপড় তাদের কোন প্রয়োজন ছিল না। নেহাৎ খেয়ালবশে অথবা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজদরবারি হাজিরার জন্য পাগড়ী, চোপ্‌কান ইত্যাদি বাজার-হাট থেকে সংগ্রহ করা হতো মাত্র।

পুরান ত্রিপুরা সহ পঞ্চ ত্রিপুরী সমাজে এবং রাজ্যের অন্যান্য আদিবাসী জনজাতিদের মধ্যে বয়ন শিল্প কতটুকু সমৃদ্ধ ছিল- তার প্রমাণ মিলেছে ১৯৩১ সালের ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মণ কর্তৃক প্রণীত সেন্সাস বিবরণীতে ঃ-

ত্রিপুরা স্টেট ইমপারিয়েল টেবিল নং - ২

মোট জনসংখ্যা

	তাঁত (হাতের কোমর তাঁত)	চরকা
১) পুরান ত্রিপুরা	৭৭৫৮০	১৫৪০৮
		১৫,২৯৬
	(৩৭৯৪৫)	
২) দেশী ত্রিপুরা	১৪৯৪	শূন্য
		শূন্য
	(৬৭৩)	
৩) রিয়াং	৩৫৮৮১	৮৩[illegible]৯
		৮০[illegible]৩
	(১৭৪৮২)	
৪) জমাতিয়া	১১০৯০	২৪৩৪
		২২৮০
	(৫৪৫৬)	
৫) নোয়াতিয়া	২৭৪০৫	৫৬৪০

		৫৩৬৬
	(১৩২৫১)	
১) হালাম	১২৭১৩	৩০০৭
		৩১৫৯
(সর্বদফা)	(৬১৩৬)	
২) মণিপুরী	১৯২১০	২৬৩৭
		৩৮৪২
	(৯৩৩৮)	
৩) চাকমা	৮৬১৩	২২১১
		২০৯০
	(৪১০৭)	

বি: দ্র: ঃ-বন্ধনীর মধ্যে সর্বমোট মহিলার সংখ্যা প্রদত্ত

উপরের সারণী থেকে দেখা যায়, পুরান ত্রিপুরী জনগোষ্ঠীর সর্বমোট স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল - ৩৭,৯৪৫। এরমধ্যে বালিকা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা মহিলাদের যারা বস্ত্র বয়নে ও চরকা কাটায় দক্ষতা অর্জন করেনি তাদের বাদ দিলে সমাজের প্রতিটি পূর্ণ বয়স্কা মহিলারাই প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁত ও চরকা ব্যবহার করে বস্ত্র উৎপাদন করতেন।

পুরান ত্রিপুরী সমাজে বস্ত্র উৎপাদনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপ

প্রথম পর্যায় ⟶ জুম ক্ষেত থেকে কার্পাস তুলা সংগ্রহ।

দ্বিতীয় পর্যায় ⟶ সংগৃহীত কার্পাস বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথকীকরণ। কার্পাস গাছে দু-রঙের তুলা পাওয়া যায় একটি সাদা তুলা- অন্যটি হরিদ্রাবর্ণের।

তৃতীয় পর্যায় ⟶ বাছাই করা তুলাকে কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে নেওয়া।

চতুর্থ পর্যায় ⟶ চখের এক ধরনের তুলা পেষণ যন্ত্রে কার্পাস থেকে কার্পাসের বীজ তুলা থেকে পৃথক করা।

পঞ্চম পর্যায় ⟶ পৃথকীকৃত তুলা ধুনাইকরণ।

ষষ্ঠ পর্যায় ⟶ ধোনাই কৃত মিহি তুলাকে ছোট ছোট বিঘত খানেক লম্বা করে প্রস্তুত করা। (ফাসুই মলিনা)

সপ্তম পর্যায় ⟶ ফাসুই গুলোকে চরকা কেটে সূতা উৎপাদন

অষ্টম পর্যায় ⟶ উৎপাদিত সূতাকে মিহি ভাতের মাড় সহযোগে সিদ্ধ করণ।

নবম পর্যায় ⟶ সিদ্ধ কৃত সূতাকে ডাংডালে রেখে শুকিয়ে নেওয়া।

দশম পর্যায় ⟶ শুকানো সূতাকে নালাতে উঠিয়ে নেওয়া।

একাদশ পর্যায় → গুচ্ছ গুচ্ছ সুতাকে রঙ করা (দেশজ পদ্ধতিতে) ও আবার শুকিয়ে নেওয়া।

দ্বাদশ পর্যায় → এক বিঘত লম্বা কঞ্চিতে পাকিয়ে নেওয়া (খীতীং গানান্নং)

ত্রয়োদশ পর্যায় → খীথীং গানাকে তাঁতে তোলা।

চতুর্দশ পর্যায় → তাঁতে বুনে বস্ত্র উৎপাদন।

প্রাচীন কাল থেকে গত শতকের চতুর্থ বা পঞ্চম দশক পর্যন্ত পুরান ত্রিপুরার মহিলাগণ নিজস্ব পদ্ধতিতে সুতার রঙ করতেন। সূতা রং করার জন্য দেশীয় ভেষজ উপকরণই ব্যবহার করা হতো।

এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ-

১) আশু - এক ধরনের বনজ গুল্ম

২) নেলা - নেলাগাছ (নীলচাষের বিকল্প)

৩) সীতাই বিলাতি - এক ধরনের গাছের ফল যা হরিদ্রা রং করার জন্য প্রয়োজন

ঐতিহ্যগতভাবে পুরান ত্রিপুরার মহিলাগণ বন জঙ্গল থেকে ভেষজ অহরণ করে নিজেরাই প্রয়োজন অনুযায়ী রং তৈরী করে রঙিন সূতা উৎপাদন করতেন।

উৎপাদিত বস্ত্রের শ্রেণীবিভাগ

১) রিগীনাই - মহিলাদের পরিধেয় পাছড়া

২) রিসা - বক্ষ বন্ধনী ও শিশুদের কোলে পিঠে নেওয়ার কাজে ব্যবহার

৩) ধুতি - পুরুষদের জন্য হাঁটু অবধি পরার কাপড়

৪) কামচৌলাই বরক - জামা প্রস্তুতের কাপড়

৫) কামচৌলাই মেরেং - বিভিন্ন রঙে ডোরাকাটা জামার কাপড় (বিশেষভাবে জামাই-উঠা জামা)

পুরান ত্রিপুরাদের কাপড়ের নক্সা (Design)

সাধারণত: বয়ন শিল্পী মহিলারা ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চির মধ্যে সূতা দিয়ে পৃথক পৃথক নক্সা করেন। তাকে "রি কারি" বলা হয়। এইভাবে প্রস্তুত রি-কারি বা নক্সা সযত্নে তুলে রাখা হয়। নতুন বস্ত্র বয়নের সময় ঐ রি কারি দেখে নক্সা তোলা হয়।

বয়ন শিল্পীদের কাছে বহুবিধ নক্সা সংরক্ষিত থাকে। প্রয়োজনে একজনের কাছে সুরক্ষিত নক্সা অন্য কেউ সাময়িক কালের জন্য নিয়ে যান এবং আবার প্রকৃত মালিককে ফেরৎ দেন।

নক্সাগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ-

(ক) আঞ্জি (খ) খুমপাং (গ) খুমতক্মা (ঘ) খুমঠলা (ঙ) থেমাই কীরাং, (চ) কীপ্লাসা (ছ) মুইখন চৗক, (জ) তকবাকতক্ (ঝ) চামাথীই বার ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরাণ ত্রিপুরাদের রিসা

অন্যদিকে নিত্য নূতন বাহারি নক্সার ব্যবহারে রিগীনাই বরক বিশেষ করে রিগীনাই চামাথাঁই যেমন জনপ্রিয় হচ্ছে তেমনি উত্তরোত্তর দামও বাড়ছে। পুরান ত্রিপুরার বেশ কিছু বয়ন শিল্পে দক্ষ মহিলা বাণিজ্যিকভাবে রিগীনাই রিসা ইত্যাদি প্রস্তুতির মাধ্যমে বাজারজাতও করছেন।

কারু শিল্প

পুরান ত্রিপুরা পুরুষ সমাজে বাঁশ ও বেত শিল্প সবিশেষ উল্লেখনীয়। চিরাচরিত বন ও বনজ সম্পদের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পুরান ত্রিপুরা সমাজ জীবনে বাঁশ ও বেত অপরিহার্য্য। বাঁশ ও বেতের সমস্ত ঘর গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। বাঁশের সুসজ্জিত নক্সা সহকারেই দেব-দেবীর প্রতীকি হিসেবে পুজা অর্চনা করাও সামাজিক রীতি।

বাঁশের ও বেতের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বেত ব্যবহারে যে সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করা হয় তা সত্যিই লোভনীয়।

পুরান ত্রিপুরায় পুরুষদের দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন সামগ্রীর কিছু তালিকা নিম্নরূপ ঃ-

১) খুতরীক - নতুন কাপড়চোপড় ও মূল্যবান সামগ্রী রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়।

২) ঝাপা - বাংলার ঝাপি শব্দের সমার্থক। এটিও কাপড় চোপড় ও অপেক্ষাকৃত মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর জন্য ব্যবহৃত।

৩) লাংগা - জুমচাষে বাঅন্য যে কোন ঘর গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত।

৪) চেম্পাই - ছোট আকৃতির অথচ কারুকার্য সমন্বিত বিশেষ আধার।

৫) কাইসেলেং - জুম ক্ষেতে বীজ বপনের সময় ব্যবহৃত হয়।

৬) দোলা - বাংলার খলই জাতীয়। গৃহস্থালীর জিনিস পত্রের আধার।

৭) ওয়া - ছোট ছোট নদী নালা মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত।

৮) সিচিং - (ঐ)

৯) ওয়ায়িং - দোলনা শিশুদের ঘুম পাড়ানির জন্য।

১০) বালিং - চাল বাছাইয়ের জন্য।

১১) তপং - ধান/চাউল রাখার জন্য।

১২) জংগিনি - চালুনি বিশেষ।

১৩) নকখাই - বন থেকে লাকড়ী ও ছড়া ঝর্ণা থেকেজল সংগ্রহের জন্য ব্যহৃত।

১৪) ওয়াসিকক্ - বোতল ইত্যাদি রাখার জন্য।

১৫) ইয়াখুং - দারি / ধাড়ি

১৬) ইয়ানজিমাই - মদ্য প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহৃত

১৭) তাখুক - গৃহপালিত মোরগের খাঁচা বিশেষ

১৮) তাইসেং - ১৩নং এর অনুরূপ ।

১৯) চেখ্‌ক - ছাই থেকে খার জল নিষ্কাশনের জন্য এবং মদ ছাঁকার জন্য

২০) চিবস্ - তিল সরিষা পেষণের জন্য ব্যবহৃত।

২১) ইয়ামফ্রা - বসার জন্য আসন।

২২) বেতারা - বাঁশের ছোট ছোট কঞ্চিদ্বারা প্রস্তুত চিরুনী।

২৩) চকারা - মাছ ধরার জন্য জলে ফাঁদ পাতা।

২৪) ডালাক - বিরাট আকারের ডালা।

২৫) দল - ধান রাখার বড় খাড়া।

২৬) কার্নিযা - দারি দিয়ে গোলাকৃতি ধানচাল মজুদের আধার।

২৭) কিছিপ্ - পাখা।

২৮) লাংতং - বিরাট আকারের দারি।

২৯) ওয়াখক্ - ছোট শূকরছানা বহনের জন্য।

৩০) বাংকালাপ - তাখুক এর দরজার ঢাকনি।

৩১) এনচি - মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত।

৩২) সুর্দাম্ - জল হিচানোর জন্য ব্যবহৃত।

পুরান ত্রিপুরা ঘরবাড়ি নির্মাণ পদ্ধতি ও গৃহস্থালী

সাধারণত: গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে অনেকগুলো পরিবার এক একটি গুচ্ছ গ্রামে বসবাসই সুবিধাজনক। গ্রাম বা পাড়া নির্বাচনে একটি জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে জলের উৎস প্রাপ্যতা। সেই জন্যেই পাড়াগুলো কোন একটি নদী, ছড়া বা ঝর্ণার কাছাকাছি করাই বিধেয়।

পুরান ত্রিপুরাদের প্রতিটি পাড়ায় পরিবার পিছু এক বা একাধিক ঘর তৈরী করা হয়। বসবাসের ঘরগুলো পরিবারের লোক সংখ্যার প্রয়োজন অনুসারে ছোট বড় হতেই পারে। তবে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বসবাসের ঘরগুলো মাটি থেকে সাধারণত: ৪ বা ৫ ফুট উঁচুতে মাঁচা তৈরী করা হয়। ঘরগুলো এককথায় দুইটি তলা থাকে। উপরের মাঁচাতে মানুষজন থাকেন আর নিচে ভূমিতলে গৃহপালিত শূকর ইত্যাদি পালন করা হয়।

প্রতিটি ঘর বাঁশ ও কাঠের সংমিশ্রণে করা হয়। আবার শুধুমাত্র বাঁশ ব্যবহার করেও অত্যন্ত মজবুত ঘর তৈরী হয়ে থাকে। গৃহস্থ ঘরগুলোর সম্মুখভাগে একটি এবং পশ্চাৎভাগে আরেকটি বারান্দা রাখা হয়। সম্মুখের বারান্দাকে 'নকসার' এবং পিছনের বারান্দাকে 'বাইগীনা' বলা হয়। তা ছাড়াও ঘরের পিছন অংশে বাইগীনা সংলগ্ন খোলা আকাশের নিচে প্রশস্ত মাচা তৈরী করা হয়

তা ঐ মাচা "নুগুল" নামে পরিচিত।

একান্নবর্তী একটি পরিবারে ২০/২৫জন সদস্যও একত্রে বসবাস করেন। এই রকম বড় পরিবারকে "নকমা" এবং ছোট পরিবারকে "নকচরাই" বলা হয়। নগমায় বসবাসকারীগণ নগসুকু বলে চিহ্নিত করা হয়। একটি দম্পতি ও বিবাহিত অবিবাহিত পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ জামাই এবং নাতি নাতনী একই ঘরে বসবাস করেন। কোন কোন পরিবারে প্রতিটি দম্পতির জন্য পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করা হয় কিংবা প্রকোষ্ঠ ছাড়াও নিজ নিজ নির্দিষ্ট শয়নস্থল চিহ্নিত করা হয়।

যেহেতু একান্নভুক্ত পরিবার, তাই বসবাস ঘরের এক প্রান্তে মাটি ঢেলে রান্নার জন্য স্থান করা হয়। রান্নার নির্দিষ্ট জায়গার উপরিভাগে এক বা একাধিক তল বিশিষ্ট মাঁচা তৈরী করা হয়। ইহাকে "বা-কা" বলে। বা-কার নিচের তলকে বা-কা কুতুং এবং উপরিতলকে বা-কা কৌচাং বলা হয়।

বা-কা কুতুং এ সাধারণত: বাঁশের শিকে গেঁথে মাংস বা মাছের টুকরো শুকোতে দেওয়া হয়। বা-কা মৌচাং এ রান্নার বিভিন্ন সরঞ্জাম ও জুমে উৎপাদিত নানাবিধ মশলা ও রন্ধন সামগ্রী রাখা হয়।

অনুরূপভাবে একান্নভুক্ত পরিবারের প্রতিটি দম্পতির নির্দিষ্ট শয়নস্থানের উপরে এক একটি মাচা বানানো হয়। ঐ মাচাটিকে 'মাঝাং' বলে। মাঝাং এ বিছানা বালিশ ও অন্যান্য শয্যাদ্রব্য তুলে রাখা হয়।

গৃহস্থ ঘরের নৈঋত্ কোণে বা একটি প্রতীকী বাঁশের আসনে 'নক সৗমা' দেবীর পীঠস্থান করা হয়। সাথে সাথে গৃহস্থের পূর্বাংশে মাইলুমা ও খুলুমা দেবীর প্রতীক হিসেবে চাউল পরিপূর্ণ দুইটি কলসী সযত্নে রাখা হয়। কলসীর চালের উপর এক বা একাধিক নুড়িখণ্ড রাখা হয় এবং মাইলুমা খুলুমা এবং নকসুদেবীকে নিত্যদিন ধূপধুনা সহকারে পূজা করা হয়। প্রয়োজনে বসবাসের ঘরের সন্নিকটে "মাযাম" অথবা শস্য গোলাঘর, হাঁস, মোরগ, পাঁঠা-ছাগলের জন্য ঘর তৈরী করা হয়। গৃহপালিত পশু পাখির জন্য নির্দিষ্ট মাচাঘরকে তক্‌নগ, পুননগ্ বলা হয়। তদুপরি বসতঘরের সংলগ্ন একটা মাচাঘরে সারা বছরের জন্য জ্বালানী/লাকড়ি মজুদ রাখা হয় ঐটি 'বলনগ' নামে পরিচিত। প্রতিটি বসতি ঘরের সম্মুখভাগে এবং নুগুল সংলগ্ন এক একটি বাঁশের বা কাঠের সিঁড়ি দেওয়া থাকে।

প্রাচীন ত্রিপুরী জনগোষ্ঠী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্ব থেকে স্থায়ী হলকৃষি জীবিকায় উত্তরণের পর চিরাচরিত মাচা ঘর থেকে অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চলে সমতলবাসীদের মতোই ঘরবাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করছেন। এমন কি আধুনিক যুগে এসে সম্পন্ন পুরান ত্রিপুরা পবিবার পাকা দালন কোঠা তৈরী করেও বসবাস করছেন।

শিক্ষাদীক্ষার অগ্রগতি ও পারিবারিক আর্থিক সামর্থ্যের নিরীখে পুরান ত্রিপুরাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ গত তিন শতকে রাজধানী আগরতলাসহ বিভিন্ন জেলা সদর ও মহকুমা সদরে এবং জনবহুল ছোট ছোট টাউনশিপ্‌গুলোতেও বাস্তুভিটি ক্রয় করে স্থায়ী বসবাস করছেন।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী খাদ্যাভাস ও রন্ধনপ্রণালী

পুরান ত্রিপুরাসহ অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের

সাথে চিরায়ত সম্পর্কেরহেতু তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও অরণ্য প্রকৃতির সাথেই সাযুজ্যপূর্ণ।

পূর্ব ভারত এবং উত্তর পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের প্রধান আহার্য্য বস্তু ভাত এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণের কোন কারণ নাই। আবার সমতল অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষত: হল-কৃষি উৎপাদন নির্ভর জনগণ সিদ্ধভাত খেতে অভ্যস্ত। অন্যদিকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা মূলত: জুম চাষের উৎপাদন নির্ভর তারা আতপ চালের ভাত খেতেই অধিক পছন্দ করেন।

জুমিয়া জীবনে প্রতিটি কর্মক্ষম নরনারী দিনে তিনবার আহার গ্রহণ করেন। অতি প্রত্যুষে কাকভোরে জুম ক্ষেতে যাবার আগে প্রভাতি আহার। জুম ক্ষেতে মধ্যাহ্নকালে দ্বি-প্রাহরিক আহার এবং সূর্যাস্তের পর বাড়িঘরে ফিরে এসে নৈশ আহার ও নিদ্রা। উল্লেখযোগ্য এই যে, শিশু-কিশোর কিশোরী যারা জুম চাষে অংশগ্রহণ করতে পারে না তারা বাড়িঘরে কচিকাচাদের দেখাশুনা ও প্রয়োজনে তিনবারেরও বেশি আহার গ্রহণ করে। সাধারণত: জুম ক্ষেতে দ্বিপ্রহারিক আহারের জন্য বাড়ি থেকেই ভাত রান্না করে কলাপাতায় মুড়ে মাথাপিছু "মাইচু" নিয়ে যাওয়া হয়। আর জুমের টংঘরে জুমের তরিতরকারী অথবা নিকটস্থ ঝরনা বা স্রোতস্বীনি থেকে ছোট ছোট মাছ, কাঁকড়া ধরে গরমাগরম রান্না ও ভোজন করা হয়।

হল-কৃষিতে উত্তরণের পর যৌথ শ্রমের পরিবর্তে পরিবার ভিত্তিক কৃষিকাজের সময় সাধারণত: পুরুষগণ অতি ভোরে হাল-গরু নিয়ে মাঠে চাষে চলে যায় এবং মহিলারা সকালে ঘর গৃহস্থালী ও রান্নাবান্না ও নিজেরা আহার করে চাষ কার্যে যাওয়ার সময় মাঠে হালচাষরত পুরুষদের জন্য ভাত-তরকারী নিয়ে যায় এবং পুরুষেরা মাঠেই আহার করে নেয়।

সাধারণত: গরীব জুমিয়া বা কৃষক পরিবারে ভাতের সাথে একপদ তরকারীই খাওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারে একাধিক পদের তরকারী খাওয়াও প্রচলিত।

রন্ধন করা ভুক্তাবশেষ তরিতরকারী গৃহপালিত পশু পাখিদের খাওয়ানো হয়।

ধর্মীয় রীতি অনুসারে কেউ কেউ প্রতি রবিবার বা বৃহস্পতিবার সারাদিন নির্জলা উপবাস ও পালন করেন এবং কেউ কেউ পঞ্জিকায় নির্দেশিত নিয়ম কানুন পালন করেন।

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর আহার্য্য বিশেষত: তরিতরকারী রন্ধন প্রণালী এক কথায় বহুবিধ কয়েকটি উদাহরণ ঃ-

১) মুইতুরু - সিদল, মরিচ, লবণ সহযোগে সাধারণ রান্না।

২) চাখৗই - মুইতুরুই মতোই রান্না কিন্তু ক্ষারজল মিশ্রিত।

৩) গদক - তরিতরকারী পেঁয়াজ সিদল/মাছ মিশ্রণে বাঁশের চুংওয়ার আধারে রান্না।

৪) মস্‌দেং - সিদল, শুটকি, পেঁয়াজ, রসুন সহকারে আগুনে ঝলসিয়ে মণ্ড তৈরী করে খাওয়া।

৫) পেংমানি - মাছ/মাংস অথবা কোন শাক-সব্জী চুংওয়ায় ভরে রান্না।

৬) হাং মানি - মাংস বা মাছ খণ্ড খণ্ড করে আগুনের গরম-আঁচে ঝলসিয়ে খাওয়া (অধুনিক প্রণালীতে "কাবাব")

৭) অলুনি - সাধারণভাবে মরিচ বা মশলাপাতি না দিয়ে সিদ্ধ করে রান্না

৮) বেরমাবৗতৗই - মরিচ সিদল সহযোগে জলে সিদ্ধ করে রান্না

৯) চাখৗতৗই বৗতৗই - ৮নং এর সদৃশ কিন্তু ক্ষারজল মিশ্রিত

১০) নাপেং - সিদল ও আদা মরিচ পেঁয়াজ সহযোগে আগুনে ঝলসিয়ে মণ্ড তৈরী করে খাওয়া

১১) ভাজা - ভোজ্য তেলে অথবা যে কোন মাংসের চর্বি দিয়ে ভেজে খাওয়া

১২) ইগ্‌মানি - ছোট মাছ বাছাই করে হরিদ্রা, লবণ-মরিচ ও পেঁয়াজ মিশ্রিত করে ভাঁপে রান্না

১৩) মুরমানি - বন আলু বা যে কোন মূলজাতীয় খাদ্যকে জ্বলন্ত আঁচের ভেতরে রেখে সিদ্ধ করে খাওয়া

১৪) চা-খীতাই বীথাং - সিদল মরিচ লবণ এবং মুইচিং পাতা সিদ্ধ না করেই খাওয়া (ক্ষার জলে)

১৫) মাছ/মাংস রান্না - সাধারণ সমতলবাসীদের পদ্ধতিতেই কিন্তু বেশি মশলাপাতি দেওয়া বারণ

পুরান ত্রিপুরাদের পিঠে পুলি

পিঠে পুলি প্রস্তুতিতে সাধারণত: চালের গুঁড়াই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বেশি গ্লুটিনযুক্ত চাল বিশেষত গুরিয়া (বিন্নী চাল) 'মামি' ধানের চালেই পিঠেপুলি অধিকতর করা হয়।

পিঠেপুলির প্রকারভেদ ঃ

পিঠেপুলিকে আওয়ান বলা হয়

১) আওয়ান সংজাগ - সাধারণভাবে সামান্য লবণ ও পেঁয়াজ কুচি আদা কুচি দিয়ে সেদ্ধ করা

২) আওয়ান ভাতি - গুড়/চিনি মিশ্রিত গুঁড়া চাউল ছোট ছোট বাটির সাঁচে সিদ্ধ করে রান্না

৩) আওয়ান সকীরাং - বিন্নী / মামি চালের আস্ত অথবা গুঁড়ো ভাপে সিদ্ধ করে রান্না

৪) আওয়ান বাংগীই - সর্বাধিক জনপ্রিয়। বিন্নী/ মামি চালকে ভিজিয়ে রেখে পেঁয়াজ, আদা কুচি এবং সম্ভবস্থলে সামান্য তেল/ঘি মিশিয়ে বাংগুই পাতায় মুড়ে সিদ্ধ করে খাওয়া

৫) আওয়ান বরা - গুঁড়ো চালকে ছোট ছোট "গুলী" করে ভাজা করা

৬) জগ এগো - চালের গুঁড়াতে অল্প পরিমাণে আদা পেঁয়াজ কুচি ছড়িয়ে দিয়ে বেশি জলে সিদ্ধ করে খাওয়া

৭) আওয়ান বেলেপ - মিহি চালের গুঁড়া ভালোভাবে মণ্ড করে ছোট ছোট পাতা সদৃশ করে ভেজে খাওয়া

৮) আওয়াং পেং - বিন্নী/ মামি চালে আদা, পেঁয়াজ মিশিয়ে বাঁশের চোংওয়ায় সিদ্ধ করে রান্না ইত্যাদি ইত্যাদি

আধুনিকতার সংস্পর্শে ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সাথে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে পুরান ত্রিপুরী সমাজে নিজস্ব ঘরানার পিঠে পুলি ছাড়াও ইদানীং সিঙ্গারা, রসগোল্লা, পানতুয়া ইত্যাদি বিভিন্ন মিষ্টিজাতীয় আহারও ধীরে ধীরে গ্রহণীয় হচ্ছে। গ্রাম পাহাড়ের কোন কোন হাট বাজারে পুরান ত্রিপুরার চা-স্থলগুলোতে তাদেরই তৈরী রসগোল্লা, সিঙ্গারা ইত্যাদি কম সুস্বাদু মনে হয় না।

পুরাণ ত্রিপুরা সমাজে হল কৃষি ও জমির মালিকানা

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিকাজই ভারতবাসীর প্রধান জীবিকা। স্বাধীনোত্তর ভারতে শিল্প

সম্প্রসারণ বৃদ্ধি হলেও গ্রামীণ ভারতের সাধারণ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য এখনও কৃষি জমি ও কৃষিকাজের উপরই নির্ভরশীল। ত্রিপুরা রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠী অনাদিকাল থেকে আদিম প্রথায় অর্থাৎ জুমচাষ প্রথায় কৃষিকাজে জীবিকা নির্বাহ করলেও ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্ব থেকে ক্রমশঃ স্থায়ী হল কৃষির মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে। প্রাক স্বাধীনতা অথবা ত্রিপুরার ভারতে অন্তর্ভুক্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ রাজ্যে মণিপুরী, বাঙালি, মুসলমান এবং বাঙালি হিন্দু (মূলতঃই নিম্নবর্ণের)

মণিপুরী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ ত্রিপুরা থেকে প্রতিবেশী রাজ্য আসামে (কাছাড় জেলায়) এবং মণিপুরে স্থানান্তরে চলে গেছেন। তেমনিভাবে ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায় দেশভাগের পর পূর্ব পাকস্তানে (অধুনা বাংলাদেশে) স্থানান্তর হয়েছেন।

স্বাভাবিকভাবেই গত শতকের পঞ্চাশ দশকে জমির মালিকানার অধিকারী কৃষক সমাজের ৭০% ছিলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠী। অবশিষ্ট ৩০% হিন্দু বাঙালি কৃষক এবং রাজন্য আমলে অধিষ্ঠিত কিছু তালুকদার এবং বড় জোতদার।

দেশ বিভাগের পর বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমন যাদের মধ্যে শতকরা ৮০জনই কৃষিজীবী ত্রিপুরায় এসে স্থায়ী বসবাসের ফলে স্বাভাবিভাবেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মালিকানা ও দখলীয় কৃষি জমির উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং বিভিন্নভাবে অদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের হাতে হস্তান্তর হতে থাকে।

গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাট দশকে ব্যাপকভাবে আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর হয়েছে। সর্বমোট ২৯১১২টি আদিবাসী পরিবারের ২৫,৪৪০.৭৭৫ একর কৃষিজমি বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত হওয়ায় ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন মোতাবেক পুনরায় ফেরৎ পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কালেক্টারদের নিকট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কিন্তু এর মধ্যে (৩০/১১/২০০৬ তারিখ পর্যন্ত) মাত্র ৮৯৪৫ আদিবাসী পরিবারকে ৭১৬৪.৯২ একর জমি বাস্তবে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে।

১৯৯০-৯১ সালে সারা ত্রিপুরায় জমিতে মালিকী স্বত্ব বিশিষ্ট কৃষক পরিবার ছিল- ৩,১৮,২১২জন এবং জোত জমির পরিমাণ ৩০৮৩৭৬ হেক্টার। এর মধ্যে আদিবাসী জমির মালিক ছিল ১১৭১১১ পরিবার এবং মোট দখলীয় জমি ১৩৮০৭২ হেক্টর। অর্থাৎ মালিকানা স্বত্বের ৩৮% এবং দখলীয় ভূমির ৪৫% আদিবাসীদের।

আবার ২০০০-০১ সালে সরকারী রেকর্ডে (State Economic Review - 2007) অনুসারে দেখা যায় আদিবাসী পরিবারের জমির মালিকানা সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫১,৩৭৯ কিন্তু মোট দখলীয় জমি কমে দাঁড়িয়েছে ১,১৪,২৬৮ হেক্টর। অর্থাৎ ১৯৯০-৯১ থেকে ২০০০-০১ এই এক দশকেই আদিবাসীদের দখলীয় জমি ১৩০৮৭২- ১,১৪,২৬৮ = ২৩৮০৪ হেক্টর হারিয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে, আদিবাসীদের জোত জমির ৪৬.৪৯% ভাগ আবার বেহান, বর্গা, বন্ধকী জমি। অর্থাৎ জমির মালিকানা আদিবাসী হলেও প্রকৃত দখলদার অন্য ব্যক্তি/পরিবার।

এ রাজ্যে খাস জমি সরকারী মালিকানার জমি রয়েছে মোট ১,৯০,১১৪.১৬ একর

(১১/৯/২০০৭)। অন্যদিকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মোট ৬৭,১৪৫ পরিবার ও লোকসংখ্যা ৩২৫৭২৫জন এর মধ্যে এস টি ২৯৬২৯ পরিবার ও লোকসংখ্যা ১,৪৮,১৪৫জন।

. ত্রিপুরার জমি বন্দোবস্ত দানের পরিসংখ্যানে সর্বমোট ১৮৪১০৪ পরিবারকে ২৪০২১.৯৩ একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এ ডি সি এলাকাতে ৭০৫৮০ পরিবার জমির পরিমাণ ১২,৯৭৪.৮৮ একর এ ডি সি বহির্ভূত এলাকায় ১১৩৫২৪ পরিবার এবং জমির পরিমাণ - ১১০৪৭.০৫ একর। এস টি-দের জমি বন্দোবস্তের পরিমাণ এ ডি সি এলাকায়৫৬৭২০ এবং জমির পরিমাণ ১০৮৩১৬.৩৯ একর। এ ডি সি বহির্ভুক্ত এলাকায় ২০৯৪৮ পরিবার ও মোট জমি ৩১৮১৩.৭৫ একর।

অপরদিকে এস টি ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের ১৩৮৬০ পরিবারকে সর্বমোট ২০৬৬১.৮৮ একর এ ডি সি এলাকায় এবং ৯২৫৭৬ পরিবারকে মোট ৭৮৬৫৮.৩০ একর এ ডি সি বর্হিভুক্ত এলাকায় জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বায়ন ও ভোগবাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল ভারতে নগরায়ন ও গ্রামীণ মানুষের শহরমুখীনতা ও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হচ্ছে । ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম নয়।

২০০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে আমবাসা ও কাঞ্চনপুর শহরসহ অগরতলা মিউনিসিপাল এলাকা ও ১২টি নগর পঞ্চায়েৎ-এ সর্বমোট শহরবাসী ৫,৮০৪৩৭জন। অর্থাৎ ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ শতাংশ লোক শহরবাসী।

গত শতকের ৫ম ও ৬ষ্ঠ দশক থেকে পুরান ত্রিপুরা সহ রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার ধীরগতি উন্নয়নের ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আলোকপ্রাপ্ত অংশ বিশেষভাবে যারা কৃষি জীবিকা থেকে মসীজীবী অর্থাৎ চাকরী বাকরী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন সেই অংশ ক্রমশ: শহরমুখী হচ্ছে। আগরতলাসহ উপরিউক্ত ১৪টি শহরে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ ধীরে ধীরে শহরে এসে স্থায়ী বসতি নির্মাণ ও বসবাস করছেন। ঐ সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে আগরতলা শহর সহ রাজ্যের ১৫টি শহরে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৮৮২৭জন। অর্থাৎ সমগ্র আদিবাসী লোকসংখ্যার ৪ শতাংশ।

ত্রিপুরার মোট শহরবাসী জনসংখ্যার শতকরা ৭ শতাংশ।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এই শহরমুখী প্রবণতা দ্রুত বেড়েই চলেছে। বিশেষত: আগরতলা, খোয়াই, আমবাসা, কাঞ্চনপুর, কমলপুর, সাব্রুম ও কুমারঘাট শহরগুলোতেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শহরমুখীনতা সর্বাধিক।

এই শহরমুখীনতার সাথে পুরান ত্রিপুরা ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অগ্রগতি, কৃষিকাজ থেকে বুদ্ধিজীবীতে উত্তরণ সম্পর্কযুক্ত।

নং সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে, ত্রিপুরা প্রশাসনে এবং ত্রিপুরা সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কর্পোরেশন ও আধা সরকারী সংস্থায় সর্বমোট কর্মচারীর সংখ্যা ১,২৪,৩০৮জন। এরমধ্যে তপশীল ভুক্ত জনজাতির কর্মচারী সংখ্যা ২৬,৩৭৯জন। (বিগত ৩১ শে মার্চ ২০০৫ তারিখে সরকারী তথ্য অনুসারে)। এই সংখ্যা বর্তমানে ২০০৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৩৬,৩০০জন। রাজ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে এস টি শ্রেণীভুক্ত জনজাতিদের ন্যূনতম ৩১ শতাংশ চাকরীতে নিযুক্তির বিধান রয়েছে।

কিন্তু উল্লিখিত সারণী অনুসারে এস টি দের প্রতিনিধিত্ব মাত্র ২৪.৬৯%। অর্থাৎ এখনও (২০০৯ ইং) আরও ৬.৩১ শতাংশ ঘাটতি রয়েছে।

পক্ষান্তরে রাজ্যে পুরান ত্রিপুরাসহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর শিক্ষিত এবং নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৭৫,৭৫৩জন। (২০০৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত)। এরমধ্যে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ১৪,৬৭৩জন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ২৬১৪জন, বি এ পাশ ১৭৫৭জন, বি এস সি পাশ- ১৫৬জন, বি কম- ১৫১, এম এ ১৪১জন, এম এস সি ১২জন, এম কম ৫জন, বি ই (সিভিল) ৩২, বি ই (ম্যাকানিকাল) ২৫ এবং বি ই (ইলেকট্রিক) ৩৫জন এমনকি এম বি বি এস বেকার রয়েছেন ৭জন।

রাজ্য সরকারের চাকরীতে এস টি সংরক্ষিত শূন্যপদ রয়েছে ৯৫৮৬টি (৩০.৬.২০০৫ ইং)

উল্লেখ করা প্রয়োজন পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কিছু শিক্ষিত যুবক যুবতী রাজ্যের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকার ও বৃহৎ জাতীয় সংস্থাগুলোতেও দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরীর সুযোগ গ্রহণ করছেন। দিল্লী, বাঙ্গালোর, মুম্বাই, চেন্নাই ও কলকাতা নগরে তাদের উপস্থিতি এমন কি স্থায়ী ঘরবাড়ি করে বসবাস করতেও দেখা যায়।

পুরান ত্রিপুরা সমাজের বেশ কয়েকজন অমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি অরব, সিঙ্গাপুরের মতো বিদেশী শহরেও দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকুরীরত আছেন।

উপসংহৃতি

পুরান ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর গত দেড়শত বছরে আর্থ-সামাজিক, ভাষা-সংস্কৃতির বিবর্তনের সার্বিক পর্যালোচনায় যেমন বহু ইতিবাচক দিক বা অগ্রগতির রূপরেখা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তেমনি সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক দিকসমূহ বিশেষত: সমাজ পরিকাঠামোর অবক্ষয় ইত্যাদি ক্রমশ: প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

ইতিবাচক দিক সমূহ

১) জীবন-জীবিকার প্রশ্নে আদিম কৃষি ব্যবস্থা থেকে স্থায়ী কৃষিকাজে উত্তরণ এবং গত শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কৃষি-জীবিকা থেকে শিক্ষিত অংশের বুদ্ধিজীবী পেশায় ধীবে ধীরে আকর্ষণ।

২) পূর্ণ জাতিসত্বায় উত্তরণের আগ্রহ। নিজস্ব ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়নের মানসিকতা জাগরণ (গত শতকের শেষাধর্ব থেকে)

৩) রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে আগ্রহ। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা।

৪) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ঐতিহ্যগত সামাজিক কুসংস্কার যেমন ডাইনী প্রথা আদিবাসী অন্য জনগোষ্ঠীর সাথে বিভেদের প্রাচীর ভেঙ্গে সখ্যতা বাড়ানো এবং বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ।

৫) বর্হিত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং ভাষাগত সংহতির প্রয়াস।

৬) মাতৃভাষা ছাড়াও অন্যান্য প্রতিবেশী ভারতীয় ভাষায় দক্ষতা লাভ ও সৃজনশীল সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চায় রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে স্বীকৃতি লাভ।

৭) সন্তান সন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য সুসংহত পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা করা।

৮) অন্যান্য উন্নত জনগোষ্ঠীর সাথে অসম প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও স্থানীয় ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশীদারিত্বের প্রয়াস।

৯) ভবিষ্যৎ এর জন্য সঞ্চয় এবং ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যক্তি ও পারিবারিক আর্থিক সমৃদ্ধির চেষ্টা।

১০) ভিক্ষাবৃত্তির বিলুপ্তি।

নেতিবাচক দিক সমূহ ঃ-

১) সমাজ পরিকাঠামোর দ্রুত অবক্ষয়।

২) ঐতিহ্যগত সামাজিক পূজাপার্বণ ও আচার আচরণের ক্রমশ: বিলুপ্তি।

৩) সামাজিক অনুশাসনে সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত: গ্রামস্তরে কামি চৌধুরী ও অন্যান্য পদাধিকারীদের গুরুত্ব লোপ।

৪) ব্যক্তি ও নিজ নিজ পারিবারিক কেন্দ্রীকতা বৃদ্ধি।

৫) শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত এবং আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তি ও পরিবারের মাত্রাতিরিক্ত শহরমুখীনতা।

৬) সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে নিস্পৃহতা সৃষ্টি।

৭) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস, ফসল উৎপাদনে পরবর্তী প্রজন্মের অনীহা।

৮) সাধ্যাতীত ভোগবাদের প্রতি নূতন প্রজন্মের আকর্ষণ।

৯) ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন যাত্রার জন্য সরকারী সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি।

১০) রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও শোষণ, বঞ্চনা এবং সাংবিধানিক অধিকার আদায়ে সুসংহত, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাব।

পুরান ত্রিপুরা সমাজ বিবর্তনের আলোকে উল্লিখিত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সমূহ কয়েকটি উদাহরণ মাত্র পূর্ণাঙ্গ নয়। এর জন্য প্রয়োজন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্যাপক সমীক্ষা। এর দায়িত্ব নিতে হবে সংশ্লিষ্ট সমাজের বিদ্বৎসমাজ ও এ বিষয়ে উৎসাহী অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানী।

পরিশেষে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। ১৩৩৯ ত্রিং (১৯২৯ ইং) সনের "ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ সংক্রান্ত নিয়মাবলী"র নিরিখে এবং বর্তমান বিবর্তনশীল সমাজের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিয়মকানুন প্রণয়ন এবং সামাজিক ও সরকারী অনুমোদন গ্রহণ।

ত্রিপুরায় সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল বলবৎ ও কার্যকর হয়েছে সেই ১৯৮৫ সাল থেকে। ষষ্ঠ তপশীলের প্যারাগ্রাফ-৪ এতে তপশীলি এলাকায় বিচারব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনানুগ আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত রয়েছে। সুতরাং এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষের সদর্থক ভূমিকা এই মুহূর্তে জরুরী।

এ বিষয়ে মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টের Law Research Institute এর সাথেও পরামর্শ

এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা আবশ্যক। কেননা, L.R.I উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক প্রথা পদ্ধতি ও অনুশাসনের উপর গবেষণায় ব্রতী রয়েছেন প্রায় দুই দশক আগে থেকেই। এমনকি ত্রিপুরার পুরান ত্রিপুরা, রিয়াং, জমাতিয়া ও মগ জনজাতি গোষ্ঠীর উপর তাদের সেই গবেষণা প্রায় সমাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা

১৯৪২-এর আগষ্ট মাসে খোয়াই কল্যাণপুরের উত্তর মহারাণীপুর গ্রামে জন্ম। কল্যাণপুর এম. ই স্কুলে পাঠ শেষ করে। খোয়াই উচ্চমাধ্যমিক স্কুল, এম. বি. বি কলেজ থেকে স্নাতক। সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে কাজ করে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের কেন্দ্র অধিকর্তা হিসেবে অবসর গ্রহণ। অগ্রসর চিন্তাবিদ্, বাংলা, ককবরক এবং ইংরেজী ভাষায় প্রতিষ্ঠিত প্রাবন্ধিক।

রিয়াং

সরকারী কাগজপত্রে 'ব্রু'রা রিয়াং সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই জনগোষ্ঠী বিষয়ে কিছু তথ্য লেখার পূর্বে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয় যে- জনগোষ্ঠীটিকে 'রিয়াং সম্প্রদায়' না 'ব্রু সম্প্রদায়' বলে অভিহিত হবে।

এই জনগোষ্ঠীর কোন লেখক কর্তৃক লিখিত পুস্তক বা বই আছে বলে আমার সীমিত জ্ঞানে জানা নেই। বিভিন্ন লেখক তাদের ডিগ্রী অর্জনের খাতিরে হোক বা পদ অলঙ্করণের খাতিরে এই সম্প্রদায়ের উপর বই/বুলেটিন লিখেছেন। প্রায় সবকটি আমার পড়ার সুযোগ হয়েছে। বিভিন্ন লেখক তার আপন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লিখে গেছেন।

বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত: ককবরক শব্দকে বিভাজন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'কক' মানে ভাষা, 'বরক' মানে মানুষ। মানুষের ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদেরকে 'ব্রু' বলে পরিচয় দেয়। তারা নিজেদের মুখে পরিচয় দানে আপনি কি রিয়াং? বলেন না। আপনি কি ব্রু? বলে আলাপচারিতা করে থকেন। এর ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। আদিমানব দেবতরণী ও দেবলক্ষ্মীর ঔরসজাত সন্তান ব্রুহার বংশধর বলে আমরা নিজেদেরকে 'ব্রু' বলে পরিচয় দিই। 'ব্রু' সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা ধারণা থাকলে বিস্তৃতভাবে বলার প্রয়োজন নেই। তবু সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বংশানুক্রমিক মৌখিক কাহিনীর কিছু অংশ তুলে ধরছি।

সহস্র বৎসর আগে 'কাঙসারি তৈবু- তৈস্তাইমা' নামক এক মনোরম দ্বীপে প্রতিদিন অনেক দেব-দেবীর সম্মিলিত হতো। তখন পৃথিবী মানব শূন্য। সেখানে দেব-দেবীরা খেলা করতেন। একদিন ঐ দেবসভায় একটি প্রস্তাব ওঠে। কি প্রস্তাব? দেব-দেবীদের পূজা-অর্চনার জন্য মানব সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দিল। আচু শিবরায়, আচু হাঙগীরায়, আচু চুয়াইঙদাই, আপা তিসনাগ্রাহা এবং আমঙ গঙ্গা বিষয়টি নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ করেন। পরে আমঙ গঙ্গাকে মানব সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আমঙ গঙ্গা তার অলৌকিক শক্তির বলে অকস্মাৎ দুটি পাথরের ডিম আচুশিবরায়কে প্রদান করেন। আচু শিবরায় অনেক ভাবনা চিন্তা করে বিয়াসমনিকে দেয়। বিয়াসমনি কাশ্যপমুনিকে ডিমটিকে তা দেবার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দেয়। এবং হস্তান্তর করে। কাশ্যপমুনিও ডিমটিকে তা দেবার জন্য বিয়াঙ্গমা ও বিয়াঙ্গফাকে (পাখি) ডেকে পাঠান। বিয়াঙ্গমা ও বিয়াঙ্গফারা বৃহৎ পাখি প্রজাতি। তারা আশ্রমের একটি 'মারথাক' গাছের ডালে বাস করেন। এবং তাদের নিজস্ব ডিম তা দিচ্ছিলেন। মুনির অদেশে তারা পাথর-ডিম দুটিকে তাদের ডিমের সঙ্গে একত্রে তা দিতে শুরু করে। তা দেবার নির্দিষ্ট সময়েই তার নিজস্ব ডিম থেকে যমজ ভাই জন্মগ্রহণ করে। তারা 'সৈনাইরাও' দেবতা। খুবই পবিত্র দেবতা। অনেক বছর কেটে যাওয়ার পরও পাথর ডিম দুটি ফুটল না। বিয়াঙ্গমা তা দিতে দিতে খুবই ক্লান্ত। তার অসামর্থের কথা মনিকে জানালেন। মনি বিয়াঙ্গমাকে ঐশ্বরিক শক্তি প্রদান করেন এবং বিয়াঙ্গমা আবার নতুনভাবে তা দিতে থাকেন। দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টাকালে তিনি অরও দুটি ডিম প্রসব করেন। অবশেষে অনেক বছর পর সব ডিম

ফুটল। পাথরের ডিম থেকে জন্ম নিল দেবতরণী ও দেবলক্ষ্মী এবং নিজস্ব ডিম থেকে যমজ ভাই 'বনিরাও'র। বনিরাও ভ্রাতৃদ্বয় দেবতা।

আচু শিবরায় বুড়া খণ্ডতুরঙ-এর ছদ্মবেশে তাদের লালন পালন করতে থাকেন। এক পরিবেশ লালন-পালন হওয়ার তাদের রূপ, বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক শক্তি সবই সমান। দিন আসে দিন চলে যায় এমন করে শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে দেবতরণী ও দেবলক্ষ্মী। মনুষ্য সৃষ্টির তাগিদে, বৃদ্ধ তাদের (দেবতরণী ও দেবলক্ষ্মী) দৈহিক মিলন ঘটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একদিন বৃদ্ধ ভান করল যে তার ভীষণ জ্বর হয়েছে। তাই পিপাসা পেয়েছে। দেবলক্ষ্মীকে নিকটবর্তী ঝরনা থেকে জল আনতে বলে। দাদুর আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেবলক্ষ্মী ছুটলেন জলের সন্ধানে। নিকটবর্তী ঝর্নার ধারে পৌছে একটি 'তাওচিঙচঙমা' (পাখি) কে দেখতে পান। পাখিটি আসলে পাখি নয়। আমঙ গঙ্গা ছদ্মবেশে পাখির রূপ ধারণ নিয়েছেন। যেইমাত্র দেবলক্ষ্মী জল তুলতে লাগলেন তখন পাখিটি জল তুলতে বারণ করলেন। সাবধান বালিকা - এই ঝর্না থেকে জল তুলবে না, আমি ও আমার বাচ্চাদের জন্য এই জল পর্যাপ্ত নয়। তাই আমি তোমাকে জল দিতে পারব না। পাখিটির বারণ সত্ত্বেও সে জল তুলতে চেষ্টা করে। হঠাৎ ঝর্না অদৃশ্য হয়ে যায়। অদূরে আরেকটি ঝর্না দেখতে পায়। সেখানেও সেই 'তাওচিঙচঙমা' পাখি অবস্থান করছে। যেইমাত্র দেবলক্ষ্মী জল তুলতে গেল, পাখিটি আবার জল তুলতে বারণ করল। পাখির বারণ অমান্য করে জল তুলতে যাওযা মাত্রই আবার ঝর্না অদৃশ্য হয়ে গেল। এভাবে শতবার চেষ্টা করেও জল পাওয়া গেল না। অবশেষে তাউকিঙচঙমা বলল, একটি শর্তে তোমাকে জল দিতে পারি। দেবলক্ষ্মী জিজ্ঞেস করল, কি শর্ত? পাখিটি শর্ত বলে দিল - তোমার ভাই দেবতরণীর সাথে বিবাহ বন্ধনে অবদ্ধ হতে হবে। এই শর্ত মানলে তবেই জল পাবে। দেবলক্ষ্মী লজ্জায় মুখ লাল করে জল না পেয়ে ফিরে গেল।

রিয়াং রমণী

শূন্য হাতে দেবলক্ষ্মী তাদের স্থানে ফিরে যায়। দাদু জিজ্ঞেস করে - জল কোথায়? দেবলক্ষ্মী লজ্জা ও ক্ষোভে কোন উত্তর দিতে পারেনি। অবশেষে দেবতরণীকে জল আনতে বলা হয়।

যাওয়ার সময় 'শিবরায়-লাঙখাইন' (গিড়ায় ছিদ্রযুক্ত বাঁশের চোঙ) দিয়ে দেওয়া হয়। জলের সন্ধানে দেবতরণী রওনা দিল। অদূরেই একটি ঝর্না দেখতে পায়। সেখানেও সেই তাওচিঙচঙমাও অবস্থান করছে। যেইমাত্র দেবতরণী জল তুলতে গেল পাখিটি জল তুলতে বারণ করল। ''সাবধান! ছেলে, এখান থেকে জল তুলবে না। আমি ও আমার সন্তানদের জন্যও পর্যাপ্ত নয়। তাই আমি দিতে পারব না। পাখিটির বারণ অমান্য করে জল তুলতেই, ঝর্না ও পাখি অদৃশ্য হয়ে যায়।

অদূরে আবার আরেকটি ঝর্ণা দেখতে পায়। দেবতরণী সেখানে ছুটে যায় এবং জল তুলতে চেষ্টা করে। তাওচিঙচঙমা পাখিটি দেবতরণীকে জল তুলতে বারণ করে। পাখিটির বারণ অমান্য করে জল তুলতে গেলে ঝর্ণা এবং পাখি অদৃশ্য হয়ে যায়। শত চেষ্টা করেও জল তুলতে অসফল হন দেবতরণী। দেবতরণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পাখিটিকে তার অসুস্থ দাদুর জন্য কিছু জল দিতে অনুরোধ করে। তখন পাখিটি বলল, একটি শর্তে অমি তোমাকে জল দিতে পারি। সে জিজ্ঞেস করে, কি শর্ত?

তোমার বোন দেবলক্ষ্মীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তবেই জল পাবে।

দাদুর শারীরিক অসুস্থতার কথা চিন্তা করে দেবতরণী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার কথা স্বীকার করে। তাওচিঙচঙমা খুশি হয়ে দেবতরণীকে জল তোলার অনুমতি দেয়। 'শিবরায় লাঙখাইন' (বাঁশের চোঙ) দিয়ে জল তুলল। দেবতরণী দেখতে পেল জল চোঙ চুয়ে পড়ছে। যেভাবে জল চুয়ে পড়ছে, তাদের স্থানে পৌঁছবার আগেই জল শেষ হয়ে যাবে। চোঙ বদলাবারও কোন উপায় নেই। কারণ সেই 'সিবরায় লাঙখাইন' দিয়ে জল নিতে বলা হয়েছে। কি উপায়! তাঙচিঙচঙমা পরামর্শ দিল মাথায় ঠেকিয়ে জল নিতে। পরামর্শ মত দেবতরণী মাথায় ঠেকিয়ে জল নিল। যেহেতু জল চুয়ে পড়ছে তাই পৌঁছতে পৌঁছতে তার কপাল ভিজে যায়।

তাদের স্থানে পৌঁছা মাত্রই দাদু জিজ্ঞেস করে বসে - কেন দেরী হলো? দেবতরণী উত্তর দেয়নি। রাগে অভিমানে দাদু জল পান করতে অস্বীকার করে। বিলম্ব হওয়ার কারণ না জানালে জল পান না করে ইহলোক ত্যাগ করার হুমকি দেয়। তখন দেবতরণী সব কথা খুলে বলে। দাদু শুনতে থাকে। তাউচিঙচঙমা পাখি জল দিতে অস্বীকার করায় জল আনতে বিলম্ব হয় বলে জানায় দেবতরণী। শেষে জল পেল কি করে? প্রশ্ন করে দাদু। তাঙচিঙচঙমা পাখির একটি শর্ত মেনে তোমার জন্য জল আনতে হয়। বোন দেবলক্ষ্মীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অঙ্গীকার আমাকে মানতে হয়। দাদু আনন্দে উৎফুল্ল এবং দেবতরণীর কাছ থেকে জল চেয়ে পান করে এবং তার অসুখ সেরে যায়। বেশ তাউচিঙচঙমা (দেবীগঙ্গা) পাখির প্রতি যে প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছ তা পালন করতে হবে। এই বলে দেবতরণীকে লাইরদম পাতা উপর বসিয়ে সেই সিবরায় লাঙখাইন-এর জল কপালে ঢেলে মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ঘোষণা দেন - আজ থেকে তোমাদের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীরূপে হবে; ভাই- বোন হিসেবে নয়।

দেবতরণী ও দেবলক্ষ্মীদের বিবাহ বন্ধন যে নিয়মে হয়েছিল - অদ্যাবধি ব্রুরা সেই নিয়ম পালন করে চলছেন। তাই ব্রু'দের সামাজিক বিয়েতে বরকে কনের 'রাঁসাতে বসিয়ে কপালে পবিত্র জল ঢালা হয়। যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষ দেবতরণীকে 'লাইরদম' (রাঁসা) পাতায় বসিয়ে দাদু (ওরফে সিবরায় দেব) কর্তৃক জল ঢালা হয়েছিল।

দেবলক্ষ্মী ও দেবতরণীর ঔরসজাত সন্তান 'ব্রুহা'-র বংশোদ্ভব বলে আমরা নিজেদেরকে ব্রু বলে পরিচয় দিই।

উৎসব ও নৃত্যগীত

বৈসু দান্দানি তাওতৈ খাঙমি সেই,
তাওতৈ মাইঙয়াখে তাওসা রিফাইদি,
তাওসা মাইঙয়াখে ক'য়ে রিফাই দি
বদ' খেরেঙ তৈখলাইবিদি কলম'
নায়ফায় দি,

১. বৈসু ঃ বৈসু হচ্ছে ব্রুদের মূল আকর্ষণীয় উৎসব। পরম্পরা চলে আসা উৎসব। চৈত্র মাসের শেষ দু'দিন থেকে বৈসুর উৎসব শুরু হয়। চলতে থাকে সাতদিন ধরে। প্রথম দিনটিকে 'হারি বৈসু' বলে। পরের দিন হচ্ছে মূল 'বৈসু'। 'হারি বৈসু'র দিনে পাড়ার সকলে দলবদ্ধভাবে ছড়ায় মাছ ধরতে যায়। ঘরে ঘরে চলতে থাকে মূল উৎসবের প্রস্তুতি। কি অবস্থাপন্ন কি গরীব, যার যার ক্ষমতানুসারে প্রস্তুতি নেয়। নারী, পুরুষ, শিশু মিলে মাছ ধরতে যায়। সকলে প্রাপ্ত মাছের অংশ সমানভাবে ভাগ পায়। জুম পোড়ার আগুন মানে না জুমের সীমা। পেড়িয়ে ''লামবি'' (অঞ্চলের) সমস্ত শুকনো পাতা পুড়ে ছাই করে দেয়। এরই ফাঁকে ''মাইরুংদই'' ফুল দ্রুত পাতা গজে 'বৈসু উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য সারা অঙ্গে ফুলে ফুলে সাজিয়ে তোলে। জুমের নতুন ''হাতা''য় বন মোরগের ডাক আর ''মাইরুদৈ'' ফুলের সুগন্ধ স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে আনে বৈসুর আগমনী সংকেত। শিশু হতে বৃদ্ধ প্রত্যেকের মনে নাড়া দেয় আবেগ। প্রেম, আনন্দ, আত্মীয় বিয়োগের স্মৃতি, নতুন পরিকল্পনা, নতুন ভাবনা-সব মিলিয়ে উল্লাসের জোয়ার বইতে থাকে। প্রেমিক প্রেমিকাদের, সিকলা-সিকলিদের সীকহৈম (গানের পূর্বে একপ্রকার আমন্ত্রণ ধ্বনি) আওয়াজে আন্দোলিত হতে থাকে বন জঙ্গল।

হজাগিরি নৃত্য

" বেঙলে প্বর'দিন তৈ সাইপাইঔ,
চুঙলে ধর্মনি চ'কা দে
চাকলাইন'হ্?"

বৈসু উৎসব উপলক্ষে পাড়ার লোকেরা মাছ ধরতে যায়। আমরা কি এই ধর্মের দিনে কোন

(বিয়ের) প্রতিশ্রুতির জাল বুনতে পারি, যে জালে মাছ উঠলে, আমাদের দু'জনে বিয়ে হবে। বিভিন্ন বয়সের লোক বিভিন্ন আশা, প্রত্যাশা নিয়েই এই বৈসু উৎসব খুব মহাসমারোহে পালন করা হয়।

বৈসুর দিন পাড়ার সকল শিশু মোরগ ডাক দেবার আগেই ঘুম থেকে উঠে দলবদ্ধভাবে ফুল তুলে ফুলের মালা তৈরী করে। ঘর- দোয়ার সাজতে থাকে। গরু, মহিষদেরকেও ফুলের মালা পরানো হয় এবং জল ছিটিয়ে স্নানও করানো হয়। সকালে স্নান সেরে নতুন জামা কাপড় পরিধান করে, রকমারি সব্জী, রকমারি পিঠে-পুলি রকমারি মদ আহার করত। ঘরে 'রংতীকসঙম (ঠাকুরঘর) জায়গায় 'মাইনীকমা' (লক্ষ্মী) দেবীর নামে মোরগ উৎসর্গ করে। কেউ কেউ আবার ভোগ দিয়ে থাকে। পাড়ার সিকলা থেকে শুরু করে বয়স্করা যার যার পারিবারিক দায়িত্ব দ্রুত সেরে 'গরৈয়া' পূজায় অংশগ্রহণের জন্য সমবেত হয়। পাড়ার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় 'গরৈয়া' পূজার স্থান থাকে। একটি পাতাযুক্ত ছোট মুলি বাঁশ ও বল্লমযুক্ত সাড়ে তিন হাত বিশিষ্ট বাঁশই হলো গরৈয়া দেবতার প্রতিক বা চিহ্ন। সেই বল্লম বাঁশে রৌপমুদ্রা সমেত রীসা বাঁধা থাকে। যদিও পূজার নাম গরৈয়া, তবে এখানে দুই ভাই (গরৈয়া ও কালাইয়া) কে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ডিম, মুরগী ইত্যাদি দিয়ে গরৈয়া দেবতার পূজা দেওয়া হয়। পূজা সম্পন্ন হওয়ার পর পূজার প্রসাদ (ডিম, মুরগী, মদ ইত্যাদি) রান্না করে খাবারের পর বিকেলের দিকে শুধু বল্লমযুক্ত বাঁশ অর্থাৎ "গরৈয়া" দেবতাকে গ্রাম বা এলাকা পরিক্রমার জন্য "গরৈয়া-সেংসারাও/ সেংক্রাকরাও' মিছিলে বের হয়। প্রত্যেক পাড়ার চৌধুরী উঠানে প্রথম গরৈয়া নাচ প্রদর্শন করতে হয়। ২৬ কি ২৭ প্রকারের নাচের আইটেম আছে। সময়ের অভাবে সব আইটেম দেখানো সম্ভব হয় না। তবে, প্রত্যেক পাড়ার চৌধুরীদের উঠানে তা দেখাতে হয় বা নাচতে হয়। গৃহলক্ষ্মী 'বাইলেং" (কুলায়) করে চাল, তুলা, টাকা, মদ দেবতাকে প্রদান করে, ধূপ-ধুনো দিয়ে নতমস্তকে প্রণাম নিবেদন করে পারিবারিক উন্নতির আশীর্বাদ মাঙ্গে।

অন্যদিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সন্ধ্যের দিকে "তাওতৈখাঙম" অনুষ্ঠান পালন করে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা একত্রে জড়ো হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ প্রদর্শন করে- ডিম, মুরগী, মদ, পিঠে ইত্যাদি সংগ্রহ করে। উল্লেখ্য, আমাদের সমাজে এই উৎসবে প্রত্যেক সদস্যদের (কি বড় কি ছোট) জন্য ড্রিঙ্কস ও সফট ড্রিঙ্কস (চ:হ্ ক্লমতৈ) বরাদ্দ থাকে। ছোটরা নিজেদের বরাদ্দ সফ্ট ড্রিঙ্কস ঐ 'তাওতৈখাঙম' অনুষ্ঠানে পান করে আনন্দ উপভোগ করে। গ্রামে যারা 'গরৈয়া' নাচ বা তাওতৈখাওম অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে না তারা, বয়:জ্যেষ্ঠদের ঘরে গিয়ে মদ, পিঠে ও অন্যান্য রকমারি খাবার প্রদান করে চরণের ধুলো নেয়। মদ্য বিতরণ করে। বিনিময়ে বয়:জ্যেষ্ঠরা খাবার ও মদ্যপান দিয়ে থাকেন। আমাদের সমাজে "বৈসু" দিনটিকেই বিশেষভাবে পালন করা হয়। আমাদের ত্রিপুরার অনেক জনগোষ্ঠী আছেন তারা "সেনা"র দিনটিকে মহসমারোহে পালন করে থাকেন। বৈসুর সাতদিন পর যে অনুষ্ঠান হয় সেটাই " সেনা"।

কথিত আছে, ত্রিপুরার তাওয়ংফা রাজার সময় নাকি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হতে হতে "বৈসু" পেরিয়ে যায়। যুদ্ধে ত্রিপুরা রাজার জয় হয়েছিল। রাজার সিপাইরা "বৈসু" উৎসব উপভোগ করতে পারেননি। তাই রাজাকে বায়না ধরে তাদের জন্য বিশেষ উৎসব উদ্‌যাপন করতে। রাজা তাদের দাবী মঞ্জুর করে এবং যুদ্ধ থেকে ফেরত আসা

সেনাদের জন্য বৈসুমা থেকে সাত দিন পর "সেনা" উৎসব পালন করে থাকেন। ত্রিপুরা সরকারও ঐ দিনটি অনুসরণ করে "গড়িয়া" পূজার ছুটি ঘোষণা করে। ব্রু'রা সাধারণত: পিঠে-পুলি করে কিন্তু সমারোহে নয়। ঐ দিন শুধু "গরৈয়া নাচে" অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিরাই গরৈয়া বিসর্জনের জন্য অনুষ্ঠান করে থাকেন।

রিয়াংদের মৃতাই ক্তরমা পূজা

২. হাংগরাই ঃ পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তি দিনটিতে হাংগ্রাই উৎসব পালন করে থাকে। ঐ দিন খুব ভোরবেলায় উঠে সকলে স্নান করে নতুন কাপড়-চোপড় পরে অওয়াইন ও মদ মাংস খাওয়া হতো। এই দিনটিতে অমরপুর মহকুমার 'ডুম্বুর' নামক স্থানে তীর্থ মেলা বসে। এটা মূলত: রিয়াং বা ব্রু'দের তীথক্ষেত্র। ধর্মের নামে সারা বৎসরের রুজি- রোজগারের টাকা দিয়ে ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে ব্রু'রা মুরগী, শূকর, ওয়াসীহ্ নিয়ে পুণ্য অবগাহনের জন্য আসে। অস্থি বিসর্জন দেয়।

এখানকার সমস্ত পূজারীরা 'ব্রু' সম্প্রদায়ের লোক। হতে পারে রিয়াং বা উসই পাঞ্জিভুক্ত। গায়ে ছিন্ন বস্ত্র পরিধেয়, তবু পুণ্য লাভের আসায় তীর্থ গমন করে থাকেন ব্রুরা। প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর নাম - মাহাদেহ্ (মহাদেব), 'আমা' (পার্বতী), গুঙ্গা, ঠাগুরয়াপাই (হরি), আন্দারনীহ্ (গণেশ), আমানি বথীহ্ - এই ৬টি দেবদেবীর উদ্দেশ্যেই ভোগ দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু কলাপাতা দিয়েই ভোগ দেবার রীতি। যত বিত্তশালী হোক অন্য জিনিস (দামী থালা, পাতিল) দিয়ে ভোগ দেওয়া যায় না।

৩. মাইখ্লুঙম ঃ মাইনীকমা, মাইকীচামমা, খুনীকমা এই তিন দেবীকে আবাহন করে যে পূজা করা হয় সেটা মাইখ্লুঙম উৎসব। সার্বজনীন হলেও এই উৎসব সবাই করার সামর্থ্য থাকে না। সাধারণত: চৌধুরী ও অবস্থাপন্ন পরিবারের কর্তারা এই উৎসব করে থাকে। মোট কথা ধান এবং তুলা রোপণ থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা অবধি সময়ে বিভিন্ন পোকা-মাকর, পশু-পাখি, অজ্ঞাতে মানুষ কর্তৃক অবহেলিত নিষ্পেশিত হয়ে থাকে। এর ফলে দেবী মাইনীকমা ও দেবী খুনীকুমারা মনক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাদের আবাহনের জন্যই এই পূজা করা হয়ে থাকে। এই পূজায় শূকর, মোরগ, ডিম, চপটুক (লাঙ্গি-মদ)ও আবশ্যক। পূজা অর্চনা সমাপ্তির পর বয়:জ্যেষ্ঠরা

আলাদা দলে 'চপটুক' ও অন্যান্য খাবার উপভোগ করেন এবং 'সিখলা-সিখলিরা' আলাদা দলে 'চপটুক' পান করে আমোদ-প্রমোদ করে থাকেন। সেখানে প্রদর্শিত হয় নাচের নানা কৌশল। হাতে থালা, গোল কুলা, গুড়িয়ে নাচ প্রদর্শন করে। ঢোলের তালে নাচতে নাচতে এই জিনিসগুলো নিয়ে "চপটুক" কলসীর উপর দাঁড়িয়ে নাচ প্রদর্শন থেকে আজ Hojagiri বা Hodaigri নাচের উৎপত্তি।

জুম অর্থনীতি

জুম চাষ

জুম ভিত্তিক এই জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা। অশা তাল বা দুর্গোৎসব মাসের পর থেকে জুমক্ষেত নির্বাচন ও জঙ্গল কাটা শুরু হয়। পাড়ার লোক সকলে মিলে পর্যায়ক্রমে জুমের জঙ্গল পরিষ্কার করে। মাঘ মাসের মধ্যেই জঙ্গল কাটা শেষ করতে হয়। কারণ জঙ্গল শুকানোর জন্য এক থেকে দেড় মাস প্রয়োজন হয়। চৈত্র সংক্রান্তি বা বৈসুর পূর্বে কাটা জঙ্গলকে পুড়া দিতে হবে জুম পুড়া দেওয়ার এক সপ্তাহ পর পুড়া জুমের হাতা (ছাইযুক্ত কালো জমি)তে মিষ্টি কুমড়া, চিমড়া, তরমুজ, থাকলু ইত্যাদি সব্জির বীজ বপন করা হয়। বিশেষত: জুম পাহাড়ের পাদদেশ ছোট ছড়ার ধারে এগুলোর ফলন ভাল হয়। ফাল্গুন মাসে শেষ দিকে জুম পুড়া দিয়ে যে সব্জী বীজ বপন করা হয় তা "বৈসু" বা চৈত্র সংক্রান্তিতে ফল ভোগ করা যায়। বিশেষত মিষ্টি কুমড়া। পুড়া জুমের যে সব স্থান ভালভাবে পুড়া যায়নি সেসব স্থান সমেত সমস্ত জুম এড়িয়া পরিষ্কার করতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে "হুক খুম" বলে। এই সময় বিশ্রামের জন্য যে টংঘর বানানো হয় তাকে " গোলা হায়ইমা" বলে। এই ঘরের মেয়াদকাল 'হুক খুম' থেকে শুরু করে বীজ লাগানো সময় পর্যন্ত। পরবর্তীকালের জন্য একটু মজবুত ও স্থায়ী "কাইরেঙ" (টংঘর), স্থায়ী বসবাস করার জন্য যে রকম ঘর প্রয়োজন অনুরূপ ধরনের বানাতে হয়।

জুমে কি কি প্রকারের ফসল হয় এবং কিভাবে তা লাগানো হয়? জুমে ধান, সব্জী, তিল, কার্পাস, রকমারী ফুল, রকমারী মেহেন্দি গাছ, হরেক রকমের আঁখ, মিষ্টি আলু, মাইসই মাইক্রো, থা ইত্যাদি লাগানো হয়।

জুমের ধান বিভিন্ন প্রকারের। সব ধানের সুগন্ধ অপূর্ব, তবু এর মধ্যে আবার কোনটি বেশি আর কোনটি কম। ধানগুলো হলো - বেতি, ডিলং, কাইনচলি, কপ্রৌহ, চিনাল, মাইক্রাইহা, মাইমি, বাদিয়া, শ্রে, মাইব্রিং ইত্যাদি। বাদিয়া আবার তিন রকমের - বাদিয়া রাইয়োক, বাদিয়া তাইনচ, বাদিনা মাঝারি মা। মাইংমি আবার তিন রকমের - মাইমি ওয়াতলাও, মাইমি য়জ্রা, মাইমি কপ্রৌহ।

মাসিংগা, (আঁখ প্রজাতি) ও অনেক রকমের। হাদুমা মাসিংগা।

'থা'ও বিভিন্ন প্রকারের - থা- লইবাউ, থা-মাইয়ুংয়াফা, থা-রীম, থা-সের, বাতেমা।

ফুলও বিভিন্ন রকমের - খুনতু, খুনতু-য়থৈ, খুমচাক, তাওলাথান থাই, খুনতু-মুস্রমবা।

সব্জীর প্রকার -

i)থাকলু - থাকলু-মাইতুক,

থাকলু- ওয়াসা, থাকলু ওয়াইপৈ

ii) সবাই (বিন) ঃ সবাই তাওবু,
সবাই ব্রু,
সবাই গবাই,
সবাই ওয়াক্রি

iii) মকন্দা (মক্কা) ঃ মকন্দাতাওসি
মকন্দা মাইমি
মকন্দা মাইসা

iv) মাইসৈ (কাউন)

v) মাইক্রো

vi) চাকুমা ঃ চাকুমা কৃতিংমা
চাকুমা ওয়াসা

vii) তৈলাও

viii) মথাই

ix) দ্রামাই

x) মফ'

xi) হামচাম

xii) উসনৈ

xiii) মৈলাওমান্দার

xiv) খুম্রফই ইত্যাদি

রিয়াংদের ওবাস'তৈসাম' (আবাহন) পূজায় পুরোহিতের নাচ

সবচেয়ে মজার বিষয়! সমতল ক্ষেত্রের চাষাবাদে বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন মরসুম, ঋতু, চাষ পদ্ধতির আবশ্যক। কিন্তু জুম চাষের বেলায় তা মানতে হয় না। ফসলের বীজরা খুব সহনশীল ও ঐক্যতা রক্ষা করে। তাদের একত্রে চাষাবাদ করা যায়। কিন্তু সমতল কৃষির ক্ষেত্রে একটি ফসলের সাথে অন্য ফসল একত্রে চাষ করা যায় না। তাদের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট এলাকা ও জলবায়ু দরকার। ফসলের মধ্যেও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই। তবে মানুষের মধ্যে থাকবে কি করে?

জুম চাষে ফসলের বীজদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ দেখতে পাওয়া যায়। সব ফসলের বীজ একত্রে লাগানো হয়। চৈত্র মাস থেকে বীজ বপন পর্ব শুরু হয়। প্রথমে তুলা থেকে আলাদা করা কার্পাস বীজকে মাটিতে ধুনে স্বল্প তুলার আঁশগুলোকে গোল করে নিতে হয়। যত পরিমাণ ধান লাগাবেন সেই পরিমাণের অনুপাত করে বিভিন্ন বীজ যেমন, তিল, কার্পাস, পাট, চিমড়া, তরমুজ, খাকলু, মাইসৈ (কাউন), মাইক্রো, দ্রামাই ও সূতাতে রঙ তোলার গাছ- লেন্ধা, মাসিংগা, খা-খাকবাঙমা মিশ্রণ করতে হয়। তারপর ' নীকখায়' (খাড়া) করে জুম ক্ষেতে নিয়ে যায়। পাড়ার সকল লোক দলবদ্ধভাবে পর্যায়ক্রমে কাজ করে থাকেন। বীজ বপন করার কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ হলো - দাখুনথা (ছোট দাও), চিঙপাই, কাইসিনি, (দুইটি বাঁশের তৈরী ঝুড়ি যেখানে মিশ্রণ করা বীজ কোমড়ে ঝুলিয়ে রেখে বীজ লাগানো হয়)। ফলপ্রসূ হতে গেলে চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ বপনের কাজ সমাপ্ত করতে হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে সব বীজের চারা বিশেষত:

ধানের চারা বড় হতে থাকে। পুড়া জুমের নতুন 'হাতা'য় (ছাইয়ে আবৃত জুম ক্ষেত্র) বন মোরগের ডাক, মাইরুংদয় ফুলের সুগন্ধযুক্ত স্নিগ্ধ বাতাস, নতুন বৎসরের নতুন পরিকল্পনা, নতুন লক্ষ্য বুকে নিয়ে তখনকার দিনের জুম চাষীরা আনন্দে মেতে ওঠেন। গানের তাল, লয় মিলিয়ে গান করতে করতে বীজ বপন কাজ সমাপ্ত করে। পুড়া জঙ্গলের ছাই-এর স্পর্শ পেয়ে চারাগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে তাকে অনেকগুলি টিলা নিয়ে একজন লোকের জুম ক্ষেত্র। অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা প্রধান খাদ্য হিসেবে - বেতী, কগ্রৌহ, কাইঞ্চলি, ডিলং ধান লাগিয়ে থাকেন। এগুলো সবচেয়ে আগে এবং প্রচুর ফলন পাওয়া যায়। আমোদ প্রমোদ ও মদ-পিঠালির জন্য মাইমি ওয়াত্লাও, মাইমি য়ম্ভ্রা, মাইমি কগ্রৌহ চাষ করেন। অনেকসময় পরিবারের উপযুক্ত ছেলেদের পকেট মানির জন্য extra ধান, পাট চাষ করা হয়ে থাকে।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে ধানের চারার শিস দিয়ে বাতাস খেলে 'মাইয়কসাখাইম' দৃশ্য সৃষ্টি হয়। মাইয়কসাখাইম কথাটির অর্থ হচ্ছে ধানের শিসের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের পথ। সেটা ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ছোট শূকর ছানা দৌড়ালে যে দৃশ্য সৃষ্টি হয়, অনুরূপ দৃশ্যকে মাইয়কসা খাইম বলে। অনেকবার আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। আগাছা পরিষ্কারের সময় ঢোল বাজিয়ে গান গেয়ে দলবদ্ধভাবে এই আদিবাসীরা কাজ করে। ত্রিপুরার অন্য কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা এরকম ঢোল বাজিয়ে জুম চাষ করে না। ঢোল বাদককে বলা হয় 'দাওয়া'। দলের মধ্যে একটু বয়স্ক গান, বাজনা ও কাজে পটু ব্যক্তিকে ঢোল বাদক নিযুক্ত করা হয়। সে নিজে গানও গাইবে আবার ঢোল বাজাবে। তেমনি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয় দলের মধ্য থেকে থেকে আগাছা ঠিকমত পরিষ্কার করছে কি না। ঢোলকের আওয়াজ বা রিদম দিয়ে তা বুঝিয়ে দেয় দাওয়া। কর্মীদের তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

নাবাক (কানের দুল)

হৈ ....
লাগাওলা লাগাওলা
লাগাওলা লাগাওলা
রেসাদেই য়ালইসং,
য়াকসৈচু মুন্দাই পেঙকীতা মাসঙ,
বাজি পাল মালাখে মালা
খাইদেইসে বাজিফ মাপাই ঔ
সৈইলা খাইদেইছে হাবা তাইঙসৗঔ"
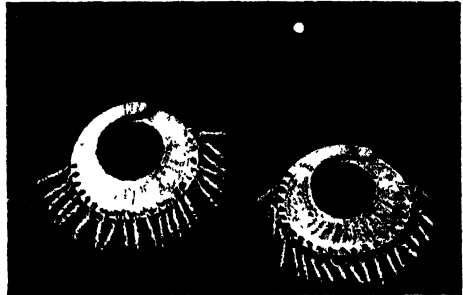
(হাত চালিয়ে যাও। সুডৌল পা ও সুডৌল অঙ্গুলি বিশিষ্ট আমার করমতি/ য়ালইদি/ দেলাঙ। তোমাদের সঙ্গ পেয়ে কাজ করলে, কোন কাজ সম্পূর্ণ হতে বিলম্ব হয় না। দেখছি অসাধ্য কাজ দ্রুত শেষ হচ্ছে। জঙ্গলের পশু পলায়নের সমান দ্রুত কাজ হচ্ছে। হাত চালিয়ে যাও। .... ও আমার প্রেয়সীরা)

দাওয়াকে কোন কাজ করতে হয় না। সে সারাদিন শুধু ঢোল বাজিয়ে নির্দেশ দেয়। দাওয়া কর্তৃক বার কয়েক সতর্ক দেওয়ার পরও যদি কেহ আগাছা ঠিকমত পরিষ্কার করছে না তাহলে ঢোলকের কাঠির আঘাতও সইতে হয়। এরজন্য কেহ মনক্ষুণ্ন ও হয় না। আপন মনে নিজেকে

শুধরে নেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জুমের জঙ্গল কাঁটা ব্যতীত সব কাজে মহিলারাও জুম চাষে অংশগ্রহণ করে। এতসব কঠোর কাজের ফাঁকে (বিশেষত: দ্বিপ্রহরের আহারের সময় থেকে বিকেলের কার্যারম্ভের সময়) সিখলা পুরুষরা প্রেয়সীকে উপহার দেবার জন্য সূক্ষ্ম বেত তুলে 'গ্রেহ' বুনত। Festive Clothe বা উৎসবের পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ রাখার জন্য কারুকার্যমণ্ডিত সুন্দর খাড়াকে 'গ্রেহ্' বলা হয়। সব লোকের পক্ষে বোনা সম্ভব নয়।
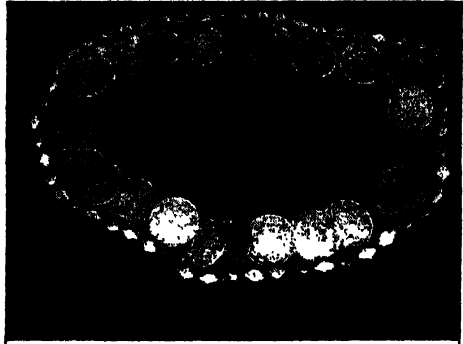
রাংবাক্ (টাকার মালা)

কারুকার্যগুলো Classic quality'র। তাই প্রেয়সীও মিলে খুব classic মানের। শুধু পুরুষরা নয় সিখলি মহিলারা আপন প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্য সারাদিন কঠোর খাটুনির পর রাত জেগে চখী দিয়ে তুলা থেকে বীজ আলাদা করে। খুটলি দিয়ে ধুনানীর কাজ হয়। আর চখা দিয়ে rolled করা তুলা থেকে সূতা কাটা হয়। তারপর তৈরী করে রকমারী ডিজাইনের কাপড় ও কামসৈ (পাগড়ির কাপড়)। কাপড় দিয়ে 'কুতাই তাকব্রী' (চিরাচরিত সাদা জামা) সেলাই করে। প্রিয়জনকে গোপনে সরবরাহ করে। তখনকার সময়ে সিকলা-সিকলিদের লক্ষ্য বা মিশন একটাই প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে "অশা মীতাই" (দুর্গাপূজা) দেখা ও সাজগোজের জন্য বানিয়ার/ বণিক্যদের দোকান থেকে "রাঙবাক, কানথি, ওয়ারেহ্, ওয়াখম কেনা। আর অভিভাবকদের সম্মতি পেলে অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।
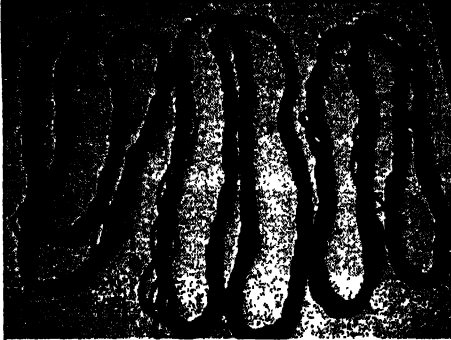
তাগুপৈল্কই (কলার বিচির মালা)

যখন শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে জুমের পাকা ধান দূর থেকে সবুজ বনানীর মধ্যে মুরগী ডিমের কুসুমের রঙ ছিটিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়।

তাঁত শিল্প ও কুটির শিল্প

আদিমকালে তাঁত শিল্প ও কুটির শিল্পে ব্রু'রা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। জুমের কার্পাস থেকে তুলা তুলে চখি দিয়ে বীজ আলাদা করা হয়। সেই তুলাকে আবার ধুনানীর ব্যবস্থা নিজেরাই করে। খুতলি ও খুলথাক দিয়ে তুলা ধুনানীর কাজ করা হয়। ধুনানীর পর চলে "কানসৈ-ম্সাকম' প্রক্রিয়া চলে। ধুনানো তুলা রোল করা হয়। সেটাই ফানসৈ। ফানসৈকে চখাতে প্রয়োগ করে সূতা তোলা হয়। এভাবে সাদা সূতার উৎপাদন হয়। সেই সাদা সূতা দিয়ে পুরুষদের ব্যবহারের জন্য

রিয়াং রমণীর সুতো পেঁচানোর একটি দৃশ্য

জামা 'কুতাই-তাকব্রীহ' ও 'কাম্‌সৈ' (পাগড়ি) তৈরী করা হয়। জামা নিজেরাই সেলাই করেন। মহিলাদের ব্যবহারের 'কুতাই তাকব্রীহ' ও সাদা রঙের হয়। কিন্তু মহিলাদের 'রিসা' বা রীসা (বক্ষবন্ধনীর কাপড়) বুনতে গেলে বিভিন্ন রঙ-এর সূতার দরকার। এগুলোও নিজেরাই রঙ করেন বিশেষত: লাল ও কালো। Dye বা রঙ নিজেরাই করে থাকেন - সাদা সূতার লোলকে তিল- তেল ও ক্ষার জলে ভাল করে ভিজিয়ে ৩-৪ দিন "ওয়ান্দা"তে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এরপর "আসু-বুকসাইর" (আসু গাছের শালের গুড়া) সাথে ক্ষার জলে সিদ্ধ করতে হয়। যতবার এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে তত রঙ সরস হয়। এভাবে সাদা সূতাকে লাল রঙে পরিণত করে। সাদা সূতাকে কালো করার ক্ষেত্রে - " লেলা" গাছের পাতাগুলোকে কেটে গুচ্ছ করে বেঁধে বড় হাঁড়িতে সেদ্ধ করে অন্তত ২/৩ দিন রাখতে হয়। পরে ঐ ' লেলার' জলে ক্ষার জল মিশ্রণ করে ফেনা ওঠা অবধি গরম করতে হয়। তারপর গরম করা লেলা + ক্ষারের জলে ২/৩ রাত ভিজিয়ে রেখে দিলেই কালো সূতা হয়ে যায়। রঙ বেশি সরস করার ক্ষেত্রে পিসলা বরিব্রই অমায় বা বৈরা গাছের ছালের রস দিয়ে বার কয়েক সিদ্ধ করলেই পছন্দসই কালো সূতা তৈরী হয়ে যায়।

কোমর তাঁতে - বকি (বেড-সীট), রিনাই, রিসা বা রীসা, কুতাই, কামসৈ, খলজা, কামছা বা পনদ্রি ইত্যাদি তৈরী করে।

বিভিন্ন ডিজাইন বা স্মুল দিয়ে রিনাই ও রিসা তৈরী করা হয়। ওয়ামুল, কলখু, মফুবহক, য়ংসা, মতাই সাকস্‌নাই, থাইফ্রইবা ইত্যাদি।

বাঁশ ও বেতের কাজে ব্রুরা খুবই দক্ষ। কেননা বাঁশ ও বেত নিয়েই এদের জীবনযাপন। বিশেষত: পুরুষরাই বাঁশ ও বেতের জিনিস বুনে থাকেন। মহিলাদেরও বোনা নিষিদ্ধ নয়। তবে

মেয়েলি কাজ ও পুরুষালি কাজ থাকে। শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যে সব কাজ করতে হয় সেগুলোকে মহিলারা করতে পারেন না বা জোর জবরদস্তি করে করানো হয় না। বেতের বাঁশ নির্বাচন করে জঙ্গল থেকে বাছাই করে আনাও খুব কষ্টকর। ফলে স্বভাবতই পুরুষদের করতে হয়। অপরদিকে অনেক পুরুষ আবার তাঁত বুনতে জানেন। কেউ বাঁধাদান্ করে না। তবু না বোনার কারণ হলো সমাজে একটা প্রচলিত রীতিকে মানতে হয়। কোন মহিলা তাঁত বোনার কাজে পারদর্শী হলে তার মান সমাজের উঁচু স্থানে। কোন পুরুষ বাঁশ ও বেত কাজে সুনিপুণ হলে সমাজে খুব মর্যাদা পায়। তাই ঘর-সংসার করার দিকে নজর দিয়ে ব্রু সিকলাকে যেমন করেই হোক বাঁশ বেতের কাজ জানতে হয়। পারদর্শী না হলেও শিখে নিতে হয়। যে পুরুষ ব্যক্তি এসব কাজ শিখবে না তার পক্ষে সমজে সুপাত্রী পাওয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, হোক যত বিত্তশালী ঘরের, তবু ব্রু'রা স্বাবলম্বী পাত্র চায়।

প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যকে নির্ভর করে বেতের কাজের আকার, ধরন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ধান ভরে রাখার জন্য - দল, খীক, বাংচাই, মাইর্বাম, দিংগ্রা, নীকখাই, লেখ ইত্যাদি।

জুমের ধান মারা দেবার জন্য - 'ক্লাং'

জল, লাকড়ি ও ভারী জিনিস বহন করার জন্য - তৈ-লাংগা।

রয়েছে বাইলেং, সসেংহা, মাইচাম, চাংগ্রেং, য়াংখং, য়াংফ্রাক, তাওখীহ্, চপ্রা, দু, স্লাম, ফাকখুয়াই, ধূলা, ধূলাকাফের, চিংপাই, কাইসিনি, লাখো, ওয়ায়েং, বখীক, চাপা গ্রেহ, চাখইখীক, চিহ্ ইত্যাদি। বেত্রাহ্, য়াখলা, ক্সিহ্, খাওগ্রা - নিজ প্রয়োজনে এগুলো তৈরী করে থাকেন। তবে, অর্ডার পেলে বিক্রিও করে থাকেন।

ঘর জামাই প্রথা

ঘরজামাই খাটা ব্রু সমাজে প্রচলিত রীতি। আজ থেকে ১৫-২০ বৎসর আগে পর্যন্ত ঘর জামাই প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল। কোন ব্রু ছেলে ঘরজামাই খাটা ছাড়া বিয়ের কল্পনা করতে পারত না। শ্বশুর-শাশুড়িদের বাড়িতে গিয়ে দাস-শ্রমিকের মত কাজ করতে হতো। সেবাকাল ৩-৫-৭ বৎসর পর্যন্ত হতো। কনে যত সুন্দরী সেবাকাল তত বেশি হবে। শ্বশুর ও শাশুড়িরা যা চাই তাই করতে হতো। বাড়িঘরের সমস্ত কাজ করতে হতো। খুব ভোরে উঠে বাড়ির উঠান ঝাড়ু দেওয়া থেকে শুরু করে শ্বশুরের মুখ ধোয়ার জল, হুকো ভরে দেওয়া, জল তোলা, নীকখায়, গ্রেহ্, বেত্রা

রিয়াং যুবতী

বানাতে হয়। তাও জুম চাষের ফাঁকে। 'হুক হাওম' (জুমের জঙ্গল কাটা) সময় সকালে কোন নীকখাই (খাড়া) কিছুটা তৈরী করা হয়ে গেলে - জঙ্গল কাটার ফাঁকে ফাঁকেই সুন্দর বেত তুলে খাড়া সম্পূর্ণ করে বিকেলে কাজ থেকে ফেরার সময় আনতে বলা হয়। তখনকার দিনে ব্রুরা মহিষ পালত। মহিষ বাঁধার কোন ঘর নেই। বাড়ি থেকে অদূরে বাঁধা হয়। গোবর স্তুপাকৃতি হতে হতে চারদিকে কোমর সমান পর্যন্ত হয়। সেখানেই নতুন জামাইকে মহিষ বাঁধতে হয়। পরিস্থিতিটা খুবই করুণ। জামাইরা খুব অসহায় বোধ করত। শ্বশুর ও শাশুড়িদের এই অত্যাচার সহ্য করে নির্দিষ্ট কাল পেরোতে পারলেই তবে বৌ নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবে নচেৎ নয়। বিশেষ করে শাশুড়িদের কর্তৃক নির্যাতন হওয়ার কাহিনী বেশি শোনা যায়। অনেক শাশুড়ি মধ্য রাত্রে চালাকি করে মহিষ ছেড়ে দেয়। রাত্রে ছেড়ে দেওয়া মহিষ ডাকাডাকি করে। ডাক শুনেই জামাইকে আদেশ দেওয়া হয় বাঁধার জন্য। সেই আদেশ পালন করতে হতো জামাইকে। অন্ধকারে কোন আলো ছাড়া মহিষ ধরা দুরূহ ব্যাপার, তবু তা করতে হয়। তবে, ব্যতিক্রম অনেক শ্বশুর শাশুড়ি আছেন। যারা খুব সহানুভূতিশীল। তবু নির্দিষ্ট মেয়াদ সেবা দিতেই হবে। এ যেন ফৌজিদের শিক্ষানবীশ কালের মতো। ৮০ দশকের ঘটনায় অমারও প্রায় পড়াশুনা ছেড়ে দেবার পরিস্থিতি। তখন সেই জামাই খাটার প্রস্তুতি নিয়ে 'নীকখায়' বেত্রা তৈরী করা শিখতে হয়েছিল। তখনকার দিনে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা জামাই না খেটে বৌ ঘরে তোলার নিদর্শনও আছে। তবে, তাদেরকে "দাফা সেং" (পণ) বেশি হারে দিতে হতো। যতদূর জানা গেছে ৫০০ টাকাই সর্বোচ্চ পণ দেওয়া হয়েছে। Georgian রৌপ্য মুদ্রা দিতে হতো। সেই পণ দেবার বিষয়টিকে স্মৃতি রাখার জন্য দম্পতির ঔরসে পুত্র সন্তান হলে- পাঁচশ রায়, চারশ রায় ইত্যাদি নাম রাখা হতো। ঐ নাম অনুসারে দম্পত্তিদের পাঁচশফা, চারশফা বলা হয়ে থাকে।

আশি দশকের শেষ দিক থেকে বাধ্যতামূলক জামাই খাটা প্রথা প্রায় অচল হয়ে যায়। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত কাউকে জামাই খাটার জন্য বলা হতো না। স্বেচ্ছায় যদি কনের বাড়িতে থাকতে চায় - তা আলাদা ব্যাপার। আগেও শিক্ষিত ও চাকুরীজীবী জামাইদের ক্ষেত্রে জামাই খাটতে হতো না।

আগে পণ দিতে হতো বরকে। এখন অনেকটা বাঙালি সমাজের প্রথা অনুকরণ করে চলছে। কোন বিয়েতে মেয়ের বাবারা পাত্রকে পণ দিতে হচ্ছে। দিতে হচ্ছে বাইক, গাড়ি ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক আসবাবপত্র। আধুনিক পণপ্রথার প্রকোপ পড়েছে। চলছে নানা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপও।

মৃত্যু

রিয়াং/ ব্রু সমাজে জন্ম ও মৃত্যু দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয়। আমাদের সমাজে কোন ব্যক্তি পুরুষ বা স্ত্রীলোক মারা গেলে তৎক্ষণাৎ গরম জল করে মৃত ব্যক্তিকে সযত্নে স্নান করানো হয়। স্নানের পর পুরুষ হলে একজন পুরুষের যা যা পরিধান থাকে তা সম্পূর্ণরূপে পরানো হয়। ধরুন পুরুষ হলে মাথায় পাগড়ি (পুরুষদের পাগড়ি), কানে 'পাংগা' (রঙিন সূতা দিয়ে কাজ করা জ্যামিতির রম্বসাকৃতি জিনিস), পরনে জামা, ধুতি, গামছা ইত্যাদি পরিয়ে দেহকে ঘরের 'রংতৌকসংম' (ঘরের যে স্থানে লক্ষ্মীদেবী ও অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে

ধূপ-ধুনা জ্বালানোর স্থান) জায়গায় নতুন নতুন বস্ত্র সজ্জিত বিছানা পেতে রাখা হয়। আমরা কোন দিন মৃত ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে রাখি না।

একদিকে আত্মীয় স্বজনরা কান্নায় মগ্ন, অন্যদিকে পাড়ার লোকজন সবাই মিলে কাজে সাহায্য করে। পুরুষ লোকেরা 'বিতাওমা-বিতাওসা' (ক্রদের মাতৃ ও পিতৃদেব যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দুটি পাথর ডিম ফুটতে পেরেছিল। সেই বিয়াঙ্গমা ও বিয়াঙ্গফা। এখানে 'বিতাওমা-বিতাওসা' নামে সম্বোধন হয়)। বাঁশের বেত দিয়ে পাখি ও 'মায়চাম-তাওয়াকসৈ' (খাবারে পাত রাখার বেতের টেবিল) তৈরী করে। মহিলারা মৃত ব্যক্তির জন্য নতুন রান্নাবান্না করে মৃত ব্যক্তিকে খাবার দেওয়া হয়। তাতে বিভিন্ন রকমের সব্জী থাকবে। রান্নার সময় সবকিছু কাজ বাঁ হাত দিয়ে করতে হবে। বিশ্বাস ইহজগতে মানুষের ডান হাত মানে পরলোকজগতের আত্মাদের বাঁ হাত। তাই সসম্মানে আমরা বাঁ হাত ব্যবহার করলে তারা নাকি খুশি হয়। খাবার হিসেবে রান্না করা ভাত ও অন্যান্য তরি তরকারি ব্যতিত একটি আস্তা মোরগ দেওয়া হয়। সেটার তাৎপর্য হলো - একটি মোরগের পায়ে ধরে সজোরে মাটিতে আঘাত করে মারতে হয়। এর কারণ যে অপদেবতা অমুককে (মৃত ব্যক্তির নাম) নিধন করেছে তারও যেন সেই পাখির অনুরূপ মৃত্যু হয়- এই উচ্চারণ করে পাখিটাকে মারতে হয়। উল্লেখ্য মৃত ব্যক্তিকে যেখানে রাখা হয়েছিল এর উপরে 'সামিয়ানা' জাতীয় কাপড় খাটানো থাকে যাতে কোন কিছু মৃত শরীরে না পড়ে। মুখমণ্ডলে পয়সা লাগিয়ে সাজানো হয়। ধরুন যে বিবরণগুলো দিলাম সেটা দিনের বেলা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ঢাক বাজতে থাকে। সারারাত একটু নির্দিষ্ট সময়ের ফাঁকে বাজানো হয়। এই বাদ্যকে খামকারা বা কোথাও কোথাও 'খামখাজা' বলা হয়। তাল-লয় অন্যান্য সময়ের বাজানো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই আওয়াজটা " নৌক্‌চাম বাইহ্‌খলুক, কামচাম বাইহ্‌খলুক'। বাদ্যের আওয়াজ শুনে ক্র সমাজের লোকেরা মৃত্যুর সংবাদটি বুঝে ফেলেন। অন্যান্য দূর দুরান্তের পাড়ায় আলাপ হয় বাদ্যের আওয়জের দিক নির্ণয় নিয়ে। ধরুন একটি পাড়ার উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আওয়াজ এলে- ঐ দিকে কারা কারা অসুস্থ ছিল তা নির্ণয়পূর্বক আন্দাজ করে ফেলেন। ঠিক ঠিক পরদিন ঐ গ্রাম থেকে মৃত্যু সংবাদকারী এসে উপস্থিত হয়। সারারাত 'জামাবাজুহা' (গাউনজাতীয় সাদা পোশাক) পরে হাতে 'রি-ওয়াসা' (কোমর তাঁতে ব্যবহৃত আড়াই হাত বিশিষ্ট ছোট বাঁশ) ও 'রিসামফি' (কোমর তাঁতে বোনার জন্য ব্যবহৃত কালো ৬"x ৩ হাত লম্বা ভারী জিনিস) নিয়ে ঘরের দুই দরজার নিকট দাঁড়িয়ে নাচতে হয়। এই নাচকে 'সামফ্রি বাচাম' বলে। কথিত আছে রাতে নাকি প্রেতাত্মাদের প্রাধান্য। এরা মৃত ব্যক্তির মাংস খেতে নাকি ভিড় করে। ফাঁক পেলেই ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করে। তাদের ভয় আগুন সেই 'রিওয়াসা' ও 'রিসামফি' 'কর্ম-নৌকসি'। তাই 'রিওয়াসা' ও 'রিসামফি' নিয়ে সারারাত যুদ্ধ নাচ নাচতে হয়। ফাঁকে 'ক্লাং'এ (এক ধরনের মজবুত বড় খাড়া, যেটাতে জুমের ধান মারা হয়) বসে নর্তকীরা বিশ্রাম করে।

পরদিন সকালে একটি পাতাযুক্ত লম্বা বাঁশে ৫-৭হাত বিশিষ্ট সাদা মার্কিন কাপড় সেই অশৌচ ঘরে ঝোলানো হয়। দূরের পথিকরাও চিহ্নটি দেখে মৃত্যুর ঘটনা বুঝতে পারে। যতদূর 'খামখাজার' আওয়াজ যাবে এবং বার্তা বহনকারী খবর দেবে সেইসব গ্রামের লোকেরা মৃতব্যক্তিকে 'মুখাগুথাইহা নাইরাকনি' বা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসে। মৃত ব্যক্তি যদি বয়স্ক হয় তাহলে

আগত শোকার্থীরা বিশেষ অসুবিধা না থাকলে, স্বামী-স্ত্রী আসতে হয়। পুরুষরা মৃত ব্যক্তির নামে টাকা দান করে। আর মহিলারা এক বোতল মদ ও একটি ডিম দান করে। দান করা টাকা মৃত ব্যক্তির বুকে মেলে রাখা হয়। সেই টাকাকে 'খাখুলা বাওয়াকনাই' বলে। মহিলাদের আনা মদগুলো শোকার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই দান করা টাকার পরিমাণ যত বেশি হবে মৃত ব্যক্তির সুনামের সংবাদটিও ত ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। বলা হয়ে থাকে ''হামক'রায়নি মচু থৈফু বেথাখে রাঙ কীলাইহা। জাতি মাসা গীবাঙ। চানাই-চুনাই ব্রেম লেই" (......... অমুকের দাদুর মৃত্যুর সময় প্রচুর টাকা দান হিসেবে পড়েছিল। আত্মীয় পরিজন বেশি, অবস্থাপন্ন আত্মীয় সব) এই বলে অন্যান্য বুড়ো বুড়িরা অক্ষেপ করতো। হায়! আমাদের সময় যেন কি হয়।

চিরাচরিত পোশাকে রিয়াং রমণী

মহিলারা মারা গেলে সেই একই নিয়ম। পোশাক পরিচ্ছদ মহিলাদের যা থাকে তা পরানো হয়। কামসৈ গবই (পাগড়ি), রাঙবাক, কানথি, তার, ত্র, ওয়ারেই, ওয়াখম সব পরানো হয়। জুমের তুলা থেকে কাটা সূতার গুচ্ছ বা লোল দিতে হয় কেননা সূতা মহিলাদের অতি প্রিয় বস্তু।

অন্যদিকে সকালে দা, কুড়াল নিয়ে একদল পুরুষলোক 'মাঙচীক' (শ্মশান) তৈরীর লাকড়ি সংগ্রহ করতে বনে রওনা হয়। পুরুষদের 'মাঙচীক' ৫ (পাঁচ) টা লেয়ার বা পলায় তৈরী। মহিলাদের মাঙচীক-এর লেয়ার সাধারণতঃ ৭(সাত) লেয়ার দিয়ে তৈরী। মহিলাদের লাকড়ির লেয়ার বেশি হওয়ার কারণ জীবিত অবস্থায় তারা পাতা ও লাকড়ি সংগ্রহ করেন এবং ভালবাসেন।

বাড়িতেও একদল বয়স্কলোক 'তলায়' (শব নেওয়ার সামগ্রি) তৈরীতে ব্যস্ত। বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন ফুল তোলা তলায়। অনেকটা ফুটবল খেলায় আহত প্লেয়ারদের বহন করার স্ট্রেচারের মতো। এই সময়ের মধ্যে আত্মীয় পরিজনদের কান্নার রোল চলতে থাকে। একই সাথে চলতে থাকে মৃত ব্যক্তির পাদদেশে দাঁড়িয়ে নাচ। এখানে কোন গান গাওয়া হয় না। শুধু ঢোল অর বাঁশি বাজিয়ে নৃত্য করা হয়। এই নাচ কিন্তু আনন্দের নাচ নয়। মৃত ব্যক্তিকে শেষবারের মত নাচ প্রদর্শনের জন্য এই ব্যবস্থা। শোকার্ত আত্মীয় পরিজনরা একে অপরকে অলবিদা-নাচ প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করে। সমাজে এটাই মৃত ব্যক্তির মান বাড়ায়। চলতে থাকে যতক্ষণ 'মাঙচীক' ও 'তলায়' তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ না আসা পর্যন্ত। সব কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার সময়

ঢোলের রিদম আবার 'নীকচাম বাইখ্লু' নয়। 'তাতা ..... তাকমা .... তাতা-তাকমা" ঢোলের রিদম দিয়ে শ্মশান মিছিল সারিবদ্ধভাবে চলতে থাকে। 'তলায়'তে মৃত ব্যক্তিকে রাখা হয়। আত্মীয় পরিজনরা যা যা দেবার সেখানেই দিয়ে দেয়। টাকা, পয়সা, নতুন পরিধেয় বস্ত্র, দা, গয়না, গাথি ঐ 'তলায়'তে দিয়ে দেয়। বাড়ির উঠানে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করানোর পর শ্মশান যাত্রা শুরু হয়। 'পলা' (সাদা কাপড়ের তৈরী) বহনকারী ব্যক্তি অগ্রভাগে থাকে। এর পেছনে ধান, তুলা, তিল ইত্যাদি ছিটানো হয়। পরে তলায় বহনকারী আত্মীয়পরিজন। বাকী শোকার্থীরা সারিবদ্ধভাবে যাত্রা করে শ্মশানের লক্ষ্যে। এটা উল্লেখ্য যে, শবযাত্রা পাড়া বা গ্রামের গণ্ডী পেরোবার সময় একটি মুরগির ডিম দিয়ে লাঁপ্রা (সৈনাইরাও) দেবতার পূজা হয়। পূজার কারণ - মৃত ব্যক্তির আত্মার যাত্রা যাতে দুরূহ না হয়, সে কামনা করে পূজা দেওয়া হয়। সারাটা পথ ধরে ধান, তিল, কার্পাস ছিটানো হয়। শ্মশানে পৌছে শবকে মুখ ধোয়ানোর পর মাগুচীকতে তোলা হয়। সাধারণতঃ পুত্র সন্তানরা মুখাগ্নি দেয়। পুত্র সন্তান না থাকলে, কন্যা সন্তান বা অন্য 'সানদায়' (পৈত্রিক লাইনের আত্মীয়) রা মুখাগ্নি দেয়।

মুখাগ্নি করার আগে ৪টি "সুরই" (ঘিলা) চারদিকে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। বলা হয়ে থাকে, পরবর্তী জন্মে মৃত ব্যক্তি ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে জন্মায়। মহিলারা 'সামচুরি' বাঁধতে থাকে। মুখাগ্নির পর সকলে শ্মশান বন্ধুরা ফিরে অসে। "হরনাইনাইরাও"। চিতা সম্পূর্ণ ভস্ম না হওয়া অবধি যারা থাকেন তাদেরকে 'হরনাইনাইরাও' বলা হয়। একদিকে জ্বলতে থাকে চিতা, অন্যদিকে 'সিমাঙনীক' তৈরীতে ব্যস্ত তারা। শ্মশানে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নির্মিত টংঘরকে সিমাঙনীক বলা হয়। 'সিমাঙনীক'কে আবার পার্শ্ববেড়া দেওয়া হয় না। খোলা থাকবে। 'হরনাইনাইরাও' একটি ডিম একটু চাউল বাঁশের চোঙে সিদ্ধ করে মৃত ব্যক্তিকে ভোগ দিয়ে কপালের একটু হাড় নিয়ে বাঁশের ছোট নৌকা তৈরী করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

পরদিন সকালে মানে কাকভোরে মৃত ব্যক্তিকে ভোগ পরিবেশন করার পর বয়স্ক মহিলারা ছাই থেকে কতকগুলো হাড় সংরক্ষণ করে বাকী চিতাভস্ম নিকটবর্তী জলে ভাসিয়ে দেয়। ছাই তোলার আগে সবাই উৎসুক থাকে সিমাঙনীক-এর নতুন চুলার কি ছাপ বা নিদর্শন নিয়ে। নতুন মাটির তৈরী সেই চুলায় নাকি ছাপ/নিদর্শন রেখে যায় - তার পরবর্তী জন্ম কোন মহলে হবে। মানুষ কূলে জন্ম নিলে ছোট পায়ের ছাপ। পাখি কূলে হলে পক্ষীর পায়ের ছাপ ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয় কিছু হাড় ধুয়ে রোদে শুকিয়ে 'সিমাঙনীক'-এ রাখা হয়। সেখানে নৌকখায় (খাড়া) ঝুলানো থাকে। তাতে তেল, আয়না, চিরুনী, বিভিন্ন ফল, জলের কলসী, হুক্কা, চুলাতে 'হসতুং' দিয়ে আগুন দিতে হয়। আত্মীয় পরিজনদের সকাল, সন্ধ্যায় আগুন ও জল দিতে হয়। এ যেন নতুন আলাদা পরিবার।

শব দাহ করার পরদিন কাকভোরে, সন্ধ্যায় ও তারপরদিন কাকভোরে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভোগ পরিবেশন করার পর থেকে কাউন্টিং করে সাত রাত্র পার হওয়ার পর একটি অনুষ্ঠান হয়। 'হস্নিমা' (সাত রাত্র)। সেই অনুষ্ঠানে সাতটা আ-বালাঙ (একপ্রকার ছড়ার মাছ) মাছ অবশ্যই দরকার। সেই মাছের সাহায্যে নাকি মৃত ব্যক্তি সাত-সমুদ্র পার হয়। আরেকটি উল্লেখ্য বিষয়

হলো - মৃত ব্যক্তির নামে ভোগ দান কালে দুটি খাবারের পাত আলাদাভাবে দিতে হয়। একটি মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য ও অপরটি "লাওতাও"-এর জন্য। লাওতাও হচ্ছে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরলোকে যাওয়ার escort। আমাদের বিশ্বাস 'কাঁথইনাইম' (শ্রাদ্ধ) সম্পন্ন না হওয়া অবধি মৃত ব্যক্তির আত্মা এখানেই বিচরণ করে।

'হন্নি' (সাত রাত্র)-র অনুষ্ঠানের পর 'কথেইনাইম' (শ্রাদ্ধ) অনুষ্ঠান করা হয়। 'চুরফং চরম' ও 'লুখ্লাইম' এই দুটি অনুষ্ঠান পর্ব মিলে পূর্ণাঙ্গ 'কথেইনাইম' সম্পন্ন হয়। আর্থিক অনটন থাকলে শুধু 'লুখ্লাইম' অনুষ্ঠান করে থাকে। শ্রাদ্ধ পর্ব খুব সারম্বরে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে যে শূকর কাটা হবে সেই শূকরের প্রায় কতকগুলো অঙ্গের (সাতটি) মাংসের মালা বা 'মৈ-তুঙ' তৈরী করতে হয়। বেত দিয়ে মাংসের মালা তৈরী করেই তা সিদ্ধ করতে হয়। পাঁচটি খাবার পাতের জন্য প্রায় ৩৫টি 'মৈতুঙ' দরকার। অওয়াইথায় (বাঙগই) ও ৩৫টি দরকার। এরসঙ্গে দুনিয়ার যতরকমের খাবার পাওয়া যায় তা কিনে দেওয়া হয়। রান্না-বান্নার কাজ বিধবা মহিলাদের করতে হয়। এ কাজে অন্যান্য সধবারাও সাহায্য করেন।

মৈতুঙ, বাঙগই ও রকমারি খাবার মদ নিয়ে আত্মীয় পরিজন আগত প্রতিবেশীরা সবাই মিলে "খাঁম-কাঁলাও" বাজাতে বাজাতে "সিমাঙনীক"-এ চলে যায়। সেখানে "কাঁথইনি-আউকচায়" মৃত ব্যক্তি ও লাওতাওকে ভোগ দেয়। তাদের পাতেও সাতটি 'মৈতুঙ' ও 'আওয়ানথাই' বা বাঙগই দরকার। আর থাকবে রকমারি সব্জী ও বাজারের খাবার, পান, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি।

আউকচাই (পুরোহিত) মন্ত্র উচ্চারণ করে তাদের আবাহন করে। প্রথমে লাওতাওকে খাবার দিতে হয়। তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মাকে দেওয়া হয়।

" - হৈ ...... (অমুক) তিনি নুঙন' রেঙঔ নুংন চামুঙ রি ঔ, নুঙমুঙ রি ঔ, য়াকসু চাফাই দি, কাঙসু চাফাইদি, হখৈ তাতঙদি, তৈ-কাঙ তাতঙদি, আলা তাতঙদি, খা কৈ তাতঙদি। ...."

হে অমুক তুমি যেখানে থাক চলে আস, তোমার জন্য রকমারি খাবার এনেছি, তোমার প্রিয় খাবার এনেছি। এসো, হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বস। অভিমানে ক্ষুধার্ত থেকোনা, পিপাসু রইও না। ইহলোকের শেষ খাওয়া গ্রহণ কর। যেহেতু ঈশ্বরের এই বিধান, তুমি খারাপ পেয়ো না। আমাদের সঙ্গ আর চেয়োনা খাবার গ্রহণ করার পর "লাওতাও"কে সঙ্গে নিয়ে পরলোকে পাড়ি দাও। সে বড়। সে তোমাকে সব দেখেশুনে রাখবে সেখানে। পথে জলের পিপাসা পেলে "লাইরুনি নীক" (লাইরু দেবতার) ঘরে বিশ্রাম করে জল পান করে যেও। .... ইত্যাদি।

'লাওতাওকেও' অনুরূপ খাবার মদ দেওয়া হয়। পুরোহিত লাওতাওকে বলে - ওহে লাওতাও যা যা খাবার, পান করার তোমাকেই আগে দিয়েছি, তুমি ওর খাবার কেড়ে খেয়োনা। তুমি বড় ও ছোট। তুমি ওকে হাত ধরে নাও। কারণ ও ছোট। ক্লান্তি হবে, পা ব্যথা করবে, পিপাসা পাবে - লাইরু-র ঘরে একটু জিরিয়ে নিয়ে যেও। .... ইত্যাদি।

এইসব মন্ত্র উচ্চারণ করে খাবার দেবার পর সিমাঙনীক আগুনে ধরিয়ে দেওয়া হয়। অস্থিকে কোলে নিয়ে মাথায় ছাতি বহন করে মহিলাদের দল অগ্রসর হতে থাকে চাড়াইনীক এর দিকে।

'সিমাঙনীক' ও পাড়ার মধ্যবর্তীস্থানে "চাড়াইনীক" তৈরী করা হয়। সেখানে মৃত ব্যক্তির অস্থির জন্য "অন্দা" (রাজ সিংহাসন তুল্য আসন) থাকে। অন্দাতে অস্থি রেখে একটি শুকর ছানা উৎসর্গ করে ভোগ দেওয়া হয়। এটাকে 'লুঙখীলায়ম' বলা হয়। নাচের বাজনা বাজানো হয়। 'অন্দা'র চারিপাশে প্রদক্ষিণ করে বাজনার তালে মহিলারা নাচতে থাকে কাঁদতে থাকে। এটা আনন্দের নাচ নয়। পরিজন বিয়োগ ও পীড়াদায়ক নাচ। মহিলারা এই নাচ করে। পুরুষদের জন্য আলাদা বসার স্থান করা থাকে। তাদেরকে "তাউখা" বলা হয়। সেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে আগতদের মধ্যে যাঁরা 'সিমাঙনক পুড়ানো থেকে শুরু করে চারাইনীক পর্ব হয়ে পুরো পর্বে সামিলকারীদের মধ্যে পুরুষদের বলা হয় "তাওখা" এবং মহিলাদের বলা হয় "তাওলেঙ"। পুরো পর্বকে "বীলীঙ-কামি" বলা হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পূর্বেই "চারাইনীক" পর্বের আচার অনুষ্ঠান শেষ করতে হয়। একজন মহিলা সেই অস্থিকে কোলে বেঁধে নেয়। মাথায় ছাতি নিয়ে 'তাওখা' 'তাউলেইঙ' মিলে পাড়াতে প্রবেশ করে। পাড়ার প্রত্যেক ঘরে ঘরে অস্থি নিয়ে প্রদিক্ষণ করে 'তাওখা-তাওলেঙ'রা। পরিবারের সদস্যগণ ধূপধুনো দিয়ে মদের বোতল দিয়ে শেষ প্রণাম নিবেদন করেন। আমাদের সমাজে সম্মানিত অতিথিকে মদ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এখানেও মৃত ব্যক্তির আত্মাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যই মদের বোতল দেওয়া হয়। পাড়ার সব গৃহ প্রদক্ষিণ করার পর চলে আসে তার নিজ বাড়ির উঠানে। সেখানে অস্থি রাখার 'নীকসা'তে রেখে সারারাত জেগে নাচ গান হতো। বর্তমানে নাম-কীর্তন করতে দেখা যায়।

ভোরে 'আইচু-তাওমাইম' অনুষ্ঠান হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মার নামে মোরগ উৎসর্গ করা হয়। প্রত্যেক আত্মীয় মোরগ নিয়ে আসে এবং তা উৎসর্গ করা হয়। পরে মোরগের নাড়ি পরখ করে মৃত ব্যক্তি সেই মোরগদানকারী আত্মীয়ের প্রতি কি মনোভাব নিয়েছে - তা বলে দেয় 'আউকচাই'। যত সংখ্যক মোরগ উৎসর্গ হবে ততজন মনের বা খুব কাছের আত্মীয়ের সংখ্যা জানা যায়।

দ্বিপ্রহরে আগত সকল লোক আহার করার পর অস্থি বিসর্জনের জন্য তৈরী করা "ওয়াফাইঙ" (বাঁশের তৈরী ২ হাত x ১½ হাত দৈর্ঘ বিশিষ্ট ভেলা) এ অস্থি নিয়ে আবার সেই 'চারাইনীক' স্থানে যেতে হয় এবং 'অন্দা'তে অস্থি রেখে আবার রকমারী খাবার দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। অন্দার চারপাশে পঞ্চভূতের জন্য পাঁচটি খাবার পাত দিতে হয়। জল, মদ, চপতৈ তিনটি ওয়াসুহ দিয়ে পান করতে দিতে হয়। মন্ত্র উচ্চারণে বলা হয় - আর দেরী নয়। তুমি যেখানে থাক চলে আস। তোমার নামে শূকর ছানা উৎসর্গ করলাম। তোমার আর আমাদের ইহজগতের সম্পর্ক ছেদ হতে আর বেশি সময় নেই। তুমি তোমার পথে যাত্রা কর। ইহলোকে থাকার আক্ষেপ আর করো না। তোমার আত্মীয় পরিজনরা তোমাকে বিদায় দিয়েছে, এই বলে "খুমফ্রা বালীক" ("খুমফ্রা" গাছের পাতা) দিয়ে জল রেখা টানার পর মৃত ব্যক্তির আত্মার সাথে আত্মীয়জনের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। এরপরে নিকটস্থ ঝর্ণায় "ওয়াফাইঙ" দিয়ে অস্থি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন নীকখথার' (গৃহ শুদ্ধিকরণ) করা হয়।

শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান এভাবেই ইতি ঘটে। একটি অস্থি রেখে দিয়ে, "ডুঙ্গুর-তীত" (পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে) সময়ে অস্থি বিসর্জন করে শ্রাদ্ধ কার্য সম্পন্ন করে থাকে ব্রু'রা।

স্মরণীয় ঘটনা ও বিপর্যয় ঃ

লিখিত ইতিহাস না থাকার কারণে অনেক তথ্য, স্মরণীয় ঘটনা, কাহিনী বিস্মৃত হয়ে গেছে। পূর্ব' পুরুষদের মুখ নিঃসৃত বাণী, ঘটনা ও কাহিনীগুলো শুধু হৃদয়ে লেখা থাকে। "সিকাম চুবা কীলায়ম" (মিজোদের লুঠতরাজের কাহিনী) এই ঘটনা ব্রু'দের অতি পরিচিত। খুবই ভয়ঙ্কর ও আতঙ্কের কারণ। তারা লুঠপাটের উদ্দেশ্যে মানুষ খুন করে। সর্বস্ব জিনিস লুঠপাট করে নেয়। সুন্দর রমণী থাকলে সেই সব সুন্দরীদের ধরে নিয়ে যায়।

জুম ভিত্তিক জীবন জীবিকা হওযায় ব্রুদের পাড়া বেশি বড় হয় না। এই সুযোগ নিয়েই তারা লুঠপাট চালায়। অনেক বিক্ষিপ্ত ঘটনা স্মৃতির অতলে চলে গেছে। এর মধ্যে বিখ্যাত কতকগুলো "চুবা" (আক্রমণ) হলো -

১. মৈসিখি চুবা

২. গুড়দায়া চুবা

৩. কৃতীক তাইঙম

৪. ওয়ালাইপাশা।

১. মৈঁসিখি ঃ

"মৈসিখি পানথর ওয়াইঙয়ীকমা,
র্সা সৈহ্মনিবু তলা,
র্নাই কাইঙমনিবু সাকা,
গিংসা আতি বুয়াকনাঙমি
মারে মা হিঙসে কাঙ্নাঙমি,
............................"

এই গানের বাংলা তর্জমা দাঁড়ায় মৈসিখি প্রান্তের বাঙ্গালি বধূ সুন্দরী রমণীর বক্ষের নিচে এবং রনাই (পাছড়া) পরিধান করার অঙ্গের উপর রাক্ষসদের সজোরে আঘাতে নিঃস্বহায় মহিলার আর্তনাদ চিৎকার শোন ....)

তৎকালীন মৈসিখি নাকি এখনকার সোনামুড়া অঞ্চল। গবেষণা সাপেক্ষ। সেখানে সমতলবাসী ও ব্রুদের সহাবস্থানের বিষয় উল্লেখ রয়েছে গানে। মিজোদের আক্রমণে অতিষ্ঠ সেখানকার জনগণ। বহু লোককে খুন করা হয়েছে সর্বস্ব লুণ্ঠিত। নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ রয়েছে। কত সালে ঘটনা ঘটেছে তার হিসেব নেই। বলা হয়েছে "গোরডায়া চুবা"-র আগের ঘটনা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মহারাজারা কি ভূমিকা নিল?

দৈঙবাঙমা খুবই সুন্দরী। স্বামীর নাম কিয়হা। এই 'মৈসিখি চুবা'র ঘটনায দৈঙবাঙমাকে স্কাম (মিজো না মগ দস্যু?) দস্যুরা ধরে নিয়ে যায়। স্কামরাজার (মিজো চিফ) অনেকগুলো বৌ রয়েছে। স্কামচিফ্ ও দৈঙবাঙমার ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। রাজার প্রথমা স্ত্রীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ দৈঙবাঙমা। প্রথমা স্ত্রী তার প্রতি প্রবল হিংসা। দৈঙবাঙমা তার থেকে অনেক গুণে সুন্দরী। তাই রাজা নাকি দৈঙবাঙমাকে বেশি আদর করত। অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয় ঘর ছাড়তে। অসহায় দৈঙবাঙমাকে জীবন হাতে নিয়ে স্বদেশের লক্ষ্যে রওনা দিতে হয়।

কোলে পুত্র সন্তান নিয়ে একাকী সে পশ্চিমমুখো আসতে থাকে। যাত্রাপথে একটি হাকচেম (সরু পথ) জায়গায় বসিয়ে জল পান করার ফাঁকেই নাকি পুত্র সন্তানকে বাঘ খেয়ে ফেলে। অসহায় দৈঙবাঙমা কোনক্রমে স্বদেশে এসে পৌছায় (নাকেহ্‌া কাসকাও-এর পাড়ায়)। অঞ্চলটা হচ্ছে মায়ানী অঞ্চলের মায়ামস্‌লামগ্‌বর নীকসি নামক স্থানে। তার স্বামী কিয়হা-র সাথে আবার মিলন ঘটে। তাদের ঔরসে ' দেবায়' নামে পুত্র ও 'তঙস্‌মাইটি' নামে কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তারা মেছকা পাঞ্জিভুক্ত লোকের পূর্বপুরুষ বলে প্রচলিত প্রবাদ সমাজে রয়েছে। কিয়হা কে? রাঙ্গামাটির (বর্তমান উদয়পুর) মহারাজা রামগঙ্গা মাণিক্যের রাজদরবারের বিশেষ দূত। নাকেহা কাসকাউ-এর স্বৈরাচারিতা বন্ধ করার জন্য ওনাকে সেখানে প্রেরণ করা হয়। তিনি সেখাই দবারায় কাংরেং-এর মেয়ে দৈঙবাঙমাকে নিয়ে সেখানেই সংসার পাতেন।

২. গোড়ডায়া চুবা

" গোড়ডায়া চুবা রন কীরাকথং
তানলাইয়া সেইঙথু নাঙসাফুলে
ম্‌থৈ তৈস্‌লঙ মাচাইনাই সেই
পিয়াম্‌মা দেই জৈঙ গ্‌বাঙফ,
চাকখৈ চাতাঙলে চামাইনাইয়া
পিয়াম্‌মা দেই জৈঙ গ্‌বাঙফ,
লাইফাঙ হাওদেঙলে হাওমায়নাইয়্যা
......................................"

গোড়ডায়ার নেতৃত্বে এই চুবা (হত্যালীলা) সংঘটিত হয়েছিল। ঘটনাস্থল পার্বত্য চট্টগ্রামের রামছিরা অঞ্চল। সেখানে "সারেতি" ("সারেতি" শীর্ষক কাহিনীর গলকুরামের প্রেমিকা) দের বাসস্থান। অবস্থাপন্ন অনেক পরিবার রয়েছে তাদের গ্রামে। সেই গ্রামে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে এবং সারেতি, মুজ্ঞাতি, মুক্তিরাম ও সিঙবাঙহাকে ধরে নিয়ে যায় স্‌কামরা। সিঙবাঙহা অনেক ছোট। এক-দেড় বছর হবে তার বয়স। পথে খুব কান্নাকাটি করায় তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

" সৈ কায়া হালা দুই নালি অ,
মালা ত'দৈইসে ত'য়াকসি অী"

যখন সারেতিদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এই উক্তি সারেতি -গান অথবা নি:সহায়ের কান্না হিসেবে করেছিল। বাংলা তর্জমা - যে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই এতই বেশি সেখানে কুকুর পর্যন্ত চলার সাহস করে না, সেখান দিয়ে আমাদের দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। (এই রাক্ষসরা)। এ গান নয়, কান্না নয়, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। প্রথম গানের মর্মার্থও তাই। গোড়ডায়া তুমি যত পরাক্রমশালী হও না কেন, তরবারীর আঘাতে তোমারও রক্তের বন্যা বইবে। জনবল বা জনসংখ্যা মৌচাকের ভীমরুল তুল্য হউক তবু বিনাশ করার ক্ষমতা তোমার নেই, ঈশ্বরের হাতে ....।

স্‌কাম রাজা (চিফ) সারেতিকে ও তার ছোট মুজ্ঞাতিকে বিয়ে করে। মুক্তারাম স্‌কামরাজাকে

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করে, হয় তাকে মেরে ফেলা হোক, নয় (বড় হলে) প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈরী হতে বলে। স্কামরাজা তাকে হত্যা করেনি্য তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। মুক্তরাম বড় হয়ে বাংলাদেশের ইংরেজ সরকারের সহযোগিতায় তাদের (স্কাম) শাস্তিদানে ব্যবস্থা করে এবং "চুবা" বন্ধ হয়ে যায়। গলকুরাম তাদের মুক্তির জন্য স্কাম দেশে যান, সারেতিকে মুক্ত করে আনেন। তবে আসার পথে স্কামরাজা সারেতির কপাল থেকে একগুচ্ছ চুল কেটে রাখে। তাতে সারেতি অসুস্থ হয় ও মারা যান। ব্রু সমাজে প্রবাদ আছে - মিজোরামের যে ছড়া থেকে শামুক তুলে সারেতি রান্না করেছিল সেই ছড়ার শামুকের নাকি লেজের দিকে কাটা হয়ে জন্মায়। আরও, সারেতির গুচ্ছ চুল এখনও স্কামরাজার সিন্দুকে সুরক্ষিত আছে বলে শোনা যায়। ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে সাত-পুরুষ আগের ঘটনা। তার প্রমাণ -

৩. কীতীক তাইঙম ঃ

রাঙ্গামাটি, বর্তমান নাম উদয়পুর। সেখানে যে চুবা সংঘটিত হয়েছিল সেই চুবার নাম 'কীতীক তাইঙম' বলা হয়। দস্যুরা নৃশংসভাবে হত্যালীলা চালায় বলে জনশ্রুতি রয়েছে।

৪. ওয়াঁলার্যপাসা ঃ

ঘটনার স্থান সিঙগাঙ (ছনগাঙ) নদীর উজান দিকে নগ্রাই-অম্পির নামক স্থানের নিকটবর্তী বড়মুড়া পাহাড়। ত্রিপুরা রাজার নেপালী (গোর্খা) সিপাহীদের সাথে স্কাম দস্যুদের যুদ্ধ হয়েছিল। অনেকদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে স্কামরা পরাস্ত হয়েছিল। বহু দস্যু মারা যায়। কথিত আছে কতিপয় গৌরফাই সিপাই চালাকি করে গোর্খা সিপাহীদের কর্তৃক নিধন হওয়া দস্যু সর্দারের মুণ্ডু কেটে নিয়ে তাদের (গোর্খা) আগে রাজদরবারে পেশ করে এবং বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়। এতে গোর্খারা খুব অপমানিত বোধ করে এবং রাগে ক্ষোভে প্রতিজ্ঞা করে বসে। রাজমহলে রক্ত গঙ্গা প্রবাতি হলে, তবেই নাকি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। তার আগে নয়। যুদ্ধবন্দী স্কামদের নিয়ে গিয়ে 'সর চখি' (লোহারের তৈরী চখি মেশিন) দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। আজ থেকে প্রায় ১১০-১১৫ বছর আগেকার ঘটনা।

স্বদেশী আন্দোলনের পেক্ষাপট

'ব্রু' জনজাতিদের চিরাচরিত প্রথা মতে - 'রায়' পদাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় কোন নতুন 'রায়' নিয়োগ করা যায় না। সমাজ দ্বারা স্বীকৃত সর্বশেষ 'রায়' পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন দেবসিং রায়। তিনি চরখি পাখির লোক। লেখাপড়ায় শিক্ষিত না হলেও সামাজিক জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, নৈতিক চরিত্র, ধার্মিক মনোভাব বাচনভঙ্গী ইত্যাদি অতুলনীয়। 'রায়' হচ্ছে ব্রু সমাজের ফার্স্ট ম্যান বা সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ব্যক্তি এই রায়ের অধীনে বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিদের নিয়ে বর্তমান মন্ত্রিসভার ন্যায় 'রায় পরিষদ' বা 'রায় হালাম' রয়েছে। পদগুলো নিম্নরূপ ঃ

১) রায় - জাতির সর্বপ্রধান গান
২) চাপিয়া খাঁ - ভাবী রায়
৩) চাপিয়া- ভাবী চাপিয়া খাঁ।
৪) দরকালিম - রায়ের অউকচাই

৫) দলই - ইনি রায়ের ক্লার্ক

৬) ভাণ্ডারী - রায়ের স্টোরকিপার

৭) কান্দা - রায়ের পরিচারক, ছত্র ও দণ্ডাধারী

৮) দাওয়া হাজরা - ঢোল বাদক

৯) মুরিয়া - মুরি বাদক

১০) দুগরিয়া - গোলাকৃতি ছোট ঢোল বাদক

১১) দাওয়া - দেবার্চনের টল্লুয়া

১২) ছিয়াক্রাক্- পূজা সমাপ্তির পর বলির মাংসাদি বিতরণকারী ও চাপিয়া খাঁর ছত্র বহনকারী।

মৌখিক ইতিহাস থেকে আমরা 'রায়' উপাধি ধারণকারী ৩৩ ব্যক্তিদের নাম জানতে পারি। শেষের দিকে নিম্নে বর্ণিত সম্মানীয় ব্যক্তিগণ এই পদটিকে অলঙ্কৃত করেছেন -

১.	ছানাগুলা রায়	মেছকা দফা
২.	খবদা রায়	মেছকা দফা
৩.	দুইজ্ঞা রায়	মলসই/ মরসই দফা
৪.	পাতঙ্গ রায়	মেছকা দফা
৫.	তলিরাম রায়	মেছকা দফা
৬.	সুর্যমনি রায়	মলসই / মরসই দফা
৭.	ছোটান্দ রায়	মেছকা দফা
৮	পাঞ্জিহাম রায়	মেছকা দফা
৯.	পুইঙপাইহা রায়	তুইমুই দফা
১০.	দেবসিং রায়	চরখি দফা

কাসকাও উপদাধি ধারণকারী ব্যক্তিগণ ঃ-

১. জরাহাম কাসকাও

২. গরাথাঙ কাসকাও

৩. খারুঙফা কাসকাও

৪. কালিজয় কামসকাও

৫. মের্গনা কাসকাও

৬. নাকেহা কাসকাও

৭. ফায়থাকহা কাসকাও

নির্ধারিত পরিষদ ও জনসাধারণকে নিয়ে দেবসিং রায় 'ব্রু' সমাজকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে গেছেন। সমাজের বিভিন্ন বিরোধ, মতানৈক্য, নিরাপত্তা বিষয়ে তিনি অতিশয় যত্নবান ছিলেন। মোট কথা প্রজাবৎসল ছিলেন। আজ থেকে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে 'হা-মৈতাইঙম' বা সমগ্র 'ব্রু' জাতির বাৎসরিক পূজা উদ্‌যাপন করতে গিয়েই ব্রু সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। এই বিভাজনের মূল নেতৃত্বে ছিলেন দেবীপুর নিবাসী খগেন্দ্র রিয়াং, পিতা- অমানিয়া রিয়াং ওরফে অমানিয়া অউকচাই বা ওঝাই। অমানিয়া 'অউকচাই' 'অউকচাই- কৃতর' নামে পরিচিত। তিনি নাকি তৎকালীন সময়ের ব্যাপক মহামারী রোগ - 'বইনা ও 'বসি কতর'-এর জীবাণু বহনকারী প্রেতাত্মাকে পোষ মানাতে পারতেন। উনার উপর রুষ্ট ব্যক্তি অথবা পাড়ায় এই 'বইনা' (কলেরা) ও 'বসি কৃতর' (গুটি বসন্ত) প্রেতাত্মাকে লেলিয়ে দিতেন বলে লোকমুখে শোনা যায়। ফলে এলাকা ব্যাপি লোক মারা যেত এবং পরিবারে এমনকি বাতি জ্বালানোর লোকও নাকি রেহাই পেত না। তিনি আবার এসব রোগের প্রতিবিধানও করতে পারতেন। দেবসিং রায়ের শাসনকালে কোন এক সময় স্বর্গীয় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের

স্ত্রী বা কন্যার নাকি ভীষণ রোগে ভুগছিলেন। যতসব চিকিৎসার ব্যবস্থা চালানোর পরও রোগ মুক্ত হচ্ছিলেন না মহারাণী (নাম অজানা)। তখন রিয়াংদের মিসিফ হরচন্দ্র দেববর্মার মারফত মহারাজার নিকট খবর যায় যে আমানিয়া নামে রিয়াং ওঝাই দুরারোগ্য ব্যাধির খুব ভাল চিকিৎসা করেন। আমানিয়া আউক্চাইকে রাজদরবারে তলব করা হয়। অ্যামানিয়া আউক্চাই রাজদরবারে হাজির হন এবং রোগীর পূর্ণ বিবরণ জেনে নেন। মহারাজাকে একটি শর্তে চিকিৎসা করার আর্জি জানান। একটি শর্ত সাপেক্ষে সে মহারাণীকে সুস্থ করে তোলার গ্যারান্টি নাকি দিয়েছিলেন। কি শর্ত? মহারাণী সুস্থ হয়ে উঠলে তার ছেলে খগেন্দ্র রিয়াংকে 'ব্রু' সম্প্রদায়ের 'রায়' পদে নিয়োগ করতে হবে। অমানিয়া ওঝাই-এর চিকিৎসায় মহারাণী সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং বীর বিক্রম খুশি হয়ে অমানিয়ার ছেলেকে 'রায়' পদে নিযুক্ত করেন। স্বর্গীয় মহারাজের এই ব্যতিক্রমী 'রায়' নিয়োগটাই ব্রু সমাজের কাল হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন থেকে জাতীয় অদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হতে থাকে। কারণ একজন রায়ের জীবিত অবস্থায় নূতন 'রায়' নিয়োগ করা যায় না। 'ব্রু' সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। ফলে দেখা দেয় দুই রায়-এর মধ্যে সামাজিক আচার ও পূজা পার্বণে সমাজের প্রোটোকল নিয়ে বিবাদ। ঐ 'হা-মৈতাইম' অনুষ্ঠানে দেবসিং রায়কে খগেন্দ্র রায় কর্তৃক অপমানিত করা হয়। শুরু হতে থাকে দ্বিধা বিভক্ত। দেবসিং রায় বনাম খগেন্দ্র রায়। দেবসিং রায়ের সমর্থনে মলসই/মরসই গ্রুপের লোকেরা কাজ করত। অপর দিকে খগেন্দ্র রায়কে সমর্থন জোগাত মেছকা গ্রুপ। দেবসিং রায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই প্রজাদের কাছে কর আদায় করত। পার্বত্য ত্রিপুরার মহারাজারা রিয়াং বা ব্রু জাতির কাছ থেকে সর্বোচ্চ কর আদায় করতেন বাৎসরিক ১২ টাকা। অথচ অন্যান্য জনগোষ্ঠী বিশেষত: তিপ্রারা দিতে হতো ১ টাকা।

কর নির্ধারণে এরূপ বৈষম্য প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষী কোন রাজার পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কিসের নিরিখে রিয়াং বা 'ব্রু' গোষ্ঠীদের সর্বোচ্চ করদাতা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এত গেল ঘরচুক্তি কর বা হাউস ট্যাক্সের নিয়ে। বাঁশ, তিল, কার্পাস ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রেও করারোপ করা হতো। মহারাজারা এসব আদায় করত সমাজপতি বা 'রায়' পদাধিকার ব্যক্তির মাধ্যমে। তারা রাজাকে খুশি করার জন্য জোর জবরদস্তি করে নিরীহ প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করত। প্রতিবাদ করার কোন উপায় ছিল না। তারা যা চাইত তাই দিতে হতো।

এত গেল আদায়ের প্রকৃতি। সামাজিক সালিসি বিচারের ক্ষেত্রেও মারাত্মক অনিয়মের সরাসরি অভিযোগ পাওয়া যায়। মোট কথা নিরপেক্ষভাবে সালিসি বিচার হতো না। পাড়া চৌধুরী বা ময়ল চৌধুরী সাথে চ্যানেল থাকলে অপরাধী ব্যক্তিকে জামাই আদরে রেখে উল্টো নিরপরাধ ব্যক্তিকে আর্থিক ও দৈহিক সাজা দেওয়া হতো। চৌধুরীদের উপঢৌকন দিতে পারলে নাকি নালিশ বা অভিযোগ গ্রহণ করা হতো। 'বারাঙ্গি (মদ)' ও 'জর(মদ)' নিয়ে যেতে হতো। চৌধুরীরা বারাঙ্গি আঙ্গুলে লাগিয়ে জ্বালিয়ে শিখা পরীক্ষা করে মন:পুত হলে অভিযোগ গ্রহণ হতো বলেও কাহিনী শোনা যায়। সমাজের বিশৃঙ্খলা, আদর্শ ও মূল্যবোধ অবক্ষয় হওয়ার মূল কারণ তারাই। বহুদিন ধরে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে। বহি:প্রকাশ করার সাধ্য ছিল না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রামসিরা নামক স্থানের শিবভক্ত তান্ত্রিক সাধু রত্নমনি নোয়াতিয়া

ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। লম্বা চুল, হাতে বালা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও ত্রিশূলধারী রত্নমনি তাউখম পাড়া বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরার করবুক অর ডি ব্লক অন্তর্গত বৈরাগী পাড়া থেকে প্রায় ২/৩ কিমি পশ্চিম দিকে একটি টিলায়, এক রিয়াং রমণীকে নিয়ে ঘরসংসার করেন। সাধু-সন্ত বা গুরুর ভূমিকা পালন করেই জীবন নির্বাহ করত। ধীরে ধীরে সরলমতি রিয়াংদের মন জয় করে এবং তাদের ক্ষোভ, তাদের প্রতি অবিচার ও শোষণের ব্যাপারটি জেনে নেন। কালক্রমে বহুলোক শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এবং এদের এককাট্টা হয়ে অবিচার ও শোষণের প্রতিবাদ করার শক্তি জুগিয়ে দেন। তার বহি:প্রকাশ ঘটে। বালাফা, সেনিফা, দগাইগুফা, শক্তিরায়, তগুনাগু আউক্চাই, আলুফা প্রমুখ শিষ্যগণের সক্রিয় সহযোগিতায় গুরু রত্নমনির নাম প্রচারের মাধ্যমে। প্রচার ছড়িয়ে পড়ে অমরপুর, উদয়পুর, বিলোনীয়ায়। দীক্ষিত হওয়ার জন্য বন্যার ন্যায় জনস্রোত বইতে থাকে।

অবশেষে তৈসারবুহা নামক স্থানে সুবিশাল ক্যাম্প করতে বাধ্য হয়। কারণ এত বিশাল শিষ্যকে কোন গ্রাম বা পাড়ায় স্থান দেওয়া অসম্ভব। বংশানুক্রমে শুনে আসা তথ্য এবং এই বিষয়ে প্রকাশিত কিছু পুস্তিকার সাহায্য নিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করে লিখছি।

শিষ্যগণের দীক্ষা দাতা হলেন তগুনাগু অউকচাই, যিনি ত্রিপুরার বর্তমান সাংসদ বাজুবন রিয়াং মহাশয়ের জেঠামশায়। ধর্ম বিষয়ে জ্ঞান দান থেকেই এই "স্বদেশী" দলের কার্যক্রম শুরু। কালাঝারি পাহাড়ের পাদদেশে ও রাইমা ও সরমার মিলিত নদীর নাম গোমতী তুইমা। এর ডুম্বুর নামক স্থানে মূলত: রিয়াং ও নোয়াতিয়া আদিবাসীরা পৌষ মাসের শেষ দিন মকর সংক্রান্তিতে পূর্বপুরুষের অস্থি বিসর্জন করত। কুমিল্লা থেকে আগত বাঙালি পুরোহিতরা সেখানে পূজা ও তার আনুসঙ্গিক কাজ করে দান-দক্ষিণা হিসেবে বহু আয় উপার্জন করত। এই আয়ের বৃহৎ অংশ চৌধুরীদের দিতে হতো। তাতে চৌধুরীরাও খুশি এবং পুরোহিতরাও খুশি।

রত্নমনির পরিচালিত 'স্বদেশী দল' এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন। তার শিষ্যরা চৌধুরীদের কাছে দাবী জানাল যে তারা নিজেরা মন্ত্রোচ্চারণ করাবেন এবং পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানও তারা পরিচালনা করবেন। অগত্যা চৌধুরীরা মানতে বাধ্য হলো। বাঙালি পুরোহিতদের আসা বন্ধ হলো। নিজেরাই মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করে দান-দক্ষিণা থেকে বহু আয় উপার্জন হতে থাকে। বিবাদ শুরু হয় বাটোয়ারা নিয়ে। অতীতে এই আয়ের সিংহভাগ চৌধুরীগণ পেত। কিন্তু রত্নমনির শিষ্যরা তা কমিয়ে দেন।

চৌধুরীরা রাজার কাছে মিথ্যা অভিযোগ করলেন যে প্রজাদের একটি অংশ রত্নমনির নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা রাজার আদেশ মানছে না। রত্নমনিকে রাজা বলে অভিহিত করত ইত্যাদি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও সুস্থ মস্তিষ্কের বিচারে বলতে হয় - এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ। খোদ রত্নমনি মূল ক্যাম্পে মহারাজার ছবি, মালা ও ফুল চন্দন সদস্যদের ঠাকুরঘর বা স্থানে মহারাজাদের ছবি স-সম্মানে অন্যান্য দেব-দেবীর ছবির সাথে এখনও পূজিত ও রক্ষিত হয়ে থাকে। রাজপ্রদত্ত যে কোন জিনিসকে রিয়াং বা ব্রুরা অতি যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে থাকেন। রাজদ্রোহীতার প্রশ্নও ওঠে না। চৌধুরীরা প্রজাদের প্রতি তাদের শোষণ, বঞ্চনা, 'স্রেং' (Slave), তৈতৈং ইত্যাদি অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যই এই অভিযোগ করেছেন। সঠিক বিষয়টি রাজগোচরে পৌঁছলে এত সংখ্যক (চৌধুরী/রায়, স্বদেশী দল উভয় পক্ষ) লোকের

প্রাণহানি ঘটত না। নারী ধর্ষণ আর হতো না। দুর্ভিক্ষ এবং খগেন্দ্র রায় ও তার অনুগামী চৌধুরীদের নির্মম নির্যাতন ও শোষণই স্বদেশী দল গড়ে ওঠার কারণ।

সরলমতি রিয়াংদের প্রাচীন গানেও সাম্যবাদ ও গণতন্ত্রের ধর্মীয় শিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, স্বশাসন (নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেরাই সুষ্ঠু বিচার করার অধিকার) গণতান্ত্রিক অধিকারের চরম রেঁনেশাস এনে দিয়েছিল এই স্বদেশী দল। প্রারম্ভে স্বদেশী দলের লক্ষ্য ছিল স্বৈরাচারী চৌধুরীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নয়, রাজন্য শাসনের বিরুদ্ধে নয়। এর জন্যই পরম্পরা রায়ের অনুশাসন শান্তিতে চলে আসছিল। মৌখিক ইতিহাস তার প্রমাণ।

স্বদেশীদের পক্ষে ইচ্ছা ও অনিচ্ছাই জনঢল বইতে থাকে। রতনমনির শিষ্যরা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে দীক্ষা নিতে নির্দেশ দেয়। ফলে স্বদেশীপক্ষ নহে এমন লোকেরাও শান্তিতে বসবাস করতে পারেননি। তেমনি স্বদেশী দলের লোকেরাও কৃষিকাজ করতে পারেনি। দেখা দেয়- দুর্ভিক্ষ। অবস্থাপন্ন চৌধুরী বা অন্যান্য লোকেদের বাড়িঘর থেকে সর্বস্ব প্রকাশ্যে লুট করে নিয়ে যেত স্বদেশী দলের সদস্যরা। মাঠের পাকা ধান, জুমের পাকা ধান, মহিষ, ছাগল, মোরগ, ইত্যাদি নিয়ে যেত। বারণ করাঁর কোন উপায় ছিল না। বলা হতো 'মরণাইদে'? 'মরয়া'দে? 'মরনাইদে' শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বদেশী দলের পক্ষে থাকা। থাকবে কি? মরয়াদে শব্দটির অর্থ হচ্ছে স্বদেশী দলের পক্ষে থাকবে না? কোন ব্যক্তি 'মরয়া' বলার সাহস ছিল না। স্বদেশী দলের ইচ্ছাকে কেউ বিরূপ মনোভাব নিলে তার পরিণাম মৃত্যু, গৃহদাহ ইত্যাদি। এই বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে বহু ব্রু জনগণ নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে ' রেজা' (Reserve এর অপভ্রংশ) নামক স্থানে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে।

চৌধুরীগণ ও 'স্বদেশী দল' উভয়ই সমান দোষে দোষী। তাদের কারণেই নিরীহ জনগণের জীবন, সম্পত্তি, নিরাপত্তা সর্বস্বভাবে লুণ্ঠিত হয়। চৌধুরীদের নির্যাতন যেমন সইতে হয়েছে নিরীহ জনগণকে তেমনি সইতে হযেছে 'স্বদেশী দলে''র তাণ্ডব। উপরন্তু বিদ্রোহ দমনের নামে মিলিটারীদের অকথ্য নির্যাতন, গণধর্ষণ, লুটতরাজ সইতে হয়েছে নিরপরাধ জনগণকে। এতসব অবিচারের বিচার কে করবে? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। অনেকেই অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবু আমার ছোটবেলার স্মৃতিচারণের একটি লাইন যুক্ত করছি। একদিন আচই (চরমমই আচই) অসাবধানতা এবং কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আমাদের (নাতি, নাতনীদের) বলে শোনান তার বিপদের কাহিনী। স্বদেশী নিধনে আসা মিলিটারীদের একা পিঠে বহন করে জলের ঘাট পার করানোর করুণ কাহিনী। নির্যাতিত সেইসব স্বর্গীয় ব্রুদের আত্মার প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

জনগোষ্ঠীর রাজনীতি

তসলামফা

ব্রুদের মধ্যে প্রথম মন্ত্রী তসলামফা। রাজপ্রসাদ চৌধুরী নামে সরকারী কাগজেপত্রে পরিচিত। উনার আসল/প্রকৃত নাম সপরায় রিয়াং। আদি নিবাস বা জন্মস্থান — 'সরদিওখা পাড়া', বর্তমান ধলাই জেলার গঙ্গানগর (দুইমুখা) অঞ্চল। আদরের নাম 'আসেওহা'। শৈশব থেকে শুরু করে

জীবনাবসান পর্যন্ত তৈক্চাকমা পাড়া, শান্তিরবাজার দক্ষিণ ত্রিপুরা। ১৯৫৭ সালের টি. টি. সি-র অধীনস্থ পরিষদে একজন সদস্য ছিলেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি রাজ্যের উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী ছিলেন। উনার মত প্রখর উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ত্রিপুরায় বিরল দেখা যায়। উনার বিভিন্ন উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা কার্যসম্পাদন করার বিষয়গুলো অফিসে, আদালতে ও সমাজে আলোচিত।

উল্লেখ্য, ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সপরায় রিয়াং (তসলামফা) কে রাজপ্রসাদ চৌধুরী নামে নূতন নামাকরণ করেন। আমাদের প্রচলিত প্রথা মতে, সন্তানাদিসম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে নাম ধরে ডাকা হয় না। বড় সন্তানের নামেই 'অমুক' .... ফা সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এই প্রথানুসারেই রাজপ্রসাদ চৌধুরীর বড় মেয়ে ''তসলাঙটির'' নামেই উনাকে তসলামফা নামে সম্বোধন করা হয়।

জনসংখ্যার অনুপাতে ব্রু'দের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পার্টি সব মিলিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। ওনারা হলেন -

শ্রীবাজুবন রিয়াং, সি পি আই (এম) পার্টির পূর্ব ত্রিপুরা আসনের বর্তমান সাংসদ। নিবাস বকাফা, শান্তিরবাজার মহকুমা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা। ব্রুদের মধ্যে প্রথম বিএসসি পাশ। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে স্নাতক। সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান ১৯৬২ সালে কারাবরণ করে বিহার জেলে ছিলেন। ত্রিপুরার একজন সুদক্ষ ও সফল প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং, প্রাক্তন উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী টি ইউ জে এস পার্টির থেকে নির্বাচনে বিজয়ী হন। ব্রুদের মধ্যে প্রথম বি এ ডিগ্রীধারী। রাজনৈতিক জীবনের আগে স্বল্প সময়ের জন্য সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। নিবাস - দশদা, কম্বলটি, কাঞ্চনপুর মহকুমা, উত্তর ত্রিপুরা। কংগ্রেস- টি ইউ জে এস জোট সরকারের সময় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন।

৩. প্রয়াত কাশীরাম রিয়াং, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি জাতীয় কংগ্রেস পার্টির টিকিটে মাতাবাড়ি কেন্দ্র থেকে কয়েকবার বিজয়ী হন। তিনি খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। বিলোনীয়া বি কে আই-এর ছাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের মেট্রিক পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও অংক তিনটি বিষয়ে লেটার মার্কস সহ ৭৮ শতাংশ নম্বর নিয়ে ১৯৬৪ সালে পাশ করেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে ২০০৪ সালে মারা যান।

৪. গৌরি শঙ্কর রিয়াং, ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ। তিনি টি ইউ জে এস পার্টির টিকিটে শান্তিরবাজার আসন থেকে বিজয়ী হয়ে জোট সরকারের সময় উপাধ্যক্ষ পদটি অলঙ্কৃত করেন।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। জীবনের শুরুতে শিক্ষকতা করেছেন। পরে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অফিসার পদেও চাকুরী করেন।

৫. প্রয়াত লেমপ্রসাদ মলসই, সি পি আই (এম) পার্টির প্রাক্তন এম এল এ পড়াশুনা প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত। নিবাস- উড়িছড়া, কাঞ্চনপুর মহকুমা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা।

৬. দুর্বাজয় রিয়াং, প্রাক্তন কারা মন্ত্রী ছিলেন। সি পি আই পার্টির টিকিটে শান্তিবাজার কেন্দ্র

থেকে বিজয়ী হয়ে মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন। তিনি সপ্তম (তফশিলী) টি টি এ এ ডি সি- তে এক্সিকিউটিভ মেম্বার ছিলেন। নিবাস- লুখু তৈসা, শান্তিরবাজার দক্ষিণ ত্রিপুরা।

ব্রুদের পুরনো রীতিনীতি সম্বন্ধে খুব বিজ্ঞ লোক ছিলেন। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

৭. সুরেন্দ্র রিয়াং, সি পি আই (এম) পার্টির টিকিটে টি টি এ এ ডি সি-র প্রাক্তন ই.এম ছিলেন। তিনিও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। রাজনীতিতে যোগদানের আগে শিক্ষকতা করেছিলেন। নিবাস - লাক্ষারায় চৌধুরী পাড়া, আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা।

৮. রাজেন্দ্র রিয়াং, বর্তমান ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য। সি পি আই (এম) পার্টির টিকিটে দশদা নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে বিজয়ী হয়েছে। পড়াশুনার মান আণ্ডার গ্রেজুয়েট থেকে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ব্রু সোসিও কালচার‍্যাল অর্গানাইজেশনের সভাপতি হিসেবে হজাগিরি টিম নিয়ে জাপানে গিয়েছিলেন। প্রথমে টি টি এ এ ডি সি থেকে ই.এম পদটিও অলঙ্কৃত করেন। নিবাস- গছিরাম পাড়া কাঞ্চনপুর উত্তর ত্রিপুরা।

৯. বিন্দুরাম রিয়াং, প্রাক্তন এম এল এ। সি পি অই (এম) পার্টির টিকিট দশদা কেন্দ্র থেকেই বিজয়ী হয়েছিলেন। শুরুতে শিক্ষকতা এরপর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার হন। পরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতি প্রবেশ এবং প্রথমবার প্রার্থী হয়েই বিজয়ী হন।

১০. নগদী রিয়াং, প্রাক্তন এম ডি সি নিবাস- তাওফ্লাঙমা পাড়া, আমবাসা, ধলাই ত্রিপুরা সি পি অই (এম) পার্টির টিকিট নিয়ে গঙ্গানগর গণ্ডাছড়া নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে বিজয়ী হন।

১১. মনীন্দ্র রিয়াং, বর্তমান কারা মন্ত্রী। সি পি আই পার্টির টিকিট নিয়ে শান্তিরবাজার নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হন। নিবাস - বকাফা, শান্তিরবাজার, দক্ষিণ ত্রিপুরা। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষামান।

১২. শান্তিরঞ্জন রিয়াং, বর্তমান চেয়ারম্যান, টি টি এ এ ডি সি। নিবাস - সাতনালা, কাঞ্চনপুর, উত্তর ত্রিপুরা। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশোনা।

সামাজিক কাঠামো

সেই 'মায়ামস্‌লামগ্‌বর নীকসি' নামক মায়ানী অঞ্চলে বসবাস কাল থেকে 'ফা' উপাধির সৃষ্টি। পরম্পরা মৌখিক ইতিহাস অনুসারে, খুচংফা প্রথম 'ফা' উপাধি ধারন করে সমাজ পরিচালনা করেছিলেন। সর্বশেষ 'ফা' 'আতাঙফা'। এরপর নতুন উপাধি 'কাসকাও' পদের সৃষ্টি হয়। প্রায় ছয়-সাত পুরুষ 'কাসকাও' সমাজ পরিচালনা করার পর 'রায়' পদের প্রবর্তন হয়। জনশ্রুতি মতে, রামগঙ্গা মাণিক্যের রাজত্বকাল থেকে এই 'রায়' পদের প্রচলন। ঐতিহাসিকদের মতে, মহারাজা গোবিন্দ মানিক্যের ঈশরী গুনমতি ৮জন রিয়াং সর্দার সন্দখা, মন্দখা, য়ংসিকা, পাইসিকা, তৈলমহা, তৈক্রুহা, সাওমসমহা, পাইমসমহাদের কাছ থেকে কাসকাও-এর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী শুনেন। বলিদান থেকে তাদের রক্ষা করেন এবং নিজ সন্তান হিসেবে বরন করে নেন। তাহলে 'রায়' পদের প্রচলন মহারাজ গোবিন্দ মানিক্যের আমল থেকে হবে। রামগঙ্গা মানিক্যের রাজত্বকাল থেকে নয়। এ পর্যন্ত ৩৩জন ব্যক্তি 'রায়' মনোনিত হয়েছেন। এর মধ্যে 'রায়' পুইঙপাইহা রায়ের মনোনয়ন সরকারী দলিলে পাওয়া গেছে। ১৩৩২ ত্রিপুরাব্দ বা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে

স্বর্গীয় মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য পুইঙপাইহাকে রায় নিযুক্ত করেন। ব্রুদের চিরাচরিত প্রথা মতে, সর্বশেষ রায় নিযুক্ত হয়েছিলেন দেবসিং রায়। ব্রুদের প্রথা মতে, একজন রায়ের জীবিত অবস্থায় নতুন রায় নিয়োগ করা যায় না। সেই প্রথা প্রথম ভঙ্গ করলেন আধুনিক ত্রিপুরার স্রষ্টা, স্বর্গীয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। তিনি দেবসিং রায়-এর জীবিত অবস্থায় খগেন্দ্রকে রায় নিয়োগ করেন।

তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়ায়। দেখা দেয় অন্তর্কলহ। জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে বিশ্বপরিসরে সমাদৃত মহারাজা তার স্বদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর প্রথা অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। স্বভাবতই মহারাজার এই অভিসন্ধি শিক্ষিত ব্রু জনগণের নিকট প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ মূল্যায়ন করছে ব্রু সমাজ। 'রায়' নিয়োগ ব্যতীত তিনি 'বাহাদু' বা 'বাহাদুর' ও 'হৌকলইচুদ্রি' পদগুলোও নিয়োগ করেছিলেন। মনগাঙ অঞ্চলে 'বাহাদুর' বা 'বাদুর' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন মলসৈ পানজির গঙ্গাজয় বাদুর। তিনি সেই অঞ্চলের সর্বেসর্বা। অনুরূপভাবে দেরগাঙ অঞ্চলের জন্য ঠাকুরচান্দকে বাহাদুর নিযুক্ত করা হয়। তৈক্সমমা (বর্তমান খোয়াই) অঞ্চলে 'বাহাদুর' নিযুক্ত হয়েছিলেন মেথারায়। চিফ জাস্টিসের কাজগুলো দেখাশুনা করবেন 'হৌকলইচুদ্রি'। তিনি 'সিঙয়া ব্রেম' ও 'য়াতাম ব্রেম' উভয় শ্রেণীর পানজিভুক্ত জনগণের দোষ ও ত্রুটি বিচার করার ক্ষমতা রাখেন। এমনকি 'রায়' পদাধিকারী ব্যক্তিদের দোষ-ত্রুটি ও বিচার করার অধিকার রয়েছে। নিম্নলিখিত সম্মানীয় ব্যক্তিগণ 'হৌকলইচুদ্রি'র পদে অলঙ্কৃত করেছিলেন। যথা — ১) লুঙথুঙ এলাকর রামবাবু চুদ্রি, ২) গোমতী এলাকার তাওথৈলা চুদ্রি, ৩) গোমতী এলাকার ভগীরথ চুদ্রি। মুহুরী নদীর উত্তর ও গোমতী নদীর দক্ষিণে 'বাহাদুর' পদ নেই। এখানে 'রায়' পদবি রয়েছে। গোটা ব্রু সমাজের পুরো প্রশাসন পরিচালনা করেন রায়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ব্রুদের মধ্যে অন্তর্কলহ প্রকট হওয়ায় রায় পদাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও প্রশাসন চালাতে পারেননি। বিপর্যয় ঘটে যাওয়া 'রায়', কাসকা ও প্রথা পুনঃচালু করার লক্ষ্যে গত ৩০ ও ৩১শে জানুয়ারী, ২০০৯ সালে আবার 'রায়' ও 'কাসকাও' পদে লোক নিযুক্ত হয়। তারিচরন রিয়াং ও অসমঞ্জ রিয়াংকে কাসকাও ও রায় পদে নিযুক্ত করা হয়। আমাদের সমাজে একমাত্র 'তাওচুইঙহা' 'নারান' পদটি অলঙ্কৃত করেছিলেন। খুবই সৎ, ধার্মিক ও দয়ালু ব্যক্তিকেই 'নারান' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বহুকাল যাবৎ এই গুণসম্পন্ন লোকের অভাব হওয়ায় 'নারান' পদে আর লোক নিয়োজিত করা যায়নি।

রিয়াং জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত খেলাধুলা

খেলাধুলা যুবক-যুবতীদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে। প্রাচীন গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে রিয়াংদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। রিয়াং জনজাতির মধ্যে খেলাধুলা কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা এক রকম অজানা। তবে মানুষ কোন একটি বিষয়ের উপর আটকে থাকে না। সমাজের বয়স্ক ও যুবকদের কাছে কোন কিছু চিত্তাকর্ষক এবং নতুন হলেই তা অনুকরণ করতে তারা ভালোবাসে। যা পরবর্তীতে প্রথাগত খেলার রূপ পায়। ঠিক একইভাবেই রিয়াংদের মধ্যে খেলাধুলার সৃষ্টি হয়েছিল। রিয়াংদের বিশ্বাস তাদের আদি পুরুষ আচু শিব্রাইয়ের নির্দেশক্রমেই তাদের সব খেলাধূলার সৃষ্টি।

রিয়াংদের চিরাচরিত বেশ কয়েকটি খেলা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তরূপে আলোচনা করা হল।

১) কেরাং মা-ম' (কচ্ছপের দৌড়)

খেলাটি কচ্ছপের মত মাথা একবার বামদিকে একবার ডানদিকে, বা কখনো সোজা আবার কখনো নেড়ে নেড়ে দৌড় দেওয়া প্রতিযোগীতারা প্রথমে পদ্মাসন করে সামনের দিকে উবু হয়ে বসবে। হাটু দুটি থাকবে মাটিতে আর বুক থাকবে মাটির উপর। দু'হাতের কুনুই থাকবে দু পাঁজরের দুদিকে। আর হাতের তালু ও আঙ্গুলগুলি থাকবে সামনের দিকে সোজাভাবে। মুখ মাটি থেকে সামান্য উপরে থাকবে। হাটুদ্বয় ও হাতের তালুর উপর ভর করে গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে যাবে। যে সবার প্রথমে পৌছার তাকেই বিজয়ী বলে বিবেচিত হবে।

২) মালফুঙ কাউলাইম'

খেলাটি হল তীর ধনুকের খেলা। এটা সাধারণত পুরুষদের মধ্যে খেলা হয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ তীরন্দাজী খেলার মত।

৩) উান্তা খুথাইলাইম'

খেলাটি কিছুটা কাবাডি খেলার সঙ্গে মিল রয়েছে। চুন দিয়ে দাগ দিয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দুধারে সীমানা করে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে খেলাটি খেলতে হয়। প্রত্যেকটি বদলে কম করে ছয়জন খেলোয়াড় থাকে। উান্তা (কাপড়ের তৈরী একটা বল) কে এক বৃক্ষে কোন একজন অপর বৃক্ষে কোন একজন একটি নির্দিষ্ট দাগে এসে সামনে দাঁড়ানো খেলোয়াড়কে লক্ষ্য করে বলটি ছুড়ে মারবে। বলটি যদি এই ব্যক্তির দেহের যে কোন জায়গায় লাগে তাহলে উনাকে মৃত (খেলার সময় পর্যন্ত) হিসাবে নিজ দলকে ত্যাগ করতে হবে। আবার যদি এই বলটি কোনক্রমে দেহে না লাগে তাহলে উান্তা প্রেবককে মৃত বানতে হবে। এইভাবে যে দল সবচেয়ে আগে প্রতিপক্ষ মৃত বানাতে পারবে সেই দলটি হবে বিজয়ী।

৪) চুর থাঁঙমুঙ

এটি সাধারণতঃ লাটিম খেলা। এটি দুইজনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা হয়।

৫) উা সসা লাইম ঃ

এ খেলাটি দুইজন মহিলাদের মধ্যে হয়ে থাকে। উপকরণ হিসাবে একটা শক্ত বাঁশ টুকরা নিয়ে দুইজন বলবান মহিলা পরস্পর মুখোমুখিভাবে বসে বাঁশটি শক্ত করে ধরে পরস্পর নিজের দিক টানলে, যে অপর জনকে ঠেকন বসা অবস্থা থেকে তুলতে পারে সেই হবে বিজয়ী।

৬) হর সুসাম

খেলাটি অনেকটা বিস্কুট দৌড়ের মত। এটি পুরুষদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দৌড় দিয়ে মাঝামাঝি স্থানে রাখা বাঁশের টুকরোকে পরস্পর ঘর্ষন করে সবার আগে আগুন জ্বালিয়ে দৌড় দিতে পারবে সেই হবে প্রথম। খেলাটি বিশেষ সতর্কতা বলে যতখন না পর্যন্ত আগুন জ্বলবে তখন দৌড় দিতে পারবে না। এইরূপ ঘটনা ঘটলে বিজয়ী হলেও তা মানা হবে না।

৭) উা দুংলাইম

খেলাটি হল শক্তির পরীক্ষা। একটা শক্ত লম্বা বাঁশের মাঝামাঝি স্থানে একটা লাল কাপড় বেধে ঠিক তার নিচে মাটিতে একটা দাগ কাটা থাকবে। একটি পাড়া দশ-বারোজন বলবান পুরুষ

এবং অপর একটি পাড়ার দশ-বারোজন বলবান পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে থাকে। দুই পক্ষে ঠেলাঠেলিতে যে দল দাগ কাটা বাইরে অপর দলকে ঠেলে বাহিরে পাঠাতে হবে।

৮) সুউই থুমে ঃ- (খিলা খেলা)

এই খেলাটি পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই খেলা। খেলাটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে থাকে, বিশেষ করে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়াতে সুউই বা খিলা রেখে জোঁড়া হয়। খেলাটি দলগত বা ব্যক্তিগত হতে পারে।

খেলার কতগুলি সুউই থাকবে তা বিচারক ঠিক করবেন। এখানে তিনজন বিচারকের প্রয়োজন হয়। প্রথম বিচারক থাকবেন মাঠের নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে খেলা শুরু হয়। অপরজন থাকবেন যেখান থেকে সুউই ছুঁড়া হয়। তৃতীয় বিচারক থাকবেন শেষ প্রান্তে যেখানে দাগ দেওয়া থাকে।

ধরা যাক ৫টি সুউই নির্দিষ্ট দাগে বসানো হল। প্রতিযোগিতায় প্রথমে পায়ের পাতা দুটিকে একত্র করে তার মধ্যে ঘিলা রেখে জাম্প দিয়ে খিলাটি ছুঁড়ল। প্রতিযোগীকে কিন্তু সেই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এরপর ঘিলাটি যে জায়গায় রয়েছে সেই সব জায়গা থেকে পুনরায় সেই প্রতিযোগিতা নিয়ম অনুযায়ী পছন্দমতো এক পাঁ নিয়ে বাকা করে পায়ের গোড়ালি ধরে ডান হাত বাঁকা পায়ের ভেতর দিয়ে বসানো ঘিলাগুলির দিকে ঘিলাটি ছুঁড়ে মারবে। এইভাবে যে সবচেয়ে বেশী দক্ষতার সহিত বসানো ঘিলাগুলোকে ঠোকাতে পারবে, সেই জয়ী হবে। তাছাড়া কপাল, কবজি, হাঁটু এইগুলিও ব্যবহার হয়। এই খেলার বিশেষ সতর্কতা হল ঘিলা ছুঁড়ার সময় মুখে কোন শব্দ করতে পারবে না।

৯) উাথ্রম কা-ম ঃ- (রনপা দৌড়)

একটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন মাঠে কয়েকজন পুরুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকে এক জোড়া উাথ্রম বা রনপ হাতে নিয়ে দাঁড়াবে। এরপর বিচারক নির্দেশ অনুসারে উাথ্রমের উপর উঠে যে যত তাড়াতাবি দৌড়াতে পারবে সেই অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নির্বাচিত হবে। দৌড়ের সময় যদি প্রতিযোগী উাথ্রম থেকে পা ফসকে পরে যায় তাহলে তাকে প্রতিযোগীতা থেকে বাহির হতে হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উাথ্রমের উপর উঠে দৌড়াতে হবে।

১০) তাউলা তামলাইম ঃ

খেলাটি অনেকটা মোরগের লড়াই-এর মতো তাই খেলাটিকে তাউলা (মোরগ যুদ্ধ) তামলাইম বলে। খেলাটি যুবকদের বুদ্ধি ও শক্তির পরীক্ষার খেলা। খেলাটির নিয়ম হল প্রতিযোগী পছন্দমতো এক পা ধরে অপর পারে দাঁড়িয়ে কাঁধের সাহায্যে বা মাথা দিয়ে অপর প্রতিযোগীকে আঘাত করার চেষ্টা করবে। একটা নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে থেকে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করার ফলে যে প্রতিযোগী বৃত্তের বাইরে চলে যাবে বা পা ফসকে যাবে তাকে পরাজিত বলে ঘোষণা করে হবে।

১১) বব্রোই বিম ঃ- (ভ্রমরের মতো উড়া) ঃ

খেলাটি খুবই কঠিন। একটা শক্ত কাঠের খুটি মাটিতে শক্ত করে পুঁতে, খুটিটির গায়ে একটা পা গামছা বা কাপড় দিয়ে শক্ত করে বেঁধে অপর .. খুটিতে শক্ত করে পারা দিয়ে হাত দিয়ে কানে ধরে এক বার ডান দিকে আর একবার বাম দিকে উড়তে থাকবে। রিয়াং ছাড়াও নোয়াতিয়াদের

মধ্যেও এই খেলার প্রচলন দেখা যায়।

১২) ওয়া সুসাম

একটা শক্ত লম্বা আগাযুক্ত বাঁশকে মাটিতে পুঁতে সোজা করে দার করিয়ে এর ভিতর অপর একটা বাঁশের চোঙা ঢুকিয়ে রাখা হয়। খেলার নিয়ম অনুসারে এই চোঙাকে পুঁতে রাখা বাঁশের থেকে ধরে সজোরে ওপরের দিকে ছোড়তে হয়। যে যত বেশী উপর ছোড়তে পারবে সেই হবে প্রথম। তাছাড়া বাঁশের পিঠে আগে থেকেই দাগ কাটা থাকে যাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নির্ণয় করতে সহজ হয়।

১৩) আউখীক বাসাম (মুরগীর খাচা তোলা)

একটা শক্ত বাঁশের টুকরোর দুই পাশে দু'জন লোক দেহের গঠন ও উচ্চতা এ কি রকম দেখতে বাঁশটিতে শক্ত করে ধরে থাকার। অপর এক ব্যক্তি এই দুইজন ধরে থাকা বাঁশকে কাঁধে ভর দিয়ে এই দুইজন ব্যক্তিকে তুলতে হবে। এই খেলা অন্যকি আনন্দ দেয় এবং প্রতিযোগী নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে থাকে।

১৪) চেংপাই হুম' ঃ

খেলাটিতে দুইজনের প্রয়োজন। দুইজনেই একি দেহের গঠন ও ওজনে সমান হতে হবে। একজন খেলোয়াড় অপর খেলোয়াড়ের বগলের নিচ দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দুই কাঁধে শক্ত করে ধরবে এবং পা দুটি কোমরে জড়িয়ে ধরবে তারপর অপর জন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করবে ও দাঁড়াবে।

১৫) ম্ফু খসাম ঃ- জুইল সাপ তোলা

এই খেলায় প্রতিযোগী মাথার সামনে লম্বালম্বিভাবে বুকে ভর দিয়ে মাটিতে শোবে। তারপর মাথা দ্বিতীয় ব্যক্তির বাম পাঁজরে লাগিয়ে হাত দুটি সোজাসুজি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিঠে রাখবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন তার পা দুটি একত্রিত করে .. এনে চেপে রাখবে আর সেই সঙ্গে হাত দুটি দুই পায়ের গোড়ালিতে শক্ত করে ধরবে। মুখ সামান্য উপরে উঠবে। তারপর প্রথম ব্যক্তি তার হাত দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পিছন থেকে সামনে একে কোলে বসাবে বা বসাতে হবে।

১৬) আমিংগা

খেলাটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা। পাঁচ-দশজনের মধ্যে খেলাটি হয়। প্রত্যেকে মিলে একটি বৃত্ত তৈরী করে। এই বৃত্তের মধ্যে তাদের নিজের থেকে একজনকে আমিংগা বা মা নিবাচন করে। ছেলেমেয়েরা আমিংগার বৃত্তের কাছাকাছি এসে নাচানাচি করবে আমিংগকে রাগান্বিত করার চেষ্টা করবে। আর আমিংগা বৃত্তের মধ্যে থেকে যদি বনভিকে ছুতে পারে তবে সেই আমিংগা হবে। আগের সেই আমিংগা ছাড়া পাবে।

রিয়াং জনগোষ্ঠী ঃ

আদমসুমারি অনুযায়ী সংখ্যাগত পরিবর্তন ঃ

বর্তমান কালে লোক গণনাকে সাধারণতঃ সেন্সাস বলিয়া অভিহিত হইলেও বহু শতাব্দী পূর্বে রোমক গণতন্ত্রে এই শব্দটিকে আরও ব্যাপক বলে জানা যায়। তাদের রাষ্ট্রতন্ত্রের ব্যবস্থাপনায় ".সেন্সার" নামক একটি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কথা উল্লেখ আছে। এই কর্মচারীর করণীয় কাজ

ছিল রাজ্যের আধিবাসীগণের অবস্থা ও তাদের সংখ্যা, তাদের আয়-ব্যয়ের তথ্যাবলী নিরূপণ করা। এই কার্যসমূহকে তারা সেন্সাস নামে অভিহিত করতেন। তাদের এই কাজে লোক গণনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে বর্তমানে সেন্সাস শব্দটিকে সাধারণতঃ লোকগণনা অর্থে পর্যবসিত হয়ে আসছে। রাজকার্য সুবিধার্থে প্রশাসনের জন্য রাজস্ব নির্ধারণ একটি অনস্বীকার্য বস্তু।

বিশ্বে সর্বপ্রথম এই সেন্সাস পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় সুইডেন রাজ্যে এবং তা ক্রমে সমগ্র ইউরোপে প্রসারিত হয়।

প্রাচীন ভারতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে জন্ম মৃত্যু সংখ্যা নির্ধারণ ও লোক গণনার প্রথা প্রচলিত ছিল।

পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতে বৃটিশ সর্বপ্রথম ১৮৭২ সালে ব্যাপকভাবে সেন্সাস গ্রহ করা হয়। ইহাই প্রথম ইম্পিরিয়্যাল সেন্সাস বলে অভিহিত হয়।

দ্বিতীয় সেন্সাস গৃহীত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সেন্সাবে সেই থেকে প্রতি দশ বৎসর অন্তর সমগ্র ভারতে সেন্সাস নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

এর সাথে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল সেই কালে বঙ্গদেশে জনসংখ্যা নির্ধারণ করার সময় রাজ্যেও প্রথম জনসংখ্যা গণনা হয়। কিন্তু তখনকার জনগণনা বিলুপ্ত হয় নি। তবে যাই হোক না কেন লোক গণনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যে পলিটিক্যাল এজেন্টের রিপোর্ট অনুসারে ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দের লোক গণনা প্রচেষ্টাই সবচেয়ে ভাল ছিল।

আমি যেহেতু রিয়াং জনজাতির লোকগণনা নিয়ে আলোচনা করছি ফলে অন্য সব জনজাতির ব্যতিত রিয়াং জনজাতির লোকসংখ্যার সংখ্যাগত পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করবো। ১৮৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দের লোক গণনা যেহেতু সবচেয়ে ভাল ছিল সেইহেতু ততকালীন সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে সর্বমোট জনসংখ্যার হিসাবে রিয়াংদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২,৪৩৫জন।

এরপরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলে পরবর্তী সেন্সাসগুলি আরও বিশুদ্ধ হতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসই এ রাজ্যের সর্বপ্রথম সঠিক সেন্সাস বলে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু শেষ স্বাধীন নরপতি মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময় অর্থাৎ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে সেন্সাস গ্রহণ করা হয়েছিল এটাকেই এ রাজ্যের সর্বপ্রথম সেন্সাস বলা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ যে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সেন্সাসগুলি মুদ্রিত রিপোর্ট বর্তমানকারে না থাকলেও, যতদূর সম্ভব অনুসন্ধানে রিয়াং জনজাতিরে যে সকল তথ্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তা নিম্নে দেখানো হল।

Total population of Reang
Community of Tripura :-

1901 15,115 (M-7,743/F-7372)
1911
19221
1931 35,881 (M-18,399/F-17,482)
1941
1951

1961	56,597
1971	64,722
1981	84,003
1991	1,11,606
2001	1,65,103

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং জনজাতির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষের উপর অতিক্রান্ত হয়েছে।

ব্রু দের বিবাহ পদ্ধতি ঃ

"র্কি ব্রেম, ফাসি ব্রেম, গব্র ব্রেম . . . .

ম্দু রাহ্‌সে ম্থাইফ থাইঔ।"

আমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে উপরোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়ে থাকে। বংশ পরিচয় — রোগ ব্যাধি, উন্মাদ, চরিত্রহীন প্রকৃতির গোষ্ঠী কিনা তা দেখা হয়। লতা যেরকম হবে, ফলও সেইরকম দেবে। অর্থাৎ পূর্ব পুরুষরা যে বৈশিষ্ট্যের হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও তাই হবে। এটা ধরে নিয়েই পাত্রী খোঁজা শুরু হয়। ছেলে বিবাহের উপযুক্ত হয়ে আসলে ধীরে ধীরে অভিভাবকরাই মেয়ে খুঁজতে শুরু করে। এলাকার পরিচিত মারফত খবর নিতে থাকে। বেশ খবরাখবর করে জানা গেল ......অমুকরা ভাল বংশের লোক। মেয়ে সুন্দরী ও গৃহকর্মে সুনিপুনা। উপযুক্ত পাত্র মিললে বিয়ে দেবে। এমন তথ্য পাবারপর ছেলের মাতা-পিতা ৪ বোতল মদ নিয়ে মেয়ের মাতা-পিতার সঙ্গে সাক্ষাত করে। সন্ধ্যা বেলায় সেই মদ পান করতে করতে ছেলের মা-বাবা শুরু করে—

বিবাহ আসরে রিয়াং নব দম্পতি

"তৈমাবু নাইদেঙ রিমাবু সুদেঙ হিঙ

ফাইলায়মিসেই চুঙলে"

বাংলা তর্জমা — রথ দেখা কলা বেচা। এই পর্বে এর আক্ষরিক অর্থ হল একদিকে আপনাদের সঙ্গে কৌশল বিনিময় করা তার সঙ্গে যদি আপত্তি না থাকে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি। মেয়ের মা-বাবা প্রত্যোত্তরে বলেন—

"ব্র নি চিনিবা তত্রা সেখে আবুকতৌই ফায় তঙখ,

খাজানি রিন' সৈহনি রৌঙয়াখ,

চাঙ রিন' কাইঙনি রৌঙয়ায়, ..."

এখনও গলা টিপলে দুধ বের হয়,

বুকের রৗসা পড়তে শিখেনি,

এমনকি কোমড়ের রৗনাই (পাছড়া) পড়তে শিখেনি . . . . . .ইত্যাদি — এই বলে মেয়ের মা-বাবা প্রত্যোতর দেয়।

"আরফ চুঙন' ফ্রুঙ লানাই,

সৈহ্নি রৗঙয়া সৈহ্সনুঙরি লানাই,

কাইঙনি রৗঙয়া কাইঙস্নুঙরি লানাই,

তাকনি রৗঙয়া তাকস্নুঙরি লানাই

. . . ."

তার উত্তরে ছেলের মা-বাবা জবাব দেয়—

তবু আমরা সব প্রশিক্ষণ দিয়ে মেয়েকে বরণ করে নেব। এই সব প্রত্যোতর থেকে বুঝা যায় যে উভয় পক্ষ রাজী। তখন ছেলের মা-বাবাকে দোয়াইঙনীক (পাড়ার যুবক-যুবতী দের রিক্রিয়েশান ক্লাব বলা যায়) উদ্দেশ্যে এক / দুই বোতল মদ দিতে হয়। তাদের সম্মতি নিতে হয়। কারণ কারোর ওজর আপত্তি থাকতে পারে। "দোয়াইঙনীক' সদস্যদের মধ্যে কেহ আপত্তি তুললে প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে ওয়াখারকাইম বলা হয়। প্রায় এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর উভয় তরফ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। যদি পজিটিভ হয় তবে, দিন, ক্ষণ দেখে আনদ্রাখুতয়মা চামঃ অনুষ্ঠান করতে হয়। অবস্থা সম্পন্ন পরিবারের হলে ৪০/৫০ কে.জি ওজনের শুকর ও ৫০-৬০ বোতল মদ দিয়ে অনুষ্ঠান করে থাকেন। পারিবারিক অবস্থা খারাপ হলে একটি মুরগ ও কয়েক বোতল মদ দিয়ে করতে হয়। এই অনুষ্ঠান অনেকটা বাঙ্গালী সমাজের "মঙ্গলাচরণ" অনুষ্ঠানের ন্যায়। এই অনুষ্ঠানকে "সৈখেম" অনুষ্ঠানও বলা হয়। তখন থেকেই ঘরজামাই খাটা শুরু হয়। জামাইকে নতুন লেপ, পাতি, দা, অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে আনুসঙ্গিক আরো জিনিস নিয়ে যেতে হয়। আবার কেহ কেহ বিয়ের মূল অনুষ্ঠান অর্থাৎ "কপালতৈলুম" অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই জামাই খাটা শুরু করে। কাউন্ট ডাউন শুরু হতে থাকে কতক্ষনে

৩,৫,৭, বছর শেষ হয়।

বিয়ের মূল অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে —

“সায়ীক বাগ্রা কাউক্‌তর,

সাজলা বাগ্রা তৈঙক্‌তর।”

বাংলা তর্জমা — বিবাহ পর্বে কন্যা সন্তানের অভিভাবকরাই ছেলের অভিভাবক থেকে প্রাধান্য , অনুরূপ জুম চাষে পুত্র সন্তানধারী অভিভাবকরা মেয়ের অভিভাবক থেকে প্রাধান্য পায়।

বিবাহ পর্বে মেয়ের পক্ষের দাবী ছেলের পক্ষকে পুরন করতেই হয়। যা চায় তাই দিতে হয়। ‘সৈখেম’ বা ‘অন্দ্রা খুতয়মা’ অনুষ্ঠানের পর বিশেষ করে মেয়ের মার, জোরালো অমত থাকলে ছেলের পক্ষকে এমন দাবী করে বসে যে তারা সেই দাবী পুরনে অক্ষম হবে। ব্যতিক্রমের মধ্যে ব্যতিক্রম হলে এসব ঘটনা হয়ে যাবে। সাধারণ দাবীগুলো হল —

৩ বছর জামাই খাটতে হবে বা জামাইকে সারা জীবন মেয়ের বাড়ীতেই থাকতে হবে, (একে চামারই ফেরাওয়ামা বলে) রকমারি মদের (বাংলা , বারাংগি, ঝর) পরিমান উল্লেখ থাকে; যাত্রাগান (যেমন , সারেতি আপ্রুধইঙ , তাওথুকিয়াওমা) ও দাবী থাকে, খাসি শুকরের আনুমানিক ওজন / পরিমাণ নারিকেল, সুপারি, বাতাসা, মিষ্টি , সিরাপ ইত্যাদি। ছোট বেলায় দেখেছিলাম, স্বয়ং সম্পূর্ণ বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রচুর মদের প্রয়োজন হয়। মেয়ের মা-বাবা থেকে শুরু করে কনের থেকে বয়সে বড় এমন ভাই-বোনদের প্রত্যেককে দুই বোতল করে মদ উপঢৌকন দিয়ে “আন্দ্র” (বরযাত্রী) প্রণাম নিবেদন করতে হয়। তারপর চলে বাবার পক্ষের ভাই-বোনদেরকেও একই ভাবে উপঢৌকন দিতে হয়। পরে মা’র পক্ষের ভাই- বোনদের কেও দিতে হয়। এই পর্বকে “আরাক সঙম’ বলে। তাই গোষ্ঠী বড় হলে মদের পরিমাণও বেশী প্রয়োজন।

বিয়ের মূল অনুষ্ঠারে ৭/৮ দিন আগে থেকেই মেয়ের বাড়ীতে বোতল হিসেবে নয়, কলসী দিয়ে মদ পৌছে দেওয়া হয়। উল্লাসের সহিত পাড়ার ছেলে-মেয়েরা স্বেচ্ছাই পৌছে দেবার কাজ করে দেয়। ‘চপটুক’ অন্ততঃ দু-কলস আবশ্যক। বিয়ের দিন বিকেল দিকেই মা, বাবা, নিকট আত্মীয়, ভাই বোন ও বন্ধবান্ধবদের নিয়ে চামারই (বর) বিয়ে বাড়ী অর্থাৎ মেয়ের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। পথে ডিম দিয়ে লামপ্রা পূজা (সেনাইরাও দেবতাকে) দেওয়া হয়। যাত্রা পথে কাঁটা, বাঁধাবিপত্তি, অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই পূজা করা হয়। আগের দিনে বিয়ের যাত্রা পথে কোন ঢোল বাজানো হয় না। মেয়ের বাড়ীর থেকে ‘হাদু-দুহা’ (আনুমানিক ১-২ কিমি) দূরত্ব থেকে বাঁশী ও গানের তালে তালে ‘মন্দ’ (দলবদ্ধ আওয়াজ) দিতে দিতে মেয়ের বাড়ী উঠানে পৌছে। পুরনো দিনে ব্রুদের বাড়ী ঘর সব টং ঘর। বরের পার্টি পৌছার আগেই সেই টং ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সহসা ঢুকতে দেওয়া হয় না। দরজা না খোলা অবধি গান গাইতে হয়।

কোন নাচের গান নয়। মেয়ের পক্ষকে অনুনয় বিনয় করে গাইতে হয় —

মাইয়ামস্‌লাম গ্‌বর নীকসি তা তাইঙদি,
জাতি ন' লাচিমাই তা ফুনীকদি।
তাওলেঙমা দেই জাগুর ফাইফ,
লাইস্রই সৈহ্‌নিলে ফাইয়া,
তাওসা সৈহ্‌নিসে ফাইঔ।
ম্‌সামাদেঙ রাঙসঙ ফাইফ,
লাইস্রই সৈহ্‌নিলে ফাইয়া,
উকসা সৈহ্‌নিসে ফাইঔ।
চাক বীসাক বীসাক চাক মান্দারবা সনি,
পুইহ্‌ বীসাক বীসাক ফুই মালিবা সলাই নি,
হাইচিং দেই ফেরাই থাঙহা অঙনি,
রিসুম দেই স্‌কহ্‌ থাঙহা অঙলাইনি
হাইঙ করীঙয়া হাইঙ করীঙনি
থৈ ক্‌রীঙয়া থৈ করীঙনি ফাইমি সেই"

বাংলা তর্জনা — আগত আন্দ্রা (বরযাত্রী) অপমান দিও না। আমাদের আগমনকে ঈগল পাখীর শিকারের ন্যায় যদি মনে করে থাক, তবে বস্তু শিকারে নই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসেছি। ব্যাঘ্রের পশু শিকারের ন্যায় যদি মনে কর, তবে কোন বস্ত শিকারে আমি নাই, এসেছি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। লাল মানদারবা ফুলকে আরো রূপময় করে তুলতে সাদা মালিফুলকে আরো রূপময় করে তুলতে।

আদার ও রসুনের ন্যায় আমরা সম্মিলিত হব। একই শ্রোতে মিলিত হব .... ইত্যাদি। এইসব গান গাওয়ার পর সাদর আমন্ত্রণে দরজা খুলে দেওয়া হয়।গানের বুলি যদি ভুলবশতঃ খারাপ গাওয়া হয়, তবে দরজা খুলতে দেরী হবে এবং গানের মাধ্যমে পাল্টা প্রশ্ন করা হতে পারে।

আগত সবাই কে মদ, ও নানারকম খাবার বিতরণ করা হয়। মদ কিন্তু সারা রাত বিতরন করতে হয়। বিয়ের লগ্ন যখন হবে তখন আউকচাই (পুরোহিত) কাউমাথাই (মন্ত্র) উচ্চারণ করে - চাউল, তুলা, তৈল, লবন, মরিচ, পাথর, লোহা, ইত্যাদি - সাক্ষী সাপেক্ষে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে থাকেন।

'দুয়াইস' চণ্ডী, গুরু সাক্ষী তঙঔ
গঙ্গা স্বামী তঙঔ,
আচু শিবরায় চঙথৈনাঙমি
আচু হাঙগ্রাই ওয়াই থৈনাঙমি,

তিনি নি বার কীমাঙঅ,
বারনি খলমঅ,
ব্সা হামক বায় বাই ব্সা হামক তিন
সত্য খেমি ইমা খেমি,
থৈক্রীঙয়া থৈ ক্রীঙরিমি
হাইঙ ক্রীঙয়া হাইঙ ক্রীঙরিমি
হাইচিঙদেই ফেরাই থাঙহা খেমি
রিসুম দৈই স্ক থাঙহা খেমি,

য়াকহা কাইম য়াকনীর কৈইমাইনাইয়া
হানাও লাঙতি ফায়ঙ লাঙতা নাইয়ে
মা - বুড়াং ফা বুড়ান, নাইয়ে
চীলাহা অঙনাই লইবাও থাইফ
ব্রইমা অঙনাই সিথাই থাইফ
কাহ্লাইমাইনাইয়া দৌহ।
খুয়ার ক্চাং কাহাম নৌকফ তৈ কুমাইনাইয়া,
লেংলাথাই কীচাঙ-কাহাম নীকফ
লেংলা - মাইনাইয়া।
হিঙ সম দেই পাহ্লাই তঙদি,
খীনাই তুলা দেই ফুইহ্লায় তঙদি,
থাও দেই ম্লিলায় তঙদি,
থামস দেই হিয়াওলায় তঙদি,
সরনিবু আয়ু হ্লঙনিবু থালু,
সাহ্ফ' চয়া মুরফ' বাইয়া
. . . ..
.. . . ..
খ্নাপাইস্রাওহাদে বার পনিজি রাও?"

বাংলা তর্জমা — চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী ও পবিত্র গঙ্গাকে স্বাক্ষী রেখে, আচু শিববায়, -এর পরিকল্পনা ও আচু হাঙরায় কর্তৃক তা (দেবলক্ষী ও দেবতরণীর বিবাহ পরিকল্পনা) বাস্তবায়ন হওয়ার বিষয়টিকে অনুসরন করে, আজ এই শুভলগ্নে অমুক ও অমুকের মধ্যে আঁদা রসুনের ন্যায় একত্রিত হয়ে রক্ত-মাংসের মিলন হবার শুভ পরিণয়ের ঘোষণা করছি। বৃদ্ধ মাতা-পিতা ও অবুঝ ভাই বোনদের প্রতিপালন করতে হবে। মেয়ে বা ছেলের মধ্যে কারোর

কোন রোগ ব্যাধি হলেও বিচ্ছেদ হতে পারবে না। জীবনের যাত্রাপথে স্নিগ্ধ বৃক্ষ ছায়ার' সাক্ষাত পেলেও বিশ্রাম করতে পারবে না। অর্থাৎ বিবাহের পর সুন্দরী মহিলার সাক্ষাত পেলেও বিবাহ করতে পারবে না। সাদা তুলার ন্যায় তোমাদের চুল সাদা হউক, লৌহের ন্যায় তোমাদের আয়ু দীর্ঘজীবী হউক - এই কামনা করে আউকচাইহা — 'তৈউাসুঙ' দিয়ে শুধুমাত্র বরের কপালে পবিত্র জল ঢালে। কনের কপালে জল ঢালা হয় না, কারণ আমাদের বিয়ে অনুষ্ঠানে কনের উপস্থিতি দরকার হয় না। শুধুমাত্র তার রীসা' (বক্ষবন্ধনী) ব্যবহৃত হয়। সেই রীসার উপর বসিয়ে বরের মাথার পবিত্র জল ঢালা হয়। তবে আজকাল ছেলে-মেয়ে একত্রে বসিয়ে পবিত্র জল ঢালা হয়।

আউকচাই সম্মুখে উপস্থিত বার'— পানজিদের (সব পান জির লোক অর্থাৎ জনগণ) সম্মতি নেয় — যে তারা তার মন্ত্র উচ্চারণ শুনতে পেয়েছিল কিনা — এই বলে পূজার জন্য রক্ষিত পাথর টুকরাকে তিন বার দা দিয়ে আঘাত করে বা বাজান। উপস্থিত পাত্র মিত্ররা ও তিন বার মন্ত্রউচ্চারণ শুনেছেন বলে উত্তর দিতে হয় এবং 'কীপাল তৈলুম'' (বিয়ে) অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সারা রাত আমোদ-প্রমোদ করে।

পরদিন সকালে বাড়ীর ওঠানে 'তৈ' ও 'সংগ্রংমা' দেবতার পূজা দেওয়া হয়। তাতে ছেলের ১ বোতল মদ ও মেয়ের ১ বোতল মদ দিতে হয়। একটি মুরগ সংগ্রংমা দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। পূজান্তে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের অভিভাবকদের নাচতে হয়। নিজেরা নাচতে না পারলে, 'Proxy' দিয়ে হলেও নাচের পর্ব পুরন করতে হয়। জলের ঘাটেও বরের নামে একটি মুরগ (রান্তা) উৎসর্গ হয়।

বর্তমানে আধুনিক বিয়ের মতই বর ও কনেকে একত্রে বসিয়ে পবিত্র জল কপালে ঢালা হয়। মন্ত্র উচ্চারণ ও অন্যান্য পর্ব একই রয়েছে।

প্রবাদ বাক্য

১. **বিসকাঙ মুহ্লাওহা উক্লাও পাফঙহা**— মূল অর্থ হবে — অগ্র পশ্চাদ ভেবে কাজ করা বা কোন কিছুর উদ্যোগ নেওয়া। অগ্রভাগে যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় সেই সমান চিন্তাভাবনা বা সতর্কতা অবলম্বন করা। 'পাথঙহা' দূরত্ব বলতে একজন লোক তার শরীর সহ দুটি হাত সম্প্রসারণ করলে যে দূরত্ব হয়, সেই দূরত্বকে বুঝায়। পশ্চাদভাগেও সেই সমান দূরত্ব পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ রাখা বা চিন্তাভাবনা করা।

২. **"তৈসা নাইয়ে আরাঙ তাওদি,**
রিত্রাক নাইয়ে য়াকঙ মসুদি।

এর মূল অর্থ — ইংরেজী প্রবচন Cut your coat according to your cloth — হুবহু মিল রয়েছে 'তৈসা' মানে ছোট ছড়া/ছেড়া।

ছেড়ার ধরন বা প্রকৃতি দেখে মাছ ধরা। এখানে 'আরাঙ' (বাইন মাছ) মাছ ধরার কথা বলা হয়েছে। ছেড়ার ধরন বা প্রকৃতি দেখে 'আরাঙ' মাছ ধরতে হয় তদ্রুপ 'রিত্রাক' (নিজেদের হাতে

তৈরী বেড-সিট)-এর বিস্তৃতি দেখে নিজের পা/শরীর মেলাতে হয়। অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে এই প্রবচনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

৩. "চানাই তাওসি বুয়াকনাই র‌্জঙ"

'তাওসি' এক ধরনের লম্বা লেজ বিশিষ্ট টিয়া পাখী। জুমের পাকা ধান তাদের প্রিয় খাদ্য। 'র‌্জঙ' হচ্ছে বাঁশের শিকর। জুম পুড়া দেবার পরও এগুলোর অস্তিত্ব থেকে যায় এবং খুবই শক্ত। জুমের মালিক পাকা ধানের 'তাওসি' পাখী তাড়াতে এসে দা দিয়ে সেই র‌্জঙ-এ আঘাত করে আওয়াজ তোলে। ন্যায় বিচারে অপরাধী হচ্ছে 'তাওসি' পাখী কারণ অন্যের পরিশ্রমের ধন নষ্ট করছে বা খাচ্ছে।

অন্যদিকে 'রজঙ' জুমের মালিককে শব্দ বা আওয়াজ তুলতে সাহায্য করছে। মূল অর্থ হচ্ছে অপরাধীকে সাজা না দিয়ে নিরপরাধকে সাজা দেওয়া।

৪. "তৈয়ারীবু তৈখ্রেঙ, তৈখ্রেঙবু তৈয়ারী অঙঐ"

'তৈয়ারী' শব্দের অর্থ হচ্ছে — কুঁড়। ছড়া বা নদীর মধ্যে এক এক জায়গায় কিছু পরিধি নিয়ে গভীরতা হয়। আবার সেই গভীরতা বিলিন হয়ে যায় বা বালিতে ভরাট হয়ে যায়। 'তৈখ্রেঙ' শব্দের অর্থ হচ্ছে — সমান তাল বিশিষ্ট ছড়া বা নদীর জল। আমরা দেখতে নদীর বা ছড়ার নির্দিষ্ট স্থান কিছুদিন সমান তল বিশিষ্ট জলে আবৃত আবার সেই স্থানই কিছুদিন বাদে গভীর জলে আবৃত হয়। মূল অর্থ হচ্ছে — ধনী ব্যক্তি ও দরিদ্র হয়ে যায় আবার দরিদ্র ব্যক্তিও ধনী হয়ে যায়।

৫. "লাউরি নৌহদাক বেত্রা য়াফাই?"

এর অর্থ — অনেকটা বাংলা প্রবচন — তেলা মাথায় তেল দেওয়ার সামিল। লাউরি (বুদ্ধ ভিক্ষুক) দের মাথার চুল থাকে না তাদেরকে চুল আঁচড়ানোর জন্য চিরুনী প্রদান করা। অর্থাৎ কাউকে বিদ্রুপ করা বা উপহাস করা।

Primitive Group

ভারতে এমন অনেকগুলো ক্ষুদ্র উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে তারা অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে বসবাস করেন এবং তাদের জীবনযাত্রার শতাব্দী বৎসর পরেও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

অন্যান্য জনজাতির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিকভাবে কম থাকে। ১৯৬১ সালে গঠিত দেবর কমিশন এই রকম ২৭টি উপজাতিদেরকে উপজাতিদের মধ্যে সর্বনিম্ন উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করেন।

নিম্ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, আদিম প্রক্রিয়ার চাষাবাদ ও শিক্ষার হার অস্বাভাবিকভাবে কম হওয়ার বিষয়গুলোকে মাপকাঠি ধরে। ভারতের গৃহমন্ত্রণালয়, এই সব বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট উপজাতিদের 'আদিম জাতি' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে, রাজ্য সরকারের সুপারিশক্রমে, শুধুমাত্র রিয়াং সম্প্রদায়কে ত্রিপুরা রাজ্যের 'আদিম উপজাতি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে বেনিফিসারী হবে শুধুমাত্র ফরেস্ট-এর রিজার্ভ এলাকার বসবাসরত জুমচাষীগণ। এই জনজাতিকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১০ বছরকে একটি Phase (পর্যায়) ধরে ১৯৮৩ থেকে সম্ভবতঃ প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়।

জুমিয়া পরিবারগুলোকে পুর্নবাসনে আনা, সেগুন বাগান করে দেওয়া, পশুপালনে আর্থিক সহায়তা দান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, ফলের বাগান সৃষ্টি সরকারী তথ্যে এগুলো দেখানো হয়েছে। P.G.P প্রকল্পের সেগুন বাগান বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য — সেগুন বাগান করতে বহু জায়গায় দেখা গেছে ঠিকই। কিন্তু এই বাগানের প্রকৃত মালিক কে? কোন পরিবার কত পরিমাণ / কখন বাগানের মালিকানা পাবেন, কত বছর পর গাছগুলো বিক্রি করা যাবে, — এইসব প্রশ্নের উত্তর দপ্তরের কর্মচারীদেরও জানা নেই। অনেকটা দিশাহীন কর্মকাণ্ডের ন্যায়। ফলে P.G.P দপ্তর কর্তৃক সৃষ্ট বহু সেগুন বাগান থেকে Contractor রা .. যার যেমন খুশি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। চাপিয়া পাড়ার এই বাগান থেকে প্রাপ্ত কাঁঠ বাংলাদেশে যায়। অমরপুর মহকুমার পশ্চিম দিকে ৭/৮ কিমি দূরত্বে 'চাপিয়া পাড়া' (একদা এখানে চাপিয়া'র নিবাস)। এখানে দেবতামুড়ার পাদদেশে ৭০/৮০ পরিবার রিয়াং জনগোষ্ঠীর লোকের বসবাস। P.G.P দপ্তর এলাকা/ পাড়াটিকে তাদের আওতাভুক্ত গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করে। নিয়মে P.G.P.-র যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে সবকিছুই বাস্তবায়ন হবার কথা। কিন্তু সরেজমিনে গেলে বুঝা যায় P.G.P দপ্তর কর্তৃক প্রদর্শিত প্রগতিপত্রের সাথে বাস্তবের কত ফারাক! যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদানের কথা বলা হয়েছে তার বিন্দুমাত্রও নেই। নেই পানীয় জল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি। বাঁচার যে মৌলিক অধিকার রয়েছে — সেই ব্যবস্থাপনাটুকুও নেই। অবাক হওয়ার কিছু নেই — বিশ্বব্যাপী আজ উন্নতির চরম শিখরে পৌছেছে কিন্তু এই "চাপিয়াপাড়া" থেকে আজ অর্থাৎ ২০০৯ সাল অবধি কেউ মাধ্যমিক পাশ নেই। মাধ্যমিক প্রাক্কড়্একজন রয়েছে।

এই গ্রাম থেকে আজ অবধি কোন সরকারি চাকুরিওয়ালা নেই। এমনকি D.R.W/সুইপার পদেও নেই। P.G.P দপ্তরে যে সব শূন্যপদ পূরণ করা হয়, যোগ্যতা নিরীক্ষে এইসব এলাকার ১/২জনকে বিবেচনা করতে পারলে দপ্তর খোলা স্বার্থক হবে বলে মনে করি। আমি শুধু এই গ্রামের কথা বললাম কারণ গ্রামটার পুরু বিবরণ আমি জানি। এমন বহু গ্রাম রয়েছে সেইসব গ্রামগুলোও অবর্ণনীয়। অর্থাৎ চরম দুরবস্থার শিকার। এমন কাঞ্চনপুর মহকুমার বালানল এলাকর P.G.P-র সেগুন বাগান জলের দরে কিছু চাকমা পরিবার কিনে নিয়েছেন। P.G.P. দপ্তরের সৃষ্ট সেগুন বাগান কি করে হস্তান্তর হয়? P.G.P-র অর্থে বহু Community হ'ল কৈলাশহর টাউন ও অন্যান্য মহকুমা অফিস সংলগ্ন স্থানে তৈরী হয়েছে। এসব কাদের স্বার্থে? P.G.P দপ্তরের প্রতি ১টি প্রশ্ন — "চাপিয়া পাড়ার" যে সেগুন বাগান করা হয়েছে — দপ্তর কত টাকা রয়েলটি পেয়েছেন? আর সেই বাগান থেকে কত পরিবার / বেনিফিসিয়ারী কত টাকা পেয়েছেন?

সে যাই হোক — ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থা ও মৃত্তিকার গুণাবলী নিরিখে রাবার চাষ খুবই ফলপ্রসূ। তাই বাঁশ বাগান, আকশি গাছের বাগানের পরিবর্তে রাবার চাষকে প্রাধান্য দেওয়া হউক। বেনিফিসিয়ারি পরিবারের "অন্ততঃ একজন ছাত্র/ছাত্রীদের আবাসিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে পারলে বেনিফিসিয়ারী পরিবার ও সমাজ উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি হবে।

ব্লকের (২০০১) আদমসুমারী অনুসারে শিক্ষার হার ১৬.৬২%

Doctor -- ২০ জন

Engineer	—	২৭ জন
T.C.S	—	১০ জন
T.P.S	—	১ জন
I.A.S	—	২ জন

ব্রুদের গান

"হউকম্‌থাই থৈ ক্‌লাইম'নচিঙ
বরুঙ-কতর কাম' জরাঅ
র্‌চা-মস্‌া তঙঅী।"

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্বের সাথে নাচ গান জড়িত। গান আনে-মনের আনন্দ বেদনা, ক্লান্তি দূর করে, দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে, শিশুর নিদ্রা আনে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার মাধ্যমে মানুষের সব অনুভূতি জাগানো যায়। তাই জুম খেতে কর্মরত ব্রু রা গান করতে করতে কাজ করে। আমাদের ব্রু-দের প্রচলিত গানগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১. পূর্বেনি হৌকগ্রা-জাগ্রা, জাতি-লুলিন' রয়ে র্‌চাম'।
২. ম্‌তাই র'য়ে র্‌চাম'।
৩. পত ফিখ্‌লাইলাইম'।
৪. মেডলনি র্‌চাহ্‌ম' য়াখেবা হজাগিরি ব্‌চাহম'।
৫. পান্দানি টুক্‌কা র্‌চাহম'।
৬. কাহ্‌স্‌মাঙ কাহ্‌ম'।
৭. আফেইহ্‌ ওয়ায়েঙ খ্রিম'।
৮. বাজি র'সায়ে র্‌চাহ্‌ম'।
৯. কাইলাই পান্দানি র্‌চাহ্‌ম'।
১০. বৈসু তাওতৈ খাঙম'নি র্‌চাহ্‌ম'।
১১. গরৈয়ানি র্‌চাহম'।

১. পূর্বেনি হৌকগ্রা-জাগ্রা, জাতি-লুলিন' র'য়ে র্‌চাহ্‌ম' ঃ

সম্মানিত পাত্র-মিত্র, জাতি ও দেশের প্রশংসা করে এই ধরনের গান গাওয়া হয়ে থাকে।

হৈ......হৈ......বংশ সরমৈহ্‌
গুরইঙনাঙরাও বাই,
আচীহ লানত্রি মা সৈনাঙমি,
বাহ্‌চা লানত্রি মাসৈনাঙনি,
আমঙয়ই ল্‌গ' তৈদেঙ ফুইহ্‌ তঙনাঙথিঙ,
আঙবা সায়াকয়া কাওন'দে মাইঙসানাঙন'?
....

বাংলা তর্জমা— ও আমার সম্মানিত পাত্র-মিত্র ও দেশবাসী! তোমাদের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি আহ্লাদিত। এই জনজোয়ারে আসন পেয়ে আহ্লাদিত আমি। যে যোগ্য সম্মান তোমরা

আমাকে দিয়েছ তা ব্যক্ত করার যথার্থ ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না...। আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানের নিবেদনে ভ্রান্তি থাকাই স্বাভাবিক, আপন করে নিও আমায়। .... ইত্যাদি।

"ব' জিলাখা খগু পর্বত' অ,
ব্রমন দেশ' হিঙথাকবিমি
আঙলে বয়ঙ বক্তর নৌকবিয়াদৌ,
আঙলে তাওয়ং তাওকতর নৌকবিয়া দৌ,
তাওয়ঙ বাই তাওচিঙ নৌকবিয়াঅ,
ব্র' রঙনি বর্ণ বা জায় সামায়নি,
ব্র থায়-থাইয়ঙ কাইফ' গথেসিনি।"

— আমার এই জীবন সায়াহ্নে প্রায় সব জায়গায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। কোন সুবিশাল বৃক্ষ (যোগ্য ব্যক্তি) দেখিলাম না। যার স্নিগ্ধতা ছায়া ও ফল আহারে বহু প্রাণীর জীবন ধন্য হয়। আমি কোন 'তাওয়ঙ' ও 'তাওচিঙ' পাখী দেখিলাম না। তাদের চাক্ষুস না করে তাদের রঙ বা বর্ণের বিবরণ কি দেব আমি? তাদের অপেক্ষায় থাকাও বেমানান হবে দেখছি?

২. ম্তাইন' র'হ্য়ে র্চাহ্ম ঃ

"আমা পাবর্তী নুঙন' খুলুম অৗ,
চুঙন' খুমবা রিদি,
চুঙন' থাওবা রিদি,
মাথাম তৈলবু সাকসিয়া,
সৈনাই কাইথ' সৈতঙফুবু সাকসিয়াবা,
সৈনাই কাইথ' সৈফু সাকসিখেবা,
আরে তাসেদিহিভ আঙফ'
সাখামু।"

দেব বন্দনার গান। পার্বতী মা তোমায় প্রণাম করি। আশীর্বাদ দিও মা। বিধির বিধান খণ্ডন করা যায় না। যদি জানতাম, যে "সৈনাইরাও দেবতা" আমার নিয়তি এভাবেই (খারাপ) লিপিবদ্ধ করবে। তবে, বলতাম অন্যভাবে লিখতে .... ইত্যাদি।

৩. পত'- ফিখ্লায়লায়ম' ঃ

এই গান প্রশ্ন ও উত্তর পর্বের হয়। সাধারণত অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদের মধ্যে এই গানের প্রচলন দেখা যায়। জুমখেতের দলগত কাজে কথা বলার সুযোগ থাকে না। সারাদিন খাটনির পর সন্ধ্যার দিকে বাড়ি ফেরে। খাওয়া দাওয়ার শেষে যার যার টংঘরের নৌকগুণ্ডে (ঘরের পেছন দিকের দরজা সংলগ্ন এক ধরনের মাচা) দাঁড়িয়ে সিখলা ও সিখলীরা এই গান করে থাকে,

ছেলে— য়াফাতীক অন্দা মুখুইঙ থাইমা
নুংলে য়াহ্গু তাহিঙদি, সীকাঙসে
হিঙফায়দি;
আঙলে ম্খরীক কামসৈহ্সে কেঙ মাতঙহা।

য়াকরাই তাওপি তৈকতামা,

নুঙবা সরখিলুঙ হুকবা চামাইনাইদে?

ওয়াকলাই ওয়াদাফ' রিসাওয়ানী।

মেয়ে— কালাসা বঙব্রাইবু নুঙ অঙফাইদি,

নখুঙনি মৈলাওবাবু আঙ অঙয়ানী,

ক্সাইহ্ হৈর'বু আঙ অঙসাওনাই,

খনাই তাওথুবু নুঙ অঙফাইদি....''

ছেলের গানের বাংলা তর্জমা —

অন্দার (এক কাঠের সুন্দর কাজ করা জিনিস) ন্যায় সুঢৌল পা অধিকারী রমণী। তুমি আমার সম্মুখে হাটতে থাক, পিছনে নয়। আমার মন ব্যকুল করছে। 'তাওপি' পাখীর সদ্য প্রসবিত ডিমের ন্যায় সুঢৌল গোড়ালি বিশিষ্ট রমণী, তুমি কি অমসৃণ পাথরে হেটে জুম চাষ করতে পারবে? তোমার জন্য কচি বাঁশের তৈরী করা 'ওয়াদা' (কার্পেট জাতীয়) বিছানোর ব্যবস্থা করব। .... ইত্যাদি।

মেয়ের গানের তর্জমা—

তুমি ভ্রমর হয়ে চলে আস, আর আমি লাউ গাছের ফুল হয়ে থাকব। আমি সরষে হয়ে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকব, তুমি ঘুঘু পাখী হয়ে আমাকে তুল।... ইত্যাদি।

মনের ভাব মিল থাকলে একরকম গান আর অমিল থাকলে অন্যরকম গান। অমিল হওয়ার ক্ষেত্রে কতকগুলো গান তুলে ধরছি।

মেয়ে— সাল গাছ' ম্ফাঙ মুঙকীপলায়ন'

নুঙবা তাইঙয়ে খুনিয়া সুমাইনাই দে?

ছেলে— ওরা থাকসামি মৈ বাজামা

খানা নাইখেবু মৈ মাসানি দাম তঙঔ,

চাঙখঙ নাইখেবু মৈ মাসানি দাম তঙ ঔ

আঙলে মৈদু য়াকতৈ দর চরাকয়া।'

মেয়ে ঃ আমি বন দপ্তরের শাল গাছ। আমাকে কেঁটে তুমি কি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? ছেলে ঃ যে পারিবারিক মর্যাদা নিয়ে তোমরা জন্ম নিয়েছ আমি সেখানে খাপ খাওয়াতে পারব না। ....ইত্যাদি।

৪. মেডল র্চাহ্ম' য়াখেবা হজাগিরি র্চাহ্ম'ঃ

ব্রুদের হজাগিরি নাচ ভারতের একটি বিখ্যাত নাচ। এই নাচ মূলতঃ মহিলারা করে থাকেন কলসের উপর দাঁড়িয়ে হাতে থালা, কুলা, মাথায় বোতল, আর বোতলের উপর বাটি জ্বালিয়ে ঢোলের তালে তালে এই নাচ করা হয়। এক সাথে কোমড়, হাত, পা সঞ্চালন করে মাথার উপর জ্বলন্ত বাটির ভারসাম্য রাখতে হয়। এই নাচের সময় যে গান গাওয়া হয় সেটাই হজাগিরি গান। নির্দিষ্ট উপলক্ষ ব্যতীত এই নাচ-গান করা হয় না।

৫. পাগুনি টুক্কা র্চাহ্ম'

এই 'পাগুার' নাচ ফ্রি-হ্যাণ্ড নাচ বলা যায়। এই নাচে কোন জিনিস (থালা, কুলা, কলস) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় না। এটা ফার্স্ট-ট্রেক নাচ। যেকোন অনুষ্ঠানে এই নাচ ও গান করা হয়।

৬. কাহ্সমাঙ ঃ কাহ্ম' ঃ

লোক মারা যাবার সময় যে কান্না হয় সেটাই কাহ্সমাঙ। 'কৃথৈই মাইবাওম' (মৃত ব্যক্তিকে ভোগ দান', 'চরম' ও 'লুখ্লাইম' অনুষ্ঠানে কাহ্সমাঙ গাওয়া/কান্না হয়।

৭. আফেইহ্ ওয়ায়েঙ খ্রিম' ঃ

দোলনা দিয়ে শিশুকে ঘুম পাতানোর সময় এই গান গাওয়া হয়। শিশুকে প্রশংসা করেই এই গানগুলো গাওয়া হয়। শিশুরা 'আমি কাকাহ্মা' (বনবিড়াল/শেয়াল) কে ভয় পায়। যে বস্তু বা প্রাণীকে ভয় পায় সেইসব প্রাণী বা বস্তুর নাম গানের কথায় উল্লেখ করা হয়।

হৈ......লে....লে.......

আমি কাকাহ্মা তাওয়াইহ্ ফাইদি,

আইনি খুচাকলে ইয়াই থুজাঔ

কর্ম তুতু তরজাখে গবেঙ ফাক্থীলায় তরলায়নায়,

ক্চু খুঙস্রই লাওলায়নায়,

থৌকমাবু কড়াই খাইসংকয়াখে

নখুঙবু ফারা বিসীহয়া অঙনাই।

— বন বিড়ালী তুমি আর কামড়াতে আসবে না

আমার সোনামনি দোলনায় ঘুমুচ্ছে।

আমার সোনামনি বড় হলে আমাদের বৃহৎ

একটি বাড়ি তৈরী হবে।.... ইত্যাদি।

৮. বাজি র'সায়ে র্চাহ্ম'

জুমের ধান গাছ বেশ বড় হওয়ার সময় আগাছা পরিষ্কার করা বা নিড়ানা দরকার। তখন আগাছা নিড়ানোর ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট প্লটে ভাগ করে দেওয়া হয়। অনেকটা চুক্তি কাজের মত। যার যার পছন্দ মত প্লট নির্বাচন করেন। এই কাজের সময় যে গানটি গাওয়া হয় সেটাই বাজি র'সায়ে র্চাহ্ম' গান। গান দু'দফায় হয় সকালের গানের মর্মার্থ এই রকম— হে আমার সঙ্গীসকল, তোমাদের হাত চালিয়ে যাও। যে কোন কাজ সম্পাদনে আমরা সমর্থ। দুপুর ঘনিয়ে যাবার আগেই আমরা কাজ সমাপ্ত করব। বাড়ি থেকে আনা আমাদের খাদ্য নষ্ট হবার পথে আমাদের জল গরম হয়ে যাওয়ার পথে। এলাকার অন্যান্য কর্মীদল তাদের কাজ সমাপ্ত করে খাবার খেতে যাচ্ছে। দ্রুত হাত চালিয়ে যাও কাজ সমাপ্ত আমাদের করতেই হবে। আমাদের কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। কখন খাওয়া শুরু করব।

তোমাদের সুন্দর গরন বিশিষ্ট হাতের ছোয়া লাগলেই কাজ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে।

বিকাল বেলার জন্য গানটির বুলি আলাদা।

দিনের নির্দিষ্ট কাজ সমাপ্ত করতে পারলেই আমরা কাজ থেকে অব্যাহতি পাব। বিকেলে "তাওকুঙ্গ"

পাখীদের মিলনের সময় হয়েছে, আমাদেরও কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে। ক্ষিদের জ্বালায় ঘরের শূকর তার খালি খাবার পাত্র নষ্ট করতে থাকবে। মুরগীগুলোও 'তাওখাঁক' (খাঁচা) ঠুকরিয়ে খাদ্য চাইবে। ইত্যাদি...

৯. কাইলাই পাভানি র্‌চাহ্‌ম'ঃ

বিয়ের সময় এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। বরকে নি বরযাত্রীরা কনের বাড়ির অভিমুখে যাবার সময় এই গান গাওয়া হয়। গানের তালে কোন ঢোল বাজানো হয় না। শুধু ক্‌সুমু (বাঁশি) বাজানো হয়।

১০. বৈসু তাওতৈ খাঙম' ঃ

বৈসু উৎসবের সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট কচিকাঁচারা মিলে বাড়ি বাড়ি নাচ প্রদর্শন করে ডিম, পিঠে, শুটকী, মুরগী ও চ'হ্‌ সংগ্রহ করে থাকে। শিশুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় উৎসব এই ''বৈসু তাওতৈ খাঙম'। নিজেরাই ঢোল বাজায়। নিজেরাই গান গায় ও নাচে। ঐদিন কোলের শিশু নাচ প্রদর্শন করলেও ডিম দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হয় সেটাই বৈসু তাওতে খাঙম' গান।

১১. গরৈয়ানি র্‌চাহ্‌ম' ঃ

গরৈয়া নাচের সময় যে গান গাওয়া হয় সেটাই গরৈয়া র্‌চাহ্‌ম। ঢোল, বাঁশি ও গানের রিদম সম্পূর্ণ আলাদা।

পান্‌জি

ব্রু সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি প্রধান 'পানজি' 'মেছকা' ও 'মলসৈ' বিদ্যমান। এই মূল দুটি 'পানজি'র সঙ্গে আরও ৫/৬টি পানজি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ ঃ—

মেছকা	মলসৈ
১. মেছকা	১. মলসৈ
২. ম্‌সা	২. চংপ্রেং
৩. চর্খি	৩. আপেত'
৪. রায়ক্‌চাক	৪. য়াকচ'
৫. তৈমৈ	৫. নৌক্‌খাম
৬. ওয়াইরেম	৬. য়াকস্টাম

এই মেছকা শ্রেণীভুক্ত পানজির লোকেদের আবার 'সেঙয়াব্রেম' ও বলা হয়। অনুরূপভাবে মলসৈ শ্রেণীভুক্ত পানজির লোকেদেরকেও ''য়াটাম ব্রেম'' বলা হয়। জনশ্রুতি মতে ''সেঙয়া ব্রেম''-এর পানজিভুক্ত ব্যক্তিরাই নাকি 'রায়' পদবী অলঙ্কৃত করেন। ''য়াটাম ব্রেম''-এর পানজিভুক্ত ব্যক্তিরা 'কাসকাও' পদবী অলঙ্কৃত করেন।

মূলত: কর্মবৈশিষ্টের নিরীক্ষে এই 'পানজি'র আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির উৎস বা মূল উৎপত্তি জানা যায় তার পানজি বিন্যাস থেকে। এখানে উল্লেখ্য, 'রিয়াং' ও 'রায়কসম' নামে যে দুটি পানজি রয়েছে তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেহ কেহ বলছেন, কোন এক কালে

'রিয়াং' পানজির লোক 'কাসকাও' পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সবাইকে 'রিয়াং' পরিচয় দিতে বাধ্য করা হয়েছে। আবার অনেকে বলছেন, রিয়াং পানজির পরিচয়ধারীরা 'মেছকা'রই বংশোদ্ভুত। উত্তর ত্রিপুরার মাছমারা ও অমরপুর মহকুমার 'কাসকাও' পাড়ায় কিছুলোক 'রিয়াং' পানজির বংশোদ্ভুত বলে দাবী করছেন। গবেষণা সাপেক্ষে সঠিক তথ্য পাওয়া যেতে পারে।
ত্রিপুরা নরেশ মহারাজা ধন্যমাণিক্যের বীর সেনাপতিদ্বয় 'রায়ক্চাক' ও 'রায়ক্সমের' পরিচয়ও এই পানজি বিন্যাসের মাধ্যমে জানা যায়। তবে, জনশ্রুতি মতে, বীর সেনানি 'রায়ক্সম'-এর নাকি কোন পুত্র সন্তান না থাকায় বংশ পরিচয় বিস্মৃতি অতলে চলে যায়।

পঞ্চরাম রিয়াং

পিতা রবিধন রিয়াং। ১৯৬৫ সালে অমরপুর মহকুমার তৈছারাংজাক গ্রামে জন্ম। গ্রামেই প্রাথমিক পাঠ। পরবর্তী লেখাপড়া অমরপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আগরতলা এম বি বি কলেজ। বর্তমানে মহাকরণে কর্মরত।

জমাতিয়া

উৎপত্তি — জমাতিয়া সমাজের উৎপত্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য রাজমালাতে তো বটেই, অন্য কোন বইয়েও পাওয়া যায় না। অন্ততঃ আমার জানা মতে তাই।

স্বর্গীয় সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা (এম, এ, - হার্ভার্ডি) প্রনীত, সেন্সাস অব ত্রিপুরা বইয়ে বলা হয়েছে 'জমাতিয়াগণ পূর্বে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে কার্য করিত। জমাৎ শব্দ দ্বারা দল বা সমবেত লোক সমষ্টিকে বুঝায়। ইহাদের দ্বারা যে সেনাদল গঠিত হইয়াছিল, সেই দলকে জমাৎ বলা হত। এতদবধি ইহারা জমাতিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে। অনেকে মনে করে জমাতিয়া সম্প্রাদায়ে অন্যান্য জাতীয় লোক ও মিশ্রিত হইয়াছে।'

সোমেন ঠাকুর একজন রাজ পরিবারভুক্ত সদস্যই ছিলেন না, সেই সময়ের একজন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাঁর দেওয়া তথ্য অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু তিনি সুনির্দিষ্ট করেন নি। কবে, কিভাবে, কোন ঘটনায় একদল সেনা বাহিনী নিজেদের জমাৎ থেকে জমাতিয়া উপাধি গ্রহণ করলেন কিংবা উপাধি প্রাপ্ত হলেন।

সোমেন ঠাকুরের পরবর্তী সময় জমাতিয়া সম্প্রদায় নিয়ে অনেকে লিখেছেন। যেমন— ঠাকুর নগেন্দ্র দেববর্মা যিনি, নগেন্দ্র ক্যাপ্টেন নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর লেখাতে সোমেন ঠাকুরের মতামতকেই সমর্থন করা হয়েছে। তবে তাঁর লেখায় পরিক্ষিত জমাতিয়ার নেতৃত্বে জমাতিয়া বিদ্রোহ নিয়ে বিশদ উল্লেখ রয়েছে। তাঁর পরেও জমাতিয়া সম্প্রদায় নিয়ে আরো অনেকে লিখেছেন। তারমধ্যে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার শ্রী কল্যান বিজয় জমাতিয়ার জমাতিয়া সম্প্রদায়ের উপর গবেষণা পত্রটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উনিও উচ্চশিক্ষিত। উচ্চ প্রশংসিত তাঁর গবেষণা পত্রটি। কিন্তু তিনিও জমাতিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। যদিও তাঁর গবেষণা পত্রের পরীক্ষকরা গবেষণা পত্রের জন্য ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেও শ্রীজমাতিয়াকে জমাতিয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে আরো বিস্তৃত পরিসর নিয়ে গবেষণা চালানোর পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন। গবেষক শ্রী জমাতিয়া এ ব্যাপারে কোন উগ্যোগ নিয়েছেন কিনা জানা নেই। উদ্যোগ নিলে আমরা সবাই উপকৃত হব।

স্বর্গীয় সোমেন ঠাকুরের লেখায় যে টুকু তথ্য বিধৃত, তা যে একশ ভাগই সত্য, তাতে সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গতঃ রাজার সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা রাজধানী ও রাজধানী সংলগ্ন এলাকাতেই বাস করবেন ইহাই স্বাভাবিক। সোমেন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন। 'পূর্বে সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ ব্যতিত অন্য কোনস্থানে জমাতিয়া গনের বসতি ছিলনা। বর্তমান কালে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত বিলোনীয়া ও সাব্রুম বিভাগ ব্যতিত অন্যান্য সকল বিভাগেই অলপাধিক পরিমাণে বসতি স্থাপিত হইয়াছে। তবে উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগেই ইহাদের সংখ্যা অধিক পরিদৃষ্ট হইতেছে'। উল্লেখ্য যে, উদয়পুর ও অমরপুরেই মহারাজাদের রাজত্বের স্থায়ীত্ব বেশী ছিল। আরো উল্লেখনীয় যে - সেই সময়কালেই মহারাজাদের সঙ্গে অন্যান্য রাজশক্তির যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল। উদয়পুর থেকে আগরতলা রাজধানী স্থানান্তরের পর আর যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা ঘটে নি। তার কারণ তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশের কবলে চলে গেছে। আর ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো শক্তি ত্রিপুরা

রাজাদের ছিল না- বলে যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা ও ঘটতে পারে নি।

দ্বিতীয়ত ঃ— রাজার সেনাবাহিনী কোন একটি বিশেষ দফার লোকজনদের নিয়ে গঠিত না হওয়ায়ই কথা। সেখানে বিভিন্ন দফা বা সম্প্রদায়ের সংমিশ্রন হওয়াই স্বাভাবিক। সেকালে রাজ্যের কক-বরক ভাষীরা ত্রিপুর- ক্ষত্রিয় নামেই বেশী পরিচিত ছিলেন। কাজেই ভাষাগত বিন্যাস করে যদি শুধু কক-বরক ভাষীদের নিয়ে পৃথক সৈন্য বাহিনী গঠিত হয়ে থাকে, তাহলেও কক-বরকভাষী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাতে সামিল থাকবেন। এই কারণে আজো প্রতিটি জমাতিয়া পরিবারের অতীত বংশধরদের পরিচয় অনুসন্ধান করলে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের বাইরে শিকড় চলে যায়। কারোর দেববর্মা, কারোর রিয়াং অথবা কারোর নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র পাওয়া যাবেই। এ বিষয়ে আর আলোচনা না বাড়িয়ে একটি কথা বলে রাখতে চাই- যে জমাতিয়া সমাজের উৎপত্তি খুব বেশী অতীতের ঘটনা হওয়ার কথা নয়। এর জনসংখ্যাই এই আশঙ্কার জন্ম দেয়। সোমেন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন ১৯৩০ সনে জমাতিয়াদের জনসংখ্যা ১১,০৯০। তন্মধ্যে পুরুষ ৫৬৩৪ জন ও স্ত্রী লোক ৫,৪৫৬ জন। ওই সেন্সাস একশভাগ নির্ভুল না হলেও খুব বেশী তারতম্য থাকার কথা নয়। তার কারণ জমাতিয়া সে সময়েও খুব দুর্গমে অঞ্চলের বাসীন্দা ছিলেন না।

এপ্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করার মতো। তাহলো জমাতিয়া সমাজের সঙ্গে গরিয়া দেবতার যোগসূত্র। ১৯৭২ সালে একটি নির্বাচনী সভা হয় জমপুইজলার জমাতিয়া অধ্যুষিত গ্রাম খুমলীং-এ। সেখানে ভাষণ দান কালে জমাতিয়া সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (যিনি পরবর্তী সময়ে হদা অক্রা হন) শিলকাটী গ্রামের ললিত জমাতিয়াকে বলতে শুনেছি - 'জমাতিয়া মানে গরিয়া বাবার ভক্ত, জমাতিয়া হদার ভক্ত হবেন। কথাগুলো আমি আরো অনেক অনুষ্ঠানে আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে শুনেছি। তাতে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে - হয়তো গরিয়া তথা মহারাজা ধন্যমাণ্যিক্যের আমলে থানাংচি বিজয়ের ঘটনার সাথে জমাতিয়া সমাজ গঠনের যোগসূত্র থাকতে পারে। এই থানাংচি বিজয়ে গোসাপের ভূমিকা জমাতিয়াদের মুখে মুখে প্রচলিত যা জেমাস লঙ সাহেব তাঁর Chronicles of Tripura- বইয়ে উল্লেখ করে গেছেন।

জমাতিয়া হদা

জমাতিয়া সমাজের সর্বোচ্চ সামাজিক সংস্থার নাম - জমাতিয়া হদা। সমাজের দুজন সমাজপতি যাদের বলা হয় হদা অক্রা। দু'জন অক্রার (একজন) নির্বাচিত বা মনোনীত হন খামা এলাকার জন্য অন্যজন হন ছাকা এলাকার জন্য। কক-বরকে খামা মানে পশ্চিম দিক বা নিম্নাঞ্চল, আর ছাকা মানে সুর্যোদয়ের দিক তথা পূর্বদিক। জমাতিয়াদের খামা বলতে উদয়পুর মহকুমার পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে সোনামূড়া, সদরের জম্পুইজলা ও বিলোনীয়ার জমাতিয়া বসতিকে বুঝায়। ছাকা বলতে উদয়পুরের পূর্বাঞ্চল নিয়ে অমরপুর মহকুমার জমাতিয়া বসতি অঞ্চলকে বুঝায়। জমাতিয়া সমাজে আরেকটি অঞ্চল রয়েছে - নাম কল্যানপুর। ওই অঞ্চলের জন্য অক্রাপদ না থাকায় পাঞ্চাই এর হাতে বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে রাখা হয়েছে। জমাতিয়া সমাজে অক্রাদ্বয়ের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা। সমাজের যে কোনো বাদ - বিবাদ, বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যপারে অক্রার বিচারই চূড়ান্ত। সমাজে নারী কেলেংকারী, নারী- পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে হদার বিচারে কঠোর শাস্তির

বিধান রয়েছে। বড় মাপের অর্থদণ্ড ছাড়াও প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে অক্রাদ্বয়ের হাতে। হদা বিচারে ৩ / ৪ বেত সাজার কথা ঘোষণা দিয়ে হদা অক্রা যে কোন ব্যক্তিকে এই সাজা দেওয়ার নির্দেশ দিলে সেইভাবে কার্যকরী হয়ে থাকে।

জমাতিয়া সমাজে প্রতি গ্রামে থাকে একজন চকদিরি। গ্রাম সমাজকে বলা হয় লুকু। সেই অনুসারে গ্রামের চাকদিরিকে বলা হয় লুকু চকদিরি। জমাতিয়া সমাজে বলা হয় লুকু চকদিরি। জমাতিয়া সমাজে এমন ৩২২ টি লুকু রয়েছে। আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি এলাকা গঠিত হয়েছে - যার নাম ময়াল। প্রতিটি ময়ালের জন্য দুইজন করে পাঞ্চাই নিযুক্ত থাকেন। চকদিরির ক্ষমতা নিজ নিজ গ্রাম বা লুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ, তেমনি ময়ালের পাঞ্চাদের ক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট ময়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন বিষয় গ্রামের চকদিরি দ্বারা নিষ্পত্তি হয় না, সেগুলো চলে যায় পাঞ্চাইয়ের দরবারে। সেখানেও নিষ্পত্তি না হলে চলে যায় হদার দরবারে। হদার দরবারে সব বিষয়ের চূড়ান্ত ফয়সালা হয়। অতীতে গ্রামের লুকু চকদিরি, ময়ালের পাঞ্চাই এর ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা ছিল। যেমন বিবাহ - বিচ্ছেদ ও নারী কেলেংকারীর বিচার শুধু অক্রার দরবারেই হতো। এখন ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরন হয়েছে। তবে বেত্রাঘাতের সাজা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র হদা অক্রাদ্বয়ের হাতেই রয়ে গেছে।

হদা অক্রা ও পাঞ্চাইয়ের মেয়াদ ৫ বছর । তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই মিয়াদ বৃদ্ধি করার বিধান আছে। তবে প্রতিবার মেয়াদ ৫ বছরের বেশী হতে পারবে না।

হদার বড় দায়িত্ব গরিয়া পুজার আয়োজন করা। তাছাড়া মাতাবাড়ীতে মহিষ বলি দিয়ে বছরে একবার পূজা দেওয়া, শিববাড়ীতে পুজা দেওয়া। বছরে একবার গোমতী (তুইমা), খোয়াই (ছমমা) ও বুড়ীমা নদীতে মহিষ বলি দিয়ে পুজো দেয়ার প্রথা চালু রয়েছে। হদার পক্ষ থেকে গরিয়া পুজা সহ অন্যান্য পুজা পার্বন ও বিভিন্ন সামাজিক দায়িত্ব পালন করার জন্য তহবিল গঠন করা হয়। সমগ্র সমাজের প্রতিটি পরিবারকে এই তহবিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিতে হয়। বর্তমানে এই চাঁদার পরিমান পরিবার পিছু ২০ টাকা। এর সঙ্গে হদা পরিচালিত বিদ্যালয় চালনার জন্য ১৫ টাকা অতিরিক্ত ধার্য্য করা হয়। হদার পক্ষ থেকে হদা অক্রা, কেরফাঙ, দরিয়া - এঁরা নির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করে এই চাঁদা সংগ্রহ করেন। হদার ক্ষেত্রে যেমন, পাঞ্চাই ও গ্রাম পর্যায়ে ও কতগুলো দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করার বিধান রয়েছে।

জমাতিয়া হদার পুনর্গঠন, গরিয়া পুজার কর্মসূচী ও হদার অন্যান্য কর্মসূচী নিয়ে বিশদ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় হদাদের বার্ষিক সভায়। সাধারণতঃ অগ্রায়ন মাসে এই বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে ময়ালের পাঞ্চাইদের নিয়ে পাঞ্চাই সম্মেলন করে পাঞ্চাইদের কাছ থেকে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, পরিস্থিতি ও অগ্রগতির রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়।

আগে হদার কোন গঠনতন্ত্র ছিল না। পরবর্তী সময় গঠনতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হয়। হদার গঠনতন্ত্র ও বেশ কয়েকবার সংশোধিত হয়েছে। পূর্বে হদার উপদেষ্টা মণ্ডলী ছিল না। পরবর্তী সময়ে উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠন করা হয় এবং তা গঠনতন্ত্রে অর্ন্তভুক্ত হয়।

জমাতিয়া হদা সম্পর্কে লিখিত কোন বই পত্র না থাকায় অক্রাদের নাম ও কাজকর্মের ধারাবাহিকতা অতীতের বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। ইদানিং হদার কিছু শিক্ষিত যুবক

হদার অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছেন।

জমাতিয়া সমাজে গত শতকে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে যেগুলোকে অগ্রগতির লক্ষন বলা যায়। সেগুলো সম্ভব হয়েছে হদার শক্তিশালী সংগঠন ও সদর্থক ভূমিকার জন্য। যেমন—

জমাতিয়া দম্পতি

এক ঃ— অতীতে অন্যান্য কক-বরকভাষী উপজাতি সম্প্রদায়ের মতো জমাতিয়া সমাজেও জামাই খাটার প্রথা চালু ছিল। একে বলা হতো চামারী অমপা। সেই প্রথা অনুযায়ী কোন যুবককে বিবাহের আগে ২ /৩ বছর ধরে মেয়ের বাড়ীতে জামাই খাটাতে হতো। ছেলেটির কাজ কর্মে সন্তোষ্ট হলেই উক্ত মেয়ে ও মেয়ের মা - বাবা বিয়েতে সম্মতি দিতেন। পছন্দ না হলে তল্পিতল্পা সমেত ফেরত দেওয়া হতো। অনেক ক্ষেত্রে মেয়ে বা মেয়ে বাড়ীর লোকেরা জামাই খাটাযুবকের বিছানাপত্র বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। যার অর্থ তৎক্ষণাৎ বিদায়।

জমাতিয়াদের ঘর জামাই'প্রথা চালু আছে কিন্তু জামাই খাটার প্রথা বাদ হয়ে যায় গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেই।

দুই ঃ— জমাতিয়া মহিলারা পূর্বে ব্যবহৃত উৎকট অলংকারসব পরিত্যাগ করে আধুনিক হওয়ার দিকে ঝুঁকে। তাদের পরিধানেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। বয়নশিল্পে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে চলছে।

তিন ঃ— একসময় জমাতিয়া সমাজে কম বয়েসী ১০ থেকে ১২ বছরের ছেলেদের পরিণত বয়সের যুবতী কন্যাদের সাথে বিয়ে দেওয়া হতো। গত শতাব্দীর ৬০ থেকে ৭০ এর দশকে এই প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো হয়।

চার ঃ— অতীতে কক-বরক ভাষী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে মেলামেশার অবাধ সুযোগ থাকলেও মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমলে জমাতিয়াদের আলাদাভাবে দীক্ষা দিয়ে উচ্চবর্ণের স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে মুরগী পালন, শূকর পালন ও পালিত মুরগ, শূকরের মাংস ভক্ষন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এরই সঙ্গে অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে জমাতিয়াদের ঘরবাড়ী প্রবেশে ও বাধা নিষেধ জারী হয়ে যায়। গত শতাব্দীর ষাট থেকে সত্তর দশকে এক তুমুল জনমতের চাপে এই বাধা নিষেধের প্রাচীর সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যায়। এই ঘটনার পেছনে রাজনীতির প্রত্যক্ষ

প্রভাব অস্বীকার করা না গেলেও হদার নৈতিক সমর্থন ছাড়া এতো সহজে এবং এতো কম সময়ে যে সম্ভব হতো না তা বলাই বাহুল্য। একই সময়ে মুরগী পালন ও শূকর পালন ও পুনঃ প্রবর্তিত হয় জমাতিয়া সমাজে। ধীরে ধীরে বিবাহ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে পালিত শূকরের মাংস ব্যবহার শুরু হয়।

উক্ত সময়ে গরিয়া উৎসব নিয়েও কয়েকটি সংস্কারের ঘটনা ঘটে। গরিয়া পুজার সময় 'বগলা' নামে গরিয়ার স্বেচ্ছা সেবকরা যেসব আশ্লীল ও অশোভন আচরণে লিপ্ত হতো তা বন্ধ করা হয়।

গরিয়া ৭ দিন পরিক্রমার সময় যাত্রীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা সবই বিনামূল্যে গ্রামবাসীদের করতে হতো। ফলে যাত্রীদের সংখ্যা হতো বিশাল যা বড় গ্রামগুলোর পক্ষে সমস্যা না হলেও ছোট ছোট গ্রামের পক্ষে সমস্যা হতো। হদার তরফে যাত্রীদের জন্য মিল প্রতি ১০ টাকা ধার্য্য করে দেওয়া হয়। এতে যাত্রীসংখ্যা কমে যায়। বিবাহ অনুষ্ঠান ৩ দিনের জায়গায় ১ দিনে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। উপরোক্ত সামাজিক সংস্কারে সবচাইতে বড় ভূমিকা নেন প্রয়াত হদা অক্রা সিদ্ধি কুমার জমাতিয়া।

যে কোনো সমাজের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি যেমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না তেমনি সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে স্থীর হয়ে থাকতে পারে না। অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে কখনো সে পরি বর্তিত হয় পারিপার্শ্বিকতার চাপে, কখনো প্রভাব খাটিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনে। জমাতিয়া সমাজ ও তেমনি নিরন্তর নতূন নতূন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। মোকাবেলা করতে হচ্ছে নতূন নতূন সমস্যারও।

পূর্বে জমাতিয়ারা গরিয়া সহ প্রকৃতির দেবদেবীর পুজো নিয়েই থাকতেন। পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবে হিন্দুর দেবদেবী তথা আর্য্যদের দেবদেবী ও পুজিত হয়। শুরু হয় রামায়ন মহাভারত পাঠ ও। বাদ যায় না শনি পাঁচালী, লক্ষ্মী পাঁচালীও। প্রকৃতি পুজা থেকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রণে যাওয়ার মধ্যে তেমন সমস্যা তৈরী হয় নি। যে সমস্যা দেখা দেয় সম্প্রতি খৃষ্টান ধর্মের অনুপ্রবেশে। প্রথমদিকে বিগত ৭০ দশকে যখন জমাতিয়া সমাজের কিছু যুবক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন -তখন সংশ্লিষ্ট গ্রামে আলোড়ন দেখা দেয়। বিশেষ করে উদয়পুরের দেওয়ান গ্রামে বিনন্দ জমাতিয়র নেতৃত্বে বেশ কিছু যুবক খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনায় দেওয়ান গ্রাম সহ পাশ্ববর্তী এলাকায় এক দারুন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীরা খৃষ্টানদের সমাজ থেকে বহিস্কারের উদ্যোগ নেন এবং সামাজিক বয়কটের প্রস্তুতিও চলে। উক্ত ঘটনা বেশীদূর এগোতে পারে নি তৎকালীন হদা অক্রা সিদ্ধি কুমার জমাতিয়ার কারণে। হদা অক্রা ঘটনা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ বিনন্দ জমাতিয়ার বাড়ীতে ছুটে যান এবং সপ্তাহ খানেক তাঁর বাড়ীতে থেকে অবস্থা সামাল দেন।

কিছুদিন পর আরেকটি জমাতিয়া যুবক মুসলিম যুবতী বিয়ে করলে পুনরায় অস্থিরতা দেখা দেয়। নবদম্পতি প্রথমে ছেলের নিজ গ্রাম বগাবাসা থেকে বিতাড়িত হয়ে দেওয়ানে বিনন্দ জমাতিয়ার আশ্রয়ে গেলে সেখান থেকে বিতাড়নের উদ্যোগ নেন গ্রামের মাতব্বরেরা। খবর পেয়ে ছুটে যান হদা অক্রা সিদ্ধি কুমার জমাতিয়া স্বয়ং। তিনি মুসলীম বধুকে জমাতিয়া সমাজে

গ্রহণ করে সেখানেই খেয়ে দেয়ে সপ্তাহখানেক কাটান। সে সময় উক্ত মুসলিম রমণীর তৈরী কার মদ সহ রান্না বান্না নিজে এবং গ্রামের চকদিরিদের খাইয়ে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনেন। ফলে সামাজিক বয়কট থেকে মুক্তি পান বিনন্দ জমাতিয়া সহ ধর্মান্তরিত হওয়া জমাতিয়া খৃষ্টানরা এবং সেই সঙ্গে মুসলিম রমণী বিয়ে করা নবদম্পতি ও।

সে সময় প্রয়াত হদা অক্রা সিদ্ধি কুমার জমাতিয়ার সাহসী ও ইতিবাচক ভূমিকায় জমাতিয়া সমাজে হিন্দু বনাম খৃষ্টান ধর্মের বিরোধ চাপা পড়ে থাকলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। খৃষ্টান ধর্মীয় লোকেরা হিন্দু জমাতিয়াদের ধর্মান্তকরনে উৎসাহ দিতে গিয়ে হিন্দু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে গেলে পুনরায় অনৈক্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এরই মধ্যে একদল উগ্রবাদী ও খৃষ্টানদের পক্ষ নিয়ে হিন্দু জমাতিয়াদের আচার অনুষ্ঠানে বাধা দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি উতপ্ত হয়ে উঠে। সে সময় উগ্রবাদীরা জমাতিয়াদের চিরাচারিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠানেও বাধা দিতে শুরু করে। সর্বশেষে হদার পদাধিককারীদের পদমর্যদায় ও আঘাত দিতে শুরু করলে জমাতিয়া হদা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এবং হদা অক্রা শ্রী বিক্রম বাহাদুর জমাতিয়ার নেতৃত্বে উগ্রবাদ বিরোধীতায় ময়দানে নেমে পড়েন। বর্তমানে উগ্রবাদী তৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসায় এবং হদার কাজকর্মে বাধা বিঘ্ন না ঘটায় হদার উগ্রবাদ বিরোধীতা ও স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবে খৃষ্টানদের নিয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা এখনো কোথাও কোথাও দেখা দিচ্ছে।

যেমন — গতবছর অমরপুরের দুলুমা গ্রামের খৃষ্টানরা গ্রামের ভিতর মৃতদেহ কবর দিলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন হিন্দু জমাতিয়ারা। শেষ পর্যন্ত মহকুমা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এবছর উদয়পুরের আঠার বোলা গ্রামে মুসলীমদের কোঁরবানীর ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রেও মহকুমা প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে হয় পরিস্থিতি শান্ত করতে।

গ্রামের মাঝখানে খৃষ্টানদের কবর দেওয়া নিয়ে অন্যত্র এবং অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিরোধের ঘটনা ঘটেছে। তবে সেসব গ্রামে সমাধান হয়েছে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই। সব ক্ষেত্রেই আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় যে গ্রামের মাঝখানে খৃষ্টানদের কবর বা হিন্দুদের শ্মশান হবে না। গ্রামের বাইরে রাখা হবে। এ সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করেই নিজেদের মধ্যে মীমাংসা হয়েছে - প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় নি। জমাতিয়া সমাজেও এমনভাবে আলোচনার মাধ্যমেই ওই সব বিরোধের মীমাংসা হওয়া উচিত। এমনটাই কাম্যও।

এক্ষেত্রে আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা যে — এরাজ্যের পাহাড়ী জনপদে অন্যধর্মের তেমন প্রভাব না হলেও খৃষ্টধর্মের প্রভাব থেকে যাবে। তার কারণ, গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অশিক্ষিত ও অনুন্নত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার সূচনাই ঘটে খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা। শিক্ষার সঙ্গে চিকিৎসার সুযোগ ও সঙ্গে করে আনেন তাঁরা। তাঁদের কয়েকশ বছরের কঠিন ও কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকারের ফলেই এই অঞ্চলের উপজাতিরা মাথা তুলতে পেরেছে। না হলে এই অঞ্চলের উপজাতিরা সবাই এতদিনে অন্ধকারে তলিয়ে যেতেন। রাজ্যের বর্তমান মন্ত্রীসভার বর্ষীয়মান সদস্য শ্রী অনিল সরকার একবার আঠারোভ্রায় জমাতিয়া হদার কোচিং সেন্টার উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন— 'এদেশের নিম্নবর্গের লোকেদের শিক্ষার অধিকার ছিলা না। তাঁদের

হাতে সর্বপ্রথম বই তুলে দেন খৃষ্টান মিশনারীরা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপজাতিদের যদি খৃষ্টান মিশনারীরা শিক্ষার আলো না দিতেন তাহলে তাঁরা বাকী ভারতীয়দের কাছে দাসত্ব করতে বাধ্য হতেন। শ্রী সরকার সপষ্ট ভাষায় বলেন — এরাজ্যেও গ্রাম - পাহাড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন একমাত্র খৃষ্টান মিশনারীরাই। অন্য ধর্মীয় সংগঠন এব্যাপারে অতীতে যেমন এখনো তেমন করেই হাত গুটিয়ে আছেন। কাজেই এরাজ্যের উপজাতি জনপদে খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে ঠেকানো যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এমন কি আমার ধারনা যে এরাজ্যের রাজরাজারা যদি হিন্দুধর্ম গ্রহণ না করতেন তাহলে উপজাতি প্রজারা খৃষ্টান ধর্মের দিকেই ঝুঁকে পড়তেন। তবে ব্যতিক্রম হতে পারে যদি অতীতের ধারাবাহিকতায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে।

জমাতিয়া বিদ্রোহ

১৮৪৯ ও ১৮৬৩ সালে পরীক্ষিত জমাতিয়া নেতৃত্বে রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় দুটি বিদ্রোহের ঘটনা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। এদুটো ঘটনা নিয়ে ইতিপূর্বে আমি একটি পুস্তক রচনা করেছি কক-বরক ভাষায়। তাই ঘটনা নিযে আর বিস্তৃত বিবরণ দিতে যাচ্ছি না। এর মধ্যে ১৮৪৯ সনের ঘটনাটা ক্ষুদ্র পরিবৃত্তে সীমাবদ্ধ ছিল। তুলনায় ১৮৬৩ সালেব ঘটনাটা অনেক বেশী বিস্তৃত পরিসরে ঘটেছিল এবং তার ফলাফল ও ছিল অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

১৮৬৩ সালের ঘটনার মূল উৎসে ছিল একটা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্রে তাই হয়ে দাঁড়ায় বিশাল এক বিপর্যয়ের কারণ। ঘটনা সম্পর্কে ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মা সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে বলেছেন — ওয়াখিরাই ঠাকুর সস্ত্রীক জমাতিয়া এলাকায় খাজনা আদায় করতে গিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবাব পথে তিতুন প্রথা অনুযায়ী গ্রামের জমাতিয়া যুবকদের তৈরী করা বাহনে চড়ে যেতে থাকেন। এমন সময় তাঁর স্ত্রীর অশৌচের কথা জানতে পারলে জমাতিয়া যুবকরা দম্পতিকে বহন করতে আপত্তি জানায়। এতে অপমান বোধ করেন রাজকর্মচারী। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেই রাজার কাছে নালিশ জানান যে — জমাতিয়ারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তিনি নানা রঙ চড়িয়ে বাজার কাছে অভিযোগ খাড়া করেন। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ওয়াখিরাই ঠাকুরের অভিযোগের সত্যমিথ্যা যাচাই না করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আনার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। রাজ সেনারা উদয়পুর মহকুমার জমাতিয়া বসতিগুলোতে হানা দিয়ে ওয়াখিরাই ঠাকুরের নাম দেওয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করলে জমাতিয়াদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সেনারা শেষপর্যন্ত সমাজপতি পরীক্ষিত জমাতিয়াকেও গ্রেপ্তার করতে গেলে জমাতিয়া যুবকরা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়। তারা রাজসৈন্যদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। পরাস্ত হয়ে সৈন্যরা জানপ্রাণ নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ঘটনা মহারাজার মনে ওয়াখিরাই ঠাকুরের অভিযোগ সম্পর্কে বদ্ধমূল বিশ্বাস তৈরী করে। মহারাজা আরো বড় একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন জমাতিয়াদের দমন করার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে গিয়েছে। মহারাজার সেনাবাহিনীর সাথে জমাতিয়া যুবকদের গেরিলা সংঘর্ষ বাধে। তাতে রাজসৈন্যের পরাজয় ঘটে। সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য নিহত হয়। বাকীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এ ঘটনায় বিচলিত বোধ করেন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তিনি এবার দুর্ধর্ষ কুকী সৈন্যদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে জমাতিয়া

বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়ে দেন। কুকীসৈন্যদের তুলনায় জমাতিয়াদের হাতে অস্ত্র না থাকায় .. সংঘর্ষে জমাতিয়া বাহিনী পরাস্ত হয়। কুকী সৈন্যরা নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য দুই শতাধিক জমাতিয়া বিদ্রোহীর কাটা মুন্ডু রাজধানীতে নিয়ে আসলে সেগুলো রাজপথেব দুধারে বাঁশের আগায় গেথে রাজদ্রোহীদের পরিণাম সম্পর্কে প্রজাদের অবহিত করার জন্য ৭দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়। ঐ সময় আগরতলায় সফররত ত্রিপুরা জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট মেঙ্গর সাহেব উক্ত দৃশ্য দেখেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে ঘটনার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন — 'The heads of these (Jamatiyas) were cut out and are now hanging up in terrorism at Agartala.'

কুকী সৈন্যরা বিদ্রোহের নেতা পরীক্ষিত জমাতিয়া সহ বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্রোহীকে ধরে নিয়ে আসে। রাজ দরবারে তাদের বিচার হয় । সেখানে প্রমাণ হয় যে - পরীক্ষিতের বিদ্রোহ আসলে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ছিল না। ছিল রাজ কর্মচারীদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে। বিচারে পরীক্ষিত সহ অন্যান্যদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

১৮৬৩ সালের ঐ ঘটনা রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের সংগ্রাম না হলেও রাজশাসনের অন্যায় - অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক বিদ্রোহ হিসাবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কিছুতেই হাল্কা করে দেখার সুযোগ নেই। তাই বিদ্রোহের নায়ক পরীক্ষিত জমাতিয়ার নামে রাজধানীর কোন একটি রাজপথের নামকরণ হওয়া উচিত। আমি রাজ্য সরকারকে এ ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার অনুরোধ করি। জমাতিয়া হদাকে ও এব্যাপারে সোচ্চার হওয়ার অনুরোধ জানাই।

উঁচুজাতের স্বীকৃতি লাভ.

উদয়পুর মহকুমার হদা (হদ্রাই) গ্রামের প্রয়াত কানাইনন্দ জমাতিয়াঁর মুখে শুনেছি রাজশক্তি যে নির্মম ও নিষ্ঠুরতায় এই.বিদ্রোহ দমন করেছিল, তাতে সমগ্র জমাতিয়া সমাজ ক্ষোভে দুঃখে এবং অপমানে ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঢাকার অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে মজুরী খেটে জীবিকা নির্বাহ করার অঙ্গীকার নেন তাঁরা। খবর পেয়ে মহারাজা বীরচন্দ্র লোকজন পাঠিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে ফিরিয়ে আনেন। উল্লেখ্য যে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য মহারাণী সুদক্ষিনার কনিষ্ঠ পুত্র। মহারাণী সুদক্ষিনা ছিলেন জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মেয়ে। তাই মামার বংশধরদের মানসিক আঘাত ও অভিমান লাঘব করার জন্য মাহারাজা মিথিলার ব্রাহ্মণদের এনে জমাতিয়াদের মন্ত্র দীক্ষা দিয়ে উঁচজাতের মর্যদা দেন। এদবধি জমাতিয়াদের ঘরে শূকর মোরগ পালন ও পালিত শূকর মোরগ ইত্যাদির মাংস ভক্ষনে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। এমন কি জমাতিয়াদের ঘরে অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করা হয় উঁচুজাতের মর্যাদা ও পবিত্রতা ক্ষুন্ন হওয়ার কারণ দেখিয়ে। স্বভাবতঃই এই নতুন ব্যবস্থায় জমাতিয়ারাও মানসিক সান্ত্বনা লাভ করে ফের রাজানুগত্য মেনে নেন।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

জমাতিয়া সমাজে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে যাত্রাগানের কদর সবচাইতে বেশী। প্রতি জমাতিয়া গ্রামে যাত্রাদল থাকবেই। একটি যাত্রাদলে গ্রামের যুবকদের জায়গা না হলে একাধিক যাত্রাদল গড়ে উঠে। কোথাও দুই তিন গ্রাম মিলে ও যাত্রাদল তৈরী হয়। আমার ধারণা আজকের পঞ্চাশোর্ধে বয়সের কোন জমাতিয়া পুরুষ পাওয়া যাবে না- যিনি যাত্রাদলে সামিল হন নাই।

৭০এর দশকে একদল শিক্ষিত যুবক সমাজে লেখাপড়ার অসুবিধার কথা ভেবে যাত্রাদল গঠনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন। ফলে ধীরে ধীরে যাত্রাগান বন্ধ হয়ে যায়।

জমাতিয়া সমাজে যাত্রাগান শুরুতে বাংলায় হতো। কখনো ছাপানো বই সংগ্রহ করে, আবার যাত্রাগানের শিক্ষকরা নিজেরাই রচনা করে তালিম দিতেন। যাত্রাগানের শিক্ষকদের ভাল বেতন দেওয়া হতো। তার সঙ্গে তালিম দেওয়ার সময় মজুত থাকতো সবচাইতে উৎকৃষ্ট পানীয়ের। যাত্রা শিক্ষকদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন — ওয়াবানপদ জমাতিয়া এবং বিদ্যুৎ দেববর্মা। ৬০ এর দশকে এসে যাত্রাপালা বাংলার পাশাপাশি কক-বরকেও রচিত হয়। তন্মধ্যে গামারিয়া গ্রামের যাত্রাদল কর্তৃক আভিনিত ককবরকে রামায়ন কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়। তাছাড়া তোতাবাড়ী গ্রামের ছেপেংতি মাইরুংতি, নোয়াবাড়ীর, রূপবান ও থাঁই ফোটা কাহিনীর যাত্রাভিনয় ও সাড়া মেলে। তবে ৭০ এর দশকের তেলিয়ামুড়ার শিক্ষিত যুবকদের অভিনীত কলীযুগ জনপ্রিয়তায় সবার শীর্ষে উঠে। তার কারণ, তখনকার যুব সমাজের সুপ্ত আকাঙ্খা ও স্বপ্ন ওই যাত্রাপালাতে দারুনভাবে ফুটে উঠেছিল।

পূজাপার্বন

জমাতিয়াদেব পূজা পার্বনের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে গরিয়া দেবতা। গবিয়ার ৭ দিবসীর পূজো পরিক্রমার সময় অন্য দেবদেবীর পূজো ও নিষিদ্ধ। জমাতিয়াদের গরিয়া দুটো। একটি হচ্ছে বিয়াগীনাং - অপরটি বিয়াকীরাই। বিয়াগীনাং - এর ৬টি হাত, বিয়া কীরাই গরিয়ার হাত ২টি। অন্যান্য বরক দফার জনগোষ্ঠীদের গরিয়া একটিই। তবে নামে ভিন্নতা রয়েছে। রিয়াংরা বলেন কলেয়া, দেবর্বমারা বলেন কালেয়া। গরিয়া দেবতার প্রতীক ও ভিন্ন। দেববর্মারা বাঁশের আগায় রিয়া বেঁধে পূজো করেন। রিয়াংরা বর্শা এবং নোয়তিয়ারা তলোয়ারকে গরিয়ার প্রতীক হিসাবে পূজো দেন। তবে গরিয়া সঙ্গীত সবার প্রায় একই। জমাতিয়ারা সমবেতভাবে কেবল দুটো স্থানে গরিয়া পূজোৎসব পালন করেন। একটিতে বিয়াগীনাং এবং অপরটিতে বিয়াকীরাই গরিয়া পূজা হয়। তবে ৭ দিনের পরিক্রমা হয় শুধু বিয়াগীনাং গরিয়ার। বিয়াকীরাই গরিয়ার ও একই সময় ৭ দিন ধরে পূজো হয়। তবে পরিক্রমা হয় না।

জমাতিয়া সম্প্রদয়ের গড়িয়া দেবতা

গরিয়া পূজোর আগের দিনকে বলে হারি বুইস্যু। সেদিন সারা রাত ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। প্রথমে সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয় - পরে যাত্রানুষ্ঠান চলে রাতভর। সারারাত মেলাও বসে ঐ রাত্রেই। পরদিন ভোর থেকে বাঁশ ও কাপড় দিয়ে তৈরী হয় গরিয়ার প্রতিকৃতি। সবশেষে প্রতিকৃতিতে স্বর্ণের মুখমণ্ডল স্থাপন করে পূজোর সূচনা করা হয়।

গরিয়া পূজোৎসব চলা কালে বহু পরিচিত এবং অপরিচিতের মিলন মেলায় যাতে সবাই সবাইকে নিসঙ্কোচে আপন করে নিতে পারেন, তারজন্য সব মহিলাকে বৌদি (বাচাঁই) এবং সব পুরুষকেই জামাই বাবু (কুমুই) সম্বোধন করার রীতি চালু আছে।

গরিয়া ৭দিন পরিক্রমার সময় কোন অবিবাহিত যুবককে গ্রামের কোন অবিবাহিত যুবতীর ঘরে ঘরজামাই তুলে যুবকের বন্ধু বান্ধবরা মদ আদায় করেন। এর সঙ্গে সামাজিক বিয়ের কোন সম্বন্ধ থাকে না। শুধুমাত্র গরিয়া পরিক্রমাকালে এ বং গরিয়া পরিক্রমায় সামিল হওয়া যাত্রীদের মধ্যেই এই রীতি প্রযোজ্য। তাছাড়া, যুবক - যুবতীর মধ্যে যাতে আত্নীয়তা বা পূর্বপরিচয় না থাকে - সে বিষয়ে সর্তকতা রাখা হয়। গরিয়া বাদে জমাতিয়ারা অন্যান্য বরক দফার মতোই লাম্প্রা, নকছু, কের নাকিরি, মাইলুংমা - খুলুংমা, বুরাছা, থুনাইরগ বনিরগ ইত্যাদির পূজো দিয়ে থাকেন। লাম্প্রা হচ্ছে পরিবারের কুশল কামনায় পূজো দেওয়া। লাম্প্রা পূজোতেই অচাই বলে দেন - পরিাবরের কোন অমঙ্গল আছে কিন! থাকলে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য কি করতে হবে - ইত্যাদি। গ্রামের সুরক্ষার জন্য নাকরি পূজো দেওয়া হয়। অনেকে পরিবারের সুরক্ষার জন্যও পূজো দেন।

বীরাইরগ মানে ডাইনী। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদেরই ডাইনী অপবাদ দেওয়া হয়। অচাইরা কোন রোগী বা রোগীনির পেছনে ডাইনীর হাত আছে বলে গননায় জানতে পারলে ডাইনীকে খুশী করার জন্য পূজো দিতে হয়। পূজোতে কি বলি হবে - তা অচাইরাই ঠিক করে দেন। হাঁস, কাছিম অথবা কবুতর জোড়া বলি দিয়ে এই পূজো দিতে হয়। পূজোর পরও রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটলে অথবা মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে গ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়। অচাইয়ের গণনার উ পর বিশ্বাস করে মৃতের আত্মীয় পরিজনরা প্রতিশোধ স্পৃহায় মেতে উঠে। কখনো কখনো খুনোখুনির ঘটনাও ঘটে। কোনো কোনো ঘটনায় অভিযুক্ত ডাইনীকে গ্রাম থেকে বহিস্কার করা হয় অথবা গ্রামে একঘরে করে রাখা হয়। আবার কোথাও কোথাও মৃতের আত্মীয় পরিজনদের সাথে ডাইনীর আত্মীয় পরিজনদের বিবাদ তুঙ্গে উঠে গ্রামকে দুই খণ্ডে বা তিন খণ্ডে বিভাজনের ঘটনা ও বিরল নয়। বলং ছোয়া মানে হচ্ছে বন দেবতার পূজা দেওয়া। এই পূজো গ্রামের উপকণ্ঠে নিরিবিলি স্থানে দেওয়া হয়। পাঁঠা বলি হয় পূজোতে। পূজোস্থানেই রন্নাবান্না হয়। গ্রামের ভিতর এর প্রসাদ নেওয়া বারন। তাই গ্রামের কচিকাচারা যার যার বাড়ী থেকে ভাতের থালা নিয়ে এসে পূজোস্থানে জড়ো হয়। সেখানে পূজোর প্রসাদ বিতরণ করা হয় তাদের।

আগে জমাতিয়াদের বিবাহ কিংবা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানগুলো অচাইদের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। পরবর্তী সময়ে এইসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মনদের অনুপ্রবেশ ঘটে। তবে অচাইদের ভূমিকা ছাড়া কোন অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হতে পারে না। জমাতিয়া সমাজে মৃত আত্মীয়দের পিণ্ডি দেওয়ার প্রথা বহুকাল ধরেই প্রচলিত। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারেরা কোলকাতা, গয়া, প্রয়াগ, কাশী এবং পুরীতে তীর্থ

দর্শনে গিয়ে সেখানে পিণ্ডি দিতেন। যাদের সামর্থ নেই, তারা ডম্বুর তীর্থে সেরে নিতেন। একসময় হাঁটাপথে তীর্থ দর্শনে যেতে হতো। তীর্থ দর্শন শেষে ফিরে আসতে তাদের বছর ঘুরে যেতো। তাঁদের মুখে গ্রামবাসীরা শুনতো মজার মজার সব গল্প এবং ঘটনার কথা, বহি- দুনিয়ার হাল চালের কথা।

জীবন - জীবিকা

জমাতিয়াদের মুখ্য জীবিকা কৃষি। অতীতে জমাতিয়রা ও সবাই জুমচাষী ছিলেন। কিন্তু রাজন্যশাসিত ত্রিপুরার সৈন্য বিভাগে কাজ করার সুবাদে রাজধানীর সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করার ফলে জমাতিয়ারা সর্বপ্রথম অধুনা বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলিম খেত মজুরদের সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমে ক্রমে জমিদারদের মজুর হয়ে আসা মুসলিমদের কাছে সমতল চাষের সুফল সম্পর্কে অবহিত হন এবং সমতল চাষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জুমচাষ ছেড়ে সমতল চাষেব উৎসাহী হয়ে উঠেন। মুসলিমরা খেত চাষ শিখিয়ে দেন। প্রথমে উদয়পুর ও সোনামুড়ার কয়েকটি গ্রামে সমতল চাষ শুরু হলে ও খুব দ্রুত জমাতিয়া সমাজে তা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৯৩০ সাল নাগাদ জমাতিয়াদের মধ্যে সমতল চাষীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৫ ভাগের উপর। বর্তমানে জমাতিয়াদের মধ্যে জুমচাষী নাই বললেই চলে। আগে জমাতিয়াদের মধ্যে সরকারী চাকুরী করা অথবা নিজেদের উৎপাদিত শস্যাদি বিক্রী করাকে অধমের কাজ মনে করা হতো। এমন কি সরকারী চাকুরে কোন যুবকের সাথে মেয়ের বিয়ে সহজে কেউ দিতেন না। বর্তমানে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। চাষযোগ্য জমির অভাব দেখা দেওয়ায় সরকারী চাকুরীর চাহিদা তুঙ্গে উঠেছে। বিশেষ করে ডম্বুরে প্রতিষ্ঠিত জমাতিয়া পরিবার গুলো বিনা ক্ষতিপূরনে উচ্ছেদ হওয়ার পর এই সংকট তীব্রতর হয়েছে। অবশ্য, জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ও অনেকাংশে দায়ী বলা যায়।

সামাজিক ভাঙ্গাগড়া প্রক্রিয়া

জমাতিয়া সমাজে বিগত দুই শতকে নানাহ সামাজিক বিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। তারমধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে - জমাতিয়া সমাজ থেকে একদল সমাজ বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ঘটনা। জমাতিয়া সমাজের শর্তাবলী হচ্ছে - গরিয়া পূজা মেনে নেওয়া। হদার রীতিনীতি মেনে নেওয়া, হদার ধার্য্য করা বার্ষিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান করা। এগুলো হদার শৃঙ্খলার বিষয়ও। যারা এসব শর্ত মানবে না, তারা জমাতিয়া সমাজে স্থান পাবে না। তাই যারাই এর বিরোধীতা বা অমান্য করেছে, তারাই হদা দ্বারা সমাজচ্যুত হয়েছে। এইভাবে অনেক জমাতিয়া সমাজচ্যুত হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে ২/৩ শ বছরে। তারা অনেকে জমাতিয়া সমাজ ছেড়ে পুরান তিপ্‌রা তথা দেববর্মা উপাধি নিয়ে নিলেও জমাতিয়া আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে তলে তলে সম্পর্ক রেখে চলছেন।

আরেকদল জমাতিয়া নিজেরাই জমাতিয়া সমাজের নিয়ম কানুন অগ্রাহ্য করে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন। তাঁদের অনেকে দেববর্মা উপাধি গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে জমাতিয়া উপাধি বজায় রেখেছেন। বিশ্রামগঞ্জের কলিরাম গ্রামের শতাধিক জমাতিয়া পরিবার এখনো জমাতিয়া উপাধি ব্যবহার করেন। অথচ জমাতিয়া হদার সঙ্গে কোন সম্পর্ক তাদের নেই। আবার জুমের ডেপা, অম্পির সাধুপাড়ার দেববর্মারা অতীতে জমাতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। হালে

এমন শ্রেণীভুক্ত পরিবারগুলো জমাতিয়া হদার রীতি নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে জমাতিয়া সমাজে ফিরে আসতে শুরু করেছেন। আবার নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ব্যাপকহারে দেববর্মা উপাধি গ্রহণের ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

বিভিন্ন সমাজে এই ভাঙ্গা গড়ার খেলা যেমনই বিচিত্র্য তেমনই কৌতূহলোদ্দীপকও।

শিক্ষা ঃ— শিক্ষাক্ষেত্রে জমাতিয়া সমাজ এখনো অনেক পিছিয়ে। তারকারণ, প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষার অভাব। তাছাড়া, জমাতিয়া গ্রামগুলোতে শিক্ষকের দারুন স্বল্পতা- শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত করছে।

সরকার পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর বেহাল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারী পর্যায়ে বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও জমাতিয়া এলাকা পিছিয়ে আছে। ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।

সরকারী দপ্তরগুলোতে পদস্থ কর্মচারীর সংখ্যা, টি. সি. এস, টি. পি. এস ক্যাডারের অফিসারের সংখ্যা খুবই নগন্য প্রায় না থাকারই মতো।

পাহাড়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায় দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা না কাটলে যেমন শিক্ষক স্বল্পতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার অভাব না ঘুচলে এরাজ্যের উপজাতি সমাজ কেবল পিছিয়ে যেতেই থাকবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলো ছাড়া ও সমাজ সংগঠনগুলোও সোচ্চার হবার সময় এসেছে।

জমাতিয়া সমাজে শিক্ষিত না বলে স্বাক্ষরতার হার ধরলে পুরুষের শতকরা ৭০ থেকে ৭৫ ভাগ ও মহিলাদের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ স্বাক্ষর হতে পারে বলে অনুমান। শিক্ষিতের হার ধরলে তার অর্ধের নীচে নেমে আসবে বলেই আমার ধারনা।

জমাতিয়া বিবাহ বেদী

বিবাহ অনুষ্ঠান

জমাতিয়া সমাজে আগে জামাই খাটা বা 'চামারি অম্পা' নিয়মে বিবাহাদি হতো। কক বরক ভাষী সব জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এককালে এই পদ্ধতি চালু ছিল। বর্তমানে দু'একটি জনগোষ্ঠীর প্রত্যন্ত জনপদ ছাড়া এর অস্তিত্ব নাই বললেই চলে। জমাতিয়া সমাজে এই প্রথা বন্ধ হয় অনেক কাল আগেই।

'চামারি অম্পা' প্রথানুযায়ী বিয়ের আগেই যুবককে যুবতীর বাড়ীতে গিয়ে ২/৩ বছর জামাই খাটতে হতো। সেই সময় মেয়ের মা-বাবা সহ বাড়ীর সবাইকে খুশী করতে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। সকাল-বিকাল মেয়ের মা-বাবাকে মুখ ধুয়ার গরম জল তৈরী করে দেওয়া, ফাঁকে ফাঁকে তামাক সাজিয়ে দেওয়া রোজকার কর্তব্য হতো। মেয়ের মা- বাবারা যুবকের

শক্তি সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য অনেক পরীক্ষা নিতেন। যেমন ঘন বাঁশের জঙ্গলে বাঁশ কেটে উল্টো টেনে নিয়ে যেতে দেওয়া, 'খাংগ্রং' নামের ঘন কাঁটাওয়ালা বন্য ফল খাড়া ভর্তি শুকিয়ে সেগুলো পায়ে পিষে দেওয়ার জন্য বলা ইত্যাদি। এছাড়া ধৈর্য্যের পরীক্ষাও যুবকদের দিতে হতো। 'চামারী মাইপক' নামে জটিল বেতের কাজ করে। এতোসবেও মনোপুত না হলে মেয়ের মা-বাবা কিংবা মেয়ে স্বয়ং বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করে যুবককে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতো। পছন্দ হলে তবেই বিয়ে নতুবা ২/৩ বছরের পরিশ্রম বৃথাই যেতো।

এই অপমান ও ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য যুবকরা জামাই খাটার আগে জোর প্রস্তুতি নিতো। বিশেষ করে বাশ বেতের কাজে পারদর্শী হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতো যুবকরা। এই দুটো বিষয়ে দস্তুর যুবকদের পক্ষে মেয়ের মা-বাবা মেয়ের মন জয় করা অনেক সহজ হতো বলে।

বর্তমানে জমাতিয়া সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা-বাবারাই ছেলে মেয়ে দেখে পছন্দ করে বিয়ে দিচ্ছেন। সমাজে জামাই খাটা বন্ধ হলেও ঘর জামাই প্রথা চালু আছে। মেয়ের মা-বাবা কোন যুবককে পছন্দ করার পর যদি দেখা যায় যে ছেলের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত দুর্বল অথবা ছেলেটি অনাথ তাহলে আলোচনার মাধ্যমে যুবককে মেয়ের বাড়ীতে ঘর জামাই করে নিয়ে যাওয়া হয়। অবশ্য বিয়ের পর বনাবনীতে অভাব হলে জামাই নিজবাড়ীতে ফিরে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, স্ত্রীরা স্বামীর সহযোগী হয়ে থাকে। একে বলে 'চামারি ফিরক।'

' ঘর জামাই' প্রথায় বরকে বিয়ের আগের দিন কনের গ্রামে নিয়ে আসা হয়। তবে বরের বাড়ীতে বিয়ে ক্ষেত্রে কনেকে যে রূপ সাজগোজ করে বাদ্য বাজনা সহ জাকজমক করে আনা হয়, সেরূপ হয় না। এক্ষেত্রে গ্রামের কয়েকজন সহপাঠী বরের সহযাত্রী হয়। তাদের সঙ্গে কোন বাজনা থাকে না। শুধুমাত্র বাঁশী বাজানো হয়। বরের সঙ্গীদের মধ্যে বাছাই করা একজন বা দুজন পালাক্রমে নির্দিষ্ট সুরে বাঁশিতে সুর তুললে সুরের তাল অনুযায়ী সঙ্গীরা এ হু হু শব্দে মুখর হয়। গ্রামের প্রান্তে পাত্রীর পক্ষের লোকজন ব্যাণ্ড পার্টি, সহ বরকে বরণ করে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকেন। এ হু হু রব তুলে বরযাত্রীরা এসে পৌছলে পাত্রীর গ্রামের যুবকরা ও দুরন্ত বাঁশির সুর তোলে প্রযোগীতার আহ্বান জানায়। সে সময় বাঁশির সুরের জাদু প্রদর্শন চলে উভয় পক্ষের মধ্যে। এরপর জাকজমক করে বরকে নিয়ে যাওয়া হয় পাত্রীর বাড়ীতে। সেখানে আবার বর খোঁজা নিয়ে তুমুল কাণ্ড চলে। বরের সহযাত্রীরা সবাই চাদর মুড়িয়ে একসঙ্গে পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বরকে লুকিয়ে রাখার জন্য। পাত্রী পক্ষের যুবকরা জোটবদ্ধ বরযাত্রীদের মধ্যে থেকে বর খোঁজে বের করতে গলদগর্ম হয়ে উঠে। নকল বর হলে পিঁড়িতে তোলে পা ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে করতে দৌড়ে গিয়ে পুনরায় দলে যোগ দেয়। আসল বর হলে পিড়িতে দাঁড়িয়ে থেকে ছোট শ্যালকের হাতে পা ধোয়া থেকে অচাইয়ের দ্বারা আনুষ্ঠানিক বরণ পর্ব পর্যন্ত সম্পন্ন করে।

ঘর জামাইয়ের ক্ষেত্রে বর আনতে পাত্রীর গ্রাম থেকে লোকজন পাঠানো হয় না। বরের গৃহে কনে আনার ক্ষেত্রে ব্যাণ্ড পার্টি সহ লোকজন পাঠানো হয়।

বিবাহ বেদীতে বর ও কনেকে তোলার সময় কনের সমগ্র শরীর ঢেকে দেওয়া হয় মিহি চাদর দিয়ে। বরের মুখ ঢাকা হয় সাজানো বেতের পাখা দিয়ে। কারণ অনুষ্ঠান চলাকালে কোন বিধবা বা বিপত্নীক পুরুষের মুখ দেখা নিষেধ। তাতে অমঙ্গল হয় বলে প্রচলিত বিশ্বাস। বিবাহ অনুষ্ঠান

শুরু হলে পাত্র পাত্রী পক্ষের গুরুজনেরা (অবশ্যই স্বামী স্ত্রী বর্তমান থাকা চাই) বর ও কনের মাথায় জল ঢেলে আর্শীবাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে বর ও কনের পোষাক পরিবর্তন করে স্বাভাবিক পোষাক পরানো হয়। বর ও কনে অতিথি অভ্যাগতদের পানে খিলে দিয়ে প্রণাম করলে টাকা পয়সা দিয়ে আর্শীবাদ প্রদান করেন। সমাগত অতিথিরা। এই অনুষ্ঠানে অতিথিরা যার যার সমবয়সীদের নিয়ে একসঙ্গে খেতে বসে এবং খাওয়ার পর একসঙ্গে বসে বর ও কনেকে ডেকে আর্শীবাদ দেন।

জমাতিয়া সমাজে যুবক যুবতীদের মধ্যে প্রেম ঘটিত বিয়ে এখন ক্রমবর্দ্ধমান। এক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলের মা-বাবারা আলোচনাক্রমে বিবাহানুষ্ঠান করে থাকেন। জমাতিয়া সমাজে বিধবা এবং বিপত্নীক বিয়ে স্বীকৃত। তবে শর্ত হলো কোন বিধবার বিয়ে শুধুমাত্র বিপত্নীক পুরুষের সঙ্গেই হতে পারবে। অবিবাহিত যুবক বা যুবতীর সঙ্গে কোন বিধবা বা বিপত্নীকের বিয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং হদার বিচারে দণ্ডযোগ্য।

জমাতিয়া সমাজ রক্ষণশীল হলেও অসবর্ণ বিয়েতে বড় একটা বাধা নিষেধ নেই। জমাতিয়াদের সঙ্গে প্রতিবেশী দেববর্মা সমাজের যুবক যুবতীর বিয়ে চলছে বহুদিন ধরেই। অন্যান্য কক বরক ভাষী জনগোষ্ঠীরা জমাতিয়াদের প্রতিবেশী না হওয়ায় বিবাহাদির সম্পর্ক তেমন গড়ে উঠেনি। ইদানিং অবশ্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মজার ঘটনা হচ্ছে যে সব দেববর্মা যুবক জমাতিয়া সমাজে ঘর জামাই হয়ে ঘর করছে, তাদের অধিকাংশই জমাতিয়া উপাধি নিয়ে জমাতিয়া সমাজে মিশে যাচ্ছে। তারা শ্বশুর - শ্বাশুরীদেরই নিজেদের মা-বাবার পরিচয় দিয়ে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও তুলে নিচ্ছে।

তেমনি জমাতিয়া যুবকরা ও অন্য সমাজে ঘর জামাই হয়ে নিজেদের উপাধি ত্যাগ করে সেই সমাজের উপাধি নেওয়ার ঘটনা রয়েছে। তবে তুলনায় সেই সংখ্যা নগন্য।

আগে জমাতিয়াদের বিবাহ- অনুষ্ঠানে যাত্রাগানের অনুষ্ঠান হতো। বিয়ের অনুষ্ঠান চলতো ৩ দিন ধরে। এখন অনুষ্ঠান ১ দিন সীমাবদ্ধ হয়েছে। আর যাত্রাদল না থাকায় যাত্রানুষ্ঠান ও হওয়ার সুযোগ আর নেই।

নগেন্দ্র জমাতিয়া

জন্ম ১৯৪৭ সালে ২২ মে তারিখে উদয়পুর মহকুমার তোতাবাড়ী গ্রামে। গ্রামের পড়া শেষ করে হদ্রা স্কুলে কিছুকাল পাঠ গ্রহণ। উদয়পুর রমেশ স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং এম. বি. বি কলেজ থেকে স্নাতক। ১৯৬২ সালে টি এস এফের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক । উপজাতি যুবসমিতিতে রাজনীতিতে হাতে খড়ি। বর্তমানে আই. এন. পি. টি'র অন্যতম পদাধিকারী। অম্পিনগর কেন্দ্র থেকে পাঁচবার বিজয়ী হয়ে বিধানসভায় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৮৮ থেকে পাঁচ বছর রাজ্যের কৃষি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

ত্রিপুরা

ভূমিকা ঃ ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ ধারা মতে প্রত্যেক রাজ্যের তপশীল উপজাতি তালিকা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত হতে হয়। ত্রিপুরার তপশীল উপজাতি তালিকার স্বীকৃতিও ঘোষণা হয়েছিল The Constitution Order 1950 অনুসারে অর্থাৎ ভারতভুক্তির কয়েকমাস পরে। কাজেই তালিকা ছিল অসম্পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ হালাম-কুকী সম্প্রদায়ে ১৭টি উপসম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ককবরকভাষীদের পাঁচ ভাগ করা হয়েছে। ক্রমিক নং ১৮ তে ত্রিপুরা, ত্রিপুরী, তিপ্রা একসঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যা বিভ্রান্তিমূলক। এ কথা সত্য যে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল ককবরক ভাষাভাষী 'ত্রিপুরা' সংক্ষেপে 'ত্রিং' টাইটেল লিখতেন। মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যও ত্রিপুরা লিখতেন। কিন্তু ঠাকুর কর্তরা দেববর্মা বা দেববর্মণ লিখতেন। পরবর্তীকালে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য ' দেববর্মা' টাইটেল সকলের জন্য অবারিত রূপে দেন। হসম ভোজনের দিন, তিনি ঘোষণা করে পাঁচ টাকা রেজিস্ট্রেশানের মাধ্যমে ইচ্ছুক নাগরিক ' দেববর্মা' লিখতে পারবেন। তখন থেকেই ' দেববর্মা' লেখার প্রচলন। ফলে সদর উত্তরে, সদর দক্ষিণ, খোয়াই ও কমলপুরের 'ত্রিপুরা'রা সকলেই দেববর্মা লিখতে শুরু করেন। অপরপক্ষে উদয়পুর ও সোনামুড়ার ককবরক ভাষীরা ' নোয়াতিয়া' থেকে যান। বাদ থাকে ধর্মনগর, কৈলাশহর, বিলোনীয়া ও সাব্রুমের ত্রিপুরারা। সদর এবং খোয়াই-এর দেববর্মাদের মধ্যে আনক (মৎস্যজীবী), মুদি (ব্যবসায়ী), মাইপালা (ধান্য ব্যবসায়ী) ইত্যাদি উপশাখা ছিল। কমলপুরের দেববর্মারা এখনও দাসপা, বেরী, দোনা, তিন উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। তেমনি কৈলাশহর, ধর্মনগর, বিলোনীয়া, সাব্রুম-এর ত্রিপুরারা এখনো 'ত্রিপুরা' লিখছেন। 'ত্রিপুরা'রাও ১৭/১৮টি উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। যেমন - (১) আনক (২) নাইতং (৩) গাবেং (৪) দেংদাক (৫) গীরজীং (৬) গাইগ্রা (৭) ফাতুং (৮) খাকলু (৯) তংবাই (১০) মংবাই (১১) হার্বাং (১২) মাইচিং (১৩) হার্বাং (১৪) কেওয়া (১৫) খালাই ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য যে 'উচই'দের যেভাবে রিয়াংদের গোষ্ঠীবিশেষ ভাবা হয় তেমনি 'আসলং'রাও পুরাতন জমাতিয়া হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকেন। সাকা রূপিণী ও খামা রূপিণী আসলে অঞ্চলগত পরিচয়মাত্র। মুড়াসিং, ততারাম, কংদই আসলে নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। অতীতে নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, পুরানতিয়া, রিয়াং বলে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে আসামের দুই রাষ্ট্রদূত রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাসের দিনলিপিতে (ত্রিপুরা বুরুঞ্জী বা ত্রিপুরা দেশের কথায়) সবাই 'ত্রিপুরী' বলেই অভিহিত করা হয়েছে। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরার সমতল অংশ চাকলা রোশনাবাদ মোগলদের ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আরাকান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর, ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে মণিপুর রাজা পামহেইবা (পরবর্তীকালে গরীব নিরাজ নাম ধারণ) বরাক ভ্যালী এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লুসাইরা বিদ্রোহ ঘোষণা করায় স্বাধীন ত্রিপুরার আয়তন ১০ হাজার বর্গ কিলোমিটারে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু উল্লিখিত অঞ্চলে বসবাসকারী 'ত্রিপুরা'রা স্বদেশে ফিরে আসতে পারেননি। ত্রিপুরার রাজাও আর তাদের খোঁজ খবর নেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের কিছু কিছু স্বদেশে ফিরে এলে ' নোয়াতিয়া' পদবী জোটে যার অর্থ নবাগত।

কৈলাশচন্দ্র সিংহ নোয়াতিয়াদের আরাকান ও অন্যজাতির সংমিশ্রণে গঠিত জাতি বলে ভুল ব্যাখ্যা দেন, যা সত্যের অপলাপ মাত্র। মনে রাখতে হবে 'ত্রিপুরা' একটি ত্রিপুরার অতি প্রাচীন আদিবাসী ও বিশাল জাতি। ত্রিপুরা ছাড়াও ভারতের হিমালয় কূলে তরাই অঞ্চলে, হিমাচল প্রদেশের মানালী জেলায়, উত্তরাঞ্চলের পিথুরা গড়ে, জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিপুরা সম্প্রদায় বসবাস করছে। শুধু ভারতে নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন - বাংলাদেশ, মায়েনমার, থাইল্যাণ্ড, ভুটান ও নেপালেও অসংখ্য ত্রিপুরা আদিবাসী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তারা কেউই নোয়াতিয়া নয়, পুরানতিয়া বটে। গত রবিবারের (পইলা ফেব্রুয়ারীর) আনন্দ বাজার পত্রিকায় বিখ্যাত ও দামী চা উৎপন্নস্থল দার্জিলিং জেলার ডুয়ার্স মহকুমায় 'ত্রিপুরা বস্তি'র নাম দেখে আমি স্তম্ভিত। এটা প্রমাণ করে সেখানে নিশ্চই অতীতে ত্রিপুরার কোন এক মহারাজার যোগসূত্র ছিল। স্থানের নামই বলছে সেখানে নিশ্চই ত্রিপুরা আদিবাসী আছে। তা তদন্ত সাপেক্ষ।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর নামের ব্যুৎপত্তি

ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ নাম পেশাগত। শুধু 'নাইতং' নামটা কার্যকারণে ভিন্ন। ১৬১৬-২০ খ্রীষ্টাব্দে আরকান রাজা (বর্তমানে মায়ানমারের একটি প্রদেশ) এবং ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের মধ্যে অসম যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আরাকান রাজা হেরে যান। ত্রিপুরার সৈন্যদের সেনাপত্যে ছিলেন যুবরাজ রাজধর কিশোর। আরাকান রাজা বুদ্ধি করে বহুমূল্য রত্নখোচিত একটি মুকুট উপহার দেন তিন যুবরাজকে। সেই মুকুট নিয়ে পরবর্তীকালে তিন যুবরাজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তখন সুযোগ বুঝে আরাকান রাজা ত্রিপুরায় পুন আক্রমণ করলে তিন যুবরাজ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাচলং বনভূমিতে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেন। আরাকান রাজা শত শত সৈন্যকে যুদ্ধবন্দী করে নিয়ে যান। তাদের রাখা হয় নাইতং (নাই - অপদেবতা + তং = পাহাড়) মানে অপদেবতার পাহাড় নামক একটি স্থানে। বার্মীদের বিশ্বাস, নাইতং পাহাড়ে কেউ টিকে থাকতে পারে না, অপদেবতার গ্রাসে মৃত্যু হয়। কিন্তু ত্রিপুরী সৈন্যদের মৃত্যু গ্রাস করতে পারেনি। তারা সুযোগ বুঝে একদিন পালিয়ে এলেন শংখ নদী হয়ে বাঁশের ভেলা (বোট) চড়ে। শংখ নদী অত্যন্ত খরস্রোতা, কিছু দুর দুর রয়েছে জলপ্রপাত। সেই জলপ্রপাতে নিচে রয়েছে গভীর খাদ। পড়ে গেলে মৃত্যু অবধারিত। পালিয়ে আসার সময় সবাই সংগে করে চাউল এনেছিলেন, যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানেই বাঁশের বোটগুলি বেঁধে রান্না করে খেয়ে বিশ্রাম করতো, বেশ কয়েকদিন পরে, জলস্রোত অতি বেগবান হলে বয়স্করা বাঁশের বোট থামিয়ে জলস্রোতের তীব্রতার অনুসন্ধানে লেগে যায়। রান্নার সময় তারা সেই নদী থেকে চিংড়ি মাছ ধরে রান্না করে খেয়ে থাকে। রান্নার সময় যাদের চিংড়ি মাছ তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যায় তারা খাওয়া দাওয়া করে রওনা দেয় তাড়াতাড়ি দেশে ফেরার তাগিদে। আর যাদের চিংড়ি মাছ সহজে লাল হয় না তাদের খাওয়া দাওয়া করে রওনা হতে সময় লেগে যায়। এইজন্য দুই দলের নাম হল 'আথুক কাঁচাক' (লাল চিংড়ি) এবং আথুক কুফুর (সাদা চিংড়ি)। কিছু দুর গিয়েই আথুক কাঁচাকের দল জলপ্রপাতের গভীর খাদে পড়ে যায় তাতে অনেকেই মারা যায়। পরে পেছনে আসা আথুক কুফুরের দল খাদে পড়া জীবিতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। এই গৃহপ্রবেশ সৈনিকরাই 'নাইতং' নামে পরিচিত হয়।

ত্রিপুরা আদিবাসীদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগমন

ত্রিপুরার আদিবাসী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরী বা তৈপ্রা (তিপ্রা)রা ত্রিপুরার অতি প্রাচীন আদিবাসী। পাঁচ হাজারের বেশি পুরোনো ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস। ত্রিপুরায় হাজার হাজার বছর ধরে ১৮৪জন রাজা রাজত্ব করে গেছেন এর উত্তরসূরী এখনো বর্তমান। এমন উজ্জ্বল ও প্রাচীন ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল। রাজতন্ত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘকাল শাসন ব্যবস্থা টিকে ছিল জাপান তারপরেই ত্রিপুরার স্থান। Tripura is the second longest dinesty in the world. এর চাইতে প্রাচীন, মহান ও গর্বের বিষয় আর কি হতে পারে। ত্রিপুরার আদিবাসীরা আদিকাল থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যেই কোন না কোন অংশে বসবাস করত, কেউ বা প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন, কেউবা চাষবাসে। ভিন্ন দেশ থেকে আগমনের প্রশ্নই ওঠেনা।

আদমসুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত পরিবর্তন

১৯০১ সালের আদম সুমারী মতে এ রাজ্যের আদিবাসীদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ-

পুরান (কৌচাম) তিপ্রা/ তৈপ্রা	-	৩৮,৩০৩ জন।
রিয়াং		১৫,১১৫জন।
নোয়াতিয়া	-	১৪,৪৩৭জন।
জমাতিয়া	-	৪,৯১০জন।
দেশী ত্রিপুরা / তিপ্রা	-	৩,০১১জন।

১৯৩১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায়,

পুরান (কৌচাম) তিপ্রা / তৈপ্রা	-	৭৭,৫৮০জন
রিয়াং	-	২৭,৪০৫জন
নোয়াতিয়া	-	১১,০৯০জন
দেশী তিপ্রা	-	১,৪৯৪জন

২০০১ সালের আদমসুমারী মতে,

ত্রিপুরা, ত্রিপুরী, তিপ্রা/ তৈপ্রা	-	৭৭,৫৮০জন
রিয়াং	-	১,৬৫,১০৩জন
উচই	-	২,১০৩জন
জমাতিয়া	-	৭৪,৯৪৯জন
নোয়াতিয়া	-	৬,৬৫৫জন
দেশী ত্রিপুরা/তিপ্রা	-	অবলুপ্ত

মতামত ঃ জ্যামিতিক নিয়মে ৭০ বছরের ব্যবধানে নোয়াতিয়াদের জনসংখ্যা হওয়া উচিত ছিল ১৩৫,০২৫জন্। বরং কমে হয়েছে ৬,৬৫৫জন। অপরপক্ষে পুরান (কৌচাম) তিপ্রার সংখ্যা

হওয়া উচিত ছিল ৩,৮৭,৯০০জন, হয়েছে ৫,৪৩,৮৪৮জন। এর অর্থ পরিষ্কার। Assimilation to the mainstream সংবিধানে যেহেতু ত্রিপুরা, ত্রিপুরী, তিপ্রার একীকরণ হয়েছে সেজন্য সোনামুড়া ও উদয়পুরের কিছু সংখ্যক ছাড়া আর কেউই 'নোয়াতিয়া' লেখে না, এমনকি নোয়াতিয়াদের মধ্যে স্বীকৃত মুড়াসিং ও কংদেইরাও ত্রিপুরা বা ত্রিপুরী শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ত্রিপুরার আদিবাসী ত্রিপুরা বা ত্রিপুরীরা মঙ্গোলীয়।

ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা

ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা হলো 'ককবরক'। কক মানে কথা, বরক মানে জাতি। সঙ্গত কারণেই ত্রিপুরার অতি প্রাচীন জাতির ভাষা ককবরক নামেই পরিগণিত। ককবরক টিবেবটো বার্মন গ্রুপের ভাষা। Kokborok is a language of the Bodo. Sub-Group of the Tibeto-Burman Sub-family of the Indo-chinese languistic family, which are famous for lexical tone along with strong inflextional morphology. Kokborok is descriptive in character. বর্ণনামূলক চরিত্রই ককবরকের মাহাত্ব। এটাই ককবরককে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ভারতের সংবিধানে যদিও ১৯টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে। তারমধ্যে আটটি সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ককবরক। যেমন - ত্রিপুরা বা ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, কলই, রূপিণী, মুড়াসিং ও উচই। এই অটটি সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার উপগোষ্ঠীও রয়েছে। প্রত্যেকটি সম্প্রদায় ও উপগোষ্ঠীর মধ্যে অঞ্চলগত পার্থক্য আছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেরই নিজস্ব কতকগুলি শব্দ ও উচ্চারণগত বৈশিষ্ট রয়েছে। যাকে অমরা Dialect Varision বা Tonal Variasion বলে থাকি। সেই পার্থক্যগুলির উর্ধ্বে এসে ককবরকের বর্তমান যে লিখিতরূপ তা সবার গ্রহণযোগ্য।

বর্তমানে ত্রিপুরার ১২ লক্ষেরও বেশি আদিবাসীদের ভাষা ককবরক। ককবরক ভাষা অতি প্রাচীন। রাজন্য অমলেও রাজ পরিবারে একমাত্র ককবরক ভাষাই প্রচলন ছিল। রাজ অন্দর মহলের সংগে পার্বত্য জনজাতি বা প্রজাদের সংযোগ বা কথোপকথনের একমাত্র মাধ্যম ছিল ককবরক। রাজ দরবারে, প্রশাসনিক কার্যে সর্বদাই কিন্তু সবই ছিল মৌখিক। ককবরক ভাষাকে লিখিত রূপ দেওয়ার নেপথ্যে দুর্লভ নারান-এর অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীন রাজমালা ককবরক ভাষায় রচনা তার প্রথম প্রয়াস (১৭১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ)। চতুর্দশ দেবতার পূজার্চনা বিষয়ক মন্ত্রাদির পাণ্ডুলিপিও ছিল ককবরকে । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ত্রিপুরার রাজ পরিবারে বৈবাহিক সূত্রে অন্য জাতির প্রবেশ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষ্যে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমল হতে বহু বাঙালি রাজ-কর্মচারি প্রশাসনে নিযুক্তির ফলে রাজ কার্যে, দরবারে, রাজ মহলে বাংলা ভাষা চালু হতে থাকে, সেই থেকে ককবরক ভাষা তার গতি হারাতে থাকে পরবর্তীকালে বাংলা ভাষাকে রাজভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন রাজা। সেটা হয়তো ঐতিহাসিক ভুল ছিল, যার ফলশ্রুতিতে ককবরক ভাষা এখনো তার গতি খুঁজে পাচ্ছে না। পাচ্ছে না সঠিক আসন। ককবরক ভাষাভাষী আদিবাসীরা নিজেদের মাতৃভাষা দিয়ে পড়ার সুযোগ এখনো পেল না। এমনটা হতে পারে বুঝতে পেরেই হয়তো তৎকালীন রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রাধামোহন ঠাকুর এর বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি ককবরককে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে

'ককবরমা' নামে ককবরকের ব্যাকরণ বই প্রকাশ করেন। ককবরককে লিখিত রূপ ও এর ব্যাকরণগত বিন্যাসে রাধামোহন ঠাকুরকে ককবরকের পুরোধা হিসাবে গণ্য করা হয়। বিশিষ্ট আইনজীবী ও লেখক দৌলত আহম্মদও আরও একটি ককবরক ব্যাকরণ বই 'কক বরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ' নামে প্রকাশ করেন। তাছাড়া ঠাকুর সমরেন্দ্র দেববর্মাও 'য়েসিয়ার খাগরা' নামে একটি বিয়োগান্তক ককবরক লোকসংগীত রচনা করেন। এমনকি যুবরাজ রাধাকিশোর মাণিক্যও ককবরকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরে ককবরক চর্চাকে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সফল হলেন না।
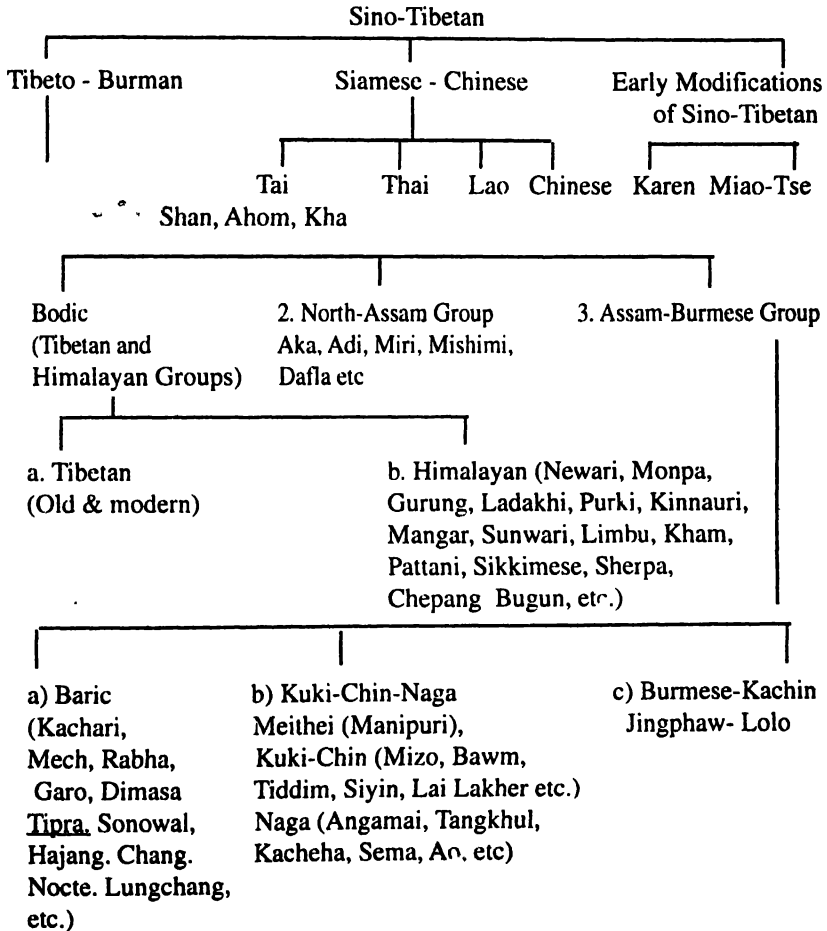
Figure 1.
The above genealogical table is based on Ajita Tripura
(prepared for M.phil.Degree.)

ককবরক ভাষা ও সাহিত্যে অধুনিকতার রূপকার হিসাবে প্রয়াত অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ককবরকের কর্ণধার হিসেবে ককবরক ভাষাভাষী আদিবাসীদের মধ্যে পূজনীয় ব্যক্তি। তাছাড়া ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুমুদ কুণ্ড চৌধুরীও ককবরক ভাষা চর্চায় আজীবন কাজ করে গেছেন এখনো করছেন। ককবরক ভাষার উন্নতিকল্পে উনার অবদান অনস্বীকার্য।

হ্যাঁ ককবরক ভাষা অতি প্রাচীন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু প্রাচীন নয়, সমৃদ্ধ, অর্থবহও বটে। বর্তমানে ককবরক ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও অন্যান্য ভাষার তুলনায় পিছিয়ে নেই। বহু গল্প (কেরেঙ কথমা /কারাকক), কবিতা (ককলব), গান (রৗচাপমুঙ), নাটক (থুঙনুক), প্রবাদ (কক বখিরি) এমনকি উপন্যাসও লেখা হচ্ছে প্রকাশও হচ্ছে। তাতে কোন খামতি নেই। গবেষকেরও অভাব নেই। শুধু অভাব সঠিক পরিকল্পনার ও পদক্ষেপের। শুধু সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই একটি ভাষার উন্নতি সম্ভব নয়, প্রয়োজন সেই ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান। তা থেকে বঞ্চিত ককবরক ভাষা ও ককবরক ভাষাভাষী সম্প্রদায়। কবি গুরুর কবিতার লাইন 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম' ত্রিপুরার ভূমিপুত্রদের কাছে অর্থহীন। কারণ তারা মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার থেকে বঞ্চিত। রাজন্য আমলের কথা বাদই দিলাম। গণতন্ত্রেও এমনটা হয়ে থাকে তা ভাবলে দু:খ হয় আবার ভাবি ককবরক নিয়ে প্রশাসন কেন জেগে ঘুমাচ্ছে, মূক ও বধিরের ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭৯ সালে ১৯ শে জানুয়ারী মাসে ককবরককে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তিন্ তিনটি কমিশনও গঠন করা হয়েছে। প্রথম ১৯৮৯ সালে S.C Tripura Commision. ১৯৯৬ সালে Bhasha Commision of Tripura বিশিষ্ট লেখক, ভাষাতত্ত্ববিদ কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরীর নেতৃত্বে আর সর্বশেষ কমিশনটি গঠিত হয় ২০০৫ সালে Tripura Upajati Bhasha Commision শ্রীযুক্ত ডা. পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে। ফল কি বেরোল ? অশ্বডিম্ব। ককবরক ভাষার সরকারী স্বীকৃতি এবার তিরিশ পূর্ণ করে একত্রিশে পা দিল। এখনো এই ভাষাকে ত্রিপুরার প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুযোগ করে দিতে পারল না। এ কী অবাক কাণ্ড। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে একটি জনগোষ্ঠীর স্বীকৃত ভাষাকে বিদ্যালয় স্তরে পৌছে দিতে তিরিশটি বছর কেটে গেল। তাতে কি বোঝা গেল, অজ্ঞতা নয় মানসিকতা ও সদিচ্ছার অভাব। কিন্তু প্রতি বছর ১৯শে জানুয়ারী ককবরক স্বীকৃতির দিন 'ককবরক ভাষা দিবস' পালন করতে ভুলেন না। জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নেতা, মন্ত্রীরা দীর্ঘ ভাষণ রাখেন, ঘোষণা করেন ককবরক উন্নতিকল্পে এই করা হয়েছে সেই করা হবে ইত্যাদি। এইসব বক্তব্য যে শুধুই মায়াকান্না তা ত্রিপুরা আদিবাসীদের বুঝার বাকি নেই। পরিকল্পনা খাতে, কাগজে কলমে ত্রিপুরার বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে ককবরক চালু আছে, যা বাস্তবের সঙ্গে কোন মিল নেই। বাস্তব চেহারা অন্য। হাতে গোণা কয়েকটি বিদ্যালয়ে চালু অছে, তাও সঠিক পরিকল্পনা ও সঠিক পদক্ষেপের অভাবে মুখ থুবরে পড়ে আছে। মানে ককবরক যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। তবে হ্যাঁ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Centre for Tribal languages' শাখা খুলে Kokborok diploma course ও Kokborok Spoken Course চালু করাতে আদিবাসীরা মাতৃভাষায়

পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাওয়া যে কি আত্মতুষ্টি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্থা তাই এ রাজ্যের আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করল। একটা সংস্থা যদি পারে তবে সেই রাজ্যের সরকার কেন পারছে না, সেটাই সবার প্রশ্ন। তবে একথা মনে রাখতে হবে। "Language is a weapon of the Nation. It is also weapon of Nationality building." "Every language is a temple in which the soul of these who speak it is enshrined."

ভাষা জাতির অস্ত্র। সেই অস্ত্র নিয়ে খেলা করলে একদিন সেই অস্ত্র খেলোয়াড়কে হানবে। তাই সময় থাকতে খেলা থেকে বিরত থাকায় মঙ্গল। এ রাজ্যের বৃহত্তর আদিবাসীদের (Son of the Soil) মাতৃভাষা ককবরক এর ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে রাজ্যের সরকার ও বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্বে বর্তায় না? অবশ্যই। আসুন না আমরা সকলে মিলে ককবরকের উত্তরণের পথ খুঁজি। সবার সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহমত পোষণ ও প্রয়াসেই তা সম্ভব। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে। তাদের স্বপ্ন পূরণ করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

তাকমুঙ - লুবমুঙ /তাঁত শিল্প

চরখা (চরকা)

তাঁত শিল্পে 'ত্রিপুরা' আদিবাসীরা অতি নিপুণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিপুরা মহিলারা জুমচাষ কালে নিজেরাই তুলা চাষ করে। তুলা ঘরে তোলার পর তা 'চরখী' দিয়ে বীজ ঝরিয়ে নেয়। সেই তুলাকে 'পকিনী'র সাহায্যে ধূনে (খুল লুগাঁই) তারপর 'চরখা' বা চরকার সাহায্যে সুতা তৈরী করে। তারপর নানা রকমের গাছের লতা-পাতা দিয়ে রঙ তৈরী করে সেই সুতা রঙ করে শুকিয়ে বাঁশের তৈরী গোল চাকার মতো (জাঙগ্রাঙমা) তে পেঁচিয়ে দিয়ে সেখান থেকে গোলা বানিয়ে নিয়ে সেই সূতা দিয়ে কাপড় বোনে। যদিও ত্রিপুরা আদিবাসীদের রিগনায় ও রিসায় রকমারী রঙের বালাই নেই। লাল, সাদা, কালো, হলুদ ও সবুজই যথেষ্ট। ত্রিপুরার আদিবাসীদের চিরাচরিত রিগনায় লাল রঙের। কালো পাড় ও লাল-কালো-এর বড় বড় চেক, মধ্যে হলুদ ও সবুজ রঙের ছোট ছোট ডোরা টান। রিসাও ঠিক তেমনি লাল বা কালো রঙের পাড় ও মধ্যে লাল কালো রঙ-এর ছোট ছোট ডোরা দুই দিকে আঁচলে হলুদ, সবুজ ও লাল দিয়ে রকমারী ফুল দিয়ে ডিজাইন করে থাকে ইহাকে 'বুমুল' বলে। শুধু মহিলাদের রিগনায়, রিসা নয়। গায়ের চাদর, পুরুষদের পরার কাপড় গামছার মতো ও গায়ে দেওয়ার (গুডাই-বরক /কামচুলাই বরক) ও বিছানার চাদর সেই সূতা দিয়ে হাতেই বোনা হতো। যাকে 'রিতারাক বরক' বলে। ত্রিপুরাদের মধ্যে অনেক পুরুষও কাপড় বুনে মহিলাদের
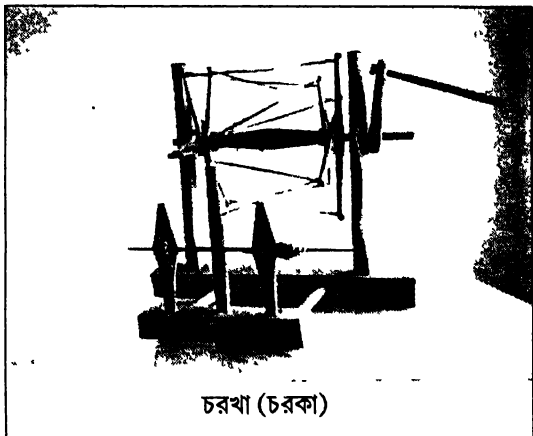
সাহায্য করে।

ত্রিপুরাজীক খুতুঙ দুলমানি (ত্রিপুরা রমণীর সুতো পেঁচানোর একটি দৃশ্য)

'ত্রিপুরা'দের চিরাচরিত রিগনায় লাল, কালো রঙের ডোরা মধ্যে লাল ও কালো রঙের সিমানায় সবুজ ও হলুদ রঙের যে ডোরা দেওয়া হয় তা 'ত্রিপুরা'র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন উপশাখা (Sub caste)- এর ভিন্ন, তাতেই বুঝা যায়, কে কোন উপগোষ্ঠীর। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। তবে বর্তমানে, লাল কালো রঙের পরিবর্তে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে ঠিকই কিন্তু সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে চিরাচরিত লাল কালো রঙের রিগনায় পরতে ভুলেন না। এটাই প্রথা।

যুগের পরিবর্তনে এখন ত্রিপুরার আদিবাসীদের আর কষ্ট করে সূতা তৈরী করে রঙ কবতে হয় না। বাজারে বিভিন্ন রঙের সূতা পাওয়া যায়। সেগুলি কিনেই ত্রিপুরা মহিলারা শুধু ত্রিপুরা কেন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মহিলারাও রকমারী ডিজাইন বা ফুল দিয়ে সুন্দর সুন্দর রিগনায়, রিসা, রিকুতু, বিতারাক বুনে সেই কোমর তাঁতে, যা মেশিনে তৈরী শাড়ির ডিজাইনকেও হার মানায়। ত্রিপুরা আদিবাসীদের যদি প্রশিক্ষণ দিয়ে উন্নত তাঁতের ব্যর্বস্থা করে দেওয়া যেত তবে ত্রিপুরার আদিবাসীদের তাঁত শিল্প যে কোথায় গিয়ে পৌছুত তা সহজেই অনুমেয়। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁতের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। তবুও আদিবাসীদের 'রিসা' বিখ্যাতের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে তা অত্যন্ত গর্বের। বর্তমানে প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই অতিথি বরণে, সম্মানার্থে ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে রিসা উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও উন্নত তাঁতের অভাবে কোমর তাঁতেই রিগনায়, রিসা, রিকুতু, রিতারাক বুনতে হয়। তাতে কষ্টও বেশি সময় সাপেক্ষও বটে। তাই তা অনেক দামে বিক্রি করতে হয়। তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই অসুবিধায় পড়তে হয়। লাভ-লোকসানের হিসাব, হিসাবের খাতায় থেকে যায়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে ত্রিপুরার আদিবাসীদের

ত্রিপুরা (নাইতঙ) রিনাই/রিগনাই
ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের চিরাচরিত পাছড়া

তাঁত শিল্পের উন্নতির মাধ্যমেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। বর্তমানে ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মহিলারাও আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন ডিজাইনের পাছড়া, রিসা ও বিভিন্ন ধরনের চাঁদর তৈরী করে ব্যবহার করছে। তা যদি বাজারজাত করার সুযোগ পেলে তাতে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হবে। এবং এক্ষেত্রে বাস্তবসম্মত প্রকল্প তৈরীর মাধ্যমে কিভাবে তাঁতশিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া দবকার। এভাবেই আদিবাসীদের জীবন-জীবিকার অগ্রগতি সম্ভব এবং ইহাই কাম্য।

রিসা (য়ঙসা বুমুল)
ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের চিরাচরিত ডিজাইন কবা বক্ষ আবরণী

রিসা (কেরাঙসা বুমুল)
ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের চিরাচরিত ডিজাইন করা বক্ষ আবরণী

বি: দ্র- ত্রিপুরা আদিবাসী মহিলারা বিসা অকারে ছোট ছোট টুকবায ডিজাইনগুলি বুনে বাখত ইহাকে 'রিখাতে' বলে। যে যত ডিজাইন (বুমুল) জানে সমাজে তাব কদব তত বেশি।

কায়মানি রাইদা/ বিবাহ প্রথা ঃ

ত্রিপুরাব আদিবাসী 'ত্রিপুরা' জনগোষ্ঠীদেব মতে বিবাহ মানে দু'টি আত্মাব পবিত্র বন্ধন। Marraige Ceremony is treated as a social festival. marraige is one of the most auspicious occassions in one's life and is performed in accordance with existing custom and habitations of the Tripura Society. সিকলা- সিকলী অর্থাৎ যুবক-যুবতী হলেই বিয়ে দেওয়া হয়। তাই 'ত্রিপুরা' সমাজে বাল্য বিবাহ নেই বললেই চলে। তবে এখনকার মতো মেয়ের বয়স ১৮ বছর বা ছেলেব বয়স ২১ বছর হতে হবে এমনটা আবশ্যক ছিল না। তা অজ্ঞতার কারণে। মেয়ে 'রিসা সবখা' মেয়ে বক্ষ অবরণী ব্যবহার করেছে বা রিসা সরখা/সাকনি খুম বারখা মানে ঋতুস্রাব হযেছে অর্থাৎ যুবতী হযেছে তখনই উপযুক্ত পাত্র পেলে সামগ্রিক প্রথা অনুযায়ী বিয়ে দেওয়া হয। ত্রিপুরার অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায 'ত্রিপুরা' সমাজেও অচাই দ্বারাই বিবাহ কার্য সম্পাদন হয। ১৯২০-২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য ব্রাহ্মণ দ্বারা হিন্দু মতে বিবাহ প্রথা চালু করেন। তারপর থেকে সমতলবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ দিয়েও বিবাহ হয়ে থাকে, তবে গ্রামাঞ্চলে এখনো প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী 'অচাই' দ্বারাই বিবাহ হয়ে থাকে। Inter-Caste maraiges are not permissible early Era in Tripura Society. ত্রিপুরার সমাজে কন্যা পণ ছিল, বর পণ ছিল না।
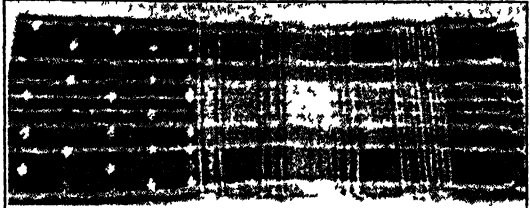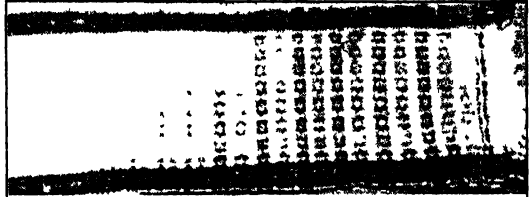
ত্রিপুরা হদাও কায়লাইমানি দাল-বিদাল /ত্রিপুরা সমাজে বিয়ের প্রকারভেদ ঃ

কক সৗঙগই (সৗঙগাই) কায়মানি / আলাপের মাধ্যমে বিয়ে ঃ

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর মধ্যে কক সৗঙগাই কায়মানি একটি অতি প্রাচীন প্রথা। ছেলের বাড়ির পক্ষ থেকে রায়বা/ জাসুর (ঘটক) পাঠিয়ে মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো হয়। মেয়ের পিতা-মাতার যদি ছেলে ও ছেলের পরিবার পছন্দ হয় তবে ঘটকের মারফত ছেলে পক্ষকে অমন্ত্রণ জানায়। সেই অনুযায়ী ছেলের পিতা-মাতা, দাদা-বৌদি (যদি থাকে) ও পাড়ার কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠদের নিয়ে মদ, পিঠা সংগে করে মেয়ের বাড়িতে যায়। দুই পক্ষের আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করা হয়। তবে পিতা-মাতা মেয়ের মতামতকেও গ্রাহ্য করেন। বিয়ের অনুষ্ঠান ছেলের বাড়িতে সম্পন্ন হয়।

খাললাই/ খারলাই কায়জাকলাইমানি / পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা ঃ

খাললাই এবা খারলাই কায়জাকমানি বা মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে বিয়ে করা ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজে সমাজ সিদ্ধ প্রথা নয়। মেনে নিতে হয় মাত্র। ছেলে মেয়ের মধ্যে ভালোবাসা হয়ে গেলে পিতা-মাতা যদি তাতে অপত্তি করে বা ছেলে মেয়ে যদি মনে করে তাদের সম্পর্ক অভিভাবকরা মেনে নেবে না তবেই ছেলে ও মেয়ে যুক্তি করে অন্যত্র পালিয়ে যায় বা নিজেরাই বিয়ে করে ফেলে। সেই ক্ষেত্রে 'হালক' বা সম্পর্ক যাচাই করা হয়। দুই পক্ষের "হালক চায়া" মানে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার মতো না হলে এই বিয়েকে সমাজ স্বীকৃতি দেয় না। এই বিয়েতে মেয়ে পক্ষ যদি 'দাফা' কন্যাপণ দাবি করে তবে ছেলে পক্ষ তা দিতে বাধ্য থাকে। 'হালক চাখা' মানে সম্পর্ক মেনে নেওয়ার মত হলে দুই পক্ষের অভিভাবকরা আলোচনা করে সামাজিক প্রথা অনুসারে বিয়ে দিয়ে দেয়। তবে এক্ষেত্রে ছেলের পক্ষই মেয়ের বাড়িতে খবর পাঠাতে বাধ্য।

চামিরি কাগই/চামারি কায়াই কায়জাকমানি / ঘর জামাই উঠে বিয়ে করা ঃ

ত্রিপুরা সমাজে চামিরি কাগই কায়জাকমানি এবা ঘর জামাইরূপে বিবাহ অতি প্রাচীন প্রথা, ছেলে মেয়ে উপযুক্ত বা সিকলা-সিকলী হলে ছেলের পক্ষ পিতা-মাতা যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে তবে ছেলের পক্ষ মেয়ের বাড়িতে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। দু'পক্ষই রাজী হলে, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের দিন স্থির করে বিয়ে দিয়ে দেয়। চামারি কায়াই কাগই কাইজাকমানি এবা ঘর জামাই-এর ক্ষেত্রে বিয়ের অনুষ্ঠান মেয়ের বাড়িতেই সম্পন্ন হয় এবং বিয়ের পরে ছেলে মেয়ের বাড়িতেই থাকে। সেটা এক, দুই বা তিন বছরের বা সারা জীবনের জন্যও হতে পারে, একমাত্র মেয়ের ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ এমনটা হয়ে থাকে। শ্বশুর মেয়ে ও মেয়ের জামাইকে স্থাবর ও অস্থাবর কিছু সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে দেয়।

এই প্রথাকে চামারি অমর বলে। ত্রিপুরা সমাজে ঘর জামাই-এর রীতি আছে কিন্তু জামাই খাটার প্রথা নেই।

কায়মানি রাইদারক /বিবাহের বিভিন্ন নিয়ম বা বিধি ঃ

খবর রমানি রাইদা / নিমন্ত্রণ বিধি ঃ

ত্রিপুরা আদিবাসীদের বিয়ের নিমন্ত্রণ বিধি খুবই অর্থবহ তাৎপর্যপূর্ণ। আদি যুগে সংসারের মূল্যবান বস্তু ধান ও তূলা। সেটাকেই পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণে কাজে ব্যবহার। মায়

বাই খুল (ধান ও তূলা) কলা পাতায় মুড়ে আমন্ত্রণ করত। অবশ্য কুঁউাই-ফাতুই (পান সুপারী) ও ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার সংগে তাল মিলিয়ে রকমারী পত্রের মাধ্যমে নিমন্ত্রণ করার প্রথা চালু হয়ে গেছে। তবে Old is gold প্রাচীন প্রথাই অপেক্ষাকৃত তাৎপর্যপূর্ণ। তা ধরে রাখা আবশ্যক।

কায়লাইমানি পানা (পাণ্ডা) / বিয়ের অনুষ্ঠান ঃ

ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজে অচাই (পুরোহিত) দ্বারা কাথার (কীথার) মাতায় বা কাথার পূজা দিতে হয়। উাথপ (কারুকার্য করা দুটি বাঁশকে ক্রস করে মাটিতে পুঁতে দেয়) এমন দুটি উাঁথপ একটি বরের নামে ও একটি কনের নামে বানিয়ে নেয় পূজা দেওয়ার জন্য। দুই খানেই দুটি বাঁশের চোঙায় পবিত্র জল রাখা হয়, সেখানে দু'জনের নামে দুটি মোবগ কেটে বর কনের দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি কামনা করে অচাই মাতাই রগঅ (মুঁতাই বি-অ) পূজা দেয়। পূজা শেষে সেখানে বর কনে নমস্কার করে, চোঙার পবিত্র জল তাদের মাথায় ছিটিয়ে অচাই আশীর্বাদ করে। তারপর উাঁথপে ছোট চারকোনা করে কেটে বাখা কলা পাতা হাতে নিয়ে অচাই মন্ত্র পাঠ করে পাতা দুটিকে হাত ঘুরিয়ে উাঁথপেব সামনে ফেলে বর কনের ভাগ্য বিচার করে। যদি পাতা দুটির একটি সোজা পিঠ ও অপরটি উলটো পিঠ হয়ে পড়ে তবে শুভ। তা না হলে অশুভ বলে বিবেচিত হয়। একবারে না হলে অনুরূপভাবে তিনবার চেষ্টা করে।

উআথপ (উাথপ) দিয়ে অজিতা ত্রিপুরা ও রবীন্দ্র দেববর্মার বিবাহ অনুষ্টানে পুজো দিচ্ছেন পুরোহিত অলীন্দ্রলাল ত্রিপুরা (কাইফুরু রিমানি মীতাই)

অপরদিকে উাঁথপে যে মোরগ দুটি কেটে পূজা দেয়া হয় তার নাড়ি-ভুরিগুলি বের করে দেখে তাতে যদি কোন কাটা না থাকে ও শক্ত যেমন আছে তেমন থাকে তাহলে তা নবদম্পত্তির জীবনে শুভদিক বলে বিবেচিত হয়, তা না হলে অশুভ বলে মনে করা হয়। ভাগ্য বিচারের এই প্রথাকে ত্রিপুরা সমাজে 'সেমানায়মানি' বলে। উাঁথপ পূজা শেষে নব দম্পতির গৃহ প্রবেশ। গৃহ প্রবেশের সময় বৌদিরা ও শ্যালক-শ্যালিকারা বা ছেলের বাড়িতে বিয়ে হলে দেওররা দরজায় খুদুঙ/ খুতুঙ অলুউা, (সূতির সূতা) বেঁধে রেখে তাদের আটকায় ও উপহার দাবী করে। দাবী পূরণ না হওয়া অব্দি তারা

নানান কথা বলে জোক করে হৈ চৈ করতে থাকে। তাদের দাবী পূরণ হয়ে গেলে শ্যালক-শ্যালিকা বা দেওররা নবদম্পতিকে পা ছুঁয়ে নমস্কার করে। নব দম্পতিও দরজায় অপেক্ষারত বৌদিকে বা বড়দের নমস্কার করে গৃহে প্রবেশ করে।

বিয়ের বেদী

ম্লাকসনয় মায় চালাইমানি

উাঁথপ মাতায়/ উাঁথপ পূজা শেষ হওয়ার পর বর কনেকে একই থালায় ভাত খেতে দেওয়া হয়। সেই ভাতের থালায় সাজানো থাকে রকমারী রান্না ও 'মায় ককে' (ভাতের মোঠা) দু'জনের জন্য দুটি ও (তক য়াফঙ) দুটি মুরগীর Leg piece ও মদ দুই কাপ। প্রথমে ভাতের মোঠা ও মুরগীর বদল করে তারপর মদের কাপ/গ্লাস (বাঁশের চৌঙা) তারপর খাওয়া শুরু হয়। খাওয়ার পর বর কনে নিমন্ত্রিত অতিথিদের (গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের) প্রত্যেকেরই পা ছুয়ে নমস্কার করে এক গ্লাস করে সবার হাতে মদের গ্লাস তুলে দেয়। তখন বয়োজ্যেষ্ঠ অতিথিরা নবদম্পতিকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করে ও টাকা পয়সা বা যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী উপহার প্রদান করে, আশীর্বাদ করে এই পর্ব শেষ হলেই সবার খাওয়া শুরু হয়। ভাত খাওয়ার আসরেও বর কনেও পরিবেশন করে থাকে। এভাবেই বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানকে ত্রিপুরা আদিবাসীরা 'পানা চারমানি' বলে। ত্রিপুরা সমাজে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে মাসে বিয়ে নিষিদ্ধ।
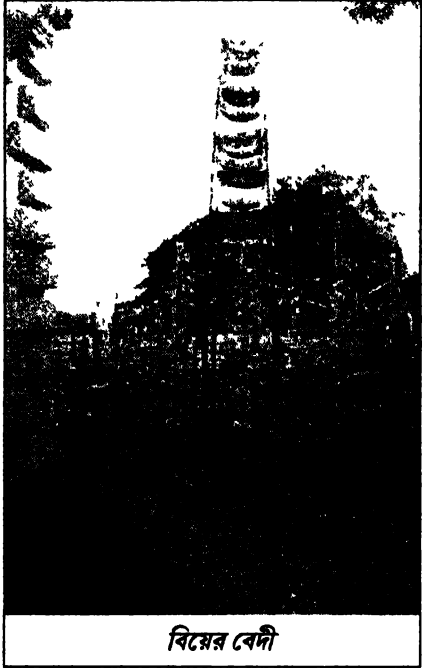
বিয়ের দিন ছেলের বাড়িতে ও মেয়ের বাড়িতে কলাগাছ দরজার দু'দিকে দুটো লাগানো হয়। বিয়েতে বরের সব কাজে সহযোগিতার জন্য একজন যুবক ছেলে ও কনের সংগে একজন যুবতী মেয়ে সর্বক্ষণের জন্য সংগে থাকে। তাদের 'গইন্যা' বলা হয়। গইন্যা কে হবে তা আগেই নির্বাচন করে রাখা হয়। তারা বিয়ের দিন সকালে উঠে স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পরে পার্শ্ববর্তী নদী বা ছড়া থেকে কলসী ভরে জল তুলে দরজায় কলা গাছের পাশে দু'দিকে দু'টো রেখে দেয়। বিয়ের সময়ও গইন্যা বর-কনের সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে বর কনেকে সহযোগিতা করে।

কাকলাইমানি রাইদা/ বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা ঃ

বিবাহ বিচ্ছেদ ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে অতীতেও ছিল বর্তমানে চালু আছে, তবে কম। ত্রিপুরা সমাজে বিবাহ পবিত্র বন্ধন হিসাবে গণ্য করা হয়। স্বামী-স্ত্রী মানেই চির সাথী। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অমিল হলে, (maladjustment) স্বামী যদি স্ত্রীর উপর শারীরিক ও

মানসিক অত্যাচার করে (Physical and mental torture) স্বামী বা স্ত্রীর যদি অন্য নারী বা পুরুষের সংগে অবৈধ সম্পর্ক থাকে (illicite relation) স্বামী বা স্ত্রী যদি দুরারোগ্য ব্যাধি থাকে (incurable disease) স্বামী বা স্ত্রী যদি মানসিক ভারসাম্যহীন বা পাগল হয় (Mentaly retarted) ও সন্তান সন্ততী জন্মদানে অপারগ (Barren) হয় তবেই স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ বিচ্ছেদের জন্য গ্রামের রোয়াজা/ পোমাং এর কাছে আবেদন করতে পারে।

Both the husband and the wife are allowed to seek divorce among the Tripura's Community. But it is not welcome at all widower required to remarraige after one year of the death of the spouce. স্বামী বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে আবেদন পেলে রোয়াজা বা পোমাং গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ সহ দুই পক্ষকেই ডেকে সামাজিক বিচার করে। যদি উল্লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় তবে বিচ্ছেদ করে দেয় লিখিতভাবে। বিচ্ছেদপত্রে সাক্ষীসহ দুই পক্ষের স্বাক্ষর নিয়ে পরে রোয়াজা বা পোমাঙ স্বাক্ষর করে বিচ্ছেদপত্র আবেদনকারীর হাতে তুলে দেয়। ইহাই ত্রিপুরা সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা। বিচ্ছেদ পত্রকে 'সুরানী' বলে।

ত্রিপুরা বসগুনি বীচামাই বাই বীচামাইজীক
(ত্রিপুরা সমাজের বৈবাহিক ও বৈবাহিকা)

চারিমানি-খানিমানি /খরপোষ :

অতীতে ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে খরপোষের (maintenance)-এর গুরুত্ব এতটা ছিল না। কারণ 'ঘর জামাই' বিবাহ প্রথায় মেয়েরা পিতৃগৃহেই থেকে যেত এবং পিতৃসম্পত্তির অর্দ্ধেক ভোগ করত। তাছাড়া জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করত তাই স্থাবর সম্পত্তিও কম ছিল।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর অবশ্যই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা হয়ে থাকে। যুক্তভাবে অর্জিত সম্পত্তি স্ত্রী পিতামাতা কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তি, বিয়েতে আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাপ্ত সম্পত্তি ইত্যাদির বন্টন হতো।

নক ফিরকমানি / দ্বিতীয় বা বহু বিবাহ প্রথা :

ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজে দ্বিতীয় বা বহু বিবাহ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রথম স্ত্রীর জীবন দশায় স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারে না। স্ত্রীও নয়। তা যদি হয়ে থাকে তবে সামাজিক বিচারে তাকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হয়।

Tripura Community is a monogamy Society. Bigamy and polygamy is

strictly prohibited or restricted in Tripura Society.

যদিও অতীতে গ্রামের ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা দ্বিতীয় বা বহু বিবাহ করে থাকেন। তা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার বা ক্ষমতাবলে করে থাকে। ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হওয়ায় গ্রামের নিরীহ জন-সাধারণ বিরোধীতা করতে সাহস করত না। তাই বলে তা সমাজের প্রথা হতে পারে না। দ্বিতীয় বা বহু বিবাহ ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই । আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভবিষ্যতেও তা হতে দেবে না।

ত্রিপুরা বসংনি হিক-সায় (ত্রিপুরা দম্পতী)

রানদি এবা রানদারকনি কায়লাইমুঙ/ বিধবা বিবাহ (Widow & wodower marriage) সিন্দুর ফুলমানি ঃ

ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বা বিচ্ছেদ হয়েছে, দুটোকেই রানদি (Female) বা রানদা (Male) 'সক কচ' বলে যা বাংলায় বিধবা বা বিপত্নী বলা হয়।

ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল এখনও আছে। Widow can select her life partner again. But divorcee lady is restricted to select a bachelor husband.

রানদি বা রানদা- দের বিবাহ উাথপ দিয়ে হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে অভিভাবকদের সম্মতিই যথেষ্ট। তাদের ক্ষেত্রে 'গইন্যা'র প্রয়োজন হয় না।

বিধবা বিবাহের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত: কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে বা মানসিক অমিলের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে মহিলাটি সমাজে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। সমাজের দুষ্ট চরিত্র ব্যক্তিদের যন্ত্রণা ও অশালীন আচরণ তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিতে পারে ও বিপথে পরিচালিত হতে পারে, তাতে সমাজে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হতে পারে তাই বিবাহ দানের মাধ্যমে তার জীবনে সুখ, শান্তি ও নিরাপদের ব্যবস্থা করে দেওয়া সমাজেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। এক্ষেত্রে বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আচাইমা/জন্ম ঃ

শিশুর জন্ম প্রত্যেক পরিবারে ও সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর জন্ম মাতা-পিতার জীবনে

আশার আলো জ্বালায়, নবজাত শিশুও পৃথিবীতে পা রাখে সাফল্য জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। তাই সমাজের সকলের কাছেই শিশুর জন্ম বিশেষ আনন্দের। আনন্দের দিন বটে, তবে সেই দিন ত্রিপুরা সমাজে বিশেষ অনুষ্ঠান বা পূজার্চনা হয় না। শুধু প্রার্থনা করা হয় নবজাত শিশুর সুস্বাস্থ্যের ও দীর্ঘায়ুর। ত্রিপুরা সমাজে শিশুর প্রসব কার্যে গুমাজীক/ লুমাজীক সহায়তা করে। শিশুর জন্মের পরে দিনক্ষণ অনুযায়ী নামাকরণ করে থাকে। যতদিন আনুষ্ঠানিকভাবে নামাকরণ না হয় ততদিন সেই নামই থাকে বা সেই নামই স্থায়ী হতে পারে। হ্যাঁ কাজের শেষে গুমাজীক/ লুমাজীককে অবশ্যই মদ্য পান করানো হয়, খাওয়ানোও হয়। সেটাই প্রথা।

চল্লিশ/পঞ্চাশ বছর অগে ছেলে জন্মালে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে স্বাগত জানানোর রীতি ছিল। এখন অবলুপ্তের পথে।

আবুর সুমানি / বর্ত / সূর্যদর্শন ঃ

ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে ''আবুর সুমানি'' বা বর্ত নবজাত শিশু উপলক্ষে প্রথম সামাজিক অনুষ্ঠান। জন্মের সাত বা একুশ দিন পর পর সামাজিক প্রথা অনুযায়ী 'অচাই' দ্বারা নবজাত শিশুকে শোধন করা হয়। শোধনে অবশ্যই 'কুচাই পানি/ কুচাই বুতীয়' (হলুদ, সুঙগাঁই বাখা (বাঁখা), কুচাই, বাথায় গুঁড়া) করে পবিত্র জল মিশিয়ে বাঁশের চৌঙগায় ভরে সেই 'কুচাই বুতাই' ঘরের ভেতরে ও চারদিকে ছিটিয়েই শুদ্ধ করা হয়। 'আবুর সুমানি' দিন লুমাজীক/ গুমাজীককে আমন্ত্রণ করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে লুমাজীক/ গুমাজীক / গুমাজীক অর্ধেক মুরগি নবজাত শিশুর মাতার হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করে ''নিনি ধন সম্পত্তি দে মানখা?'' তখন মা উত্তরে বলবে, মানখা। নিনি বাসা (বাঁসা) গাম (কাহাম) কুরুঙ দে? তখন মা উত্তর দেয় আও। এটা এই অনুষ্ঠানের বিশেষ দিক। তারপর মোরগের বাকী অর্ধেক অংশটা শিশুর মা লুমাজীক/ গুমাজীক এর হাতে তুলে দেয়। এটাই ত্রিপুরা সমাজের রীতি। সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের পর আমন্ত্রিত অতিথিরা ধান, দুর্বা ও তুলা মাথায় দিয়ে (ফিম) নবজাত শিশুকে আশীর্বাদ করে।

অমথায় কাকমানি (কাঁরাইমানি) / নাভিছুটা বা পরা ঃ

নবজাত শিশুর নাভি যেদিন পড়ে সেইদিন কুচাই পানি বা কুচাই বাঁতাই শিশু ও শিশুর মার গায়ে ও ঘরের চারিদিকে ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে। এছাড়া সেই দিন বিশেষ কোন অনুষ্ঠান থাকে না।

খা লামানি (নামানি) মাতাই (মাঁতাই) / মান ভাঙ্গার পূজা ঃ

ত্রিপুরা সমাজে 'খা-লামানি' মাঁতাই একটি বিশেষ পূজা বা অনুষ্ঠান। যা অন্যান্য সম্প্রদায়ে বিরল। কোন শিশু বা নাবালক বা নাবালিকা যদি কথায় কথায় অভিমান করে, খেতে না চায় অল্পেতে কাঁদে বা অভিমান করে তখন মাতা-পিতা বা অভিভাবকেরা মনে হয় যে বাচ্চা অভিমান করছে 'খা কইখা' তখন সেই শিশুর অভিমান ভাঙ্গার উদ্দেশে অচাই দিয়ে খা-লগ' (পূজা করে। অচাই উাথপ-এ শূকর বা মোরগ বলি দিয়ে বাচ্চা শিশুর কোলে দিয়ে মান ভাঙ্গার অনুষ্ঠান করে থাকে। একবার পূজা দিয়েও যদি শিশুর আচরণ একই থাকে তখন পরে আবার অভিভাবকরা আবার সেই পূজা করে। এভাবে শিশুর মান ভাঙ্গার পূজা কোন কোন পরিবারে তিনবারও দিয়ে থাকে। তবে এই পূজা করে থাকে। বা মাঁতাই বিশেষ করে ধনীদের ক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়।

থীয়মানি য়াগুলনি রাইদা/ মরণোত্তর সামাজিক প্রথা ঃ

জন্ম ও মৃত্যু শব্দ দুটি একে অপরের পরিপূরক। জন্ম মানেই মৃত্যু অনিবার্য। ইহাই শাশ্বত সত্য। এবং ইহাই পৃথিবীর নিয়ম। কিন্তু কোন মনুষ্য জাতি এই সত্যকে সাদরে গ্রহণ করতে নারাজ কেন না মানুষ মাত্রেই মায়াজালে আবদ্ধ। কিন্তু না চাইলেও মানতে বাধ্য পৃথিবীর নিয়ম। তাই নিজের একান্ত আপনজন, আত্মীয় স্বজন মারা গেলে প্রথা অনুযায়ী রীতি নীতি মেনে বিদায় দিয়ে থাকে অশ্রু নয়নে। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে চির বিদায় দিতে বাধ্য। এই অংশটা লিখতে গিয়ে বিখ্যাত কবির কবিতার লাইনটি বার বার মনে পড়ছে-

"মরিতে চাহি না অমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই...."

চির বিদায়ের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রীতি নীতি আছে। ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজেও মরণোত্তর নিজস্ব সামাজিক রীতি নীতি আছে।

ত্রিপুরা আদিবাসীরা পরলোকে বিশ্বাসী। মৃত্যু মানে আত্মার (ফলা) দেহ বদল। ফলা অবিনশ্বর। তাই হয়তো মৃত্যুর পর সামাজিক রীতি-নীতির প্রতিপালন করে থাকে আত্মার শান্তি কামনায়। ত্রিপুরা আদিবাসীর কোন ব্যক্তি মারা গেলে মৃত ব্যক্তিকে সযত্নে নতুন সাবান দিয়ে গরম জলে স্নান করিয়ে নতুন জামা কাপড় (রিগনায়, রিকতু, ধুতিবরক) পরিয়ে সাজিয়ে চোখে তুলা বা তুলসী পাতা দিয়ে চোখ বন্ধ করে দেয়, তারপর ঘরের উঠানে কারুকার্য করা বাঁশের তৈরী মাচাতে পূর্ব দিকে মাথা রেখে শোয়ানো হয় (মরদেহ শোয়ানোর জন্য বাঁশের তৈরী মাচাকে 'খাইন নক' বলে) তারপর একটি. মোরগ কেটে রান্না করে (পেউগই) ভাত সহ মরদেহের পায়ের দিকে ভোগ বা বাড়ান দেওয়া হয়। তা থেকে অর্ধেক রেখে দেওয়া হয় শ্মশানঘাটে (সিমালুঙ) ভোগ দেওয়ার জন্য।

ত্রিপুরা সমাজে কেউ মারা গেলে বিশেষ শোকাহত স্বরে ঢাক বাজানো হয়, সেই ঢাকের শব্দ মৃত্যুর খবর বহন করে বা প্রেরণ করে। আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেওয়া ছাড়াও ঢাকের শব্দ শুনেও মৃতের বাড়িতে লোক জমায়েত হতে থাকে। যতক্ষণ না পর্যন্ত সব আত্মীয় স্বজন না আসে ততক্ষণ মরদেহের পাশে রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করে সারা রাত কাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালে সবাই মিলে ঢাক বাজিয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। শোকাহত স্বরের ঢাক আর মেয়ে ছেলে বউ ও আত্মীয়-স্বজনরা 'খাইননক' কাড়াকাড়ি করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই শ্মশান যাত্রা যে কি মর্মান্তিক দৃশ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্মশান যাত্রার আগে মরদেহ শোয়ানো 'খাইননক' কাঁধে নিয়ে উঠানে তিন পাক ঘুরে তারপর যাত্রা করে। 'খাইননক' বহন করে ছেলেরা ও মেয়ের জামাইরা যদি মেয়ের জামাই না থাকে তবে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কেউ। সামনে থাকে মেয়ের জামাই দু'জন ও পেছনে থাকে ছেলেদ্বয়। ত্রিপুরা সমাজে মেয়েরাও শ্মশানে যায়। মরদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর মরদেহকে দাহের নির্দিষ্ট স্থানে রেখে মাথার দিকে দুটি বাঁশ কারুকার্য করে (সুরুয়ই /সিরিগাই/চানদউা মিছরি) ক্রশ করে মানে উাথপ বানিয়ে মাটিতে পুঁতে, তাতে একটি বাঁশের চোঙ-এ পবিত্র জল ভরে রেখে দেয়। শ্মশানে বানানো উাথপকে 'সিমুতুমু' বলে। সেই উাথপ ও মরদেহ শুইয়ে রাখা 'মাচা' বা 'মাইচাম' যাকে বলা হয়

'চুথুঙনক' এর চারিদিকে খুদুঙ অলুউা (সুতির সূতা) দিয়ে সাত পাক বেঁধে দেওয়া হয় সবই অচাই করে থাকে। মুখাগ্নির আগে ছেলে, মেয়ে, মেয়ের জামাই, বধু, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনরা সাত পাকে বাঁধা 'চুথুঙনক' ও 'সিমুতুম' ধরে শপথ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে যেন কোনদিন বিচ্ছেদ না হয় শপথের পর চৌঙায় রাখা পবিত্র জল উাথপ অর্থাৎ 'সিমুতুম' ঢেলে দেয়, তারপর মুখাগ্নি করে। মুখাগ্নির আগে সাত পাক ঘোরে। মুখাগ্নি করে বড় ছেলে নতুবা সবচেয়ে ছোট ছেলে, ছেলে না থাকলে মেয়ের জামাই আর যদি ছেলে মেয়ে না থাকে তাহলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। মুখাগ্নির আগে মরদেহ শোয়ানো 'খাইন নক' থেকে এক টুকরা বাঁশ কেটে রেখে চৌঙ বানানো হয় অস্থি রাখার জন্য। ও মরদেহের গায়ের কাপড়ের এক টুকরা রাখা হয় অস্থি চৌঙায় ভরার পরে চৌঙগার মুখ বন্ধ করার জন্য। আর খাইননক থেকেই একটি বাঁশ রেখে দেওয়া হয়। বাম হাতে জ্বলন্ত মরদেহের মাথায় সেই বাঁশ দিয়ে ঘা দিয়ে সামান্য 'বমতম' (মগজ) নিয়ে ছেলে ও অচাই গিয়ে পার্শ্ববর্তী নদী বা ছড়াতে ভাসিয়ে দেয়। ছেলে সেখানেই স্নান করে শ্মশানে ফিরে গিয়ে বাড়িতে মরদেহে ভোগ দেওয়ার পর যে অর্ধেক অংশ রাখা ছিল তা শ্মশানে ভোগ দিয়ে বাড়ি ফেরে। শ্মশানে ভোগ বা বাড়ান দেওয়াকে 'খঙ লল্' বলে। সবাই শ্মশান থেকে ফিরে স্নান করে বাইরে রাখা পবিত্র জল তুলসীপাতা দিয়ে ছিটিয়ে আগুন স্পর্শ করে ঘরে প্রবেশ করে।

দাহের পরদিন সকালে ছেলে ও বয়োজ্যেষ্ঠরা মিলে শ্মশানে গিয়ে নতুন কলসীতে জল ভরে শ্মশানে (সিমালুঙ-এ) সেই জল ঢেলে অস্থি তুলে 'খাইননক' থেকে দাহের দিন কেটে রাখা চৌঙগায় ভরে মরদেহের শরীর থেকে বাখা কাপড়ের টুকরা দিয়ে মুখ বন্ধ করে নিয়ে আসে ও ছাইগুলি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে আসে। চোঙাগায় ভরা অস্থি বাড়িতে এনে বাড়ির কাছাকাছি যে কোন গাছে উল্টোভাবে ঝুলিয়ে রাখে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না হওয়া অবধি। ত্রিপুরা সমাজে সদ্যজাত শিশু বা মুখে ভাত দেওয়া হয়নি এমন শিশুদের দাহ করা হয় না কবর (ফব্) দেওয়া হয় কিংবা বাঁশের তৈরী বিশেষ খাঁচাতে করে জঙ্গলে গাছের আগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দাহের সময় মরদেহের উপর (কাঠ) লাকড়ি দেওয়া ত্রিপুরা সমাজে এক বিশেষত্ব আছে। যদি পুরুষ মারা যায় তবে মরদেহের উপর ছয় পল্লা (রুঙ-দক) করে দিতে হয় আর যদি মহিলা মারা যায় তবে তার উপর লাকড়ি দিতে হয় সাত পল্লা (রুঙ স্নি)। সমাজের সব রীতি-নীতিই যে জীবন জীবিকার উপর নির্ভরশীল তারই প্রমাণ। মহিলারা রান্নার কাজের জন্য লাকড়ি কুড়িয়ে পুরো বছরের জন্য জমা করে রাখে। তাই মহিলাদের লাকড়ি লোভী হিসাবে অভিহিত, তাই মহিলাদের ক্ষেত্রে এই প্রথা। ত্রিপুরা সমাজে দাহ বেশিরভাগ নদীর ধারেই করা হয়।

থীয়ফুরু কাপমানি/ বিয়োগান্তক ককবরক লোকসংগীত / elegy :

য়াকুঙ য়ানি বঅ মুলাই কঙ
য়াইসা য়ানি বঅ সবায় থায়
বুউা য়ানি বঅ শসা কল (বকল)
বুকুঙ য়ানি বঅ সিপিউ বার
মকল য়ানি বঅ মাঁইউান জৗয়
খুনজুর য়ানি বঅ বাইকাঙবার

ববই (বাই) তনমানি তয় (তীয়) সারি
তামা মায়ানঅ নীঙ সারি
তামা পেরেম (প্রেম) নঅ নীঙ সারি
গাতি খামানি থায় পলঅ
বরক অঙমানি (ঔঙমানি) বিফলঅ
উানজীয় দোগান (দোকান) নি রি সারি
তামা মায়া নঅ নীঙ সারি
তামা পেরেম নঅ নীঙ সারি
খুমুই থায়চুয়ার লিলা-লাঙ
চীঙবা তুরুক খা লা লা-লাঙ
তামা মায়া নঅ নীঙ সারি
তামা পেরেম নঅ নীঙ সারি
সীয়নাই কাইথরসা সীয় পাল'গঅ
সীথমুঙ সীয় দেরাজাক মানি সে
বগনায় লালিমা (মাতাই) বগফুগঅ
বগমুঙ দেরাজাকমানি সে
সীয়মুঙ দেরাজাকমানি সে ....

অনুবাদ ঃ পা গুলি যেন মূলার মতো, আঙ্গুলগুলি যেন সীমের লতার মত্তো, দাঁতগুলি যেন শশার দানার মতো, নাকটা যেন তিলের ফুলের মতো, চোঁখ যেন সুন্দর ফলের মতো, কান ও বাইকাঙ (বিশেষ সব্জী যা সুন্দর) ফুলের মতো, দিদি জল হিঁচে গেল, কেন তুমিও মায়া ছেড়ে গেলে, কেন তুমি প্রেম ছেড়ে গেলে, গাতি খামানি থামপল অ (মানে পচা পরিত্যাক্ত যা নদীতে ফেললে ভেসে যায়) চালতা ফল ইহার মতো তুমিও চলে গেলে, মানুষ হয়ে আসাতা বিফল হলো। বাঙালী দোকানের শাড়ি (মানে যা বরক জাতিদের কোন কাজে আসে না) ইহার মতো তুমিও মায়া ছেড়ে চলে গেলে, কেন প্রেম ছেড়ে গেলে। খুমুই খায়চুয়ার (বিশেষ ফল) যেমন ঝুলছে, আমরাও তেমনি (বিষণ্ণ) ফাকা মনে ভুগছি, কেন তুমি মায়া ছেড়ে গেলে, কেন তুমি প্রেম ছেড়ে গেলে, ঈশ্বর লেখার সময় ভুল করেছে মানে তাই তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ .... ইত্যাদি।

মায় খ্লায় রমানি (রিমানি) রাইদা/ শ্রাদ্ধের নিয়মাবলী

ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজে মৃত্যুর সাতদিন বা তের দিন পর শ্রাদ্ধ করার নিয়ম। পিতা-মাতার মৃত্যু হলে ছেলে মেয়ে একত্রে একই দিনে শ্রাদ্ধ করে। তবে শুধু ছেলেরাই নিরামিষ খায়। মেয়েদের খেতে হয় না তবে সিদল, সুটকী খেয়ে থাকে। শ্রাদ্ধের আগের দিন ছেলে/ ছেলেরা মাথা মুণ্ডন করে। শ্রাদ্ধের দিন সকালে অচাই দিয়ে পূজা করে সামর্থ্য অনুযায়ী দান-দক্ষিণা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত। তবে বর্তমানে ব্রাহ্মণ দিয়েও শ্রাদ্ধ করা চালু হয়েছে। শ্রাদ্ধের আগের দিন বাঁশ দিয়ে টং ঘরের মতো করে মাটি থেকে সামান্য উঁচু করে চারিদিকে বাঁশের বারান্দা

(চাকেরেং) দিয়ে ঘর (সিমাঙ নক) বানানো হয়। সৌন্দর্যের জন্য চালের উপরে (তায়ুঙ-তক চিঙ) পাখির নমুনায় বানিয়ে বাঁশ দিয়ে বেঁধে দেয়। শ্রাদ্ধের দিন সকালে চৌঙগায় ভরে রাখা অস্থি নামিয়ে (কুচাই পানি) কাঁচা হলুদ ও বনাজি অষুধ দিয়ে বানানো পবিত্র জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে সিমাঙনক (ভাত বাড়ান দেওয়ার জন্য তৈরী বিশেষ টং ঘর)-এ পূর্ব-পশ্চিম দিক করে রেখে রকমারী রান্না, পিঠা, বাঙগাঁই বানিয়ে বাড়ান বা ভোগ দেয় প্রথমে ছেলেরা, স্বামী, স্ত্রী তারপর আত্মীয় স্বজনরা জনে জনে সবাই দেয় সেটাই ত্রিপুরা আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা।

মৌতাই-আতায় রমানি (রিমানি) রাইদা ঃ ত্রিপুরা আদিবাসীদের লৌকিক দেব-দেবী ও পূজা পদ্ধতি ত্রিপুরা আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারী যাকে বলা হয় Animism. তাদের অধিকাংশ পূজাই বন-জঙ্গলে, নদীতে বা ছড়াতে দিয়ে থাকে। জন্ম থেকে মৃত্যু প্রতিটি পদক্ষেপেই পূজা পার্বণের মাধ্যমেই আদিবাসীরা জীবন অতিবাহিত করে।

গরিয়া মাতাই (মৌতাই) / গড়িয়া পূজা ঃ গরিয়া মাতাই (মৌতাই) কে 'উাকালক' মাতায়ও বলা হয়। গারিয়া বাঁশ দিয়ে বানানো হয় বলেই হয়তো এমনটা বলে। উাথপ দিয়ে মোরগ কেটে অচাই দ্বারা গরিয়া পূজা করা হয়।

পাড়া কেরমানি / কের পূজা ঃ ত্রিপুরার অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায় 'ত্রিপুরা সমাজেও 'পাড়া কেরঅ' মানে কের পূজা করে। 'ত্রিপুরা' আদিবাসীরা বছরে একবার পাড়া কের অ (কের পূজা) করে থাকে। কের পূজার জন্য দিন বা মাসের কোন বালাই নেই ... জা ও পাড়ার সকলের সুবিধা অনুযায়ী দিয়ে থাকে। তবে অনেকে ফাল্গুন, চৈত্র মাস বে... নেয়। কের পূজার জন্য পাড়ার প্রত্যেক বাড়ি থেকে চাঁদা তোলা হয় যে যার সামর্থ অনুযায়ী চাঁদা দেয়। পাড়ার মুখ্য রোয়াজাব নেতৃত্বে কের পূজা করা হয়। পূজার দিন পাড়ার প্রবেশদ্বারগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় মানে সেই দিন পাড়ার কেউ বাইরে বেরুতে পারে না, প্রবেশও করতে পারে না। যদি সে সেই পাড়ারই হয়ে থাকে, তাও না। যতক্ষণ না কের পূজা শেষ না হয়। তবে জরুরীভিত্তিতে রোয়াজার অনুমতিক্রমে প্রবেশ করা যায়। যদি কেউ না জেনে বা ইচ্ছাকৃত প্রবেশ করে তবে তাকে জরিমানা হিসাবে দিতে হয় টাকা, মদ, মোরগ বা শূকর।

কের পূজার নিয়মাবলী ঃ পূজার দিন পাড়ার প্রবেশদ্বারগুলির মধ্যে দু'দিকে দুটি বাঁশ পুঁতে তার মধ্যে একটি বাঁশ আড়াআড়িভাবে বেঁধে তাতে এক হাতের সমান করে কেটে তিনটি বাঁশের টুকরা ঝুলিয়ে দেয় তাকে খঙলল' 'খঙ য়র' বলে। তারপর পাড়ার ভিতরেই কাছাকাছি জঙ্গলে ও দীপউাথপ বানিয়ে সেখানে দুটি মোরগ, পাঁঠা ও শূকর বলি দিয়ে পূজা করা হয়। এই পূজাকে কাথারগ' বলে।' তারপর পার্শ্ববর্তী নদী বা ছড়ার কিনারে তিনটি দীপ (কারুকার্য করা বাঁশের টুকরা /উা সিরিগই) ও তিনটি মাটির ঢেলা বানিয়ে তাতে খুদুং আলুউা (সূতির সূতা) ও তুলা (খুল) গিট দিয়ে বেঁধে দিয়ে, একটি শূকর ও দুটি মোরগ কেটে লংতরাই পূজা করে। পূজাগুলি দিয়ে থাকে অচাই। রোয়াজার তত্ত্বাবধানে পূজাগুলি হয়ে থাকে। কের পূজার উদ্দেশ্য হলো পাড়া শুদ্ধ করা ও পাড়ার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা। 'ত্রিপুরা' সমাজের আদিবাসীদের বিশ্বাস পাড়ায় কের পূজা হয়েছে মানে পাড়ার মঙ্গল হবে, পাড়ায় অসুখ বিসুখ হবে না। তাই প্রত্যেক বছর প্রতেক পাড়ায় কের পূজা করা হয়। কের পূজায় বলি ছাড়াও মদ্য আবশ্যক।

খাণ্ডমানি মাতাই ঃ অসুখ-বিসুখ হলে বা অভিভাবক যদি মনে করে যে শিশু কোন কারণে ভয় পেয়েছে এবং অস্বস্তি বোধ করছে। তবে মোরগ বা শূকর দিয়ে অচাই দ্বারা এই পূজা করে।

মুলি খামানি ঃ মুলি খামানিও ত্রিপুরা সমাজে এক ধরনের পূজা। শিশুরা রোগাক্রান্ত হলে আরোগ্য কামনা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য এই পূজা দেওয়া হয়। শূকর বা পাঁঠা বলি দিয়ে অচাই এই পূজা করে। অচাই সহ সাতজন বা নয়জন বেজোড় সংখ্যায় জঙ্গলে গিয়ে এই পূজা দিতে হয়।

বুরাসা মাতাই (মৌতাই) ঃ অসুখ-বিসুখ হলে বুরাসা মাতাই দেওয়া হয়। জঙ্গলে গিয়ে শূকর কেটে এই পূজা দিয়ে থাকে।

নুখুঙনি মাতাই (মৌতাই) ঃ ত্রিপুরা আদিবাসীদের সমাজে নুখুঙনি মাতাই সংসারের উন্নতি, মঙ্গল ও শান্তির কামনার্থে বাড়িতেই এই পূজা দেয়। শূকর, মোরগ দিয়েই এই পূজা করে। ধনবান ব্যক্তিরা বছরে একবার এই পূজা দিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের খাওয়ান।

মায়কাতাল (কৌতাল) চামানি ঃ মায় কৌতাল চামানি মানে নবান্ন উৎসব। ভাদ্র আশ্বিন মাসে নতুন ফসল বাড়িতে তোলে পূজা দিয়ে পাড়া প্রতিবেশী সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া করে, প্রতি বছর যাতে ভাল ফসল হয় তার কামনা করে। যারা জুম চাষ করে তাদের মধ্যে যাদের ফসল কম বা যাদের অনুষ্ঠান করার সামর্থ নেই তারা নদীর ধারে বাঁশের বেত (দীপ) একটি ও বাতা (জুমের বিশেষ এক ধরনের গাছের আগা জলের ভেতর বা ছড়ার কিনারে পুতে (খুদুঙ আলডা) (সুতির সূতায়) তুলা দিয়ে সাতটা গিট দিয়ে (খুতলুঙ) বানিয়ে মোরগ কেটে পূজা দিয়ে সেরে ফেলে। এটাকে 'মাইরুঙ অলুঙা সুকু লগ অ' বলে।

কুসুমরগ ঃ এই দেবতাকে ত্রিপুরা সমাজে গরিয়ার পুত্র বলে গণ্য করা হয়। অসুখ-বিসুখ হলে বিশেষ করে মাথা ব্যথা, চোখের রোগ ইত্যাদি হলে বাড়ির অনতিদূরে যে কোন গাছের গোড়ায় উার্থপ বাঁশের কারুকার্য (চানদুউা মিশিরি) বানিয়ে দুটি কালো মোরগ দিয়ে এই দেবতার পূজা করা হয়।

মাইলুমা / খুলুমা (মাইনজীকয়া খুইনজীকমা) মাতাই (মৌতাই) ঃ ত্রিপুরা সমাজে ইহা লক্ষ্মী দেবতা হিসাবে পরিগণিত। ধান ক্ষেতে যখন ধানের শীস বেরুতে থাকে তখন ধানের ক্ষেতে বা জুমে এই পূজা করা হয়। এই পূজার জন্য শূকর ১টা (Female) মোরগ ৩টি (Male/ Female) (প্রসব হয়নি এমন) দিয়ে ধান ক্ষেতে সুবিধা মতো জায়গায় চারটি বাঁশ পাশাপাশি খাড়াভাবে মাটিতে পুতে বাঁশের উপরে নতুন কাপড় বেড় দিয়ে সেখানে শূকর ও মোরগগুলি বলি দিয়ে অচাই এই পুজা করে, পূজার সময় চাল, খই, তুলা ও ১ টাকা নতুন কাপড় দিয়ে বেঁধে পূজাস্থলে রেখে আসে। তারপর পূজায় দেওয়া শূকরের মাথা সেই ঘরে মেয়ে বা যুবতী মাথায় করে বাড়িতে নিয়ে আসে তার পেছনে অচাই থাকে। বাড়ীর দরজায় পৌছোলে তাকে ধুপ-ধুনা দিয়ে স্বাগত জানায় এবং বলে 'মাইনজীকমা নগ' ফাইকা' মানে লক্ষ্মী ঘরে এসেছে। যদিও এই পূজা এখন অর এতটা প্রচলন নেই। তাছাড়াও আছে সনিরক এবা থুমনাইরক, বনিরক, সংগ্রামা ইত্যাদি। পূজা-পার্বণ অমান্য করার মতো মানসিকতা আমাদের মধ্যে এখনো গড়ে ওঠেনি। শুধু মাইলুমা ও খুলুমা ব্যক্তিস্বার্থে। বাকী সব দেব-দেবী সমাজ ও দেশের স্বার্থে পূজিত। আমাদের সব পূজাতেই অচাই, উাথপ ও কোন কোন পূজাতে দেশী মদ আবশ্যক।

বি:দ্র:- ত্রিপুরা আদিবাসী সমাজে যে কোন পূজা-পার্বণে অচাই ও উাথপ অবশ্যিক। স্বাভাবিক পূজা-পার্বণে উাথপ দু'টি প্রয়োজন। কিন্তু মৃতের বেলায় বা পারলৌকিক ক্রিয়াদির ক্ষেত্রে তিনটি উাথপ আবশ্যক। পূজা পার্বণে অচাইকে তার পারিশ্রমিক স্বরূপ দক্ষিণা দিতে হয়। তাকে ত্রিপুরা সমাজে 'গুরুবানা' বলে।

হুক চামানি রাইদারক/জুম চাষ নিয়মাবলী

জুম চাষ ত্রিপুরার আদিবাসীদের চিরাচরিত প্রথা। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের পার্বত্য জাতিরা জুম নির্ভর ছিলেন। পার্বত্য প্রজাগণকে জমিচাষে উৎসাহিত করার জন্য মন্ত্রী মোহিনী মোহন বর্ধন কর্তৃক ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ১লা আষাঢ় প্রথম সরকারী আদেশ জারী হয়। কিন্তু ঐ আদেশ কার্যকরী হয়নি। পার্বত্য প্রজাগণ জুম চাষেই উৎসাহী। তাই মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্য (২০/৫/৪১ ত্রিং) প্রজাদের জমিচাষে উৎসাহদানে খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকায় পর্বতবাসী পুরান (কৌচাম) ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং ও হালাম জাতি সমূহের জন্য ১১,০০০ দ্রোণ জমি নির্দিষ্ট (Reserve) করে দেন। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ তারপর ধীরে ধীরে পার্বত্য আদিবাসীরা জমিচাষ করতে শুরু করে। কিন্তু এখনো ত্রিপুরার অনেক আদিবাসী জুম নির্ভর।

হুক (জুম) নির্ভর পার্বত্য আদিবাসীদের জুম চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে

হুক নায়মানি /জুম নির্বাচন : জুম চাষ একটি স্থানে একবার করলে পরের বছর অন্য স্থানে। মানে অনির্দিষ্ট। অনেক পাহাড় বা টিলা ঘুরে দেখে পছন্দ হলে সেখানে দুই টুকরা বাঁশ কেটে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ক্রশ করে পুঁতে দিয়ে আসে। তার মানে সেই স্থান জুম চাষের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেছে। আর অন্য কেউ দাবী করবে না। এটাই নীতি। ক্রশ চিহ্ন দেওয়ার পর সেখান থেকে সামান্য মাটি এনে বিছানার পাশে রাখে তাতে রাত্রে কি স্বপ্ন দেখল শুভ না অশুভ তা বিচার করে। জুম নির্বাচনে ব্যবহৃত ক্রশ চিহ্নকে 'দাবু' বলে। পৌষ মাসে জুম নির্বাচন (হুক নায়অ) করে। সেই মাসেই জুমের গাছপালা কাটা শুরু করে। ইহাকে 'হুক হগ অ' বলে। অনেকে আবার অগ্রহায়ণ মাসেই জুম নির্বাচন করে থাকে।

হুক হর রমানি (রিমানি) /জুমে আগুন দেওয়া : জুমের কাটা গাছ-পালা যখন শুকিয়ে যায় তখন এগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সাধারণত: চৈত্র মাসে জুমে আগুন দেওয়া হয়।

আরা রুগমানি /জুম পরিষ্কার করা : জুমের গাছপালা যখন সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়, তারপর এগুলিকে সরিয়ে জুম পরিষ্কার করে।

মায় কাইমানি রাইদা/ ধান লাগানোর প্রথা : জুম পরিষ্কার করার পর বৈশাখ মাসে জুমে ধান লাগানো হয়। শুধু ধান নয় সংগে মক্কার দানা (মগদাম বুচুলাই), তুলার বীজ (খুচুলাই, তিল (সিপিঙ) ও বিভিন্ন সব্জী ফল ও ফলের বীজ ও ধানের ফাঁকে ফাঁকে লাগানো হয়। বাঁশ বেতের তৈরী বিশেষ পাত্র 'সেলেঙ' বা কাসলেঙ-এ ধানের ও অন্যান্য বীজগুলি ঢুকিয়ে কোমরে বেঁধে রেখে জুমে ধান লাগায়।

জুমে ধান লাগানোর পর যখন ধানের চাড়া উঠতে থাকে তখন দফায় দফায় পরিষ্কার করে। এটাকে 'হুক টাংগঅ' বলে। প্রথমে ধান উঠতে শুরু করলে একবার পরিষ্কার করে, মানে আগাছাগুলি

তুলে ফেলে দেয়। প্রথমবারের পরিষ্কার করাকে 'হাতালনি পলা' বলে। কিছুদিন বাদে আবার করে, একে 'কাচারনি পলা' বলে। শেষে ধানের শীস বেরুলে আবার পরিষ্কার করে, এটাকে 'মায়য়াগুল কল অ' বলা হয়ে থাকে। তখন কিছু ফসলও পাওয়া যায়। যেমন থায়চুমু (চিনদ্রা), দরমাই (শশা), খাকলু (চাল কুমড়া), চাকুমারা (মিষ্টি কুমড়া) ইত্যাদি।

মায় রামানি / ধান কাটার নিয়ম : জুমের ধান পাকা পরিপূর্ণ হলে ভাদ্র মাসে ধান কাটা হয়। ধান কেটে জুমেই কয়েক দিন রাখা হয়। ধান কাটার সময় ফসল যেমন বজরা (মকদানার মতো বিশেষ বীজ) বীজগুলি লাল রঙের অ খই-এর মতো ভাজা করে খাওয়া যায়। এটা আবাব সাদা রঙেরও থাকে। মুইপে (জুমের বিশেষ সীম), মাইন জীকমা লাঠা (জুমের আখ) সবুজ রঙের। এই ফসলগুলি সংগ্রহ করে বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর তিন-চার দিন পর যখন কাটা ধানগুলি শুকিয়ে যায় তখন জুমেই এগুলি সারাই করে। বাঁশের বানানো বিশেষ মাচার উপর রাখা কাঠের তক্তার উপর পিটিয়ে পিটিয়ে ধান সারাই বা মাড়াই হয়। এই পদ্ধতিকে 'মায় বুগঅ' বলে।

বি: দ্র: - জুমে বিশেষ ধরনের অস্থায়ী ঘর বানানো হয় যা 'টং ঘর' নামে পরিচিত। কাজ করে পরিশ্রান্ত হলে টং ঘরেই বিশ্রাম করে। বাড়ি থেকে নেওয়া খাবারগুলি টং ঘরেই রাখে। সেখানেই খাওয়া দাওয়া করে। অনেকে আবার টং ঘরেই রান্নাও করে। জুমিয়ারা জুম চাষ শুরু করার আগেই মাটিতে ছোট একটি ঘর বানিয়ে নেয়, সেখানেই বাড়ি থেকে নেওয়া জিনিসপত্র রাখে ও বিশ্রাম করে। এই ঘরকে 'বাননক' বলে। পরে ধীরে ধীরে টং ঘর বানায়। টং ঘরকে 'গারিং বা গাইরিং' বলে।

তের তাই রীচাপমুঙ মাসাসুঙ/(মীসামুঙ) / লৌকিক উৎসব ও নৃত্যগীতি

ত্রিপুরা সমাজের সংস্কৃতি অতি উৎকৃষ্ট। নাচ ও গানই হচ্ছে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। লোক সংস্কৃতিই আমাদের চলার পথ । সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে জীবন ও জীবনের ছন্দ। যুগ যুগান্তরের লৌকিক গানে লুকিয়ে আছে ত্রিপুরা সমাজের হৃদয়ের সুর । তাতে রয়েছে সংস্কৃতির ঐতিহ্য। পার্বত্য ত্রিপুরাদের জুম সংস্কৃতি হচ্ছে গানের উৎস। আর গরিয়া হচ্ছে নৃত্যের উৎস। চৈত্র সংক্রান্তিতে গরিয়া নৃত্যই হচ্ছে ত্রিপুরাদের বিখ্যাত নৃত্য। গরিয়া নৃত্য ত্রিপুরা সমাজে 'খেরেবায় -মাসমনি' বুমানি নামে পরিচিত। জুম চাষকালে যুবক যুবতীদের মধ্যে ভাব বা ভালোবাসা বিনিময় হতো গানের মাধ্যমেই।

রীচাপমুঙ /গান

হাবা সাকাঙনি কুক খালায় (জুমের পোকা)

সগাই চাখামুঙ মানতিলায়।

দাদা গিরা নঅ মানতিলায়

তাঙগয় চাখামুঙ তাকালায়।

রাজা নয়ুঙমা ফাকালায় (সিলিঙ)

বিনি সেবুকফুঙ অঙখালায়

তাঙগয় চাখামুঙ তাকালায়।

অইচুক কুচুইমুঙ তকজালা (মোরগ)
সারি অ সাঁই সাঁঙমুঙ সাঁইজালা (কুকুর)
দাদা গিরা নঅ মানতিলায়
তাঙগয় চাখামুঙ অকালায়।

অনুবাদ ঃ হাবা (দিনের কার্যভার জুম চাষ) জুমের যদি কুকু খালায় (পোকা) পেলে পুড়ে খেতাম। ছোট দাদাকে (মনের মানুষকে সম্বোধন করা) যদি পেতাম, এ বছর বিয়ে করতাম। রাজবাড়ির মারই যদি হতাম, তার সেবকও সৈনিক যদি হতে পারতাম এ বছর বিয়ে করতাম।

রীচাপমুঙ /গান ঃ

ত্রিপুরা বসঙনি বুরীহ সিকলা/ত্রিপুরা রমণী

হাপিঙ কুপুলুঙ মুইমায়সিঙ,
দাদা গিরাসা নৗঙ নাইসিঙ।
থালৗই আইথিয়া কঙ বা বায়,
বিয়াঙ (বজাঙ) থানানি নক (নরগ) ফায়বাই
খলা (নৈখলৗ) কাচারনি থেনদুরুই,
তকমা তয়কুমুঙ হাদুরুই।
বুরুইসা বুরুই অঙতিয়ই,
রিসা তাখুমতৗয় সলতিয়ই।
কয়লি বায়লি খায় হেমতিয়ই,
বরঅ থানাই নৗঙ জাদুয়ই
বারি অ (বাগানে) উমায়া (বিশেষ ফুল) বার তিলাই
খাগই রখামুঙ বাখা (বৗখা) বাই।
লামা করেনি থায়পাক (বিশেষ ফল)
নৗঙ বা অঙ থৗয়য়াসাকনি আফাক
লামা করেনি থায়চেরেম
চারাই ফাঙসিনি চৗঙ পেরেম (প্রেম)

অনুবাদ ঃ আগের বছরের পুরোনো জুম (হাপিঙ) অরল সব্জী ভরা, ছোট্ট দাদাটি আমার জন্য অপেক্ষা কর। আইথাল কলা (থালৗই/থালিক আইথিয়া) আছে নৃত্যভঙ্গীতে। কোথায় যাবার জন্য তোমরা এসেছ? উঠানের মাঝখানে তেঁতুল, মুরগী স্নানের মত ধূলা উড়িয়ে। মেয়ের মতো মেয়ে হয়ে, রিসা তাখুমতৗয় (বিশেষ ডিজাইন দিয়ে বুনা রিসা) বুকে বেঁধে। নৃত্যভঙ্গীতে হেঁটে, কোথায় যাবে তুমি জাদু (প্রাণের মানুষ) বাগানে উমায়া ফুল যদি ফুটত, তুলে দিতাম মন দিয়ে।

রাস্তার ধারের থায়পাক (জুমের বিশেষ ফল), মৃত্যু পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গী। রাস্তার ধারের থায়চেরেম (জুমের ফল), ছোটবেলা থেকেই তোমার আমার প্রেম।

· ত্রিপুরার আদিবাসীদের সমাজ ও সংস্কৃতি অতি সমৃদ্ধ। 'ত্রিপুরা'দেরও তাই। লোক নৃত্য ও

লোক সংগীতের মধ্যেও তা ফুটে ওঠে। ত্রিপুরা সমাজে গান মানেই কক খলাই রীচাপবঅ মানে সমৃদ্ধ শব্দগুলির একত্রীকরণ। প্রতিটি নাচ ও গান ছন্দময় ও অর্থবহ। তা উৎসবের গানই হোক, বিয়োগান্তকই হোক আর জুম চাষকালে যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেম বিনিময়ের (প্রথা) গানই হোক না কেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গানগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গানগুলি অনুবাদ করতে গেলে পাশাপাশি ভাষা বাংলা ততোটা সমৃদ্ধ নয় বলে শব্দ ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়। তাই অনুবাদ করতে গেলে ছন্দময় গানগুলির ছন্দ হারিয়ে যায়। তাই পাঠকেরা পড়ার সময় হয়তো খাপছাড়া মনে করবেন। কিন্তু একথা সত্য যে, 'ত্রিপুরা'দের প্রতিটি গানই ছন্দময়।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অলঙ্কারাদি
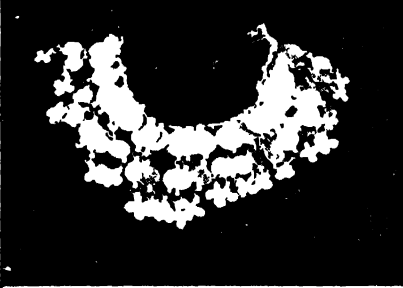
রাঙ বাতাং (গলায় পড়ে)
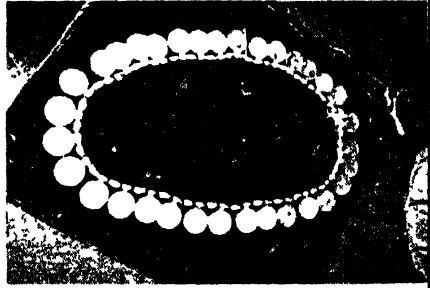
রাঙ বাতাং (পয়সার মাল্রা) গলায় পড়ে

তাল (হাতের উপরিভাগে পড়ে)

বেংকি (পায়ে পড়ে)

সুয়াম (খোপার কাঁটা)

ক্য
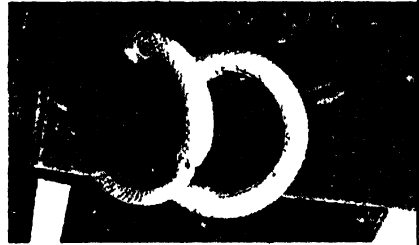
বাও (মানতাসা) হাতে পড়ার

গলার মালা

পার্বত্য ত্রিপুরার অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠী ত্রিপুরা। ত্রিপুরাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ঐতিহ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ তাতে কোন সন্দেহ নেই। ত্রিপুরা সমাজে প্রবাদবাক্যের (Proverbs) এর প্রচলন রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখেই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি। এর প্রাসঙ্গিকতাও আছে। ত্রিপুরা সমাজের অতীত জীবন ধারাকে বুঝাতে সাহায্য করে সেই প্রবাদবাক্যগুলি। ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি ফুটে ওঠে প্রবাদ বাক্যের মাধ্যমে। প্রবাদবাক্যগুলি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে গোটা সমাজ প্রবাহকে ব্যাখ্যা করে।

উাতীয় নঅ আশাই দে (দই) রিগনায়অ সীতীয়।

অনুবাদ ঃ বৃষ্টির আশায় রিগনায়ে প্রস্রাব করা ঠিক নয়।

আমানঅ পাইয়া, পুমানঅ পায়।

অনুবাদ ঃ মাকে পারে না ছাগীকে

বউ এর উপর রাগ ঝী এর উপর।

ডীনসুকুমা ন্যাঙয়া, গথকমা নাঙগঅ।

অনুবাদ ঃ যাহা ভাবি তা হয় না, যা হয় তা ভাবি না।

খিলুঙ কাদি, মামলা তাকাদি।

অনুবাদ ঃ মলের উপর হাঁটো, দরবারে নয়।

বীষ্ঠায় পাড়া দাও কিন্তু মামলায় যেও না।

মায়নঅ পাইয়া, মুয়নঅ পায়।

অনুবাদ ঃ ভাতের সংগে না পারলে তরকারীকে।

বসুমতি নাইয়াখাই হা মানয়া।

অনুবাদ ঃ বসুমতি না চাইলে জায়গা (মেলে না) মেলা ভার।

মাখরা/মীখরা কাসা মানতীই। বা

মীখরা হায়, কীসা (কাসা) খেরেক।

অনুবাদ ঃ বানরের মতো ক্ষতস্থান চুলকায়।

হুক হাময়ালে বিসানি, সায়-হিক হাময়ালে থীয়য়াসাকনি।

অনুবাদ ঃ জুম খারাপ হলে এক বছরের জন্য কিন্তু স্বামী-স্ত্রী খারাপ হলে মৃত্যু পর্যন্ত।

তখা চুয়ান বালতীই (বাঙখারতাই)

অনুবাদ ঃ কাকের মদের পিঠা নিয়ে পালাবার মতো।

খুনজু বায় খানাকায় খীনাকায়, মকল বায় নুগঅ।

মকল বায় নুঙখায় নুকখায়, সাগ অ কীলায়অ।

অনুবাদ ঃ কানে শুনলে চোখে দেখতে পায়,

চোখে দেখলে ঘাড়ে এসে পড়ে।

বরক কুথীয় তিসা খাই কক খনতায় মাচাঅ,

মুসুক কুথীয় তিসা খাই দুদ মাচা অ।

অনুবাদ : মরা মানুষ বাঁচালে দোষের ভাগী হতে হয়,

মরা গরু বাঁচালে দুধ খেতে পায়।

বিগরাসানি খরক থক করই (কুরীই)

অনুবাদ : দারিদ্র্যের মাথায় তেল নেই।

চেরগ (চেরায়) বাই থীঙখাই বাদুরুই (হাদুলীই) মাচা অ।

অনুবাদ : শিশুর সংগে খেলা করলে ধূলি খেতে হয়।

চরদে হান খা।

অনুবাদ : গায়ের কাটা কি মাংসে পরিণত হয়।

হাইচিঙ কারান' (কীরান) তয় (তীয়) লুতীই।

অনুবাদ : বালুচরে জল ঢালার মতো।

বীসান অ ফুরীঙখাই হামজীক রীঙগ অ।

অনুবাদ : মেয়েকে শিখালে গৃহবধূ শিখে।

ককবরক ভাষা অতি সমৃদ্ধ। তার শব্দগুলি একান্তই নিজস্ব। শব্দ ভাণ্ডারও অফুরন্ত যা অন্যান্য ভাষায় নেই। তাই অনেকাংশেই অনুবাদ সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ককফুমলক (ককফেমলক)/ ধাঁধা

লুঙ্গা-লুঙগি উা সুরকালায় = উাতীয়। (বৃষ্টি)

চারাই (চেরাই) মাসা গুউায় (কামচুলীয়) দগলা (Loss) চুমজাক=

সিকাম থায়তয় বাথায় (বীথায়)। (বিশেষ ফল)

চারাই মাসা হাপলগ কতনঅ হুইজাক = খাচু (খাজু)। (খোপা)

চারাই তাখুকনীয় লামা সেকলায়অ = য়াকুঙ/ য়াথীই। (পাদুকা)

চারাই মাসা গুউায় (কামচুলীয়) পলা ন্নি চুখজাক। = মকাম (মগদাম) (ভুট্টা)

রাজানি নগ' খাম খাচিজাক = উাখুম। (কানের দুল)

রাজানি খলাঅ (নখলা) কল কাইঅ = সুরাম (সুরাঙ)। (খোপার কাঁটা)

রমসাখাই মান', নাইসাখাই নুঙয়া (নুকয়া) = বখরক। (মাথা)

নখা নাইসাখা, মুলি (উা) সুরসামা = মীইখুম বাথায় (বীথায়) । (কলার থোড়)

থিঙ থিঙমা গানাঙ (গীনাঙ) = ফানক (ফানতক)। (বেগুন)

থিঙ-থিঙমা করই (কাঁরাই) = তকতাই। (ডিম)

নক বিসিংঅ নক গিরা (বৌসা) = গুনদা । (মশারী)

গুরুম কালাই অ (কৌলাইঅ) গুরুম বাচাঅ (বৌচাঅ) = দিংগী । (ঢেঁকি)

(থীঙমুঙ/ খেলাধূলা)

ত্রিপুরার সব আদিবাসীদের খেলাধূলা প্রায় একই রকম। যেমন সুংগাই বা সুকুই থীঙমানি 'ত্রিপুরা'দের ঐতিহ্যগত খেলা। চৈত্র সংক্রান্তির দিন (বুইসুক) বা আগের দিন (হারি বইসুক) এই বিশেষ দিনেই এই খেলার প্রচলন। গ্রামের যুবকরা এই খেলা খেলে থাকে। তবে অন্যনান্য দিনেও খেলে। সলাইমানি (কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ), খারমানি (দৌড় প্রতিযোগিতা), হাচাম কামানি (পাহাড়ে চড়া), কলদং কামানি (বাঁশে ওঠা), দুই হাতে দুটি বাঁশ নিয়ে সেই বাঁশে বাঁশেব টুকরা দিয়ে গিট বেঁধে তাতে উঠে, কে কতদূর হাঁটতে পারে তার প্রতিযোগিতা হতো, এটা 'ত্রিপুরা'দের মধ্যে বিশেষ ঐতিহ্যগত খেলা। যা অন্যনান্য সম্প্রদায়ে দেখা যায় না।

ধর্মতাই ধর্ম কাকমানি /ধর্ম ও ধর্ম বিভাজন

ত্রিপুরার আদিবাসীরা প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাসী। অপৌত্তলিক। 'ত্রিপুরা'রাও এর ব্যতিক্রম নয়। ত্রিপুরাদের যে কোন পূজায় বলি এবং মদ্য অবশ্য বস্তু। যা হিন্দু ধর্মের সংগে সম্পূর্ণ পৃথক। আদিবাসীরা আর্যদের কোন দেবদেবীকে পূজা করেন না। কিন্তু বর্তমানে অন্যনান্য জাতির সংমিশ্রণের ফলে বর্তমানে আদিবাসীরাও হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর পূজা করে থাকে। এবং কিছু কিছু অঞ্চলে ককবরক ভাষাভাষীরা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ধর্মীয় সংঘাত নেই। তবে নিজস্ব ধর্মকে লালন-পালন করাই সকলের উচিত। কারণ Religion is a identity of any cast or race. যে জাতি যে সমাজ আধ্যাত্মিক ভাবে যত অগ্রসর সে জাতি সে সমাজ তত সভ্য। ইহাই শাশ্বত সত্য।

সরকারী সেবুক (চাকরি-বাকরি)

বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে 'ত্রিপুরা' টাইটেল লেখার সংখ্যা কমে গেছে তার কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু আনুপাতিক হারে সরকারী চাকরিরত কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। ত্রিপুরাদের মধ্যে বর্তমানে উক্ত শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা' প্রচুর।

বানিয়া (ব্যবসা বাণিজ্য) ঃ

ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে 'ত্রিপুরা'দের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। ব্যবসা বাণিজ্যে দক্ষতার অভাব তো বটে, তবে সুযোগ সুবিধাও কম।

ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী 'ত্রিপুরা' জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ও সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসারের সংখ্যা

ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসকারী 'ত্রিপুরা' জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা - ১,৬৮,৩৮০জন।

সরকারী চাকরিজীবীর মোট সংখ্যা - ৩৬০৯জন।

ডাক্তার- ১৩জন, ইঞ্জিনীয়ার - ১৮জন, এগ্রি অফিসার - ৫জন। বিদ্যালয় পরিদর্শক - ৪জন। অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক - ৩জন। উচ্চতর বিদ্যালয়ের ধান শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ২০জন। ডি এফ ও (D.F.O) - ২জন। ড্রাগ ইন্সপেক্টর- ১জন। ডেপুটি ডাইরেক্টর - ২জন। তাছাড়া অন্যান্য বিভাগে গেজেটেড অফিসার- ১জন। ইন্সপেক্টর (পুলিশ, সেল্স টেক্স, ফুড, রেভেনিউ, পঞ্চায়েত ও লেবার দপ্তরে) - ১৭জন।

উচ্চ পদস্থ অফিসার পদে - ১জন। জিৎ দাস ত্রিপুরা (I.A.S)। বর্তমানে অনেক উচ্চ শিক্ষিত বেকারও আছে। যেমন - ইঞ্জিনীয়ার বেকারের সংখ্যা - ৮জন, তাছাড়া ডাক্তারী পাঠরত আছে - ৮জন, ইঞ্জিনীয়ার আছে - ২৫জন।

প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ও তার বিবর্তনের ধারা

রাজন্য ত্রিপুরার পার্বত্যজাতিদের সামগ্রিক পরিকাঠামো ছিল সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল। জেলা ভিত্তিক অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য সমাজের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিয়োগ ও নির্বাচনই এর প্রমাণ। 'ত্রিপুরা'দের সমাজ ব্যবস্থাও একই। রাজার শাসনকালে 'ত্রিপুরা' সমাজের জন্য সর্বোচ্চ আসনে একজন নারান ছিলেন, যিনি রাজার নিয়োজিত। সর্বশেষ নারান ছিলেন দীনসেন ত্রিপুরা। তার নিচে অঞ্চলভিত্তিক অসংখ্য পোমাঙ। তারও নিচে পাড়াভিত্তিক রোয়াজা। রোয়াজারা জনগণ কর্তৃক এবং পোমাংরা রোয়াজা কর্তৃক মনোনীত অথবা নির্বাচিত হতেন। রোয়াজারা বিচার ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করতেন। পোমাং-এর দরবার ছিল অ্যাপিলেড আদালতের মতো। নারানরা রাজসভার সদস্য হতেন বলে সাধারণ প্রশাসনই দেখাশুনা করতেন। বিশেষ ক্ষেত্রে সুপ্রিম আদালতের কাজও করতেন। বর্তমানে নারান ও পোমাং পদ বিলুপ্ত। পাড়া প্রতি রোয়াজা আছেন নামে মাত্র। সামাজিক বিচার ছাড়াও বিভিন্ন পূজা-পার্বণে যেমন- কের, গরিয়া পূজা চৈত্র সংক্রান্তিতে রোয়াজাকে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সমতলের বহু গ্রামেই বিশেষত: খ্রীষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় রোয়াজার সন্ধান মেলা ভার। ত্রিপুরার আদিবাসীদের সামাজিক কাঠামো এক হলেও ত্রিপুরাদের সমাজকর্তাদের পদবীর নাম অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে একটু আলাদা। যেমন - ত্রিপুরা সমাজে পাড়ার কর্তা রোয়াজা দেববর্মা সমাজে আবার চৌধুরী।

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর রাজনীতি ঃ বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ ও পরিচয়

রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় রাজনীতির সূচনা ভারতে যোগদানের পর। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণের মৃত্যুর পর যুবরাজ কিরিট বিক্রম কিশোর মাণিক্য দেববর্মণ নাবালক হওয়ার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের কল্যাণার্থে তৎকালীন মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ অক্টোবর স্বাধীন ভারতে যোগদান করেন। সে থেকেই রাজতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের শুরু। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজনীতির শুরু থেকেই অন্যান্য সম্প্রদয়ের পাশাপাশি 'ত্রিপুরা'রাও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে আসছেন। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ১৯৭২-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সুখময় সেনগুপ্তের আমলে প্রয়াতহরিচরণ চৌধুরী (ত্রিপুরা) উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি গঠিত হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রয়াত ঈশান চন্দ্র রোয়াজার (ত্রিপুরা) সুপুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ

ত্রিপুরা সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন। তাছাড়া শ্রীযুক্ত জীতেন চৌধুরী (ত্রিপুরা) বর্তমান মন্ত্রী সভায় বন দপ্তরের দায়িত্বে আছেন।

'ত্রিপুরা' জনগোষ্ঠীর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ও বিপর্যয়

ত্রিপুরা আদিবাসী 'ত্রিপুরা'দের জীবনে সবচেয়ে স্মবণীয় ঘটনা হলো ১৮৬০ সালের 'কুকী বিদ্রোহ' (সিকাম চবা)। কুকী বিদ্রোহের সময় কুকীরা (লুসাই বা মিজো) পার্বত্য চট্টগ্রাম (স্বাধীন ত্রিপুরার অংশ ছিল) থেকে শুরু করে চাকলা রোশনাবাদের ছাগলনাইয়া পর্যন্ত নৃশংসভাবে অবাধে খুন, ডাকাতি ও অপহরণ করে। ওই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৮টি মৌজায় রক্তের হোলী খেলেছিল। পলায়নে অক্ষম নারী ও শিশুরা কমপক্ষে ২১৫জন খুন হয়েছিল। সেই বিভৎস ঘটনার কথা ত্রিপুরা অদিবাসীরা এখনো ভোলেননি। ত্রিপুরাদের মতে সেই দিনটি কালো দিবস।

বিবর্তনের পথে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী

রাজন্য ত্রিপুরা সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ। ত্রিপুরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলধারা হলো এ রাজ্যের আদিবাসীরা (ভূমিপুত্ররা)। বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরায় বয়ে চলেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনেব ধারা। ত্রিপুরা নানা দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। হয়েছে কত উত্থান-পতন, ভাঙ্গা গড়া। রাজতন্ত্রের অবসান, প্রজাতন্ত্রের সূচনা, আদিবাসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে পরিণত হয়েছে সংখ্যালঘুতে। স্বাভাবিক কারণেই ত্রিপুরার আদিবাসী জাতিদের জীবনেও দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। বিবর্তনের হাত ধরে চলতে গিয়ে ত্রিপুরার আদিবাসীরা হারিয়ে ফেলেছে তার মূলস্রোত। ত্রিপুরার আদিবাসীরা আদিকালে সকলেই 'ত্রিপুরা' বা 'ত্রিং' টাইটেল লিখত। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন টাইটেল লিখতে শুরু করেছে। শুরু হলো নিজেদের মধ্যে বিভেদ। ভাগ হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ে। স্বাধীন ত্রিপুরা ১৯৪৯ সালে ভাবতে যোগদানের পর ভারতের সংবিধান মোতাবেক ত্রিপুরার আদিবাসীদের সংখ্যালঘু চিহ্নিত করে 'উপজাতি' হিসাবে স্বীকৃতি দিল। ভারতের সংবিধানে নথীভুক্ত হলো ১৯টি সম্প্রদায়। যদিও ঘোষিত সবগুলি সম্প্রদায় ত্রিপুরার ভূমিপুত্র বা আদিবাসী নন। ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষী সম্প্রদায়গুলি হলো- ত্রিপুরী (ত্রিপুরা ও দেববর্মা) সম্প্রদায়, জমাতিয়া সম্প্রদায়, নোয়াতিয়া সম্প্রদায়, রিয়াং সম্প্রদায়, কলই, রূপীনি (হালাম) সম্প্রদায়, মুড়াসিং ও উচই সম্প্রদায়। তাদেরকেই ত্রিপুরার আদি জনজাতি বলা যেতে পারে। একটি বৃহত্তর জাতি থেকে উপজাতিতে পরিণত হওয়া তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ও দু:খের তো বটেই। কিন্তু একথা সত্যি যে, ত্রিপুরায় ভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশের ফলে আদিবাসীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত। হয়েছে। তাতে আদিবাসীদের উন্নতির পথেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই হয়তো বিশেষ (প্যাকেজ) সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। সেদিক থেকে বিচার করলে, তা ছিল সঠিক পদক্ষেপ। তা সত্ত্বেও ত্রিপুরার আদিবাসীরা এখনো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। গণতন্ত্রে পদার্পণ করেছে ঊনষাট বছর পেরিয়ে গেছে। মানে কয়েক প্রজন্ম। ত্রিপুরার আদিবাসীরা এখনো অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি। আদিবাসীদের বেশিরভাগই এখনো কঠিন ও কঠোর জীবন সংগ্রাম করে দিন কাটাচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে জন্মভূমিতেই আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিপন্ন। বৃহত্তর জাতিগোষ্ঠীর সংগে সমন্বয় সাধন করতে

গিয়ে, সমাজ ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে হারিয়েছে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সবই যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট।

ত্রিপুরার আদিবাসীরা সহজ, সরল ও শান্ত প্রকৃতির ও অতি অতিথি পরায়ন। আদি সমাজে অতিথিদের নারায়ণরূপে গণ্য করা হয়। অতিথিদের সমাদরে কোন ত্রুটি রাখতে নারাজ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরার মহারাজাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ত্রিপুরার আদিবাসী মহিলারা বহিরাগত ভিন্ন জাতির মহিলাদের 'বৈনারী' মানে বান্ধবীরূপে সাদরে গ্রহণ করেছে। আদিবাসী মহিলারা বৈনারীদের এতই মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন যে তাদের সংগে ভাব বিনিময়ের জন্য অনেক কষ্ট করে বাংলা বলার চেষ্টা করে, বলেই ক্ষান্ত হতো না এমনকি বছরের নতুন ফসল - চাল, শাক-সব্জী বৈনারীদের আগে দিয়েই তৃপ্তি পেত। শুধু মহিলাদের নয়, ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রে পাহাড়ে ওঠা পুরুষদের আতিথেয়তায়ও কোন খামতি ছিল না। গৃহপালিত মোরগ, পাঁঠা কেটে খাওয়ানো থেকেও বিরত থাকে না। সকলকে সসম্মানে বরণ করাই আদিবাসীরা দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে। কিন্তু কালক্রমে সেই সহজ, সরল, শান্তিপ্রিয় 'ত্রিপুরা' আদিবাসীরা একদিন উগ্রবাদী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ইহা সত্য না মিথ্যা। ইতিহাস এর সাক্ষী।

ত্রিপুরার আদিবাসীদের জীবন-যাত্রায় সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তনে ধারা লক্ষ্য করা যায়। তা সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই বলুন। মুক্ত জীবনের স্বাদ খুঁজতে গিয়ে হারিয়েছে তার সুস্থ, সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিকাঠামো। অতীতে ত্রিপুরার প্রতিটি প্রান্তে আদিবাসী সমাজে ছিল মহারাজা কর্তৃক মনোনীত ও নির্বাচিত সদস্য বা সমাজ রক্ষক বা সমাজ অভিভাবক। নারান/ সর্দার/ চৌধুরী/ পোমাঙ/ রোয়াজা ইত্যাদি পদবী নামে বয়োজ্যেষ্ঠ বা সুদক্ষ ব্যক্তি। তারা কেউবা অঞ্চলভিত্তিক, কেউ গ্রামভিত্তিক। যদিও পদবীর নাম ভিন্নমাত্র, সম্প্রদায়ে ভিন্ন মাত্র। সমাজ ব্যবস্থা তাদের হাতেই ন্যস্ত। তাতে সমাজ ছিল সুশৃঙ্খল ও সুন্দর। কিন্তু ধীরে ধীরে এই প্রথাগুলি বিলুপ্ত হতে লাগল। বর্তমানে কোন কোন গ্রামে শুধুমাত্র চৌধুরী ও রোয়াজা দেখা যায়, যা গণনার বাইরে। শুধু জমাতিয়া সম্প্রদায়ই এই প্রথা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। পরিবার অভিভাবকহীন হলে যা হয়, বর্তমানে আদিবাসী সমাজেরও একই অবস্থা। সমাজ বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে, বেড়েছে অন্যায়-অবিচার ও হানাহানি।

শুধু তাই নয়। বিবাহ প্রথায়ও দেখা যাচ্ছে আমূল পরিবর্তন। বিবাহে উঁাথপ দিয়ে, অচাই দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠান শুধুমাত্র গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমতলে দেখা যাচ্ছে বিবাহে আধুনিকতা সেখানে অনুপস্থিত অচাই ও উঁাথপ। হিন্দুশাস্ত্র মতে বেদী ও সাজসজ্জাই বিবাহের উপকরণ। অবহেলিত প্রাচীন বিবাহ প্রথা, নিজস্বতা। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বিপুলহারে বিবাহ বিচ্ছেদ, দ্বিতীয় বিবাহ, এমনকি পণ দেয়া নেয়া শুরু হয়ে গেছে। যা আমাদের সমাজে কোন দিনই ছিল না। শুধু তা নয় সামাজিক পূজা-পার্বণে অনীহা ও সামাজিক রীতিনীতি প্রতিপালনেও সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা যদি চলতে থাকে সমাজ কলুষিত হতে বাধ্য।

আদিবাসীরা যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে প্রভাবিত হয়েছে ধর্মক্ষেত্রেও। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ ত্যাগ করে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে। অনেকে অনুকূল ঠাকুর ও স্বরূপানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। অবার অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম

গ্রহণ করছে। আমার শ্বশুরমশাই, ফেনা রায় সর্দার (মহারাজা কর্তৃক মনোনীত সর্দার) ব্যবসা সূত্রে বাঙালিদের সংগে সুসম্পর্ক ছিল এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরও আনাগোণা ছিল। তা থেকে প্রভাবিত হয়েই হয়তো বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন (ষাট থেকে সত্তর দশকে)। এখনো উনার হাজারো শিষ্য বর্তমান। কিন্তু পত্নীকে মানে আমার শাশুড়িমাকে (বিদ্যালক্ষ্মী দেববর্মা) বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত করতে পারেননি। তিনি সাধু হয়েছেন মাত্র। তবে বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করা আর দেখা যাচ্ছে না। প্রজন্ম তা থেকে পিছপা। কারণ ওরা নিজস্ব সংস্কৃতির সংগে তার মিল খুঁজে পায়নি। তবে খ্রীষ্টান ধর্মের দিকে ঝুঁকছে, তা সবই প্রভাবিত, নিজস্ব নয়। পরিবর্তনের চাকা ঘুরছে, তা কোথায় গিয়ে থামবে জানি না। সমাজ পরিবর্তনশীল। উন্নতির স্বার্থে তা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে এই পরিবর্তন হতে হবে নিজস্বতাকে বজায় রেখে। সামঞ্জস্যহীন পথ ধরে চলতে শুরু করেছে বহুকাল ধরে। এখনো ভবঘুরে। বিবর্তনের পথ বেয়ে চলতে গিয়ে ত্রিপুরার আদিবাসীরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে, হারিয়ে ফেলছে অতি প্রাচীন ঐতিহ্যময় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। 'ত্রিপুরা' আদিবাসীরাও এর ব্যতিক্রম নয়।

বর্তমানে ত্রিপুরার আদিবাসীরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে আসছে। উচ্চ পদে ও বিভিন্ন পদে চাকরিরত-এর সংখ্যাও বেড়েছে ঠিকই। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে অতি নগণ্য। আদিবাসীদের বহুলাংশ এখনো জুমচাষ নির্ভর, অধিকাংশ গ্রামবাসী তারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। দিন মজুর, বি পি এল কার্ড ও রেগার কার্ড পাওয়ার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত। গ্রামের কোথাও খাদ্যাভাবে মৃত্যু, তো কোথাও অজানা রোগে, কোথাও পানীয় জলের অভাব, তো কোথাও বিদ্যালয়ের, এ কি বীভৎস রূপ, যা আধুনিক কালে ভাবা যায় না। কিন্তু এটাই গ্রাম্য আদিবাসীদের করুণ বাস্তবচিত্র। স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন তাদের কাছে এখনো আকাশ কুসুম স্বপ্ন মাত্র। এটাই সত্যি এমনটাই হচ্ছে। এটা কি বিবর্তন না, বিপর্যয় তা সহজেই অনুমেয়।

একথা সত্যি যে, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমেই জাতি ও সমাজ উর্বর হয়। সম্পর্কও সুদৃঢ় হয়। তবে এই আদানপ্রদান অবশ্যই হতে হবে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধরে রেখে। কারণ, সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি, ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভ্যাসই হলো জাতির পরিচয়। তা লালন-পালনের মাধ্যমেই জাতির অগ্রগতি ও উন্নতি সম্ভব।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বৃহৎ অংশ নিজস্ব সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। নিজস্বতাকে জানতে আগ্রহী। সামাজিক পরিকাঠামো রীতি নীতি ফিরে পেতে তারা উদ্‌গ্রীব। তাদের মাধ্যমেই ত্রিপুরার আদিবাসীরা ফিরে পাবে নতুন দিগন্ত, নবীন প্রাণ। সমাজের সার্বিক উন্নতির মাধ্যমেই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। প্রত্যেক রাজ্যের উন্নয়নের মাধ্যমই গড়ে ওঠে প্রগতিশীল দেশ। যা আমরা সকলেই কামনা করি। তার জন্য প্রয়োজন সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও ভালোবাসা।

" Custom, Culture and Relegion is the identity of any caste or race. If custom, culture and relegion is lost, everything is lost. So we should preserve it, protect it, and foster it. This is the way to Survive."

ত্রিপুরার আদিবাসী বিশেষ করে ককবরক ভাষাভাষী বিভিন্ন সম্প্রদায় যেমন - ত্রিপুরী (ত্রিপুরা

ও দেববর্মা) সম্প্রদায়, রিয়াং সম্প্রদায়, জমাতিয়া সম্প্রদায়, রূপিনী ও কলয় (হালাম) সম্প্রদায়, নোয়াতিয়া সম্প্রদায়, মুড়াসিং সম্প্রদায় ও উচই সম্প্রদায়ের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন হলেও সাদৃশ্যই বেশী। তাদের সকলের মাতৃভাষা ককবরক, লোক সঙ্গীত ও নৃত্য সেই জাদু কলিজা, গড়িয়া, মামিতা, জীবন জীবিকা, খাদ্যাভাস, পোষাক পরিচ্ছদ, পূজা পার্বণ, খেলাধূলা সব প্রায় একই রকম। সামান্য বৈসাদৃশ্যের উর্ধে উঠে বলতে পারি, ত্রিপুরার আদিবাসীরা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদের উৎপত্তি স্থল ও গন্তব্য স্থল একই। কাজেই এক ভাবাই সমীচিন।

অজিতা ত্রিপুরা

১৯৭২ সালে ৭ই মার্চ উত্তর জেলার ময়নামা গ্রামে জন্ম। পিতা রাজ্যের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সুলেখক শ্যামাচরণ ত্রিপুরা। পড়াশুনা ময়নামা প্রাইমারী স্কুলে শুরু। আগরতলা তুলসীবতী ও বিজয়কুমার স্কুল থেকে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক। পরে মাদুরাই কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে এম. এ ও M. Phil (English) বর্তমানে রামনগর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। সঙ্গে সমাজসেবা। বর্তমানে মুভমেন্ট ফর ককবরক-এর ভাইস্ চেয়ারপার্সন, বরক দফা এবং হিলস উইমেন সোসাইটির রাজ্য কমিটির কার্যকরী কমিটির সদস্য পদে বৃতা। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ককবরক ভাষার শিক্ষিকা।

মুড়াসিং

ত্রিপুরায় বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর ন্যায় মুড়াসিংও একটি। দীর্ঘদিন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির অভাবে সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্তমানে নিজেদের বংশ পরিচয় দিতে দেববর্মা, নোয়াতিয়া, ত্রিপুরা প্রভৃতি ব্যবহার করছেন। ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজগুলির মধ্যে কোথাও হালাম সম্প্রদায়ের শাখা, কোথাওবা নোয়াতিয়া, কোথাওবা ত্রিপুরী হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবার কোথাওবা কোন উল্লেখই করা হয়নি। তদ্রুপভাবে বিলক, মসবাং, তৌয়মুকদক, কংদাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ও স্বীকৃতির অভাবে বর্তমানে নিজেদের পরিচয় হারিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের পরিচায়ক হিসেবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। বর্তমান যুগেও ত্রিপুরার নৃতত্ত্ব আলোচনায় ঐসব সম্প্রদায়গুলি রহস্যজনকভাবে অনুল্লেখিতই রয়ে গেছে। মনে হয় নিরপেক্ষ এবং ক্ষেত্র-অনুসন্ধানের মাধ্যমে নৃতত্ত্বগত পুনরুবিন্যাস প্রয়োজন। রাজ্যের অধিবাসীদের নিয়ে নৃতত্ত্বগত বিন্যাস এখনও হাস্যকর হিসেবে রয়ে গেছে। যার আশু সমাধান জরুরি। যাই হোক সেই কাজ পন্ডিতদের, আমার মত সাধারণ উৎসুকীদের প্রবেশের অধিকার নিয়েই সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে।

উদ্ভব

'মুড়াসিং' শব্দটি শুনলেই নব-পরিচিতদের কাছে এক কৌতুহলের বিষয় হয়ে যায়। আবার কারো কারো কাছে ব্যাখ্যা শুনতে পাই 'মড়া গরুর শিং'। খুবই খারাপ লাগে, অথচ উপায়ও নেই। বংশের পরিচয় এবং উদ্ভব-এর কৌতুহলবশত অনুসন্ধানে যতটুকু পাওয়া গেল সেটাই বলছি।

১। জুমকেন্দ্রীক জীবন-যাপনের সময়ে দু-তিনটি পাশাপাশি জুমচাষকে বলা হত 'হুক আলেম'। আবার সেইরকম 'হুক আলেম' বিশাল আয়তনের হলে, অর্থাৎ কুড়ি-পঁচিশটি জুম পাশাপাশি হলে তাকে বলা হত 'হুক লামবির বা হুক লাম্বির'। হুক লাম্বির আয়তনে এতই বড় হত যে, সেটাকে একদিনে একদিক থেকে অন্যদিকে পেড়িয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর ছিল। সেইসব হুক লাম্বির-এর জন্যে জঙ্গল কাটার পর আগুন দিতে হলে পাশাপাশি লোকালয়ে পূর্বে থেকেই খবরাখবরের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হত কখন আগুন দেওয়া হবে। জুমে আগুন দেওয়ার সময়ে কাটা জুমে কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্যেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেইরকমের কোনও এক 'হুক লাম্বির'-এর মাঝ দিয়ে একদল লোক পাড়াপার হচ্ছিল। জুমে আগুন দেওয়ার দিনক্ষন ওদের জানা ছিলনা। তাই তারা জুমের আগুনে পুড়ে মারা যায়। তাদের যে কিছু আত্মিয়-স্বজন, যাঁরা বেঁচেছিল, তারা আপন হারার শোকে নিস্তেজ হয়ে যায়। এতই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, তাঁদের প্রতিরোধ স্পৃহা বা প্রতিশোধ স্পৃহা লুপ্ত হয়ে যায়। তাতে প্রতিবেশীরা তাদেরকে 'বকরং কীথীয়', কেউবা 'সির কীথীয়' বলে সম্বোধন করতে থাকে। সেই 'বকরং কীথীয়' শব্দটিই পরে বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে 'মড়া শিং' শব্দের সৃষ্টি হয়। আরও পরে উচ্চারণগত ধ্বনি বিপর্যয়ের মাধ্যমে 'মড়া শিং' থেকে 'মুড়াসিং' শব্দের উৎপত্তি ঘটে।

গল্পের মধ্যে জীবন-যাপন প্রণালী ও শব্দ-উদ্ভবের বর্ণনা থাকলেও উল্লিখিত স্থানান্তরকারী জনগনের অবস্থান সম্পর্কে কোন কিছু স্পষ্ট বিবরণ নেই। তাছাড়া স্থানান্তরকারীদের স্থানান্তরের

কোনও দিক নির্নয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই উদ্ভব সম্পর্কিত এই গল্পটি অসম্পূর্ণ বলা যায়। তাছাড়া শব্দ-উদ্ভবের বর্ণনার নিরিখে বলা যায় সম্প্রদায়টি হয়তোবা বঙ্গভাষীদের প্রতিবেশী ছিল। তাই যদি হয়ে থাকে তবে এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব বেশীদিন হয়নি বা তেমন প্রাচীন নয় বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়।

২। রাজন্য শাসনব্যবস্থায় রাজ কর্মচারীরা বিভিন্ন লোকালয়ে প্রতিবৎসরই খাজনা আদায়ের জন্যে যেত। রাজ কর্মচারীগণ এমনই একটি লোকালয়ে গিয়ে পৌছান যেখানকার অধিবাসীদের কোনও সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই। যাঁরা শিং-সহ মৃত পশুর মাথা দিয়ে সুন্দরভাবে গৃহসজ্জা করত। তাঁদের কাছে খাজনা এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিন্ত ছিল। সেহেতু খাজনা আদায়কারী রাজকর্মচারীগনের প্রতিবৎসরেই ঐ লোকালয়ে যাতায়াত ছিল। লোকালয়ের পরিচয়ের জন্যে ওঁরা "নগ' বকরং কৌথীয় তননাইরগ" শব্দ ব্যবহার করত। পরবর্তী কালে সেই শব্দগুচ্ছ একত্রিকরণের মাধ্যেমে পরিবর্তিত হয় 'বকরং কৌথীয়রগ'। সেই 'বকরং কৌথীয়রগ'-শব্দটাই রাজঅন্দরের বঙ্গভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে 'মড়া শিং' হয়ে যায়। পরে 'মড়া শিং' থেকে 'মুড়াসিং' শব্দের সৃষ্টি।

গল্পে অধিবাসীদের সৎ, সাহসিকতা, বীরত্বের পরিচয় দিলেও পূর্বের মতই বাসস্থানের নির্দেশ করেনা। শিং-সহ শিকারকৃত পশুর মাথা ঘরে রেখে দেওয়া নিশ্চয়ই বীরত্বের প্রতিক। প্রাচীণকালে রাজা-মহারাজাদেরও সেই অভ্যাস ছিল। বর্তমানেও সেই অভ্যাস বা মৃত পশুর মস্তক দিয়ে ঘর সাজানোর রেওয়াজ রয়ে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেই এই অভ্যাস বিদ্যমান। কিন্তু সেই অভ্যাস থেকে একটি সম্প্রদায়ের পরিচয় ঘটবে সেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশও থেকে যায়। কেননা "নগ' বকরং কৌথীয় তননাইরগ"-এর মধ্যে মহারাজারাও আছেন। তাই বলে মহারাজা 'মড়া শিং' বা 'মুড়াসিং' হতে যাবেন কেন?

৩। কোনও এক সময়ে রাজ-অন্দরে রাজার এক রানীর রাজপুত্রের সাথে ঐ একই রাজার মনিপুরী রাণীর মেয়ের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। ভাই-বোনের এই অবৈধ্য সম্পর্ক কেউ মেনে নেবেনা ভেবে এক সময় রাজকুমার ও রাজকুমারী প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গিয়ে সংসার পাতে। কথিত আছে, বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার উরমাই বা উমরাই-এ গিয়ে ওরা অবস্থান করেন। সন্তান সন্ততিদের বংশ পরিচয় ও তাঁদের প্রেমকে স্মরণীয় করার জন্যে রাজকুমার ও রাজকুমারী একটি নতুন শব্দের সৃষ্টি করেন। তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর ও মনিপুরী শব্দ জুড়ে 'মুড়াসিং' শব্দ তৈরী করেন। সেটাই পরে তাদের বংশ পরিচায়ক হয়।

রাজ-অন্দরের কেচ্ছা কেলেংকারী অনস্বীকার্য হলেও গল্পে উল্লেখিত ব্যক্তিদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। নামের আদ্যাক্ষরগুলি যুক্ত করে নতুন শব্দ তৈরী করার মতো যে পান্ডিত্য বা যোগ্যতা সেটা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাছাড়া সেই ঘটনা যদি হয়েই থাকে তবে কখন, বা কোন রাজার সময়ে, কোথায় সেটা উল্লেখ নেই। তাই এই গল্পটিও সমস্ত দিক থেকে সঠিক বলে স্বীকার করা যায় না, কেবল কাল্পনিক হিসেবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

৪। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কিত আরো একটি গল্প হল, প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থানরত জনগণকে কিছু লোক ধর্মের পথে ন্যায়ের মাধ্যমে শান্তিতে রাখত। ঐসব লোকেরা এর ফলে

সমাজে গন্যমান্য হিসেবেই ছিল। অর্থৎ অন্যান্য লোকেদের কাছে তাঁরা সমাদরের ছিল। রাজা সেইসব ঘটনা এবং তাদের ঐ আশ্চার্যজনক গুণাবলীর জন্যে তাঁদেরকে 'পাহাড়ের শিং' বলে আখ্যায়িত করেন। পশুদের মাথায় যেমন শিং থাকে তেমনী জঙ্গলঘেরা অশিক্ষিত লোকেদেরকে সঠিক পথে চালনাকারীদের তিনি পাহাড়ের সিং বলে আখ্যা দেন। সেটিই পরে সাধারণ বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে 'মুড়া শিং' বা 'মুড়া সিং' হয়ে যায়। উল্লেখ্য, সাধারণ কথিত বাংলায় ছোট টিলাকে 'মুড়া' বলা হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাই যদি হয়ে থাকে তবে কখন, কোন অঞ্চলে, কোন রাজা সেগুলির প্রশ্ন থেকে যায়। অর্থাৎ পাহাড়ে বসবাসকারী হিসেবে দেখা গেলেও বাসস্থানের সঠিক পরিচয়, সময় প্রভৃতি অপরিপূর্ণই থেকে যায়।

৫। উদ্ভব সম্পর্কিত আরো একটি গল্প আছে। যে গল্পটি সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন না, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যঙ্গাত্বক পরিচয়ের জন্যে বলেন। সেইরূপ ব্যঙ্গাত্মক গল্প-কাহিনী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একে অপরকে হীন করার জন্যেই বলা হয়। যেমন বাঙ্গালীদের ককবরকভাষীরা বলেন উানজীয় বা মুসলীমদের বলেন থুরুক বা থুলুক বা বখরক কীরাই। তেমনি দৌলত আহাম্মদের লেখায় পেলাম বাঙ্গালীরা ককবরকভাষীদের বলেন সেঙ্গা। আবার খেয়াম-রা ককবরকভাষীদের বলেন সিপাক কতর, আর ককবরক ভাষীরা হালাম-কুকিদের বলেন সিকাম। যাই হোক, এবার পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসি। কোনও এক সময়ে জুমে আগুন দেবার পর পুড়ানো জুমে ঝলসানো শিং-সহ এক আশ্চার্যজনক দু-শিং ওয়ালা পশু দেখতে পায় কিছু লোকজন। সেই ঝলসানো পশুর মাংস খাবার পর আশ্চার্যজনক পশুর শিং-সহ মাথা রেখে দেয়। পরে তাঁরা সেই শিং-সহ মাথা রাজার কাছে নিয়ে যান। তাঁরা আশ্চার্যজনক দু-সিং ওয়ালা পশু আবিস্কারের জন্যে রাজার কাছে অর্থ এবং সম্মানের আশায় গিয়েছিল। রাজা সেটা দেখেই চিনতে পারেন আশ্চার্যজনক পশুটি গরু ছাড়া আর কিছুই নয়। একজন হিন্দু রাজার অধিনস্থ প্রজারা গো-ভক্ষন করেছে। তাতে রাজা বেজায় চটে যান এবং ভৎসর্না করে অপমানসূচক পরিচয় দিয়ে দেন 'মড়া শিং'। সেই শব্দটাই পরে প্রতিবেশীদের মুখে উচ্চারণগত বিকৃতির মাধ্যমে 'মুড়াসিং' হয়ে যায়।

এটা ঠিক যে, অন্যান্য দিকগুলিকে বাদ দিলে সমতল কৃষিকেন্দ্রিক জীবন-যাপন প্রণালীতেই একমাত্র গরু-র ভূমিকা বেশী। আমাদের ত্রিপুরায় সমতল কৃষির প্রচলন একশো বছরের বেশি হয়নি বলা যায়। তাছাড়া রাজ্যে বসবাসরত আদিবাসীদের সমতল কৃষিতে প্রবেশ মূলত: মহিষের মাধ্যমে হয়েছিল। ত্রিপুরায় সমতল কৃষিতে গরুর ব্যবহার পঞ্চাশ বছরও হয়নি। উল্লিখিত গল্পের সত্যতা স্বীকার করলে মুড়াসিংদের উদ্ভব একশো বা পঞ্চাশ বছর হয়নি বলা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এই সম্প্রদায় উদ্ভবের পর বৈষ্ণব ধর্ম দীক্ষাকারী ধর্মগুরু বনমালী গোস্বামীর শিষ্য হরিচান বা হরিচাঁদ-এর ষষ্ঠ পুরুষ-ই বর্তমানে ষাটোর্দ্ধ, এবং জীবিত রয়েছেন। তাছাড়া গল্পে বাসস্থান ও পরিচয় প্রদানকারী রাজার কোনও পরিচয় নেই, শুধুমাত্র গল্প।

উদ্ভব সম্পর্কিত উল্লেখিত গল্পগুলির মধ্যে কোনটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। যার কারণে সম্প্রদায়ের পূর্ব পরিচয়, বাসস্থান প্রভৃতি নিয়ে আলোচণা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নৃতত্বগত গবেষণাই একমাত্র

সঠিক পরিচয় দানে সক্ষম হবে বলে আশা রাখি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, তথাকথিত গবেষণার নামে কিছু গবেষক আমাদের ত্রিপুরার অধিবাসীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই কেবল খেলছেন না, ভবিষৎ গবেষণাকারীদেরকেও পথভ্রষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট মশলা রেখে গেছেন বা তথ্য বিকৃতি করে ডিগ্রি নিয়ে বসে আছেন নিজেদের তথাকথিত এক্সপার্ট হিসেবে। যা অত্যন্ত দুঃখের এবং একটা অপরাধও, যার শাস্তিবিধান ভারতীয় সংবিধানে আছে কিনা জানা নেই।

সামাজিক কাঠামো

মুড়াসিং সম্প্রদায়ের সামাজিক কাঠামোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়, ১) যুবক-যুবতীদের সংগঠন, ২) বয়স্কদের সংগঠন, ও ৩) বৈষ্ণবদের সংগঠন। বর্তমানে এই তিন ধরনের সামাজিককাঠামো ছাড়াও সমস্ত সংগঠনকে নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি বা উর্দ্ধতন পরিষদও রয়েছে। পূর্বে কিন্তু সেরূপ কোন উর্দ্ধতন পরিষদ ছিল না, তখন কেবল চারটি খিল বা দফার মূখ্য রাজপ্রতিনিধি মিসিপ ছিল। গত তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে এই সংগঠন বা কমিটি গঠিত হয়েছে। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি দফা বা 'খিল' আছে। সেগুলি হল, ১) মুড়াসিং, ২) দংগ্র, ৩) মসবাং, এবং ৪) ততরাম।

১) মুড়াসিং ঃ দফার লোকেরা বর্ণে কিছুটা কালো, পাতলা শক্তপোক্ত দেহের গঠন, টিকলো নাক ও কর্মঠ হন। পশ্চিম জেলার বুরাঘাট, তীয়উান্দাল, দক্ষিন জেলার তুলামুড়া, ধুপতলি, কাংগ্রি, চুংথিং, পতিছড়ি অঞ্চলে এদের বসতি দেখা যায়।

২) দংগ্র ঃ দফার লোকেরা সামান্য তামাতে বর্ণ, পরিষ্কার, বেশ শক্তপোক্ত সুঠাম দেহের অধিকারী। ওদের সুউচ্চ নাক ও দেহ পেশীবহুল হয়ে থাকে। পশ্চিম ত্রিপুরার বুরাঘাট, তীয়উান্দাল, তীয়ক্রামা, ন-পারা, দক্ষিন জেলার কাংগ্রি, চুংথিং, ধুপতলি, তাইদুম, তারপাদুম, পতিছড়ি, রাঙ্গাছড়া, কালাবন এলাকায় এদের বসতি আছে।

৩) মসবাং ঃ দফার লোকেরা কিছুটা বেঁটে ও গায়ের রং ফর্সা হয়। নাক কিছুটা চ্যাপ্টা ধরণের এবং দেহে কমনীয়ভাব বর্তমান। এঁরা প্রচন্ড কর্মোদ্যোগী হন। পশ্চিম জেলার সুনদুল, কলাক্ষেত, তীয়উান্দাল, বুরাঘাট, তীয়ক্রামা, থলিবারি, দক্ষিন জেলার তুলামুড়া, তাইদুম, তারপাদুম, পতিছড়ি, চুংথিং এলাকায় এদের বসতি আছে।

৪) ততরাম ঃ ততরাম দফার লোকেরা বেঁটে ও গাঁয়ের রং কিছুটা কালো হয়। নাক চ্যাপ্টা ও মুখের আদল চ্যাপ্টা আকৃতির হয়। এঁরা খুবই পরিশ্রমী, কর্মঠ এবং উদ্যোগীও। পশ্চিম জেলার তীয়ক্রামা, শামুকছড়া, গামাক্রুই, থলিবাড়ি, সুনদুল, কলাক্ষেত, দক্ষিন জেলার তাইদুম ও তারপাদুম অঞ্চলে এদের বসতি দেখা যায়।

এগুলি ছাড়াও কংদাই, তীয়মুকদক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে নিজেদের পরিচয় মুছে ফেলে মুড়াসিং সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। উপরে উল্লেখিত দফা-পরিচয়ের বর্ণনা হয়তোবা অতীতে দফা বা খিল প্রধানের ছিল। কেননা সেইরূপ অর্থাৎ দফা-পরিচয়ের বর্ণনানুযায়ী দফার সকল লোকেরই একই ধরনের চেহারা হবার কথা, কিন্তু বর্তমানে বা বাস্তবে সেরূপ হয়না বা সম্ভব নয়।

প্রতিটি মুড়াসিং জনগনের লোকালয়েই একটি করে যুবকদের সংগঠন থাকে। মুলত:

যুবসম্প্রদায়কে সংগঠিত করে যুবশক্তির সদ্ব্যবহারের জন্যেই এই প্রক্রিয়া, যা ত্রিপুরায় বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। লোকালয়ের সমস্ত অবিবাহিত যুবক-যুবতি নিয়েই এই সংগঠন সংগঠিত হয়। যুবক-যুবতীদের সমস্ত ন্যায়-অন্যায়, দোষ-গুণের বিচার করে যুব সংগঠন। তাছাড়া অন্যান্য অঞ্চলের যুবক-যুবতীর সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনও মূলতঃ এই সংগঠনেরই কাজ।

গ্রাম-স্তরে সমস্ত অপরাধের বিচার ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য গ্রাম চৌধুরীর নের্তৃত্বে থাকে একটি সামাজিক সংগঠন। সংগঠনের নেতৃত্বে থাকেন চৌধুরী, কারবারি, খান্দল, বান্দারি ও সিরুমনি। চৌধুরী গ্রামস্তরের সমস্ত কিছুর শীর্ষে অবস্থান করেন। কারবারি বিচার চলাকালে বা সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদনকালে উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। খান্দল-এর কাজ হল, বর্তমানের অন্যান্য সংগঠনের কোষাধাক্ষের মতো। সামাজিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ মুলতঃ খান্দলেরই কাজ। বান্দারি যে-কোন সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদনকালে স্টোর কীপারের কাজ করেন। সিরুমনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংগীতের নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ থাকে যে, মুড়াসিং সম্প্রদায়ের প্রতিটি সামাজিক অনুষ্ঠানেই ধর্মীয় গীতি গাওয়া হয়। তাছাড়া গ্রামের মধ্যে যে-কোনও সংগীত সম্পর্কিত অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্যে প্রথমেই সিরুমনি-র অনুমোদন নিতে হয়।

একটি সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠানে মুড়া সিং যুবক-যুবতী

গ্রাম-স্তরের মতই প্রতিটি দফা বা খিল অনুযায়ী প্রত্যেক খিল বা দফার আরো একটি সংগঠন থাকে। সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কোন নাম না থাকলেও তাতে রায়-এর নেতৃত্বে সানুউান, কাসকক, সিরুমনি প্রমুখ থাকেন। রায় সংগঠনের সর্বোচ্চে অবস্থান করেন। অর্থাৎ বর্তমানের যে -কোনও সংগঠনের সভাপতির কাজটি পরিচালনা করেন রায়। সানুউান সংগঠনের কর্ম সম্পাদকের কাজটি দেখাশুনা করেন। কাসকক হলেন দফা বা খিল-এর কোষাধাক্ষ্য। গ্রামস্তরের সিরুমনি-র মতই দফা বা খিল স্তরের সিরুমনি তাঁর কার্য সম্পাদন করেন। তবে গ্রামস্তরের সিরুমনি-র কাজ গ্রাম স্তরেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু খিল-এর সিরুমনি-র কাজ সংশ্লিষ্ট খিলের সমস্ত গ্রামেই অনুসরনীয়।

উপরোক্ত পদ্ধতি বা কাঠামো অনুযায়ী মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মধ্যে চারটি খিল বা দফার রায়, সানুউান, সিরুমনি, কাসককদের নিয়ে সম্প্রদায়গত সংগঠন গঠন করা হয়। এই সংগঠনকেই বর্তমানে উর্দ্ধতন পরিষদ বা উপদেষ্টা কমিটি বলা হয়। যার নেতৃত্বে থাকেন একজন মিসিপ। এক

সময়ে কর্ণেল মহিম ঠাকুর-ও মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মিসিপ ছিলেন। মিসিপ মূলত রাজপরিবার বা শাসকের নিকট সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় রাজতন্ত্রের অবসানের পরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মুড়াসিং সম্প্রদায়ের কোনও মিসিপ নেই। উর্দ্ধতন পরিষদ বা উপদেষ্টা কমিটিতে বর্তমানে চারটি খিল বা দফার রায়-গণকে নিয়ে সাধারণ সভাপতি মন্ডলী আছেন।

বৃদ্ধ বয়সে বৈষ্ণব বা বইরাগিদের মধ্যেও অনুরূপ সংগঠন দেখা যায়। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিটি খিল বা দফা অনুযায়ী চারজন মহন্ত থাকেন। মহন্তদের মধ্যে একজন থাকেন পাতিদার বা মুখ্য মহন্ত। পাতিদার রাজস্বীকৃতির তাম্রপত্র-সহ অন্যান্য দলিল, রাজ-পরিবারের সাথে যোগাযোগের চিঠিপত্র, প্রাচীণ ধর্মগুরুদের ব্যবহৃত ঠাকুর দেবতা প্রভৃতির বাহক। বর্তমানে সম্প্রদায়ের পাতিদার ও সেইসব সম্পত্তিগুলি দক্ষিন জেলার শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি মুড়াসিং পাড়ায় আছে। পাতিদার ও মহন্ত-এর নেতৃত্বে বা তাঁর অধিনে থাকেন তলুউা, পুজারি, সরিফুদদার ও ফুদদার। তলুউা মহন্ত-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। মহন্ত-এর অবর্তমানে বা তাঁর অনুমতিক্রমে তলুউা মহন্ত-এর কাজ সম্পাদন করতে পারেন। পুজারি ঐতিহ্যবাহি দেবদেবী ও ঠাকুর পুজো করে থাকেন। সরিফুদদার ধর্মীয় তোলা আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকেন এবং ফুদদার ঐতিহ্যবাহি সম্পত্তিগুলি রক্ষণাবেক্ষন করে থাকেন।

ধর্ম

মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেরা মূলতঃ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। বর্তমানে কিছু লোক খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে দেখা যাচ্ছে। ধর্মীয় আচরণগতভাবে মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে তিন ধরনের অবস্থান দেখা যায়। ১) বিরাগি বা বইরাগি, ২) সাধু, ৩) সাক্ত। জন্মের সময়ে সাধু, কৈশোর ও যৌবনে সাধু বা শাক্ত এবং পরিণত বয়স বা বৃদ্ধ বয়সে বিবাগি বা বইরাগি হতে হয়। প্রাচীন কাল থেকেই বা উদ্ভবের সময় থেকেই মুড়াসিংগণ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিল সেকথা বলা যায় না। সম্ভবত অন্যান্য সাধারণ আদিবাসীদের মতই তাঁদের ধর্মও বর্তমানের বহু আলোচিত 'টোটিজম, অ্যানিমিজম, অ্যানিম্যাটিজম' ছিল। ধর্মান্তকরণের কাহিনীও সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ —

কোনও এক সময়ে কোনও এক লোকালয়ে মহামারি দেখা দেয়। লোকালয়ের মধ্যে প্রায় সবই মহামারিতে মারা গেলেও একই পরিবারের বড় ভাই ও তাঁর ছোট ভাই-এর স্ত্রী-ই একমাত্র বেঁচে যান। স্বজন হারা-র শোকে তাঁরা আর একে অপরকে ছেড়ে চলে যাননি, একই ছাদের নিচে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক অর্থাৎ বড় ভাই ও ছোট ভাই-এর স্ত্রী একই ঘরে বসবাস করা সামাজিক অপরাধ হবার কারণে তাঁরা সমাজচ্যুত হয়। এই ধরণের সম্পর্ক বা "বুউাইজৗক-বুউাই" সম্পর্কীত লোকেরা একে অপরকে চোখ তুলে দেখাও গর্হিত অপরাধ বলে গন্য হয়। উল্লেখ্য, মগ বা মুং জাতিদের মধ্যে এ ধরনের বুউাইজৗক-বুউাই সম্পর্কিত লোকেরা একইসাথে একই জলাশয় বা নদী বা ছড়ার জলস্পর্শ করাও অপরাধ হিসেবেই গন্য হয়।

সমাজচ্যুত হবার পর তাঁরা বাংলার বৈষ্ণবধর্মের তীর্থস্থান নবদ্বীপে চলে যান। নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহন করার পর উল্লেখিত বড় ভাই নতুন নাম ধারণ করেন প্রভুপাদ বনমালী

গোস্বামী। নবদ্বীপে গৌর নিতাই-এর নিকট তিনি বা তাঁরা বারো বছর ধরে ধর্মশিক্ষা নেন।

ধর্মশিক্ষা শেষে স্বদেশের টানে বনমালী আবার পূর্বের লোকালয়ে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর লোকালয়ের লোকেরা তাঁকে প্রথমে সাধুপুরুষ হিসেবেই সাদরে গ্রহন করেন। বনমালী তাঁর সমাজের মধ্যে নানাবিধ অনাচার, চুরি, রাহাজানি, মদ্যপসহ বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে পরেন এবং সমাজের জনগনকে বৈষ্ণবধর্ম শিক্ষা দিতে শুরু করেন। অর্থাৎ সমাজ সংস্কারের কাজে হাত দেন। প্রাথমিক অবস্থায় সমাজের লোকেরা তাঁকে এবং তাঁর শিক্ষাকে মেনে নিলেও সেটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। লোকেরা বৈষ্ণব ধর্মের সাধারণ রীতিনীতিগুলি সহজেই মেনে নিতে পারেননি। ফলতঃ বনমালী আবারো লোকালয় থেকে বহিস্কৃত হয়।

মুড়াসিংদের কুলগুরু
শ্রীশ্রী হরিচাঁদ গোস্বামী

বিষন্নমনে বনমালী আপন লোকালয় ছেড়ে চলে যান বর্তমান বাংলাদেশের চিটাগং পাহাড় এলাকার উমরাই বা উরমাই অঞ্চলে। সেখানে তিনি হরিচাঁন এবং বলাইচান প্রমুখদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা দেন। তখন চাঁদপুর, বারিশা, হরিনা প্রভৃতি এলাকায় বলাইচাঁদ ও হরিচাঁদ-এর প্রচেষ্টায় বনমালী-র শিষ্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। বনমালীর মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্য শিষ্য বলাইচাঁদ ও হরিচাঁদ গুরু-র অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের ভার তুলে নেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে জীবন-যাপন প্রনালীগুলি পরিবর্তনে হাত দেন। বলা যায় হরিচাঁদ-এর হাত ধরেই মুলত: মুড়াসিং সমাজ নবজাগরণের স্বাদ পেয়েছিল। হরিচাঁদ -এর নেতৃত্বে মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেরা বর্তমান ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমা অঞ্চল দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। এর পর তাঁরা ধীরে ধীরে উদয়পুর, বিলোনীয়া এবং অমরপুর মহকুমায় ছড়িয়ে পড়ে। হরিচাঁদ ত্রিপুরায় প্রবেশ করেই বসবাসের জন্যে মহারাজার কাছে অনুমতি আদায় করে নেয়। তখন মহারাজা সম্প্রদায়ের লোকেদের দেখাশোনা করার জন্যে প্রথম মিসিপ নিয়োগ করেন।

হরিচাঁদ-এর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোক প্রবেশ করার সাথে সাথে বলাইচাঁদ-এর নেতৃত্বেও বিশাল সংখ্যক লোক বর্তমানের দক্ষিন ত্রিপুরার সাব্রুম ও বিলোনীয়া মহকুমা দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। কিন্তু বলাইচাঁদ-এর রাজ-স্বীকৃতি লাভের পুর্বেই হরিচাঁদ স্বীকৃতি নিয়ে নেয়। ফলে বলাইচাঁদ ও তার অনুগামীরা রাজানুকুল্য পায়নি। সেই অস্বীকৃতির ফলেই কিছুকাল পর্যন্ত নিজেদের নিজস্ব পরিচয় ধরে রাখার পর ধীরে ধীরে বলাইচাঁদ-এর অনুগামীরা নিজেদের সম্প্রদায়গত পরিচয় মুছে ফেলে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে নিজেদের মিশিয়ে দেয়। বেশীরভাগ অনুগামীরাই নিজেদেরকে ত্রিপুরা, দেববর্মা, নোয়াতিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত করে ফেলে। যা বর্তমানেও চোখে পড়ে। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের চারটি খিলের মধ্যে ততরাম ও মসবাংদের মধ্যে এখনও প্রায় বেশীর ভাগই নিজেদের মুড়াসিং হিসেবে পরিচয় দেননা, বরং সম্প্রদায়গত

পরিচয়ে নিজেদেরকে ত্রিপুরা বলে জাহির করেন, অথচ ধর্মীয় কাজকর্মে নিজেদেরকে মুড়াসিং সম্প্রদায়ভুক্ত বলতে কোনও দ্বিধা করেন না।

হরিচাঁদ গোস্বামীকে মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেরা রাধা-কৃষ্ণ গোপাল-গোবিন্দের সাথে একাসনে বহুকাল আগে থেকেই পুজো করে আসছেন। প্রতি বৎসর রাস-পূর্ণিমার দিনে এ-উপলক্ষে একটি মেলাও বসে আসছে, একে 'বানি'-ও বলা হয়। বর্তমানে এই মেলা মুড়াসিং সামাজিক-সাংস্কৃতিক মেলা নামেই পরিচিত। এই মেলা-টি মুড়াসিং সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকালয়েই অনুষ্ঠিত হয়। তবে যেই স্থানে হরিচাঁদ-এর ব্যবহৃত খরম, এবং সামাজিক ধর্মীয় সম্পত্তি থাকে সেখানে বেশ বড়ো করে মেলা বসে। অন্যান্য অঞ্চলে একদিন আগে মেলা বা আনুষ্ঠান সম্পাদনের পর মূল মেলা বসে। বর্তমানে এটি দক্ষিন ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি মুড়াসিং পাড়ায় বসছে। সেখানে হরিচাঁদ ঠাকুরের একখানা মন্দিরও রয়েছে।

হরিচাঁদের আসল নাম ছিল হানকরাই (মতান্তরে খিনকরাই)। তিনি মসবাং দফার লোক ছিলেন। তাঁর গুরু বনমালী বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত করার পর নাম পরিবর্তন করে হরিচাঁদ রেখে দেন এবং এটাই পরে পরিচিত হয়। হরিচাঁদ ছোট বয়সেই অনাথ ছিলেন। দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা ত্যাগেব সময়ে বনমালী তাঁকে পথে রাখাল হিসেবে দেখে নিজের সন্তান হিসেবে গ্রহন করে আশ্রমে নিযে যান। উল্লেখ থাকে যে, বনমালী ও তাঁর ছোট ভাই-এর স্ত্রী একসাথে বসবাস করতে শুরু কবলেও ওদের এমন কোন সম্পর্ক ছিলনা যাতে কবে সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ কবে। আশ্রমে অবস্থান কালেই হরিচাঁদ একসময়ে গেলেকতি-র প্রণয়ে আবদ্ধ হন এবং তাঁদের বংশধরেরা বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছেন।

হরিচাঁদ গোস্বামী মুড়াসিং সম্প্রদায়কে সংস্কারের কাজে হাত দেন এবং তাঁদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তিনি জানতেন, সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হলে প্রথমেই যুবক-যুবতীদের নিযে সংগঠন গঠন করা প্রয়োজন। তাই তিনি প্রথমেই প্রতিতি মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকালয়ে যুবকদের সংগঠন গড়ে তোলেন এবং ধীরে ধীরে সমাজের অন্যান্য স্তরেও সংগঠন গঠন করে মুড়াসিং সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

জন্ম

মুড়াসিং সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী প্রসূতি কালকে বলা হয় 'সাক-আবুর'। প্রসূতি মাকে একটি আলাদা ঘরে রেখে দেওয়া হয়। সেই ঘরকে বলা হয় নক-আবুর। শিশু জন্মের মুহূর্তে প্রসূতি মায়ের সাহার্যার্থে থাকেন একজন আয়া-সহ অন্যান্য সহযোগী। প্রসুতিকালে 'ফাতি' নামে একটি বিশেষ ধরনের গাছের বাকল দিয়ে ঘরের পাইর-এ 'লংগই' বেঁধে প্রসুতিকে মাটিতে বসিয়ে দুহাতে সেই লংগই ধরিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে প্রসূতি সেই লংগই-এ ঝুলে দেহের শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া প্রসুতি মাকে তাঁর দু-পা ফাঁক করে 'য়াখতম'-এ পায়ের পাতা রেখে দেওয়া হয়। তাতে প্রসুতি মায়ের শক্তি প্রয়োগ আরো দৃঢ়তর হয়। তাছাড়া আয়া ও সহযোগীরা প্রসুতির কোমরে পায়ের পাতা রেখে সোজা হয়ে পর পর বসেন। এর ফলে প্রসুতি মা ক্ষীণকায় বা দুর্বল হলেও তার সন্তান প্রস্রবে শক্তির বাড়তি সাহায্য পাওয়া যায়।

শিশু ভুমিষ্ঠ হবার পর 'উানথাল' (তোঁয়াল) দিয়ে নাড়ি কাটেন সেই আয়া। নাড়ি কাটার পরেই আয়া নবজাতককে কুমকুম গরম জলে স্নান করিয়ে একটি নাম রেখে দেন। বিশ্বাস করা হয়, শিশুর ভবিষৎ নির্ধারণের জন্যে অর্থাৎ কপালের লিখন লেখার জন্যে চিত্রগুপ্ত নবজাতকের কাছে থাকেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশুটির নাম লেখা হচ্ছে। আয়া নবজাতকের নামাকরণের পরই চিত্রগুপ্ত নিজস্থানে চলে যান, এরূপ বিশ্বাস করে থাকেন সম্প্রদায়ের লোকেরা। এর পর প্রসূতি মাকেও গরম জলে স্নান করানো হয়। আয়া এবং অন্যান্য সহযোগীরাও স্নানের পরই গৃহে প্রবেশ করেন। নবজাতকের পিতা 'ফন' ও 'বাদুক' বেতের তৈরী খাঁচায় করে জঙ্গলে বাঁশের সাহায্যে ঝুলিয়ে রেখে দেন, যাতে করে বন্যপশু সেগুলি খেয়ে ফেলতে না পারে। নবজাতক এবং প্রসূতি তখন নবজাতকের পিতা-সহ ঐ নির্দিষ্ট ঘর বা যে ঘরে শিশুটির জন্ম হয়েছে, সেই ঘরে অবস্থান করেন। তখন নবজাতকের ঘরে অন্য কেউ যদি প্রবেশ করে তাহলে তাকে স্নান করেই অন্য ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কেবল প্রবেশই নয়, নবজাতকের পিতার সাথে কারো দৈহিক স্পর্শ হলেও স্পর্শকারীকে স্নান করে পরিশুদ্ধ হতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত শিশুটির নাভি পড়ে না যায়। নবজাতকের নাভির অপ্রয়োজনীয় অংশ পড়ে গেলে শিশুকে দেখা বা স্পর্শ বা প্রসুতির ঘরে প্রবেশের পর প্রবেশকারী, স্পর্শকারী, দর্শনকারীকে তুলসী পাতার জল ছিটিয়ে পরিশুদ্ধ করলেই চলে, স্নান করতে হয়না। 'সাক আবুর' এর সময়ে প্রসূতি 'থালিবক বীলাই' (সামান্য তেতো এক ধরনের পাতা যার কন্ধমূল খুবই সুস্বাদু) কেউ কেউ বলেন 'কীখা বীলাই' সামান্য নুন, লংকা ও 'বেরমা' সহযোগে সেবন করেন। তাতে নবজাতক ও প্রসুতির দুধ বা শরীরের দ্রুত উন্নতি ঘটে।

শিশুর জন্মের সাত দিন পর সূর্যব্রত করা হয়। বাংলায় যাকে সূর্যব্রত বলা হচ্ছে তাকেই ককবরকে বলা হয় 'আবুর সুমা'। জলে 'তীয়মা' পূজা দেওয়ার পরই প্রসুতি মা জলে নেমে স্নান করেন। এর আগে প্রসুতিকে তাঁর স্বামী জল তুলে স্নান করান। ঐ সময়ে প্রসুতি সীকীয়-কে ভেঙ্গে জলে ভিজিয়ে এবং ছাই দিয়ে ক্ষার বানিয়ে মাথার চুল ধুয়ে ফেলেন। 'তীয়মা' পূজার পর তুলসী পূজা দেওয়া হয়। এর পরে 'মাইলুমা' ও 'রনদক' দেবীকে পূজো দেওয়া হয়। এর পরই শুরু হয় শিশুর আনুষ্ঠানিক নামাকরণ। উপস্থিত যতজন লোক নবজাতকের নামাকরণে ইচ্ছুক ততগুলি সলতে পাকানো হয়। সেই সলতেগুলি 'মুসি' বা মাটির তৈরী ছোট পাত্রে সরষের তেলে রেখে জ্বালানো হয়। সলতেগুলির মধ্যে যেই সলতে বা যে নামাকৃত সলতে দীর্ঘক্ষণ জ্বলবে সেই নামই পরে নবজাতকের ভবিষৎ পরিচিত নাম হিসেবে রেখে দেওয়া হয়। এর পর 'অচাই' সহ উপস্থিত সকলে নবজাতক ও প্রসূতিকে দা, পাথর, দুর্বা, তুলা, ধান ও অগ্নি সহযোগে আশির্বাদ ও 'আয়ু দান' করেন। আশির্বাদ কালে প্রত্যেকেই বলেন, দা-এর ধারের মতো বুদ্ধিমান হও, পাথরের মতো শক্ত হও, দুর্বার মতো দীর্ঘায়ু হও, তুলার মতো কোমল মনের অধিকারী হও, ধানের দেবী সদা সহায়বান হও এবং অগ্নির মতো উজ্জ্বল সুভাগ্যবান হও।

কৈশোর

মুড়াসিং সম্প্রদায়ের কিশোরীকে বলা হয় 'বসলক' এবং কিশোরকে বলা হয় 'চাসলক'। কিশোরীর বয়স ছয়-সাত বৎসর হলেই তার নাক ও কানে অলঙ্কার ব্যবহারের জন্যে 'কানতা

নাকসের' ফুলের কাঁটা দিয়ে ছিদ্র করে দেওয়া হয়। তদ্রুপভাবে কিশোরের কানেও কান-পাতায় ছিদ্র করা হয় 'নাকসের' নামক গয়না ব্যবহারের জন্যে। কিশোরীর বয়স এগারো-বারো হলে বয়স্করা বিশেষ করে মহিলারা তাঁকে ছোট্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'রিসা' পরিয়ে দেন। এভাবে রিসা না বাঁধলে মেয়ের বিয়ে হয়না বলেই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার লোকজন বিশ্বাস করেন। কিশোরী স্বেচ্ছায় রিসা বাঁধাকে অস্বীকার করলে সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগও করা হয়।

যৌবন ও যুব-সংগঠন

এই সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে যুবককে বলা হয় 'চাকৗলীয়' এবং যুবতীকে বলা হয় 'সিকলা'। অন্যান্য ককবরকভাষীদের মতো যুবকদের 'সিকলা' এবং যুবতীদের 'সিকলি' বলা হয়না। প্রতিবছর, কৃষির কাজ শেষ হলে শীতকালের দিকে সমাজের নেতৃস্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগেই যুব-সংগঠন করা হয়। এই যুব সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কোন নাম না থাকলেও এর প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'সিকলা মুঙ চামুঙ'। সমাজের নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে নির্ধারিত দিনে ঐতিহ্যবাহী দেবদেবীর পুজার্চনার মাধ্যমে 'সিকলা মুঙ চামানি' প্রক্রিয়া শুরু হয়। সমাজের কর্তাগণ তখন যুবক-যুবতীদের প্রত্যেক-কেই গলায় ফুলের মালা দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে নতুন নামাকরণ করেন। নামাকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয়। যেমন, সুন্দরী ও সুরেলা কণ্ঠের অধিকারিণীকে বলা হয় 'তকসা রাঙগি', তেমনি চাঁপা ফুলের ন্যায় দেহবর্ণের অধিকারিনীর নামাকরণ হয় 'সামপারি'। এই প্রক্রিয়াটি বর্তমানের কলেজগুলিতে নবীন বরণের মতই।

এভাবে নতুন নামাকরণ ও বয়োজ্যষ্ঠদের আশির্বাদ নেবার পর যুবক-যুবতীরা আর পূর্বের নামে একে অপরকে ডাকেন না। তাঁরা তখন 'সিকলা মুঙ' বা যুব-নাম ধরেই ডাকেন। 'সিকলা মুঙ' দেবার সময়ে ওদের মধ্যেও সামাজিক সংগঠনের মতো একটি যুব সংগঠন গড়ে দেওয়া হয় যাঁর নেতৃত্বে থাকেন সিকলা মিসিপ, সিকলা রাই, তৗয়ফাঙ, নারেঙ, লুপজারি প্রমুখ। যুব সংগঠনের কাজকর্ম সংশ্লিষ্ট গ্রামের যুবক-যুবতীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সংগঠনের প্রশাসনিক শীর্ষে থাকেন সিকলা মিসিপ। যুবকদের মধ্যে যাঁর বিচক্ষণ শক্তি ও ন্যায়বোধ থাকে এবং বয়সে অন্যান্যদের তুলনায় জ্যষ্ঠ্য তাঁকেই সিকলা মিসিপ নামাকরণ করা হয়। তিনি বর্তমানের অন্যান্য সংগঠনের সভাপতির ন্যায় কাজ করেন। তাঁর পরবর্তী পদমর্যদায় রয়েছেন সিকলা রায়। সিকলা মিসিপ সভাপতির সমতুল্য হলে সিকলা রায় হলেন সম্পাদকের সমতুল্য। তাঁর ঠিক পরেই আছেন সিকলা চদিরি। সিকলা চদিরি হলেন যুবক-যুবতীদের ভালো-মন্দের বিচারক। দাগিয়া হলেন যুবকদের কাজকর্মের নির্দেশক এবং পরিকল্পক। তিনি বিচারকালে অপরাধীর শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। চামপ্রাসি হলেন শাস্তিদাতা। সিকলা চদিরি বিচার করে অপরাধী সাব্যস্ত করার পর দাগিয়া তাঁর অপরাধ অনুযায়ী শাস্তির পরিমান নির্ধারণ করে দিলে চামপ্রাসি অপরাধীকে নির্ধারিত শাস্তি দান করেন। তৗয়ফাঙ হলেন মুখ্যত সংগঠক, তিনি অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন লোকালয়গুলির মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করেন। অর্থাৎ তিনি মুলত বর্তমানের 'লিয়াসঁ' অফিসারের ন্যায় কাজ করেন। নারেঙ হলেন যুবতীদের মধ্যে প্রধান, তিনি সিকলা মিসিপ-এর সমতুল্য এবং লুপজারি হলেম সিকলা রাই-এর সমতুল্য। যুব সংগঠনের সদস্যগণ

কিছু নির্ধারিত নিয়ম কানুন মেনে চলেন। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ —

১) বয়স ও দৈহিকভাবে অবতীর্ণ গ্রাম বা লোকালয়ের সমস্ত যুবক-যুবতীই 'সিকলা মুঙ' নিতে বাধ্য।

২) 'সিকলা মুঙ' নেবার পর যুবক-যুবতী পর স্পরকে আর পূর্বের নাম ধরে ডাকেন না। যদি কেউ, যুবক-যুবতী ছাড়াও গ্রামের অন্যান্য বয়স্করা কোন 'সিকলা মুঙ চাজাক' যুবক-যুবতীকে পূর্বের নাম ধরে ডাকে তবে তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে আর্থিক জরিমানা, নাক-খৎ, বেত্রাঘাত প্রভৃতি শাস্তির বিধান রয়েছে।

৩) কোনও 'সিকলা মুঙ চাজাক' গ্রামে বা লোকালয়ে অন্য কোনও গ্রাম বা লোকালয়ের যুবক-যুবতী যুব-নেতৃবর্গের অনুমতি ব্যতিত সংশ্লিষ্ট গ্রামের যুবক-যুবতীর সাথে দেখা করতে পারেননা। যদি কেউ এইরূপ গর্হিত কাজ করে থাকেন তবে তাকে পূর্বে উল্লেখিত শাস্তি ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে, অর্থাৎ যুবক বা যুবতীর সাথে দেখা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট যুবক-যুবতীকে প্রথমেই গ্রামের তীয়ফাঙ-এর কাছে যেতে হয় এবং তীয়ফাঙ এর মারফৎই অনুমতি আদায় করতে হয়। সিকলা মিসিপ, সিকলা রায় প্রমুখের অনুমতি পাবার পর তীয়ফাঙ ঐ যুবক বা যুবতীকে নিয়ে উদ্দিস্ট ব্যক্তির কাছে নিয়ে যান।

৪) কোনও বিবাহিত ব্যক্তি একান্তে অবিবাহিত যুবক বা যুবতীর সাথে দেখা করতে পারেননা। তাছাড়া কোনও যুবক-যুবতী একান্তে কথা বলার সময়ে বিবাহিত ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হতে পারেন না। যদি সেরকমের কোন কিছু হয়ে থাকে তবে ব্যক্তিকে আর্থিক জরিমানা সহ বৃহত্তর সামাজিক বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং সামাজিক বিচারে তাঁর প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তির আর্থিক ও দৈহিক এবং উভয় শাস্তিও হতে পারে।

৫) যুব সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে যুবক ও যুবতী অন্য কারো সাহায্য ছাড়া পরস্পর একান্তে সাক্ষাৎ করতে পারেননা। অর্থাৎ অবিবাহিত যুবক ও যুবতীর সাক্ষাৎকালে তৃতীয় কোনও অবিবাহিত ব্যক্তির উপস্থিতি অপরিহার্য্য। এই অপরাধের জন্যে অপরাধীদের সমাজচ্যুত পর্যন্ত্য হতে পারে।

৬) সিকলা মুঙ নেবার পর যুবক-যুবতীরা পরস্পরের নামে কোনও প্রকার কুৎসা করতে পারেননা। এই অপরাধের জন্যে ব্যক্তিকে প্রথমত আর্থিক জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার একই কাজ করলে তাঁকে দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হয়। তাতেও সমাধান না হলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়।

৭) যুবক-যুবতী সম্পর্কীত সমস্ত অপরাধের বিচার প্রথমে যুব সংগঠনই করে থাকে। যদি যুবসংগঠন কোনও সমস্যার সমাধানে অপারগ হয় তাহলে সেটি গ্রামস্তরের বিচার সভায় প্রেরণ করা হয়। তাতেও সমাধান না হলে সমস্যাটি দফা বা খিল স্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

৮) সংগঠনের সদস্যদের অপরাধের জন্যে শাস্তি প্রদানের চুড়ান্ত ক্ষমতা সংগঠনের হাতেই থাকে। চুড়ান্ত শাস্তি বলতে মূলত সমাজ থেকে বের করে দেওয়া, একঘর করে রাখা, দৈহিকভাবে নির্যাতন প্রভৃতি রয়েছে, কিন্তু মৃত্যুদন্ড নেই।

৯) সংগঠনের কোনও সদস্য বিয়ে করলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। তখন যুবসংগঠন

থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিকে 'কাকসেং' দিতে হয়। 'কাকসেং' হল 'কাকলাইমানি সেং' অর্থাৎ আলাদা হয়ে যাবার জন্যে বা ত্যাগ করে চলে যাবার জন্যে সাম্মানিক জরিমানা। বিয়ের সময়ে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সংগঠনের সদস্যদের নিমন্ত্রণ সহ সামান্য কিছু উপহার দেন। সেই উপহারটি মূলত খাদ্যবস্তুই হয় এবং সেটাই 'কাকসেং' নামে পরিচিত'।

১০) যুব সংগঠনের প্রায় বেশিরভাগ সদস্য বিয়ে করে সদস্যপদ খারিজ করে নিলে সংগঠন ভেঙ্গে নতুন যুব সংগঠন গঠন করা হয়।

অলংকার

মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেরা ছেলে মেয়ে প্রায় সবাই গয়না পরতে ভালবাসে। ছেলেরা কানের উপরদিকের পাতায় চেরুউাই নামক তিন-পাতা বিশিষ্ট সোনা বা রুপার ছোট গয়না পরেন। মেয়েরা কানে কানফুল, তয়া, উাখুম, রিং প্রভৃতি পরেন। নাকে থাকে নাকফুল, কলি, বালি ইত্যাদি। চুলে থাকে সাংগেং, সুরাং। গলায় ছোট ছোট লাল-কালো পাথরের মালা পরতে ভালবাসেন। তিন-স্তর বিশিষ্ট পয়সার মালাও গলায় পরতে দেখা যায়। তাছাড়া বিবাহিত মেয়েরা গলায় তুসা নামক একধরনের স্বর্ণের তৈরী গয়না কালো সুতোর সাহায্যে পরেন। হাতে পরেন বালা, চুড়ি, মাথিয়া, বলিয়া প্রভৃতি। কোমরে থাকে পয়সার মালা বা চানদুক। পায়ে থাকে বলিয়া ও খারুক।

মুড়াসিংদের অলঙ্কার

খেলাধুলা

মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত বহু খেলা রয়েছে যা ত্রিপুরায় বসবাসরত অন্যান্য আদিবাসী জনগনের মধ্যে বর্তমান। খেলার মধ্যে ছোটদের — ফুলা, দাণ্ড, গুলাপ, গাদু, সীকাই, কাদং, কিত-কিত, বুরি, তকবাক, কাউা, হারি প্রভৃতি রয়েছে। বড়োদের মধ্যে অর্থাৎ যুবক-যুবতীদের মধ্যেও দাণ্ড, ফুলা, গাদু, ফানসতন, কাদং, সীকাই, সলাই প্রভৃতি খেলা দেখা যায়। দাণ্ড খেলার গননায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের উপস্থিতি ও কিছু ক্ষেত্রে অপরিচিত শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দাণ্ড খেলা মূলত দু'ধরনের থাকে। গণনা বা দাণ্ড মাপার ক্ষেত্রে যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি হল, ১) গায়া, দুয়া, তেনা, চারা, পাঞ্জা, চুল, বুল, কদম, গুদ। ২) এরি, দুরি তেরি, চাল, চাম্পা, দেক, ছুটে।
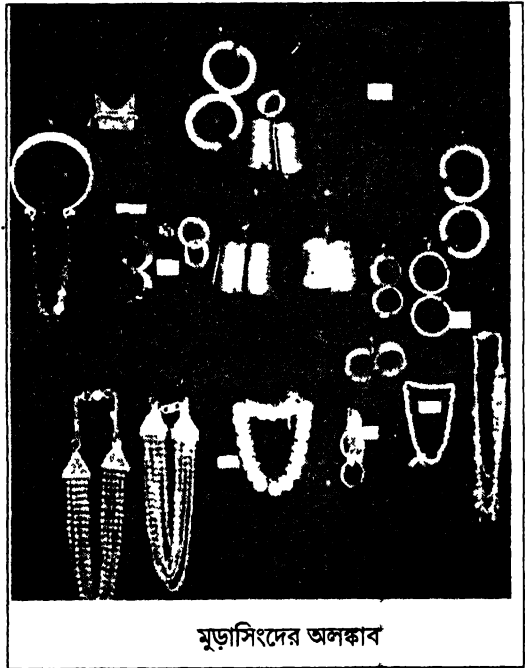
ফুলা খেলার জন্যে মূলত করবী ফলের বীচির শক্ত খোল ব্যবহৃত হয় এবং মূলত যুবতীদের মধ্যে এই খেলা দেখা যায়। গুলাপ খেলাটি মূলত বাংলার গুল্লা-ছুট খেলার মতই। গাদু খেলাটি বর্তমানের কবাডি খেলার ন্যায়। সৗকৗই মুলতঃ সৗকৗযতীক নামক একপ্রকার বুনো লতার ফলের বীচি। সৗকৗয় খেলা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ১) সৗকৗয়-কে দু-পায়ের মাঝে রেখে লাফ দেবার সময়ে দুরে ছুঁড়ে মারা। যে যত বেশী দুরে ছুঁড়তে পারবে সেই খেলায় জয়ী হয়। ২) পেছন ফিরে ঝুঁকে দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে অন্য সৗকৗয়গুলিকে লাগানো। কিছুটা মার্বেল খেলার মতো। ৩) পেছন ফিরে এক পাঁয়ে দাঁড়িয়ে অন্য পা দিয়ে ছুঁড়ে অন্য সৗকৗয়গুলিকে লাগানো। বাংলায় রণ-পা বলতে যাকে বোঝায় সেটাই হল কাদং। কাদং খেলাও কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। ১) কাদং-এর সাহায্যে দৌড়ানো। ২) কাদংএ উঠে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য কাদং ধরে মাটি থেকে সুঁই তোলা। কিত-কিত খেলাটি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা যায়। এটি বাংলার এক্কা-দুক্কা খেলার ন্যায়। বুরি খেলায় দু-দলে ভাগ হযে যায়। একদল প্রথমে বোল দিতে দিতে নির্দিষ্ট জায়গায় দলের একজনকে বুরি হিসেবে রেখে আসে। প্রতিপক্ষ দলের লক্ষ্য থাকে বুরি যাতে পালিয়ে পূর্বের জায়গায় ফিরে যেতে না পারে। তাছাড়া বোল ছেড়ে যাওয়া খেলোয়ারকে ছুঁয়ে বধ করাও তাদের কাজ। বুরিদল বোল দিতে দিতে যদি প্রতিপক্ষ দলের কাউকে ছুঁয়ে ফেলে তবে যাঁকে ছোঁয়া হবে সেও বধ হয়। তকবাক খেলায় ছোট ছেলেমেয়েরা বারান্দা বা খানিকটা উঁচু কোনও গাছের ডালে ঝুলে বাঁদুরের মতো কবে পা দুটো হাত দুটার মাঝ দিয়ে নিয়ে গিয়ে শরীরটাকে উল্টিয়ে মাটিতে নামে। কাউা খেলা সবাই মিলেই খেলে এবং এর একটা সীমানা থাকে। সবাই হাত ধরাধরি করে হাত নাড়তে নাড়তে হঠাৎ করে ছেড়ে দিয়ে হাত দুটো একসাথে তালি দেয়। দলের যে ছেলে বা মেয়ে সবথেকে পরে হাত তালি দেবে সে থেকে যাবে আর বাকীরা দল থেকে বেড়িয়ে পড়তে থাকে। এভাবে সবশেষে দু'জন খেলোয়াড় থেকে যায়। সেই দুজনের মধ্যেও যে পরে হাত তালি দেবে সে কাউা হিসেবে গন্য হয় এবং অন্যবা তার থেকে দুরে সরে যায়। কাউা তখন অন্যদেরকে তাড়া করে ছুঁয়ে দেয়। যাকে ছুঁয়ে দেওয়া হয় সেও কাউা হয়ে যায়। এভাবে সবাই কাউা হলে পুনরায় খেলা শুরু হয়। হারি খেলাও সবাই মিলে খেলে তবে দুজনের মধ্যেও এই খেলাটি হতে পারে। দলের মধ্যে একজন হারি হন আর অন্যরা তার থেকে দুরে সরে যায় এবং হারি অন্যদেরকে তাড়া করে ছুঁয়ে বধ করেন। সলাইমা খেলাটি অনেকটা কুস্তির মতো। ফানসতন খেলা মূলত দু'জনের মধ্যেই হয়ে থাকে। দুজন লোক পরস্পর পা লাগিয়ে মাটিতে বসে একটি শক্ত বাঁশকে ধরে টানাটানি করেন। যেই লোকটি প্রথম মাটি থেকে উঠে যাবে বা দাঁড়িয়ে যাবে সে পরাজিত বলে গন্য হয়।

বিবাহ

যতক্ষণ না পর্যন্ত একটি যুবক তাঁর বাম হাতে কাঁচি দিয়ে একটি পরিপূর্ণ কলাগাছ এক কোপে কেটে ফেলতে না পারছে ততক্ষণ অবধি সেই যুবক বিয়ের উপযুক্ত হয়নি বলেই মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস করা হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রায় সব প্রথাই মুড়াসিং সমাজে বিদ্যমান। পালিয়ে বিয়ে করার মধ্যে সাধারণত, ১) পাত্র বা পাত্রী-র অভিভাবকের অসম্মতিতে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। ২) পাত্র ও পাত্রী উভয়ের অভিভাবকদের অসম্মতিতে পালিয়ে গিয়ে

বিয়ে করা। ৩) পাত্র ও পাত্রী উভয়ের অভিভাবকদের সম্মতিতেও পালিয়ে বিয়ে করা, এগুলি দেখা যায়। তাছাড়া, পাত্রীকে সসম্মানে পাত্রের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা বা পাত্রীর বাড়িতে পাত্র গিয়ে বিয়ে করা সমস্তটাই রয়েছে। ঘর-জামাই প্রথাও সমাজে প্রচলিত। তবে ঘরজামাই প্রথা দুভাবে হতে দেখা যায়। ১) নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী পাত্রীর বাড়িতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঘরজামাই থাকা। ২) পাত্রীর বাড়িতে সারা জীবনের জন্যে ঘরজামাই থাকা।

ঘরজামাই প্রথার প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী বিয়ের পূর্বেই যুবকের পিতা যুবতীর পিতার সাথে আলোচনা করে ছেলেকে মেয়ের বাড়িতে দিয়ে আসেন। মেয়ের অভিভাবক ছেলের কাজ কর্মে, চরিত্রে পছন্দ হলে এবং মেয়ে রাজী হলেই বিয়ে সম্ভব। নাহলে সেই যুবককে বিয়ে না করেই বিনে পয়সায় মেয়ের বাড়িতে খেটে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে হবে। কোনও যুবককে এভাবে ঘরজামাই রাখা হলে প্রথমেই মেয়ের মা "খংগ্রং" (এক ধরনের লম্বা কাঁটাওয়ালা বুনো ফল) নামিয়ে ধান মাড়ানোর মতো করে খালি পায়ে মাড়াতে দেন। সেক্ষেত্রে মেয়ে যদি রাজি থাকে তবে লুকিয়ে জল গরম করে সেই "খংগ্রং" এর উপর ঢেলে দেন যাতে করে কাঁটাগুলি নরম হয়ে যায়। মেয়ে যদি রাজি না থাকে তবে পায়ের পাতার অবস্থা অবর্ননীয়। এর পরই মেয়ের বাবা ছেলের কাজ পরখ করতে এবং সহনশীলতা ও ধৈর্য্য পরীক্ষা করতে গারিং-এর নুগুল বাঁশকে (টং-ঘরের মেজে আটকানোর জন্যে আড়াআড়ি ভাবে পাতা শুকনো বাঁশ) বের করে "নখাই" বানাবার জন্য বলেন। কথা হল, শুকনো বাঁশ থেকে বেত তোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এমতাবস্থায় মেয়ের সম্মতি থাকলে, সে জল গরম করে শুকনো বাঁশকে ভিজিয়ে দেন এবং ভাতের ফেন লুকিয়ে বেতে মেখে রাখেন। তাতে বেত নরম এবং ভালো থাকে। এভাবে বহু পরীক্ষার পর মেয়ের অভিভাবকগণ খুশি হলে একদিন মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। ঘরজামাই প্রথার দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী বিয়ের দিন থেকেই ছেলেকে মেয়ের বাড়ীতে ঘর-জামাই হিসেবে থেকে যেতে হয়। ছেলে নিজের ঘরে বেড়িয়ে আসতে পারলেও সে কিন্তু সারা জীবনের জন্যেই মেয়ের বাড়িতেই থাকতে বাধ্য।

বিয়ে না করেই কেউ সংসার পেতে বসলে তাকে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে আলাদা করে রাখা হয়। কিন্তু সামাজিক বয়কট বা একঘরে করা হয় না। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে ঐ ব্যক্তিকে সমাজপতিদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমানে জরিমানা দিতে হয়। জরিমানা দেবার পর সামাজিকভাবে তাঁর সংসারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং এর পর সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহনে আর কোন বাধা থাকে না।

মুড়াসিং সমাজে বিয়েতে লোকালয়ের সবাইকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। বিয়ের আগেই প্রথমে বরপক্ষের লোক মেয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়ে দেখে আসে। একে বলে নাইগ্রামা। তখন ছেলের অভিভাবকগণ একটি মাটির হাঁড়িতে মুরি-বাতাসা ভর্তি করে, পান সুপুরি নিয়ে মেয়ের মা-বাবাকে দেন। মেয়ের অভিভাকগণও সমাজপতিদের নিয়ে একইরকমের কাজ করেন। কলার পাতায় সবাইকে ঐ মুরি-বাতাসা দেবার পর শুরু হয় আলোচনা। আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ সেই মুরি-বাতাসা স্পর্শ করেন না। এর পর মেয়ের অভিভাবকরাও ছেলের বাড়িতে পূর্বের ন্যায় পান-সুপারি ও মুরি বাতাসা নিয়ে যান এবং দু-পক্ষের অভিভাবক ও সমাজপতিদের সম্মুখে

বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করেন। একে 'সীং-কতর' বলা হয়। এর পরে বরপক্ষের সমস্ত অভিভাবক ও সমাজপতিগণ মেয়ের বাড়িতে পূর্বের ন্যায় মুরি-বাতাসা-সহ পান-সুপারি মশলা ইত্যাদি নিয়ে যান। একে বলা হয় খরকসেং। তখনই ছেলের মা মেয়ের মা-কে পাঁচ টাকা দুধের দাম হিসেবে দিয়ে দেন। জন্মের পর থেকে বুকের দুধ খেয়ে মেয়ে বড় হবার জন্যেই ছেলের মা মেয়ের মাকে ঐ টাকা দিয়ে মেয়েকে নিজের মেয়ে বা বৌমা হিসেবে বরণ করে নেন। এর পরে মেয়ের বাবা তাঁর খুশীমতো ছেলের অভিভাকদের কাছে 'খরকসেং' দাবি করেন। এক্ষেত্রে মেয়ের বাবার দাবীর কোন সীমা থাকেনা। বরপক্ষ মেয়ের বাবার ঐ দাবি পুরণ করলেই বিয়ে সম্ভব, নতুবা বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। শুনা যায়, মেয়ের বাবা বরপক্ষের কাছে দাবি করেন, ১) মেয়ে ছোটকালে যে দোলনায় ঘুমিয়েছিল, সেই দোলনা ভরে টাকা দাও, ২) মেয়ে ছোটকালে চাটাই-এ ঘুমিয়েছিল, চাটাই ভরে টাকা দিন, ৩) মেয়ে ছোটকালে খাটে ঘুমিয়েছিল, খাট ভরে টাকা দেবেন, ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকে যে, মুড়াসিং সমাজে পণ প্রথা ছিল। পণ প্রথা বলতে, কন্যাপক্ষকে বড়পক্ষের দাবি অনুযায়ী কোন কিছু দেওয়াকে বোঝালেও মুড়াসিং সমাজে এর ঠিক উল্টোটাই ছিল। কন্যাপক্ষের অর্থাৎ কন্যাব পিতার দাবি বরপক্ষ পুরণে বাধ্য ছিল। অবশ্য বর্তমানে এই প্রথা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে কেবল আবুকতীয়সেং দেওয়া হয় মেয়ের মাকে এবং খরকসেং-এ নামমাত্র কিছু দেওয়া হয়।

মুড়াসিং সমাজে বিয়ের নিমন্ত্রণ লোকালয়ের সবাইকে দিতে হয়। বিয়ের খবর দেবার জন্যে দু'জন লোক নতুন কাপড়ে থালা বেঁধে তাতে ফুল রেখে গ্রামের সবার বাড়িতে গিয়ে দুটি ফুল গৃহস্থের হাতে তুলে বিয়েব দিন এবং বৌভাতের সময় জানিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসেন। বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষের আত্মিয়স্বজনকে নিমন্ত্রণের জন্যে তখন দেওয়া হয় একটি পান ও দুটো সুপারি। বিয়ের জন্যে মহন্তকে মাটির হাঁড়িতে মুরি-বাতাসা ও পাঁচ টাকা সহকারে নিমন্ত্রন করা হয়। তাছাড়া বিয়ের পুজারি, বাজনাদার বা হারি, জগায়া বা যিনি উলুধ্বনি দেবেন তাঁকে, আয়া বা বিয়ের জল যারা তুলবে ও বিয়ের সময়ে বর ও কনের সহচরী হবেন তাদেরকেও পান সুপারি দিয়ে নিমন্ত্রন করা হয়।

বিয়ের দিনে সূর্য উঠার সাথে সাথেই হারি বা বিয়ের বাজনাদাররা বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হন। এর পর চলে বিভিন্ন আয়োজন। সন্ধ্যায় বাজনা সহকারে দুজন আয়া ও অন্য সহচরীদের নিয়ে জগায়া বিয়ের জল তুলতে নামেন। উল্লেখ্য বিয়ের জল কখনোই বদ্ধ জলাশয় থেকে তোলা হয়না। বিয়ের জল তোলা হয় নদী বা নালা থেকে। জল তুলে আনার পর সেই জল দিয়ে বর কনেকে আয়াগণ স্নান করান। স্নানের পর বিয়ের জন্যে ওদেরকে সাজানো হয়। সাজানোর পর জগায়ার তত্বাবধানে বড় কনেকে সিঁদুর পরিয়ে দেন। এর পরে বর-কনেকে তুলসীতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অচাই বা পুজারি তুলসী পূজো করার পর বর-কনেকে তুলসী মালা পরিয়ে দেন। তুলসী মালা পরিয়ে বিয়ে দেবার পর ওদের ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। এর পরে বর কনেকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসেন দুজন আয়া। আসরে বর কনেকে ওদের মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, গুরুজন, সমাজকর্তা প্রমুখেরা আশীর্বাদ দেন। আশীর্বাদ দেবার সময়ে আশীর্বাদদাতা দুহাতে দুটো থালায়, সামান্য ধান, সরষের তেলের প্রদীপ, তুলো, দুর্বা, জল, দাবরক, পাথর নিয়ে বর-কনের

মাথার উপর তিনবার ঘোরান। এর পরে পান, সুপারি ও বাতাসা বর ও কনের হাতে ধরিয়ে দেন। সবশেষে নদী থেকে তোলে আনা আয়াদের জল দিয়ে বর কনের মাথায় ঢেলে দেন। এভাবেই প্রত্যেকে বর কনেকে আশীর্বাদ দিতে থাকেন। তখন তালে তালে চলতে থাকে হারিদের বিয়ের বাজনা। বিয়ের পরের দিনেই হয় 'পানদা' বা বৌ-ভাত। বিয়ের ঠিক সাতদিন পর নব-দম্পতি শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে যান। তখন নবদম্পতি শ্বশুর বাড়িতে মাত্র আড়াইদিনই থাকতে পারেন। নবদম্পতির এই বেড়ানোকে আড়ায়া বা হরন্নি বলা হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ

মুড়াসিং সমাজের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নারী বা পুরুষ যে কেউ বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে সমাজপতিদের কাছে আপিল করতে পারেন। আপিলের পরে নির্দিষ্ট দিনে বিচারসভা বসে। বিচার সভার সিদ্ধান্তকে বাদী-বিবাদী উভয়েই মেনে নিতে বাধ্য থাকেন। স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের পর বিচ্ছেদ হলেও সেই বিচ্ছেদের স্বীকৃতি নিতে হয় সমাজপতিদের কাছ থেকে। সমাজপতিদের বিচারে বিচ্ছেদ হলে স্বামী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকেন। তাছাড়া তাঁদের সন্তানাদি থাকলে সন্তানেরা ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁর বাবা বা মায়ের কাছে থাকতে পারেন। বিবাহ বিচ্ছেদের পর উভয়ে-ই ইচ্ছে করলে পুনরায় নতুন করে সংসার পাততে পারেন বা পুর্নবিবাহ করতে পারেন। মুড়াসিং সমাজে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তারা আবার বিয়ে করার রীতি প্রচলিত। ফলত দেখা যায় এক একজন মহিলার চার-পাঁচ জন স্বামী, আবার এক একজন পুরুষের পাঁচ-ছয়জন স্ত্রী। সোজা কথায় বহুবিবাহ প্রথা স্বীকৃত। তবে একই সঙ্গে দুজন মহিলা একই স্বামীর সংসার করে না বা একই সংঙ্গে এক মহিলার দুই স্বামী থাকতে পারেনা।

মৃত্যু সম্পর্কিত রীতিনীতি

মৃত্যু পরবর্তী ক্রিয়া বা অন্তোষ্টিক্রিয়া মুড়াসিং সমাজে দু'ধরনের পদ্ধতি প্রচলিত। নিরামিষাশি বা সাধু ও বৈষ্ণবদের কবর দেওয়া হয় এবং আমিষভোজী বা শাক্তদের দাহ করা হয়। সমাজের কেউ মারা গেলে লোকালয়ের প্রায় সকলেই হাতে লবন, দাবরক, দামরা, প্রভৃতি নিয়ে মৃতের বাড়িতে উপস্থিত হন। প্রথমেই মৃতদেহকে সৎকারের জন্যে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে উঠোনে কোন কিছুটে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখা হয়। মৃতের বাড়িতে যখন অচাই-সহ অন্যান্যরা মৃতদেহকে শুদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত থাকেন, তখনই অপরদিকে নির্দিষ্ট স্থানে চলতে থাকে কবর দেবার প্রস্তুতি বা দাহ করার প্রস্তুতি। অচাই তুলসী পুজো দেওয়ার পর মৃতদেহের দু চোখে দুটো তুলসী পাতা উল্টিয়ে লাগিয়ে রাখেন। তখন মৃতের সামনে চলতে থাকে হরিনাম সংকীর্তন। এর পর বাঁশের দোলনা বানিয়ে মৃতদেহকে তার সর্বশেষ ঠিকানার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় হরিকীর্তন সঙ্গীতের মাধ্যমে।

মৃত ব্যক্তি নিরামিষাশি হলে তাঁর অন্তোষ্টিক্রিয়ার জন্যে নির্বাচিত স্থানে এক টাকা রেখে টাকা না সরিয়ে মাটি কোপ দিয়ে টাকাসহ মাটি তুলে আলাদা জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। এর পর লম্বায় তিন হাত ও চওড়ায় দু হাত মাপের সাড়ে তিন হাত গভীর গর্ত করা হয়। সাড়ে তিন হাত গভীর হবার পর গর্তের নিচের দিক থেকে পশ্চিম দিকে সমান্তরাল ভাবে আরো প্রায় দু'হাত উচ্চতা, প্রস্থে পূর্বের ন্যায় তিন হাত এবং দেড় হাত গভীর গর্ত করা হয় গুহার আদলে। একে

বলা হয় কুঞ্জবন। কুঞ্জবন তৈরী সমাপ্ত হলে সেখানে গোবর জল দিয়ে লেপে দেওয়া হয়। এর পর অচাই সেখানে গিয়ে মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে কিছু পুজার্চনা করেন। মৃতদেহ ঐ স্থানে পৌঁছানোর পর মৃতকে কুঞ্জবনের ভেতর পদ্মাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। তখন ঐ কুঞ্জবনে মৃতের সমস্ত কিছু অর্থাৎ কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয়। পরে বাকী অংশে লবন দিয়ে পুরো কুঞ্জবন ভর্তি করে দেওয়া হয়। লবন দেওয়ার সময়ে মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা প্রথম তিন মুঠো লবন ছুঁড়ে দেবার পর অন্যেরা লবন দান করেন। এর পর বাঁশ কেটে কুঞ্জবনের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে করে কুঞ্জবনের ভেতর বাড়তি মাটি প্রবেশ করতে না পারে। কুঞ্জবনের মুখ বন্ধ হয়ে গেলে খালি গর্তে তখন মাটি দেওয়া শুরু হয়। মাটি চাপা দেবার পর মৃতদেহের ঠিক মাথার উপর একটি তুলসীগাছ লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানে একটি ছোট ঘর তৈরী করে দেওয়া হয়। ঘরের চারিদিকে সাদা নিশান এবং তুলসীগাছের উপর ঘরের ভেতর সাদা কাপড়ের চাঁদোয়া দিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘরকেই বলা হয় সিমালৌং নক। তুলসীগাছ লাগানো হলে অচাই তুলসী পুজো দিয়ে আসেন। তুলসী পুজো দেওয়ার পর মৃতের আত্মার হাতিয়ার হিসেবে একটি দা-বরক, খাবার জন্যে জলের কলসী, কানে গুঁজাব জন্যে একটি ফুলগাছ ও তামাক খাওয়ার জন্যে একটি দাবা দিয়ে সবাই যে যার বাড়িতে ফিরে আসেন। এর পরে মৃতের পরিবারের লোকেরা শ্রাদ্ধ দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ঐ সিমালৌং-এ প্রদীপ জ্বালিয়ে আসেন। শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মৃতের আত্মা লোকালয়ে বা তাঁর ঘরে বা তাঁর সিমালৌং-এ থাকে বলেই মুড়াসিং সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করেন।

মৃত ব্যক্তি যদি শাক্ত বা আমিষভোজী হয়ে থাকেন তবে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে চিতা তৈরী কবা হয়। মৃত ব্যক্তি নারী হয়ে থাকলে তাঁর চিতায় কাঠ সাজানো হয় সাত স্তরের। পুরুষ হলে পাঁচ স্তরের। মৃতদেহকে এনে চিতায় তোলার পর মৃতের নিকট আত্মীয় তাঁকে প্রথমেই বাঁশের চোঙা দিয়ে জল পান করান। মুখে জল দেবার পর মৃতের নিকটআত্মীয় হমচাং বা আগুনের মশাল নিয়ে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক থেকে সাতবার চিতা প্রদক্ষিন করে পেছন ফিরে মৃতের মাথার কাছে ডান দিকে অগ্নিসংযোগ করেন। মৃতদেহ সৎকার শেষ হলে সবাই বাড়িতে ফিরে আসেন। সেক্ষেত্রে মৃতের উদ্দেশ্যে আর ঘরদোর তৈরী করা হয়না বা প্রতিসন্ধ্যায় আর প্রদীপ জ্বালানো হয় না। তিন দিন পর চিতা-ভস্ম তুলে নদী বা ছড়ায় ফেলে দেওয়া হয় এবং একটি হাড় কুড়িয়ে এনে গাছের কৌটায় রেখে সেই গাছকে বাড়ির পাশে পুঁতে রাখা হয়। পরে মকর সংক্রান্তির সময়ে তীর্থস্থানগুলিতে গিয়ে সেই হাড় ফেলা হয়। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করেন, মৃতদেহ দাহ করা হলে মৃত ব্যাক্তি চলে যান শিবের কাছে এবং কবর দেওয়া হলে মৃতব্যক্তি চলে যান ব্রহ্মা-র কাছে।

নিরামিশভোজী গর্ভবতী মহিলা যদি মারা যান, তাহলে মৃতার পেট থেকে মৃত শিশুকে বের করে আলাদাভাবে শিশুকে কবর দেওয়া হয়। আবার আমিষভোজী গর্ভবতী মহিলা হলে তাঁর পেটের সন্তানকে বের করে মায়ের সাথেই চিতায় দাহ করা হয়। মৃত ব্যক্তি অবিবাহিত হলে কলাগাছ কেটে ওর কোলে বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে পরবর্তী জীবনে ও জীবনসঙ্গীহীন না হয়। একমাস অবধি বয়সের শিশুরা মারা গেলে ওদেরকে সাধারণত: কবর দেওয়া হয়। তবে শিশুর

মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করা হয় না। একমাত্র শিশু মুখে ভাত নিলেই বা ভাত খেতে পারলেই তাঁর শ্রাদ্ধও বড়োদের মতো করা হয়।

মৃত্যুর পর তিন, পাঁচ বা সাত দিন পর প্রথম শ্রাদ্ধ করা হয়। একে কাঁথাঁয় মায় রাঁঅ' বলা হয়। শ্রাদ্ধের বাজার করার সময়ে বাজারের সমস্ত খাবার একটু একটু করে নিয়ে এসে পিন্ড দান করা হয়। তাছাড়া হরেক রকমের পিঠে-পুলি, আধ-সেদ্ধ শাক-সহ সাত প্রকারের ব্যঞ্জন তৈরী করা হয়। পিন্ড দানের পূর্বে অচাই ও মৃতের পরিবারের একজন সিমালাঁং-এ গিয়ে পুজো দিয়ে আসেন। পরে তুলসী পুজো দিয়ে মৃতের প্রতীক হিসেবে রিসা দিয়ে পাগরি বেঁধে তাঁর সামনে সমস্ত খাবার দাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়। অচাই সেখানে মৃত ব্যক্তিকে কাল্পনিকভাবে প্রথমে পা ধুইয়ে আসনে উপবিষ্ট করান। এর পর কাল্পনিকভাবেই মৃতের হাত মুখ ধুইয়ে খেতে দেন। অচাই খাওয়ানোর পর মৃতের আত্মীয়-স্বজন সহ উপস্থিত ইচ্ছুকগণ মৃত ব্যক্তিকে শেষ খাবার খাওয়ান। খাওয়ানো শেষ হলে অচাই আবার কাল্পনিকভাবে মৃতের হাত মুখ ধুইয়ে দেন এবং তাঁকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জানিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। মৃতকে খাওয়ানোর পর্ব শেষ হলেই উপস্থিত সকলে সামান্য কিছু মুখে দেন। এভাবে শ্রাদ্ধ দেবার পর নববর্ষের ঠিক দু'দিন আগে আরো একটি বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হয়।

আমিষভোজী মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধও মৃত্যুর পর তিন, পাঁচ বা সাত দিন পর একবার এবং বৎসরান্তে একবার হয়। তবে শ্রাদ্ধের পদ্ধতি আলাদা ধরনের থাকে। আমিষভোজীর শ্রাদ্ধে প্রথমেই মদ, ডিম ও মুরগী-সহ লামপ্রা মাঁতাই-কে পুজো দেওয়া হয়। এর পর উাথপ ও নাগরি মাঁতাইকে একই রকমের উপকরণ দিয়ে পুজো দেওয়ার পর মৃতের উদ্দেশ্যে খাবার দাবার সাজিয়ে উঠোনের এক কোনায় রেখে দেওয়া হয়।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতির নিরিখে চাকুরিজীবি প্রচুর হয়ে গেলেও মুড়াসিংগণ মূলত: কৃষিজীবি ছিল। পূর্বে জুম চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করত অন্যান্য আদিবাসীদের ন্যায়। জুমে একই সাথে ধান, পাট, তুলো, নানারকমের সবজি, মশলা, মরিচ চাষের ফলে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। কেবল মাত্র বেরমা ও লবন-এর জন্যে ত্রিপুরার আদিবাসীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলনা। জুম চাষ ছেড়ে সমতল কৃষিতে নেমে আসার পরই ওদের উন্নতি দ্রুততর হয়েছে বলা যায়। জুম চাষের পর সমতল কৃষিতে পরিবর্তনের সময় প্রথমেই পরিচিত হয় মহিষের সাথে। মহিষ ব্যবহারের বহু বছর পর শুরু হয় গরুর প্রচলন। মূলত: জলাভূমিগুলিতেই সমতল কৃষি প্রথম শুরু হবার ফলে মহিষের ব্যবহার হয়। এর পর ধীরে ধীরে জলাভূমিগুলি শুকনো জমিতে পরিণত হবার পর গরুর আগমন ঘটে। তখন শুরু হয় মহিষ ও গরুর বিনিময়। এবং এভাবে ক্রমশ লুপ্ত হতে হতে বর্তমানে মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রায় কারো কাছেই আজ মহিষ পালন দেখা যায় না বা নেই। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে ব্যবসা-বানিজ্যে অংশগ্রহন প্রায় নেই বললেই চলে। তবে বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামান্য দোকান-পাট করলেও বৃহত্তর অর্থে তারা ব্যবসায়ী নয়। অর্থনৈতিক বুনিয়াদের মজবুত মাধ্যম ব্যবসা-বানিজ্যে পিছিয়ে থাকার জন্যেই সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তি তেমন উল্লেখযোগ্য হতে পারেনি বা বিত্তবান কেউ হতে পারেনি। তবে

বাগিচা চাষের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সম্প্রদায়ের লোকেদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হতে শুরু করেছে ইদানিং।

জুমকেন্দ্রিক জীবন-যাপন প্রনালী থেকে যখন সমতল কৃষিতে পদার্পন করল, তখন সমাজস্থ মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যেই ছিল সামাজিক বিধিনিষেধ। বলতে গেলে লেখাপড়াতেও কিছুটা বাধা ছিল। প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান লাভের পর বৃহত্তর জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রেই মুলত: এই বিধিনিষেধগুলি ছিল। বলা হত, লোকালয় বা ঘর থেকে বাইরে গিয়ে লেখাপড়া করলে 'সাধু'-পদ্ধতি ভেঙ্গে যাবে বা নষ্ট হবে। কেননা তখন ঐ ছেলে বা মেয়ে অন্যের ছোঁয়া, রান্না করা খাবার খাবে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর পরবর্তী শিক্ষার জন্যে প্রায় সুযোগই দেওয়া হত না। তবে যাই হোক, বর্তমানে এই অবস্থা আর নেই। মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানে প্রায় সবাই স্বাক্ষর, শিক্ষিত এবং গড়ে প্রায় প্রতি পরিবারেই একজন করে চাকুরিজীবি রয়ে গেছেন। তবুও বহু ক্ষেত্রে এখনো পিছিয়ে আছে এই সম্প্রদায়টি।

সম্পত্তির অধিকার

মুড়াসিং সমাজে পৈত্রিক সম্পত্তিতে সন্তানদের নারী-পুরুষ ভেদে সমান অধিকার রয়েছে। মায়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধীকার একমাত্র তাঁর মেয়েরই আছে, মায়ের সম্পত্তির ওপর ছেলের কোন অধিকার নেই বা থাকেনা। ছেলেদের অধিকার থাকে একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তিতে। তাতেও মেয়ের সমানাধিকার রয়েছে। তাছাড়া কেউ ইচ্ছে করলে জীবিতকালেই তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর ছেলে বা মেয়েকে দান করে যেতে পারেন। এভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে ঐ সম্পত্তিতে অন্য ভাই বা বোনদের কোন অধিকার থাকেনা। অর্থাৎ পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারনের স্বাধীনতা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মালিকের হাতে থাকে।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

মূলত: জীবনযাপন প্রণালীর সাথেই সাংস্কৃতিক পরিচয় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। মুড়াসিংদের সাংস্কৃতিক পরিচয় একটু মিশ্র ধরনের। একদিকে প্রাচীন উপজাতীয় সংস্কৃতি ও অপরদিকে ধর্মীয় বা বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবের ফলে এদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে মিশ্র ধরনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এই উভয় ধরনের অর্থাৎ দুই বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির প্রভাবের ফলে সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে সংস্কৃতির পরিচায়ক উপাদানগুলি ভাল করে লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। পোষাক পরিধানের মধ্যে যে বিশেষ নকশা থাকে তা দেখেই সম্প্রদায় চিহ্নিত করা যায়। রিয়াং-দের রিগনাই-এ কালো জমির উপর সাদা ছোট ছোট ডোরা কাটা দেখলেই তা স্পষ্ট, আবার সাদা জমির উপর লাল ডোরা কাটা দেখলেই তা ত্রিপুরী দেববর্মাদের রিগনাই চামাথাই স্পষ্ট হয়, তেমনি ভাবেই কালো জমির উপর লাল পাড় দেখলেই রিগনাইটি ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের বলে সহজেই ধরে নেওয়া যায়। এভাবেই লাল জমির উপর ছোট করে কালো পাড় দিয়ে ছোট ছোট হলদে ডোরা কাটা রিগনাই দেখলেই তা মুড়াসিংদের "রিগনাই হজলাই" বলে নির্দেশ করা সম্ভব। তাছাড়া মুড়াসিংদের রিসা-র নকশা বা বুমুল-এ দেখা যায় "কবংথাইবার" "খুমতুবার" প্রভৃতি। জীবনধারনের উপায় হিসেবে মুড়াসিং সম্প্রদায়ের মধ্যে জুম কেন্দ্রিক যেসব

সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে তেমনি ভাবেই ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাবে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে বৈষ্ণব ধর্মের রীতিনীতিগুলি মানতে দেখা যায়। খুব সম্ভবত: এ-কারণেই সাংস্কৃতিক সংকটও প্রবল ভাবে দেখা যায়। মৃত্যুকালে মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানযাত্রীরা *"চলোগো শ্রীবৃন্দাবনে/ জয় রাধা শ্রী রাধা নাম বলে/ চিনিনা চিনিয়ে দাওগো/ ব্রজে যাওয়া কোন পথে/ ব্রজে গিয়া মাগিয়া খাইব/ জয়রাধা শ্রীরাধা নাম বলে"* গান গাইতে গাইতে কীর্তন করে গেলেও মৃতের জীবনসাথী গান গাইতে গাইতে কাঁদেন, *"অ রাঙচাকয়াঁই/ নীঙবাই য়াকুরাই থানসা তাঙলায়াঁই ফাইমানি/ বাহাই আঙ সাইচুং তাঙন'/ খালাই থানসাঅ চালাই ফাইমানি/ বাহাই আঙ সাইচুং চান'/ নীঙবাই চৌঙ কীনীয় হিমমানি লামা/ বাহাই আঙ সাইচুং হিমন'।"*

লক্ষ্মীধন মুড়াসিং

দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া মহকুমার পতিছড়িগ্রামে ১৯৭৭ সালে জন্ম। পিতার নাম দ্বিপদহরণ মুড়াসিং। ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত নিশিকান্তমুড়া সিং পাড়ায় পড়েছেন। তারপর রমেশ স্কুল। উদয়পুর সুভাষ মহাবিদ্যালয় থেকে স্নাতক। বর্তমানে আগরতলা মহাত্মা গান্ধী স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

উচই

আদিবাসী উচই জনগোষ্ঠীর নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে ধারণা

ত্রিপুরায় বসবাসকারী উছইদের উৎপত্তি ও ইতিহাস সম্পর্কে অর্থাৎ তাহাদের আদিম বাসস্থান সম্পর্কে বিশেষ তথ্য লিখিত প্রমাণ পাওয়া না গেলেও পূর্বপুরুষদের দেওয়া কাহিনী ও কিংবদন্তী অনুসারে উচইদের আদিম বাসস্থান ছিল বর্তমান ব্রহ্মদেশ ও তিব্বত পার্শ্ববর্তী সীমান্ত এলাকা চীন দেশের সিয়াং প্রদেশ। তাহারা ছিল তিব্বত ধর্মীয় মঙ্গোলীয় বংশজাত।

প্রাচীন কালে তাহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। তাহারা ছিল যাযাবর এবং তাহাদের কোন স্থায়ী বসবাস ছিল না। পেশা জুমচাষ ও বন্যপশু শিকার। জুমের পার্শ্বে বৃক্ষের উপর টংঘর বাঁধিয়া বসবাস করিত।

তাহারা যে ভাষায় কথা বলিত তাহা ব্রুং (Brung) বলিয়া পরিচয় দিত।

কালক্রমে, তাহারা কাজের অনুসন্ধানে ব্রহ্মদেশ ও চীন দেশ হইতে আরাকান হইয়া সমতল ত্রিপুরা (বর্তমান বাংলাদেশের কর্ণফুলী নদী পাশ্ববর্তী এলাকা) অনুপ্রবেশ করেছিল। সমতল ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে তাহারা মগ রাজা মংমং রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মগ রাজা তাহাদের অছাই বলে সম্বোধন করিয়াছিল। তখন হইতেই ব্রুং (Brung) রা অছাই উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিল।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অচাইরা সমতল ত্রিপুরা ছাড়িয়া পার্বত্য ত্রিপুরা বা স্বাধীন ত্রিপুরায় রামানন্দ অছাই হেডম্যানের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক অছাই জনগোষ্ঠী অনুপ্রবেশ করিয়াছিল। রাজার অনুমতিক্রমে স্থায়ী বসবাস করিয়াছিল। ত্রিপুরায় প্রবেশের পর মহারাজ তাহাদেরকে /উছই* বলে সম্বোধন করিয়াছিল। তাহাদেরকে উছই জনগোষ্ঠী উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল।

ত্রিপুরায় উচই বা উছই জাতির আগমন

১৯০৭ ইং খ্রীঃ বর্তমান বাংলাদেশের কর্ণফুলী নদীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে রামানন্দ হেডম্যানের পরিচলানায় একসাথে ৮৫ (পঁচাশি) পরিবার পানছড়ি হইয়া ত্রিপুরায় চলিয়া আসে। তাহারা দক্ষিণ ত্রিপুরার অমরপুর বিভাগে নূতন বাজারের পশ্চিমাংশে একছড়ি নদীর তীরে বসতি স্থাপন শুরু করে। বসতি স্থাপনের দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত একই অঞ্চলে বসবাস করিতেছিল কিন্তু বিভিন্ন কারণ বশতঃ কিছু পরিবার পুনরায় পুর্ব বাসস্থানে (বাংলাদেশে) ফিরিয়া চলিয়া যায় এবং রামানন্দ হেডম্যানের পরিচালনায় আরও কিছু সংখ্যক পরিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার মুহুরীপুর অঞ্চলে চালিয়ে যায়। আবার কিছু পরিবার উত্তর ত্রিপুরায় দশদা কাঞ্চনপুর অঞ্চলে চলিয়া যায়।

আদমসুমারি অনুযায়ী সংখ্যাগত পরিবর্তন

অন্যান্য জাতির তুলনায় ত্রিপুরার উচই জাতির সংখ্যা খুবই নগণ্য। ত্রিপুরার উচই জাতি সংখ্যালঘু হওয়ার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ- অনেক হিন্দু উচই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিবার ফলে তাহারা নিজেদের উচই সমাজ বহিস্কৃত বলেই নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ- বাজনৈতিক কারণে অনেকে সুবিধা লাভের আশায় উচই পদবী

না দিয়া অন্য জাতি পদবী দিয়া থাকেন। চাক্ষুশ প্রমাণ হইল, ত্রিপুরায় বিধানসভার একজন প্রাক্তন সদস্য স্বর্গীয় রায়মনি রিয়াং এর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি আসলে রিয়াং নন্, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি উচই। যেহেতু ত্রিপুরার উচই জাতির সংখ্যা খুবই নগণ্য অতএব বিধানসভার নির্বাচনে জয়লাভের আশায় তিনি নিজেকে এবং উত্তর ত্রিপুরার বসবাসকারী উচইদেরকে রিয়াং পবদী দিয়া রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত করেন। তবে বর্ত্তমানে আগের তুলনায় অনেক বাড়িয়াছে। বর্ত্তমানে ৩০০০ (তিন) হাজারের অধিক সংখ্যা আছে।

চিরাচরিত পোষাকে দুই বান্ধবী

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

উচই জাতি-মঙ্গোলীয়। ত্রিপুরার আদিবাসী (রিয়াং জনগোষ্ঠীর) সঙ্গে মিল আছে।

ভাষা সম্পর্কিত তথ্য ঃ

উচই জাতির ভাষাবংশ-তিব্বত-বর্মীয়।

জনগোষ্ঠীর ভাষার নমুনা, কিছু প্রবাদ বাক্য ও প্রাচীন লোকগীতির উদ্ধৃতি ঃ

উচই জনগোষ্ঠী কক্‌বরক ভাষায় কথা বলে। উচইদের প্রবাদ বাক্যে আছে /লেখাপড়া শ্লুংনাই মাইক্কাং চানাই* মানে হল (লেখাপড়া করে যে ভাত তরকারী খায় সে। /লেখাপড়া ক্কাং মানাই, বেইংন ক্কাং ফিনাই* এর অর্থ হল (পণ্ডিত হয় যে অপরকে ঠকায় সে) /লেখাপড়া ক্রুং মখা বাখান ব্রৌঃ* মানে (যে শিক্ষিত সে অহংকারী)।

জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যা এবং শতাংশ হিসাবে স্বাক্ষরতার হার ঃ

১৯৪৭ইং সালের পূর্বে উচইদের মধ্যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই ছিল না। সকলেই ছিল অশিক্ষিত এবং লেখাপড়া শেখাকেএকেবারেই মূল্য দিত না। পিতামাতারা নিজেরা নিজের ছেলে-মেয়েবে বিদ্যালয়ে যাইতে দিত না। কারণ তাহারা মনে করিত লেখাপড়া শিখিলে না কি, তাহাদের ছেলে-মেয়েরা অলস, দুষ্টামি ও পিতামাতার অবাধ্য হয়। উচইদের ভাষার কোন বর্ণ নাই তবে নিজস্ব মাতৃভাষায় কথা বলে। উচইরা বর্তমানে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লেখাপড়া করে। বর্ত্তমানে ৬০% শতাংশ সাক্ষর। উচইদের মাতৃভাষায় সাতবার, মাস ও ঋতু আছে।

BA-KTEMO উচই সাতবার

Uchoi	English
Talangli	Sunday
Talangla	Monday
Anga	Tuesday

Mdhu	Wednesday
Kraksandi	Thursday
Sokkra	Friday
Chani	Saturday

TA-KTEMO উচই বারমাস

Fagun	January
Chengra	February
Boishu	March
Cheihti	April
Asharoi	May
Shrau	June
Endri	July
Durboi	August
Osha	September
Khathoi	October
Mongsroi	November
Mangyung	December

Bla (Season) .

Shatung Bla -- Chengra, Boishu, Cheihth

Basha Bla -- Asharoi, Shrau, Endri

Sajlang Bla -- Durboi, Osha, Khathoi

Maseng Bla --Mangsroi, Mangyung, Fagun

উচইদের উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য

উচইদের মধ্যে বি.এ মোট- ১০ জন। বি.এস.সি- ১ জন। এম.এ- ৪ জন। এম.কম, এম.এস.সি- ১ জন। ডাক্তার নাই, ইঞ্জিনিয়ার- ৫ জন, সরকারী উচ্চপদে।

জুমকৃষি ও আরণ্যক জীবন

প্রাচীন কালে তাহারা ছিল যাযাবর এবং তাহাদের স্থায়ী বসবাস ছিল না। জুমচাষ ও পশু শিকার ছিল তাহাদের জীবন। কোন এক পাহাড়ে বা স্থানে এক বৎসর জুমচাষ করে। এইভাবে অর্থাৎ যাযাবরের মত উচইদের জীবন তাহাদের স্থায়ী ঠিকানা নাই। বন্য পশুদের মত বেড়ায়।

সমতল কৃষি

উচইদের সমতল কৃষি ভূমি নাই। তাহারা ছোট ছোট লুঙ্গা দখল করিয়া আছে। তাহারা অতিকষ্টে জীবন-যাপন করে এবং অন্যদের নিকট শ্রমদান করিয়া সংসার নির্বাহ করে।

ব্যবসা-বণিজ্য

উচইরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে না। ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা নাই।

চাকরি-বাকরি

উচইরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত অফিসার নাই। বর্তমানে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী আছে।

ঐতিহ্যগত তাঁত শিল্প ও অন্যান্য কুটিরশিল্প

উচইদের নিজস্ব জাতীয় পোষাক আছে যাহা অন্যান্য জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পোষাকেব দিক দিয়া তাহারা স্বাবলম্বী ছিল এবং বাজারে তৈরী কাপড় ব্যবহার করিত না। তাহারা জুমচাষ করিয়া তূলা উৎপাদন করিত এবং নিজেরাই চরকা দিয়া কার্পাস হইতে তূলা বাহির করিত এবং তূলা হইতে সূতা বাহির করিয়া নিজেদের প্রয়োজনীয় পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করিত। পুরুষ লোকেরা ছোট গামছার মত নেইংটি পরিত আর মাথায় পাগড়ী ও গায়ে পুরা হাতা ওয়ালা কোটের মত জামা পরিধান করিত। স্ত্রী- লোকেরা নিম্মাংশের জন্য এক খণ্ড কাপড় (পাছড়া) কোমর হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ব্যবহার করিত এবং বুকে 'রিয়া' নামে একটি ছোট কাপড় এবং মাথায় টুপির মত পুরুষের নমুনায় পাগড়ী বাঁধিত। স্ত্রী-পুরুষ উভযেই অলংকার পরিতে ভালবাসে, মেয়েরা যেমন মাথায় চুলে খোঁপা বাঁধে ও গলায় মালা, হাতে চুড়ি কানের দুল ইত্যাদি ব্যবহার করে ঠিক সেই ভাবেই পুরুষরাও ব্যবহার করিত। এই সব মিল থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী-পুরুষ চিনিতে অসুবিধা ছিল না। উচইরা রূপার টাকা দিয়ে মালা বানাইয়া পরিতে ভালবাসিত। আগের দিনে উচইদের এক বিশেষ বৈশিষ্ট হইল, নিজেদেব তৈরী চিরুনী সব সময় মাথায় দিযা অলংকাব রূপে পরিয়া থাকিত। উচই জাতীয় যুবক-যুবতী সকলেই ফুলকে খুবই ভালবাসে এবং অলংকার হিসাবে ব্যবহার করে।

জনগোষ্ঠীর জন্ম-মৃত্যু বিবাহের আচারানুষ্ঠানের বিবরণ

শিশু জন্মাবার আগে মায়ের যখন প্রসব ব্যদনা শুরু হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীকে ও অচাইকে খবর দিতে হয়। 'অচাই' (পুরোহিত) একটি বাঁশকে কেটে সুন্দরভাবে সাজাইয়া তিনটি খুমতাং (কার্পাসের মালা) ঝুলাইয়া সঙ্গে তিনটি মোরগ নদীর ঘাটে লইয়া যায়। বাঁশটিকে নদীর ঘাটে পুঁতিয়া দিয়া ফুলের মালাগুলি তিনটি কাঠিতে ঝুলাইয়া দেয় এবং তিনটি মোরগ তিন দেবতা- কালাখি, দলাখি ও বুড়াছা দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেয়। বলি দেওয়ার সময় /অচাই* নানা মন্ত্র উচ্চারণ করে। বলি দেওয়ার পরেই ঐদিকে শিশুর প্রসব হয়ে যায়। তিনটি মোরগ বলি দিতে হয়, তাহাকে বলে /গেবেং বুমানি*।

জনৈকা উচই বৃদ্ধা

কোন মায়ের শিশু বার বার মারা গেলে সন্তান টিকাইয়া রাখিবার কামনা করে /আঁমি,* বলে একটা অনুষ্ঠান করতে হয়। অনুষ্ঠানটি হচ্ছে- 'অচাই', একটি চুঙার ভিতরে /কামাত্রি*(একপ্রকার বনের সব্জি) ঢুকাইয়া সঙ্গে মরিচ লবণ দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া একটি কাঠি দিয়া গুটাইতে হয়।

শিশুর জন্মের পরে ৫(পাঁচ) দিন পর্যন্ত শিশুর মাতাকে অশোচ ঘরে থাকিতে হয়। /মাচাং,, ঘরের উপর ছোট /থাপা,, (আগুন জ্বালাবার স্থান) করে, আগুনে তাপ দিয়া থাকিতে হয়।

তাহাকে বলে থাফাঃ আচৌকমানি। শিশুর মা পাঁচদিন অশৌচ ঘরে থাকিবার পর তাহাকে শুদ্ধ করা হয় তখন শিশুর মা স্নান করিয়া মাথা ধোয়। থাপার মাটি ফেলিয়া দেওয়া হয়। ধাত্রী আসিয়া দুটো ডিম লইয়া একটি ডিম ফাটিয়া দেয় এবং একটি ডিম জলে ভাসাইয়া দেয়। এই অনুষ্ঠানকে বলে /আবু সুমানি*। শিশু ৫(পাঁচ) মাস পরে অনুষ্ঠিত হয়

স্বগৃহে উচই যুবতী

/বাচৌক কামানি*। তখন শিশুর চুল কাটা হয়। কান ছিদ্র করা হয় এবং নামাকরণ করে। উপরিউক্ত প্রাচীন রীতি ছিল কিন্তু বর্তমানে উচইগণ ৯৫ শতাংশই খ্রীষ্টান। সুতরাং পূজা পার্বণ বা বলির কোন অনুষ্ঠানই করে না। বর্তমানে শিশুর জন্ম ধাত্রীর মাধ্যমে হোক বা হাসপাতালে হোক এমন কোন অনুষ্ঠান হয় না। তবে বর্তমানেগ্রামে-গঞ্জে হলে ৫/৭ দিন অশৌচ ঘরে, কঠোর ভাবে তৈরী তরকারী বাছিয়া বাহিরে বাহির না হয়ে আগুনের কাছে থাকিতে হয়। ৫/৭ দিন পরে শিশুর নাভী ছিঁড়ে গেলে মা স্নান করে, মাথা ধুইয়ায়ে শুদ্ধ হয়। পরিশুদ্ধির দিনে খ্রীষ্টানগণ পাড়ার সবাইকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে শিশুর মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। শিশুর নামাকরণ করে।

উচই সমাজ কোন লোক মারা গেলে প্রথমে তাহাকে স্নান করিয়ে শুদ্ধ করিতে হয়। তারপর পুরুষ বা নারী যে যার পোষাক পরিয়া ঘরের মাঝখানে সামনের দিকে মুখ করে, চেয়ারের মত করে তৈরী করা বাঁশের হেলান মাচায় হেলানো অবস্থায় বসিয়ে রাখা হয়। মৃত লোকে জড়াইয়া দেওয়া হয় নূতন /রিত্রাক দিয়া। পায়ের কাছে রাখা হয় একটি থালা। মৃত লোককে যে সাজানো হয়, তাহা খুব বিদ্ঘুটে ধরনের হয়। লাল-কালো সূতা দিয়ে কান বেরিয়ে ঠোটে লাল সূতো দিয়ে একটা বিদ্ঘুটে ভাবে সাজানো হয়। মৃত লোকের দুর-দুরান্তের আত্মীয়স্বজন যাহাতে আসিয়া দেখা করিতে পারে তাহার জন্য সঙ্গে সঙ্গে মৃত দেহকে ফেলে দেওয়া হয় না। এই ভাবে একরাত একদিন ঘরে রাখা হয়। যাহারা শেষ দর্শন করিতে আসে যে যার মত টাকা বা পয়সা মৃত লোকের পায়ের দিকে রাখা থালের মধ্যে দান করে। সারা রাত ধরিয়া কেউ বা কাঁদে, কেউ বা নাচে। পরের দিন মৃত লোককে বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্যে বাঁশের বাক' তৈরী করে, নানা ভাবে সাজানো হয়। এরপর নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে। লাকড়ীর মাচা তৈরী হয় পুরুষদের জন্য ৫টি থাক ও নারীর জন্য ৭টি থাক। মৃত লোকের উদ্দেশ্যে আগত লোকদের পরে খাওয়ানো হয়।

বিবাহিত নারীকে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব অলংকার খুলিয়া ফেলিতে হয়। এক সপ্তাহ ধরে কারোর ঘরে বেড়াতে পারিবে না। একমাত্র চৌধুরীর ঘর ব্যতীত। মৃত পিতামাতার উদ্দেশ্যে এক বৎসর পরে যে যার সাধ্যমত/ধর্মমেলা* করে। তবে ইহার কোন বাধ্য বাধকতা ছিল না।

বর্তমান রীতিতে মৃতলোকের স্নান করানো, সাজগোজ, নাচ গান ও রাত জাগিয়া পাহারা দেওয়া, টাকাপয়সা দান করা সব একই নিয়ম। তবে বেশীর ভাগ খ্রীষ্টানগণ কবরের সময় ফাদার বা পাস্তরের মাধ্যমে প্রার্থনা করে এবং আগত অতিথিদের ভাত খাওয়ানো হয়। বর্তমানে যার যাহা যখন ইচ্ছা যে কোন সময় সমাজের দশজনকে খাওয়াইয়া পিতামাতার উদ্দেশ্যে /ধর্মমেলা* করিতে পারে।

বিয়ে সাধারণত রাত্রিবেলা হয়। ছেলে বরের বেশে অর্থাৎ মাথায় সুন্দর উচই পাগড়ী পরিয়া খুতাই তাক ব্রাক (নিজ তৈরী জামা) গায়ে দিয়া, সুন্দর নুতন বিছানা চাদর উপর দুটি বালিশ সহ সাজানো বিছানায়, বিবাহের জন্য কন্যার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। ঐ দিকে মেয়ে অন্য ঘরে লুকাইয়া থাকে। মেয়ের জামাই বাবু ও বেয়াই সম্পর্কের ছেলেরা মেয়েকে খুঁজিয়া জোর করে বিবাহ আসরে ধরিয়া নিয়ে আসে এবং ছেলের নিকট বিছানার উপর বসাইয়া দেয়। এরপর /অচাই* তাহাদের উভয়ের মাথায় নানা কথা উচ্চারণ করে আর্শীবাদ করে ও জল ঢালে। তারপর জোর করিয়া তাহাদের উভয়কে শুয়াইয়া দেয়। এবং চাদর ছড়াইয়া দিয়া চারকোনায় চারজন তাদেরকে জোর করিয়া চেপে ধরিয়া রাখে। তারপর সমবেত লোকেরা হাততালি দিয়া লজ্জা নাই বলিয়া হাসাহাসি করে। এরপর আদ্রাং সর্দার তাহাদের মাথায় জল ঢালে। জল ঢালার পরেই /আদ্রাং সর্দার* বড় কথা বলতে পারে। এই ছিল উচই সমাজের বিবাহের অনুষ্ঠানের নিয়ম কানুন।

উচই সমাজের আধুনিক বর-কনে

প্রাচীন রীতিতে উচই সমাজের একটি নিয়ম ছিল যে, জামাইকে বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীতে চার বৎসর চার মাস চার দিন জামাই খাটিতে হইত। এই চার বৎসর জামাইকে পুরোপুরি চাকরের মতই খাটিতে হইত। সকাল বেলা শ্বশুর ঘুম থেকে উঠিলে দাঁত মাজনের কাঠি দিতে হয়। শ্বশুর মাতাল হয়ে কোথাও পড়ে থাকলে কাঁধে করে ঘরে নিয়ে আসিতে হইত। বড় বোঝা কাঁধে লইতে হইত। চার বৎসর পূর্ণ হলে, ছেলেমেয়ে সহ বউকে নিজ ঘরে লইয়া আসিতে পারত। খুশী হয়ে তখন কাপড় চোপড়, শুয়োরের বাচ্চা, মুরগী, ছাগল বা গয়ের গরু ইত্যাদি দিয়া দিত। তবে এখানে উল্লেখ করিতে হয়, বিয়ের সময় মেয়ের মাকে বুকের দুধের মূল্য স্বরূপ ১২০ টাকা দিতে হইত। এই প্রথা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

বর্তমানে উচই সমাজে বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইল ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ছেলেদের

২১ বৎসর এবং মেয়েদের ১৮ বৎসর। ছেলে ও মেয়ে উভয়ই রাজী না হইলে পিতামাতা জোর করিয়া বিবাহ দিতে পারে না। ছেলে বিবাহের আগে বা পরে জোর করিয়া কোন 'পণ' দাবী করিতে পারে না।

নব দম্পতিকে আশীর্বাদরত উচই পুরোহিত

প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী 'জামাই খাটা' প্রথা উচ্ছেদ হইয়াছে। কাহাকেও বাধ্যগত ভাবে জামাই খাটিতে হয় না। তবে পুত্রহীন শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে কোন জামাই যদি নিজের ইচ্ছায় লালন-পালন করে তাহাতে সমাজের কোন বাধা নাই। বিবাহের সময় মেয়ের বুকের দুধের মূল্য স্বরূপ এই টাকা দিতে হয়। প্রাচীন কালের প্রথাটি ধরে রাখা হয়েছে।

বাগদান (খুংলাইম)

বর্তমানে উচই সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী (খ্রীষ্টান, হিন্দু-বৈষ্ণব, বৌদ্ধ) ইত্যাদি আছে। সুতরাং প্রাচীন কালের মত এক জাতি এক আইন করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাগদান ও বিবাহ পদ্ধতি যার যার ধর্মীয় রীতিতেই অনুষ্ঠিত হয়। কারণ প্রাচীনকালের মদের অনুষ্ঠান বা পুজো বা বলির অনুষ্ঠান খ্রীষ্টান ও বৈষ্ণবগণ করিতে পারে না। হিন্দু-শক্তি ও বৌদ্ধগণ ও প্রাচীন রীতি আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। কারণ বর্তমানে উচইদের মধ্যে শতকরা ৯৫ শতাংশই খ্রীষ্টান।

প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ও বিবর্তনের ধারা ঃ

প্রাচীনকালে উচইদের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং পরে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা তুলনামূলক আলোচনা করিয়া পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহারা পূর্বে যে বড় বড় গাছগুলির মধ্যে ঈশ্বর আছে বলিয়া আরাধনা করিত, আজ তাহা করে না। পূর্বের দেবদেবীকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া পূজা ও আরাধনা করিত, আজ তাহারা সেগুলোকে পূজা ও আরাধনা করে না। কিন্তু পরিবর্তে প্রকৃত ঈশ্বরকে তাহারা ভজনা করে। সমাজ হিসাবে পূর্বে যে সমস্ত লজ্জাজনক কাজগুলি করিত, সেগুলি আর করে না। কোন অনুষ্ঠানে মদ খাইয়া নিজের ভাইবোনদের সহিত আদি কালে যে ভাবে নাচ-গান করিত, এক্ষণে সেগুলো আর করে না। আগে নিজের শুইবার মাচাং এর নীচে শুকর পালিত এবং যেখানে সেখানে মাচাং এর উপর থেকে মল ত্যাগ করিত। *কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান হইবার পর থেকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে সকলেই খুবই উন্নতির পথে* অগ্রসর হইয়াছে বলা যায়। পোষাকের দিক দিয়েও তাহারা আজ অনেক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। পূর্বে পুরুষেরা ছোট একটি গামছা নেংটি পরিত, স্ত্রীলোকেরা হাটুর উপর হইতে কোমরে পাছড়া ও বুকে ছোট একটি কাপড় রিয়া পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারন করিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে ১৩ বৎসর না হলে বুকে (রিয়া) ও নেংটি পরিতে পারিত না। এক কথায় খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পরে খাওয়া দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, লেখাপড়া ও আর্থিক অবস্থা

সবদিক দিয়েই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খ্রীষ্টিয়ান হবার পূর্বেই উচইদের মধ্যে অনেক কু-সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ছিল। যেমন — কেহ কোন শুভকার্য্য শুরু করিবার সময় কেহ যদি হাঁচি দেয়, তবে অশুভ লক্ষণ বলে সেই কাজটিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা দরকার বশতঃ কোন স্থানে যাওয়ার জন্য যদি শ্মশানের মধ্য দিয়ে যাইতে হয় তবে তাহাদের কানে কিংবা মাথায় ঝাড়ু পরিয়া যাইতে হইত। বৎসরের প্রথম কৃষিকাজ করিতে হইলে পূর্ণিমা কিংবা নতুন চাঁদ দেখা না দিলে আরম্ভ করা যাইত না। স্বামী কিংবা স্ত্রী মারা যাইবার পর এক সপ্তাহ না হইলে জীবিত কেনা স্বামী বা স্ত্রী অন্যের বাড়ীতে বেড়াইতে পারিত না। যদি বেড়ায় তাহাকে জরিমানা করা হইত। এই সমস্তের পরিবর্তন একমাত্র খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

উচই দম্পতি

ধর্ম ও ধর্মীয় বিভাজন এবং সমাজে তার প্রতিক্রিয়া

ত্রিপুরার উচইদের একদিন তাহাদের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি পূজা-পার্ব্বণ, পোষাক-পরিচ্ছদ, রতিনীতি ইত্যাদি ছিল। কিন্তু আজ তাহাদের মধ্যে এইগুলি আর দেখা যায় না। কেন সেগুলো আজ আর তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না? দেখা যায় না, কারণ এই সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু দরিদ্র লোকেরা এই সম্প্রদায়েরই ধনী ও শক্তিশালী লোকদের হাতে অত্যাচার অবিচার পেয়ে নিজস্ব পূর্ব্বকালের ধর্ম সংস্কৃতি ত্যাগ করে অন্য আর একটি ধর্মাবলম্বী হইতে বাধ্য হয়। তাহারা শক্তিশালীর প্রভাব থেকে মুক্তি বা রেহাই পাবার জন্য অন্য আর একটি শক্তিশালীর আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছে। এই আশ্রয়দাতা হইলেন খ্রীষ্টিয় ভাইরা। যত সব গরীব, দুর্বল ও অশিক্ষিত শ্রেণী পরিবারের লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী হইলেন। তবে তাহারা প্রথমে যীশুখ্রীষ্টকে সত্যিই করিয়া ত্রানকর্ত্তা রূপে বিশ্বাস করিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারি না বা বোধ হয় না। মনে হয় শুধু শক্তিশালীর অত্যাচার-অবিচার হইতে রেহাই পাওয়ার জন্য ধর্ম ও ধর্মীয় বিভাজন হইয়াছে। বর্তমানে খ্রীষ্টান, কিছু অংশ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছে।

দেবদেবী, তাদের পূজা পদ্ধতি

উচই সমাজে সমাজগত ভাবে বৎসরে বিশেষ ভাবে দুইবার পূজা হইত। এই দুইটি পূজা কোন নির্দিষ্ট সময় বা কাল ছিল না। সকলেই মিলে বৎসরের যে কোন মাসে বা সময়ে করা যেত। পূজার খরচের জন্য প্রত্যেক পরিবারকে এক বোতল মদ দিতে হয়।

একটি পূজা দেওয়া হইত বড় গাছের তলায় মহাদেবের উদ্দেশ্যে এবং এই পূজাটি করার সময় মহিষ বলি দেওয়া হইত। পুরোহিত বেদীর চারিদিকে ঘুরিয়া নাচার পর পশুটি বলি দিতেন। দ্বিতীয় পূজাটি দেওয়া হইত ঘাটে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে। এই পূজায় শূকর ও মোরগ বলি দেওয়া হয়। এবং সকলে একটি মুরগীর বাচ্চা গঙ্গার উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করিতে হত। ফুল ও খৈও নদীতে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ছিটাইয়া দেওয়া হইত। উভয় পূজাতেই উপস্থিত সকলকে আর্শীবাদ হিসাবে বলির মাংস ভাগ দিতে হয়। বর্তমানে উচইরা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী বলে, তাহাদের জাতীয় উৎসব ২৫শে ডিসেম্বর যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন হচ্ছে উচইদের জাতীয় উৎসব। সেই দিন তাহারা নাচ-গান ও নৃত্যগীতি করে পালন করে। কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছে। তাহারা বৌদ্ধপূর্ণিমার সময় নাচ-গান করে।

ঐতিহ্যগত খেলা-ধূলা

উচইদের খেলা-ধূলা অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে মিল দেখা যায়। যেমন — "সিঐ" খেলা উচইদের জাতীয় খেলা। এই খেলাটি দুইজনে বা চারজনে খেলা হয়। "সিঐ" হচ্ছে গাছের ফল। ঐ গাছের ফল দিয়া এই খেলা হয় বলে, খেলার নাম "সিঐ" খেলা। সিঐ ছাড়া আরও খেলা আছে। ওয়া ডুমলাইম, দুঃ সলাইম ইত্যাদি।

উচই জনগোষ্ঠীর জীবনে স্মরনীয় ঘটনা ও বিপর্যয় ঘটনা নেই বললে চলে। তবে ত্রিপুরায় আগমন সময়ে একছড়িতে বসবাস করার সময় কলেরা রোগে প্রতিটি ঘরে লোক মারা যায়। সেই ঘটনাকে সাধারণতঃ বিপর্যয় বলা যায়।

রাজনীতি

উচইরা ত্রিপুরা রাজ্যে খুবই সংখ্যালঘু। সুতরাং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করার মত নেই। তবে ভিলেজ কমিটি গুলিতে আছে। শ্রী সইত্যমনি উচই, শ্রী অনন্ত উচই, শ্রী এরাধন উচই, শ্রী সম্বারায় উচই, শ্রী অমাজয় উচই ইত্যাদি।

বহিরাগত প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও সহাবস্থান

উচইরা পার্ব্বত্য ত্রিপুরা বর্তমান বাংলাদেশের বান্দরবন অঞ্চলে আছে। চিঠি ও টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হত। বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকেরা যাওয়া আসা করে। আর মিজোরাম ও ময়নামা, ব্রহ্মদেশেও উচইরা বাস করে। মিজোরাম থেকে প্রায় উচইরা এখানে বেড়াইতে আসে। এইভাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে।

বিবর্তনের পথে উচই জনগোষ্ঠী

বিগত ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পুর্বে উচইদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং কেহ কেহ প্রকৃতির পূজারী ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় শ্রী মঙ্গলচান উচই চিচ্‌রি গ্রামে (বর্তমানে নূতন বাজারের পূর্বে) প্রথম খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন। ঐ বৎসরই দক্ষিণ ত্রিপুরার বর্তমান রঙ্গাছড়া গ্রামে স্বামী-স্ত্রী ৩৩ (তেত্রিশ) পরিবার মোট ৬৬ (ছেষট্টি) জন আবার দীক্ষিত হন। সে সময় থেকেই প্রতি উচই পরিবারের পিতা-মাতারা শাস্ত্রীয় শিক্ষা অর্থাৎ বাইবেল শিক্ষায় নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতি মনোযাগ দিতেন। কারণ বাইবেল আমাদেরকে কিভাবে উপাসনা করিতে

হয়, পরিবার সামাজিক সম্পর্ক, কৃষিবিদ্যা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে নিয়মিত শিক্ষা শিশুদিগকে দিবার আদেশ করে। শাস্ত্র বলে "গৃহে বসিবার কিংবা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিংবা গাত্রোত্থান কালে শাস্ত্রের কথোপকথন করিবে" (দ্বিতীয় বিবরন ৬ঃ৭। গৃহে শাস্ত্রীয় আলোচনাই বর্তমান উচই জনগোষ্ঠীকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চালচলন ইত্যাদির প্রগতি ও বিবর্তনের পথে আগাইতে সাহায্য করিয়াছে।

গৃহের বাহিরে শিক্ষা

বর্তমানে উচই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ খ্রীষ্টিয়ান ধর্মাবলম্বী। তাহারা সাধারণত দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম গড়িয়া একসাথে বসবাস করিতে পছন্দ করে। ১৯৭৮ সালে উচই আতাইবাং নামে একটি সামাজিক সংস্থা গঠিত হবার পর, সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রীতিনীতির নিয়ম কানুন বই-এর আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সেই সময় হইতে বাধ্যতা মূলক আইন তৈরী হইয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক বালিকাও বালককে ১৮ বৎসর আগে বিয়ে করা নিষেধ করা হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ফলে প্রথমতঃ খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদের প্রভাব ও গৃহে বাইবেলের নিয়মিত শিক্ষা এবং দ্বিতীয়ত ঃ সমাজে বাধ্যতা মূলক শিক্ষার আইনের জন্য বর্তমানে ৫ (পাঁচ) জন মাষ্টার ডিগ্রি লইয়া পাশ করিয়াছেন এবং আরও ৬ (ছয়) জন ত্রিপুরায় ও ত্রিপুরার বাইরে মাষ্টার ডিগ্রি নিয়ে পাঠরত আছেন। সাথে সাথে তাহারা বর্হিজগতের সভ্যতার কাজ ও নিয়মও শিখিয়া আসিতেছে। লেখা পড়ার শেষে অনেকে চাকুরী পাইয়া আর্থিক ভাবে কিছুটা স্বচ্ছন্দ হতে পারিয়াছে। কিন্তু বেশীর ভাগ শিক্ষিত ছেলে মেয়েরাই এখনো চাকুরী পায়নি।

পাম্বিরাম উচই

দক্ষিণ জেলার অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত করবুকের বড়বাড়ি গ্রামে ১৯৫৭ সালে জন্ম। পিতা খমবুইহা উচই। আগরতলার সেন্টপলস ইস্কুল ও নতুন বাজার উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে ইস্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে কেওয়াই উচই পাড়া উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় কর্মরত আছেন। তিনি বর্তমানে থাকেন করবুকের ডেপাছড়া গ্রামে।

কলয়

রাজ্যের উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে হালাম (Halam) একটি সম্প্রদায়। রাজ শাসনে এই "হালাম" সম্প্রদায়কে ১২ (বার) টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন ঃ (১) মলসম্ (২) কাইপেং (৩) রাংখল (৪) কলয় (৫) রুপিনী (৬) বংচের (৭) করবং (৮) লঙ্গায় (৯) মসফাং (১০) বাসাল (১১) দাব (১২)সাইমার অর্থাৎ এই ১২ দফা উপজাতি গোষ্ঠীকে নিয়েই বৃহত্তর "হালাম" সম্প্রদায়। এদের মধ্যে ভাষাগত ভাবে, দুটি ভাগে বিভক্ত। কক্‌বরক ও কুকি ভাষা। কলয় এবং রুপিনীরা হচ্ছে কক্‌বরক ভাষাভাষি এবং বাকিরা সবাই কুকি বা মিজো ভাষাভাষি। কলয় এবং রুপিনীরা কক্‌বরক ভাষাভাষি হয়েও কি করে কুকি ভাষা-ভাষিদের সঙ্গে "হালাম" সম্প্রদায়ে ভূক্ত হল তার যুক্তি খুজে পাওয়া যায়না। খুব সম্ভবতঃ রাজশাসনের সুবিধার্থে ভৌগোলিক পরিবেশের ভিত্তিতেই "হালাম" সম্প্রদায় ভূক্ত করা হয়ে থাকতে পারে। হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শ্রেণী এখনও হালাম হিসাবেই তাদের পদবী লিখছে। তাদের মধ্যে আবার অনেকেই উপ-শ্রেণী (Sub Cast) রাংলং ও চরাই পদবী ব্যবহার করছেন। চরাইদের মধ্যে আবার অনেকেই ত্রিপুরা পদবী ব্যবহার করছেন। যেমন- উত্তর ত্রিপুরা জেলার জয়থাং, বাগবাসা ও নওগাং এলাকার হালাম বাসিন্দারা এই সব পদবীতে পরিচিত। আবার দামছড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার মাকুন্দা, মানিকবন্দ এলাকার হালামদের মধ্যে চরাই ও ত্রিপুরা পদবী লিখতে দেখা যায়।

হালাম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি শ্রেণী-গোষ্ঠী যেমন ঃ লঙ্গাই, মসফাং, বাসাল, দাব ও সাইমার জনগোষ্ঠী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলা যায়। কারণ হালামদের মধ্যে কুকি বা মিজো ভাষাভাষিরা মাতৃতান্ত্রিক। তাই এই সমস্ত ছোট ছোট শ্রেণীভূক্তরা বিবাহের পর তাদের সন্তান অর্থাৎ ছেলে মেয়েরা "মা"র পদবীতেই পরিচিত হয়ে থাকেন। হালামদের মধ্যে কলয় এবং রুপিনীরা পিতৃতান্ত্রিক তাই পিতার পদবীতেই পরিচিত ও গোষ্ঠীভূক্ত হয়ে থাকেন।

আদিবাসস্থান ঃ— কথিত আছে যে, কলয়দের আদিবাসস্থান ছিল "দোয়া পাম্থর"। অর্থাৎ এরাজ্যের কলয় এবং হালাম সম্প্রদায়ভূক্ত অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী কুকি দেশ থেকেই ত্রিপুরায় এসছে। এই কুকি দেশ বা প্রদেশ [illegible]ময ত্রিপুরার অর্থাৎ তৎকালিন বৃহত্তর কিরাত দেশের শাসনে চলে আসে। কুকি দেশেরই [illegible]ণ পশ্চিম সীমান্ত আরকন প্রদেশের কুকি নালার পার্শ্ববর্ত্তী জায়গার নাম "দোয়াপাম্থর"। তার উপরিভাগ উত্তর-পূর্বে "খামা রাংখল" নামে জায়গায় বসবাস করত রাংখল জনজাতি গোষ্ঠি এবং তারও কিছু পূর্বাংশে "কাইপং" নামক জায়গায় কাইপেং জনগোষ্ঠী। এই ভাবে কুকি দেশে ছড়িয়ে ছিতিয়ে মলসম, বংচের, মসফাং, সাইমার, দাব, বাসাল, কুকি, পাংখ এবং আরও ছোট ছোট জাতি গোষ্ঠী বসবাস করত। অতি প্রাচীন কালের সেই ভৌগোলিক অবস্থান এখন আর নেই বললেই চলে। বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই। অতিসহজেই কল্পনীয় তখন সেখানকার সামাজিক ব্যবস্থা ও সভ্যতার কি চরম দুরবস্থা। ছোটকালে শুনেছি নানা-নানিদের কাছে ঘটে যাওয়া অনেক লোমহর্ষক-কাহিনী। যখন অতি আগ্রহে জিজ্ঞেস করি, নানা-নানিরা বলত আমরা কি আর দেখেছি, তোমাদের মতো আমরাও আমাদের নানা-নানিদের

কাছ থেকেই শুনেছি। এভাবেই মুখে মুখে কানে কানেই সীমাবদ্ধ ছিল এসব কাহিনী ও ইতিহাস। শুনেছি তখনকার সর্দ্দার, রাজাদের পেশাই ছিল লুঠতরাজ, ডাকাতবৃত্তি। আর দুর্বলতম অংশের মানুষের পেশাবৃত্তি ছিল জুমচাষ আর জঙ্গলের খাদ্য সংগ্রহ করা। আর জুমচাষ মানেই অস্থায়ী বসবাস। এককথায় যাযাবরী জীবন যাপন। জুমচাষ মানেই এগিয়ে যাওয়া, পেছনে ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। এভাবেই জীবন জীবিকার তাগিদে এবং লুঠতরাজ, ডাকাতদের ভয়ে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজন ও গোষ্ঠীদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াতো, নিত্য নূতন বসতি স্থাপন করত। এভাবেই কলয় সমাজ কালের স্রোতে দোয়াপাছুর থেকে ধীরে ধীরে মায়ানি রিজার্ভ, পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে এক সময় দক্ষিণের ফেনী নদী অতিক্রম করে সাব্রুমে চলে আসে। সাব্রুম কেন, গোটা রাজ্যটাই ছিল ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। হাতি, বাঘ, ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র প্রানীর-তাণ্ডব, কখনো কখনো জুমিয়াদের জীবন অকালে ছিনিয়ে নিত। এভাবে মুহুরী নদীর পার ঘেসে জুমচাষ করতে করতেই একসময় উদয়পুরের আশপাশ এলাকায় চলে আসে। গর্জ্জী খিলপাড়া হয়ে গোমতী নদী পার হয়ে পাড়া কতাল অর্থাৎ বর্তমান নোয়াবাড়ী। তারপর বুড়িমা নদীর আশপাশ ঘেসে বড়মুড়ার চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। স্বভাবতই জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে এবং নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ছোট ছোট পাড়া বা গ্রাম গড়ে উঠে। যেমন তারপাদুম, এরাম, লুঠর কামি। জানা যায় কলয়দের আরও একটা অংশ বর্ত্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লাতেও একসময় বসতি স্থাপন করে এবং পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে। বর্ত্তমান বাংলাদেশের তৎকালিন ভাঁটিবন, মধুবন, কাওয়াবন, দেবীপুর একসময় কলয় অধ্যুষিত এলাকা ছিল।

"কলয়" নামের ব্যাখ্যা ও পরিচিতি

কথিত আছে যে, সে সময়কার কুকি দেশের কিছু লুঠতরাজ বা ডাকাতরা পাশ্ববর্তী গ্রাম গুলোতে মাঝে মধ্যেই আচমকা এসে সর্বস্ব লুটপাত করে নিয়ে যেত। একসময় এ খবর ত্রিপুরার মহারাজার কর্ণগোচরে আসে। তখন মহারাজ গুপ্তচর পাঠিয়ে সমস্ত খবর সংগ্রহ করে এবং রাজ পরিষদের বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে সৈন্য সামন্ত নিয়ে ঐ অঞ্চলে প্রবেশ করে। ওরা এর পূর্বে রাজা মহারাজাদের কোন খবরই জানাত না। অজানা আতঙ্কে ও ভয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। একে একে যখন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন মহারাজার পাহারারত বৃন্দাবাহিনী অর্থাৎ সেনাবাহিনী পালিয়ে যাওয়া গ্রামবাসীদের ঘিরে ফেলে। কিছু পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও বিরাট একটা অংশ ধরা পড়ে যায়। মহারাজার কাছে খবর পৌঁছামাত্র মহারাজ তাদের সবাইকে মহারাজার অস্থায়ী শিবিরে নিয়ে আসার আদেশ করেন। মহারাজ তাদেরকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেও কি জানি কি হয় আতংকে ভোগতে থাকে। মহারাজকে দেখে ওরা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ওরা বুঝতেই পারছেনা স্বর্গ থেকে স্বয়ং ভগবান দেখা দিয়েছে না যমরাজ। আকার ইঙ্গিতে মহারাজ এবং তার লোকজন তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করে এবং তাদের অবস্থা জানতে চেষ্টা করে। ন্যাংটি পড়া প্রায় ওলঙ্গ সব গ্রামবাসীদের দেখে মহারাজার দয়া হয় এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য কতিপয় সেনা মোতায়েন করে মহারাজ রাজবাড়ীতে ফিরে আসেন। কয়েকমাস পর মহারাজ তাদের জন্য খাদ্যবস্তু ও কাপড়-চোপব পাঠিয়ে দেন। এরই মধ্যে নিরাপত্তা ও তাদের দেখাশুনা করার জন্য রেখে আসা

বৃন্দা বা সিপাহীদের সঙ্গে তাদের মারাত্মকভাবে ঝগড়াও হয় এবং মেরে ফেলারও চেষ্টা হয়। এসব ঘটনাকে নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। কারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় ডাকাতদের সহযোগীও ছিল। অনেক বুঝানোর পর গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেরই নমনীয় মনোভাব দেখা দেয় ও সিপাহীদের বিশ্বাস করতে শুরু করে। এরই মধ্যে মহারাজার পাঠানো খাদ্যবস্তু, কাপড়-চোপর এবং আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র উপহার পেয়ে গ্রামবাসীরা মহারাজকে তাদের ত্রানকর্তা হিসাবে ভাবতে শুরু করে। তারপর মহারাজ তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্রসামগ্রী নিয়ে একদিন সেখানে হাজির হলে গ্রামবাসীদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশ দেখে মহারাজ অত্যন্ত খুশী হন এবং তাদের মধ্যে এক সুন্দরী যুবতীকে বিয়ে করে নিয়ে আসেন। ওবাও সম্পূর্ণভাবে মহারাজার বশ্যতা স্বীকাব করেন এবং আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন থেকেই তাদেরকে কলই বা কলয় বলে আখ্যায়িত করা হয়। ক-ল-ই অর্থাৎ খুব নম্র ও ধীবে-সুস্থে বুঝিয়ে স্বাভাবিকভাবে আনা বা বশ্যতা স্বীকার করানো। এরপর থেকেই রাজপ্রজাদেব সবাই তাদেরকে কলয় বলে ডাকত অর্থাৎ ককবরকে বলতে গেলে (চিনি রাজা ব-রক ন কলই তবুমানি) এ থেকেই নাকি ওবা কলয় নামে পরিচিতি লাভ করে।

বলং সুয়ার মানি মতায় (পূজা)

হালাম সম্প্রদায়ভূক্ত কলয় জাতি ৭ (সাত) টি ভাগে বিভক্ত। একেকটি ভাগকে পাঞ্জি বা হদা বলা হয়ে থাকে। এই সাতটি হদা হল ঃ (১) ওয়াপ্রম (২) ওয়াকবুর (৩) রোজগুই (৪) বুকাং (৫) আবেল (৬) চরাই (৭) কুসু।

সামাজিক শাসন ব্যবস্থা ও পরিকাঠামো

(ক) সমাজ পরিষদ ঃ- সামাজিক শাসন ব্যবস্থাকে সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সমাজ পরিষদ থাকে। এই সমাজ পরিষদের মুখ্য হচ্ছেন রায় এবং পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ৭ (সাত) জন। এই ৭ জন সদস্য কলয় সমাজের ৭ (সাত) টি হদা বা পাঞ্জি থেকে মনোনিত হয়ে আসেন। এই পরিষদের মেয়াদ কাল ৫ (পাঁচ) বৎসর ছিল বর্ত্তমানে তাহা সংশোধন করে ৩ (তিন) বৎসর করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই সাতজনের পদবী হচ্ছে ঃ (১) রায় (২) গাইলেম (৩) কামিসিকাউ (৪) গাবুর (৫) জাকসুম (৬) খুকসুম ও (৭) সেঙা।

প্রতি বাংলা বর্ষের অগ্রহায়ন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে "রায় বালমা পাণ্ডা বা বাৎসরিক সভা ও উৎসবের পর ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হলে স্বাভাবিক ভাবেই রায়কে অবসর নিতে হয় এবং তিনি রায়বুড়া (প্রাক্তন রায়) হিসাবে আখ্যায়িত হন। বাকি ৬ (ছয়) জন সদস্যের পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি হয়। যেমন গাইলেম রায় হিসাবে, কামিসিকাউ গাইলেম হিসাবে, গাবুর কামিসিকাউ হিসাবে, জাকসুম গাবুর হিসাবে, খুকসুম জাকসুম হিসাবে এবং সেঙা খুকসুম হিসাবে ভূষিত হন। আর সেঙা পদটি খালি হয়ে যায় এবং রায় অবসর নেওয়ার পর তার হদার লোকগন সেঙা মনোনীত করে পরিষদে পাঠান। উল্লেখ থাকে যে, পরিষদের মনোনিত সদস্যকে অবশ্যই সক্‌গ্নাং অর্থাৎ বিবাহিত হতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে সমাজ-দ্রোহীতার অভিযোগ থাকতে পারবেনা বা সামাজিক ও আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করা যাবে না।

(খ) শূন্যপদ ঃ- পরিষদের যেকোন পদে থাকাকালিন যদি তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় তাহলে সাথে সাথে তার পদ খারিজ হয়ে যাবে এবং.তার পরবর্ত্তী পদাধিকারী ব্যক্তি এর স্থলাবিসিক্ত হবেন, সাথে সাথে তার নীচের পদাধিকারীদেরও পর্যায়ক্রমে পদোন্নতি ঘটবে। খারিজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তির হদার লোকজন তাদের হদা থেকে আবারও সদস্য মনোনিত করে পরিষদের পাঠাবেন এবং সেঙা পদে বহাল হবেন। অর্থাৎ নতুন করে মনোনীত সদস্যকে পরিষদের কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবেই যোগদান করতে হবে এবং তখন তাদের কার্য্যকাল রায়ের কার্য্যকালের সমান হবে। এক্ষেত্রে রায়ের বা তার স্ত্রীর মৃত্যু হলে পরবর্ত্তী পরিষদ পূর্ণ মেয়াদই কাজ করে যাবে। আর কোন সদস্য যদি শারিরিক অসুস্থ বা অন্য কোন কারনে পদত্যাগ করতে চায় তাহলে সংশ্লিষ্ট হদা অর্থাৎ নিজ হদার লোকজনের বা হদা কমিটির সঙ্গে আলোচনা ক্রমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং হদা কমিটির পক্ষ থেকে অন্য একজনকে মনোনীত করে পাঠাতে পারবে এতে তার কোন পদাবনতি ঘটবে না।

(গ) সচিব পর্যায়ে কমিটি গঠন

বর্ত্তমানে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, কর্মপরিধির বিস্তার ঘটায় ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে কার্য্য পরিচালনার জন্য সমাজ পরিষদের সাহায্যকারী বা সহযোগী হিসাবে প্রত্যেক হদা বা পাঞ্জি থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে একটি সচিব পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

(ঘ) সমাজের অন্যান্য পদাধিকারী ও তাদের ভূমিকা

মুইলা-মুদি ঃ সমাজ পরিষদ ও সচিব পর্যায়ে কমিটির বাদেও সমাজ পরিচালনা ও শাসন

ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির মতো "মুইলা ও মুদি" নিযুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজ পরিষদের সভাতেই মনোনিত করা হয়ে থাকে। সমাজ পরিষদ যে কোন কারনে ভেঙ্গে গেলে বা সমাজ পরিষদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলে "মুইলা ও মুদি" সমাজ পরিষদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করে এবং পরবর্ত্তী সমাজ পরিষদ গঠন করে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্য্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে। মুইলা-মুদিকে বিরিসিংদের মধ্য থেকে মনোনীত করতে হবে এটাই নিয়ম।

কাইথার ঃ সমাজ পরিচালনায় ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী কলয় অধ্যুষিত গ্রাম গুলিকে সারা রাজ্যে ৪ (চার) টি সেক্টরে বা অঞ্চলে ভাগ করা হয়। সমাজ পরিষদ প্রতিটি বিভাগের ৪ (চার) জন করে মোট ১৬ (ষোল) জন কাইথার মনোনীত করেন। কাইথারগণ দায়িত্বপ্রাপ্ত নিজ নিজ এলাকার যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বাংচি অর্থাৎ উদ্যোক্তা বা পরিবেশক হিসাবে কাজ করতে হয়। বিশেষ করে সমাজের পদাধিকারী বা বিশিষ্ট ব্যক্তি মারা গেলে কাইথারের উপস্থিতিতেই কাজ করতে হয়। তাছাড়া কাইথারগণ সমাজপতি রায়কে সামাজিক অপরাধের গোপন তথ্য সরবরাহ করে থাকেন।

বিরিসিং ঃ বিরিসিং পদের জন্য কাউকেই মনোনীত করতে হয়না। কাইথারগণের ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ শেষ হলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই বিরিসিং পদে উন্নীত হন এবং সমাজ পরিষদ ভেঙ্গে যাওয়ার পর "মুইলা-মুদি" যখন সমাজের ক্ষমতা হস্তক্ষেপ করেন তখন এই বিরিসিংদেরকে নিয়েই সমাজ পরিচালনা করে থাকেন।

চকদ্রী ঃ কলয় অধ্যুষিত প্রত্যেক কামি বা পাড়ায় একজন করে কামি চকদ্রী থাকেন। কামি বা পাড়ার লোকেরাই সমবেত হয়ে চকদ্রী মনোনিত করে থাকেন। আর যে কামি বা পাড়ায় সমাজ পরিষদের কোন পদাধিকারী সদস্য থাকলে স্বভাবতই কামি চকদ্রীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। অবশ্য প্রয়োজনে কাজের সুবিধার্থে কামি বা পাড়ার যে কোন ব্যক্তিকে চকদ্রী মনোনীত করা যাবে। কামি চকদ্রী সাধারনত নিজ কামি বা পাড়ার সামাজিক আচার-বিচার ও ভালমন্দ সবটাই দেখাশুনা করেন। পাড়ার কোন ঘটনা বা বিচার যদি সুস্থ-সুরাহা করতে অক্ষম হন, তাহলে চকদ্রী সমাজ পরিষদের মুখ্য বা সমাজপতি রায়ের কাচারি বা দরবারে প্রেরণ করে থাকেন।

বিচার ব্যবস্থা ঃ বিচার ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত (১) চকদ্রীকাচারি বা দরবার (২) রায় কাচারি বা দরবার (৩) মুইলা মুদির কাচারি।

(১) কামি চকদ্রীর কাচারিতে সচরাচর কামি বা পাড়ার যে কোন ব্যক্তির অভিযোগ মূলে চকদ্রীর কাচারিতে দরবার বসে। চকদ্রীর গ্রামের যে কোন সভা খান্‌দলদের মাধ্যমে আহ্বান করে থাকেন। পাড়ার পরিবার সংখ্যানুযায়ী খানদল এক বা একাধিক নিয়োগ করা হয়।

(২) রায়-কাচারি ঃ কোন পাড়ার চকদ্রী সুস্থভাবে বিচার সম্পন্ন করতে না পেরে বা চকদ্রীর বিচারে যে কোন পক্ষ সন্তুষ্ট না হলে রায়ের নিকট অভিযোগ জানাতে পারে। তখন রায়ের কাচারিতে বিচার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। সমাজ পরিষদই কলয় সমাজের সর্ব্বোচ্চ আদালত।

(৩) মুইলা-মুদি ঃ মুইলা-মুদির কাচারি বা দরবার হচ্ছে সমাজ পরিষদের পদাধিকারী সদস্যদের বিচার করা। কোন কারণে সমাজ পরিষদ ভেঙ্গে গেলে সমাজ পরিচালনা ও বিচার ব্যবস্থা "মুইলা-মুদির" উপরই ন্যস্ত হয়।

তরমারি চারিমুং বা ভোজসভা ঃ সমাজ পরিষদের ও অন্যান্য পদাধিকারীদের তিন বৎসর মেয়াদ পূর্ণ হবার পর পদোন্নতি ও মুইলা মুদি মনোনীত করার পর প্রথমে মুইলা-মুদি ও পরবর্ত্তী সময়ে সমাজপতি রায় ও অন্যান্য পদাধিকারীগণকে সামাজিক নিয়মানুযায়ী ভোজ সভা করতে হয় এবং এই ভোজ সভাকে বলা হয় "তরমারি চারিমুং" অর্থাৎ পদোন্নতি হয়ে নতুন পদ গ্রহন করায় সমাজকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে জানান দেওয়া বা সমাজের স্বীকৃতি গ্রহন করা। এই ভোজ সভা পরবর্ত্তী 'রায় বালমানি পাণ্ডার' আগে বৎসরে যে কোন সময়েই করা যাবে। তবে এই ভোজ সভার জন্য শুকর বা পাঠার (ছাগল) প্রয়োজন হয়। কারণ ভোজ সভাতে ৪ (চার) টি জাথেক অর্থাৎ পা প্রয়োজন হয় এবং এই জাথেক বা পা হচ্ছে সম্মানের। রায় এবং রায় বুড়াদের এই জাথেক দিতে হয়। মুইলা-মুদি এবং গাবোর পদাধিকারীগণ পাবে, বমল অর্থাৎ মেরুদণ্ডের অংশ, বখা অর্থাৎ কলিজার অংশ ইত্যাদি। তাছাড়াও চাখোই-চারতাং অর্থাৎ বিভিন্ন সবজি, লতা-পাতা ও বাতেমা অর্থাৎ বনের আলোকে শুকনো করে চাখোই অর্থাৎ খারপানি দিয়ে তৈরী তরকারিকে চারতং বলা হয় এবং যে কোন শাক-সবজিকে চাখোই অর্থাৎ খারপানির ঝুল দিয়ে রান্নাকে বলা হয় চাখোই। এই "চাখোই-চারতাং" কলয় সমাজের যে কোন ভোজ সভায় অবশ্যই থাকতে হয় এবং কলয় সমাজ এই চাখোই-চারতাং তরকারিকে অন্যান্য তরকারির চাইতে বড় বা সম্মানের হিসাবে গণ্য করে থাকেন। ভোজনের সময় চাখোই-চারতাং তরকারিকে প্রথম পরিবেশন করা হয়। তারপর অন্যান্য তরকারি ও শেষে মুখুই অর্থাৎ ত্বক দিয়ে ভোজনের সমাপ্তি ঘটে।

জন্ম ঃ— শিশু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের তৈরী একধরনের চাকু (ওয়ানথাল) দিয়ে নাভীর অংশ অর্থাৎ বালডুক কাটা হয় এবং পুত্র সন্তান হলে মহিলারা পাঁচ বার উলুধ্বনি দিবে আর মেয়ে সন্তান হলে তিন বার উলুধ্বনি দিয়ে থাকে। সপ্তাহ খানেক পর নবজাত শিশুর অমথায় অর্থাৎ নাভীর অংশ পড়ে গেলে মা ও শিশুকে আলাদা ভাবে যেখানে রাখা হয়েছিল সেখানকার অস্থায়ী চুল্লি অর্থাৎ থাপাতে যে আগুন ধরানো হয় তার সমস্ত থাপ্লা অর্থাৎ ছাই পরিস্কার করে ফেলে দেওয়া হয়। মা ও শিশুকে তুলশিপাতা দিয়ে জল ছিটিয়ে পবিত্র করে ঘরে তোলা হয়। আবার অনেকে উজায় অর্থাৎ অচায় দিয়ে ও কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। কমপক্ষে এক মাস পর শিশুটির আবুর সুমানি পাণ্ডা করা হয় অর্থাৎ মা ও শিশুর অসূস কে ধূয়ে ফেলা এবং এই অনুষ্ঠানের পরই শিশুর মা রান্না ঘরে প্রবেশ করতে পারবে ও রান্না বান্না সহ বাড়ীর পূজা অর্চনা করতে পারবে এবং এই অনুষ্ঠানেই নবজাত শিশুর নামাকরণ করা হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে চিকিৎসালয়ে শিশুর জন্ম হলেও আবুর সুমানি পাণ্ডা করতেই হবে। থাপ্লা খিবিমানি ছেলে সন্তান হলে ৭দিন ও মেয়ে সন্তান হলে ৯দিনে এবং আবুর সুমানি বা ব্রত ছেলে সন্তান হলে ২১ দিন এবং মেয়ে সন্তান হলে ৩০ দিনে।

নামাকরণ পদ্ধতি ঃ জন্মের রাশির অদ্যাক্ষর দিয়ে উপস্থিতদের মধ্যে বিশেষ করে দাদু-দাদিমারা নাম দিয়ে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাবে এবং যে নামের প্রদীপ শেষ পর্যন্ত জ্বলবে সেই নামই রাখা হয়। এবং তার নামে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে ধনুক্ দিয়ে তীর ছোড়া হয়ে থাকে। নবজাত শিশুকে নতুন কাপড় পড়ানো হয়।

বিবাহ উৎসব ঃ ছেলের অবিভাবকরাই সাধারণত মেয়ে দেখেন ও ঠিক করে থাকেন।

আবার ছেলে মেয়েদের মধ্যে যদি প্রেম ভালবাসা হয়ে থাকে এবং তাতে যদি মা-বাবার সম্মতি থাকে তাহলে ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে মেয়ের মা-বাবা বা অবিভাবকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াকে বলা হয় সুংলোয়মানি পাগুা এবং ঐ দিনই বিয়ের কথা বার্তা পাকা পুক্ত করা হয়। বিয়ের প্রাক্ মূহূর্তে যদি ছেলে বা মেয়ের নিকট আত্মীয় মারা যায় বা মেয়ের মাসিক হয় তাহলে বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়। আবার বিয়ের আগে মেয়ে যদি অন্য কোন ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায় তাহলে ছেলের পক্ষের মান হানির জন্য মেয়ের পক্ষকে জরিমানা হিসাবে ছেলের পক্ষের যাবতীয় খরচ মিটিয়ে দিতে হয়। অনুরূপ ভাবে ছেলে যদি অন্য কোন মেয়েকে ঘরে নিয়ে আসে বা পালিয়ে যায় তাহলে ছেলের পক্ষকে একই নিয়মে জরিমানা বহন করতে হয়। বিবাহ সংক্রান্ত যে কোন অসামাজিক কার্য্যকলাপ, যেমন যুবতী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়া, যুবক যুবতী বা অন্য কারোর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হওযা, যুবকযুবতী অন্য কারোর সঙ্গে গোপনে যে কোন মন্দির বা দেবালয়ে বিয়ে করে আসা, জোর পূর্বক বিয়ে দেওয়া সবই সামাজিক অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পাড়ার চকদ্রী বা সমাজপতি রায় তাদেরকে কলয় সমাজের সামাজিক নিয়মবিধি (গঠনতন্ত্র) অনুযায়ী জরিমানা করে থাকেন। সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য সামাজিক ভোজ সভা করতে হয়।

রায় বালমানি পাগুা উৎসবে কলয় রমণীদের মধ্যে বাঁশ দিয়ে শক্তি প্রতিযোগিতার মুহূর্ত

সোংলায় মানি পাগুা ঃ— ছেলের পক্ষ থেকে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। প্রস্তাবের পর উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিবাহ অনুষ্ঠান মেয়ের বাড়ী না ছেলের বাড়ীতে হবে এবং বিবাহের দিন তারিখ ঠিক হওয়ার পর মেয়ের পক্ষ থেকে জলপান

করানো হয়। তারপর উজায় বা অচায় দিয়ে ২টি পাত্রে জল নিয়ে নতুন লাঙ্গি (মদ) দিয়ে বর-কণের নামে মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করা হয় এবং তাকেই কলয় ভাষায় তুইকারমানি বলা হয়। এরপর অচায়কে মদ দিয়ে বিয়ের ব্যপারে ভালমন্দ জিঙ্গেস করা হয় .... এবং ছেলের পক্ষ থেকে জলপানের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠান শেষ হলে পরে পাড়ার বয়স্ক বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন তাদেরকে বাঁশের লাক্ড়িতে আগুন জ্বালিয়ে বিদায় জানাতে হয় ঘরের উঠান সীমানা পর্যন্ত্য বা তাদের নিজ নিজ বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিতে হয়। বাড়ীতে পৌছে দিলে তাদেরকে মদ খাওয়াতে হয়। এই অনুষ্ঠানকে "মনাক-হ্মচাং" বলা হয় অর্থাৎ অন্ধকারে আলো দেখানো।

কলয় সমাজে ঘর জামাই প্রচলন আছে। কিন্তু আদিকাল থেকেই বিবাহের জন্য মেয়ের পক্ষকে কোন প্রকার দাবী বা পণ দিতে হয়না। কলয় সমাজে পণ দেওয়া-নেওয়া বা পণপ্রথা কোন দিনই ছিলনা বা বর্ত্তমানেও নেই।

বিবাহ অনুষ্ঠান ঃ যার বাড়ীতে বিবাহ হবে ঐ বাড়ীতে কওয়াই তানমানি ও কওয়ায় বাতেমানি অনুষ্ঠান করতে হয়। এই অনুষ্ঠানে অচায়ের মাধ্যমে অর্থাৎ সুপারি কাঁটা, কওয়াই বাতেমানি মানে সুপারি দিয়ে নিজ গ্রামের সব পরিবারকে আমন্ত্রন জানানো। দুইজন ব্যক্তি কাটা সুপারি, একটি পান, সঙ্গে সুন্দর করে কাটা কলা পাতা বা লাইরো মানে বাওগুই পাতাকে একটি পিতল বা কাঁসার থালাতে নিয়ে নতুন সাদা কাপড়ে (মার্কিন) বেঁধে ঘরে ঘরে গিয়ে আমন্ত্রন জানাবে। এভাবেই বিয়ের দিন রান্না বান্না, জল তোলা বা বিবাহ আসরের কাজ করার জন্য আমন্ত্রন জানাতে হয়।

লোকু বাতেমানি ঃ পাড়া চকদ্রীর মাধ্যমে নতুবা সরাসরি সমাজপতি রায়ের বাড়ীতে গিয়ে সামাজিক নিয়মমাফিক মং ২০ টাকা ফি সহকারে ১০০ গ্রাম সুপারি ও এক বিরা পান দিয়ে আমন্ত্রন বা বিয়ের সংবাদ জানাতে হয়। তখন সমাজপতি রায় সমাজ পরিষদের কনিষ্ঠতম পদাধীকারী সেঙাকে মহারাজার প্রদত্ত রূপার চণ্ডি অর্থাৎ লাঙ্গি খাওয়ার বিশেষ পাইপ দিয়ে পাঠাবে এবং সেঙাই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করবে। এছাড়া পাড়ার চকদ্রী ও অন্যান্য সমাজের পদাধিকারী বা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসার জন্য আলাদাভাবে ব্যবস্থা করতে হয়। এই বসার জায়গাকে "নক্সার" বলা হয়। এই নকসার যে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি আসন গ্রহণ করতে পারবে না। বিবাহে প্রতিটি মূহুর্তে তাদেরকে জানান দিতে হয় মদের মাধ্যমে।

চালায়মানি ও নায়রোকমানি পাগুা ঃ কণ্যার বাড়ীতেই এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কণ্যাকে বিয়েতে পাঠানোর জন্য গ্রামের সবাইকে আমন্ত্রন জানিয়ে খাওয়াতে হয় এবং ছেলের অর্থাৎ বরের বাড়ী থেকে কণেকে নিয়ে আসার জন্য বাদ্য বাজনা নিয়ে যাবে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওরা কণেকে সঙ্গী সাথী ও আত্মীয় স্বজন মদ ও লাঙ্গি খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে বিদায় জানানোকেই নায়রোকমানি বলা হয়।

খুমফুনুকমানি ঃ কণেকে নিয়ে বরের বাড়ী আসার পথে যেসব পাড়া দিয়ে যাবে ঐ পাড়ার চকদ্রী এবং রায় বুড়াসহ সমাজ পরিষদের পদাধিকারীদের বাড়ীতে গিয়ে কানে ফুলের মালা পড়িয়ে সম্মান জানাতে হয়। তাছাড়া সমাজের যে কোন অনুষ্ঠানেই এটা করার প্রথা রয়েছে।

সমাজ পদাধিকারী অনুযায়ী ফুলের মালা পেয়ে থাকেন। যেমন- রায়, রায়বুড়া, গাইলেম, কামিসিকাউ গণ ৯ (নয়) টি ফুল দিয়ে তৈরী মালা, সমাজ পরিষদের অন্যান্য পদাধিকারী, চকত্রী অচায় ও সমাজের অন্যান্য স্বীকৃত বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ৭ (সাত) টি ফুল দিয়ে তৈরী মালা ও অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিগণ ৫ (পাঁচ) টি ফুল দিয়ে তৈরী মালা দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

আয়া-লায়সমানি ঃ বিবাহের জন্য কমপক্ষে দুইজন মহিলাকে আয়াজুক ও কমপক্ষে একজন আয়া-চলা নিযুক্ত করতে হয়। এই দুইজন আয়াজুক বরের ঘর অর্থাৎ বিবাহের ঘর থেকে কণেকে রাখা অস্থায়ী ঘরে বাদ্য-যন্ত্র নিয়ে ৩ বার আসা যাওয়া কবে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করবে।

তৌই তানমানি ও তৌ-খাওমানি ঃ আয়া-চলা (পুরুষ) এবং আয়াজুকগণ বাদ্য-যন্ত্র নিয়ে পাড়ার পাশের নদীতে জল আনতে যাবে। প্রথমে আয়াচলা দা দিয়ে নদীর জল কাটবে অর্থাৎ জলের মধ্যে কোন অশুভ শক্তিকে দূর করে দেওযা, যাতে করে বর কণেকে জল থেকে যেন কোন প্রকার দিশা না লাগে। তারপর দুজন বালককে দুটি নতুন গামছা পড়িয়ে নতুন মাটির কলসী দিয়ে জল তুলানো হয়। এই জল ভরা কলস নিয়ে একটি কণের ওখানে ও একটি বরেব ঘবে নিয়ে রাখা হয়। এই জল দিয়েই কণেকে এবং পরে বরকে স্নান করানো হয। স্নানের পর আয়াজুক কুসু অর্থাৎ দুইজনের মধ্যে ছোট আয়াজুক কণেকে সাজিযে ঠিক সময়ে বিয়ের আসবে নিয়ে যাবে এবং এদিকে বরকে সাজিযে বিবাহের আসর বা বেদীতে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হল আয়াজুক অক্রা (বড়) ও আয়া-চলার।

বেতি বা বেদি ঃ বাঁশ ও বেত দিয়ে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বর্গাকারে বেড়া দিয়ে তৈরী করা হয়। বেতি ঘরের দুটি দরজা থাকবে, পশ্চিম ও উত্তরে। পশ্চিমের দরজা দিয়ে বর এবং উত্তরের দরজা দিয়ে কণে প্রবেশ করবে।

কলয়দের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্র

চরখা -চরখি
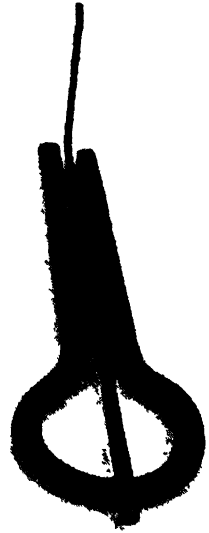
ডাংদু এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র

লাম্প্রাওয়াথপ ঃ বিবাহ কার্য্যে নিযুক্ত উজায় বা অচায় বিয়ের দিন সকালে লাম্প্রাওয়াথপ পূজা করবে। এই লাম্প্রাওয়াথপ দুই প্রকারে করা হয়। একটি নৈর্বেদ্য বা নবদীব ও অন্যটি কাটাসিরা অর্থাৎ বলি। নবদীব হচ্ছে কলা বাতাসা ও ফলফকরা দিয়ে। কাটাসিরা হচ্ছে ছোট ছোট মোরগ কেঁটে।

হাত্রায়

ডোলা

ডোলা
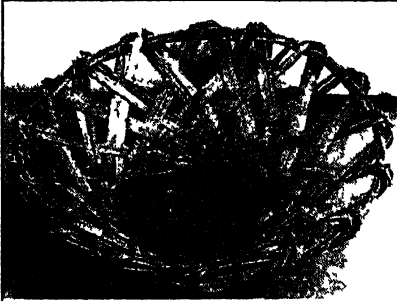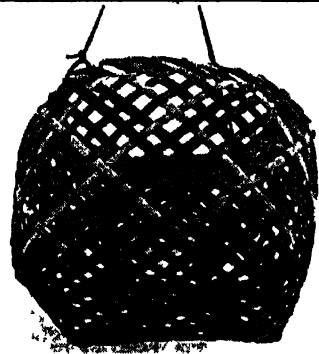
হাত্রায়

ওয়াম্নামমানি ঃ ম্নামকুবুই, কাইসং-৮টি, কেবেং- খামানি ৪টি, থারুমা ৬টি, দ্বীপ-৬টি খং-২টি, জাবরাফব-৬টি, চুথুং-৬টি, চাতি সাওমানি-৬টি, চপরা-২টিও হমচাং-২টি।

হায়া পূজা বা বিবাহ বন্ধন ঃ বেতি বা বেদীর ভেতরে চারকোনায় চারটি বাঁশ পুঁতে উপরে সমাজপতি রায়ের পাঠানো চান্দোয়া বা সামিয়ানা টাঙ্গানো হয় এবং এর উপরে সাতটি কাপড় টাঙ্গানো হয়। এর নীচে পাথর দিয়ে হায়া বা বেদী তৈরী করে নতুন গামছা বিছিয়ে দেওয়া হয়। অচায় কাটাসিরা বা নৈর্বেদ্য দিয়ে হায়া পূজা করার পরই বর-কণেকে এনে সেখানে দাঁড় করানো হয়। প্রথমে অচায় লাম্প্রাওয়াথপ পূজার জল ছিটিয়ে মন্ত্রগুপ্তি পাঠ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। এরপর বরের মা-বাবা, সহ উপস্থিত আত্মীয়-স্বজনরা লাম্প্রাওয়াথপের জল ছিটিয়ে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। বিবাহের পর জামাই-বৌকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার পর

অচায় আবার ও ঐ হায়া বা বেদীতে পূজা সম্পন্ন করেন।

খুতুং আলুয়া সাচ-মানি ঃ বর-কণেকে বেদীতে প্রবেশ দ্বারে দাঁড় করানো হয়। বরকে পশ্চিমের দরজায় এবং কণেকে উত্তরের দরজায় দাঁড় করানো হয়। তখন আয়া-চলা বরের পেছনে দাড়িয়ে বরের ডান কাধে হাত রেখে তার অনামিকা আঙুলটি বাড়িয়ে দেবে এবং বরের পায়ের নীচে ৯ (নয়) হাত লম্বা সাদা নতুন কাপড় (মার্কিন) ভাজ করে রাখা হয়। আয়াজুক অক্রা (বড়) তখন খুতুং আলুয়া বরের ডান পায়ের বুড়া থেকে আয়াচলার বাড়িয়ে দেওয়া আঙুলে সাত পলা টানা হয়। খুতুং আলুয়া মানে অপাকানো সূতা। আয়াজুক অক্রাকে কিছু টাকা দক্ষিনা দিয়ে সূতা কেটেই বেদীতে প্রবেশ করতে হয়।

ধান্দুওয়া রিমানি ঃ— বিবাহের পর্ব শেষ করে জামাই বউকে ঘরে প্রবেশের সময় দরজায় টাঙানো চান্দোয়া ও মঙ্গল ঘটের সামনে দাঁড় করানো হয়। তখন জামাইয়ের ছোট ভাই-বোন বা সম্পর্কের ছোট বয়সীরা জামাই-বউকে পা ধুইয়া দেবে এবং ধান-ধুব্বা, তুলা, ডিম, পাথর ও তিল দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ও ডিম ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

সুকুই বাখলা সেক্লায়মানি ঃ— নতুন জামাই - বউ ঘরে প্রবেশের পর ভেজা কাপড় চোপর পাল্টিয়ে নতুন পাটি বিছিয়ে আয়া-চলা ও আয়াজুক সহ জামাই বউকে বসিয়ে, সুকুই, বাখলা, চাল, কাঁচা হলুদ, তিল, ধান ও জামাই বরণের আংটি নতুন মাটির পাতিলে ঢাকনা দিয়ে রাখা হয়। (সুকুই-বাখলা মানে একজাতীয় লভার লম্বা ফলের বিচি আর বাখলা হচ্ছে হরতকি) জামাই -বউ ঢাকনা দেওয়া পাতিলে হাত ঢুকিয়ে ভেতরে রাখা জিনিষ কাড়াকাড়ি করে নিয়ে আসবে। কে কি পেল তা থেকে জামাই-বউয়ের কার কি ভাগ্য দেখা হয়।

চাতি সাউমানি ঃ সুকুই বাখলা সেক্লায় মানি পর্ব শেষ করে আয়া চলা জামাইকে এবং আয়াজুক বউকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে ও নমস্কার করে আর্শীবাদ গ্রহণ করবে। এদিকে উজায় বা অচায় ঘরের এক কোনে চপরার উপর দুটি প্রদীপ ও শুকনো বাঁশের লাকড়ি দিয়ে তৈরী দুটি হমচাং জ্বালিয়ে পূজা দেওয়ার পর হমচাং দুটি বাড়ীর উঠানে নিয়ে নিভিয়ে ফেলা হয়। আর একটি প্রদীপ জামাই-এর নামে ও অন্যটি বউয়ের নামে জ্বালানো হয়। এই দুটি প্রদীপ দিয়ে নতুন জামাই বউয়ের আয়ু পরীক্ষা করা হয়। যে প্রদীপ আগে নিভে যাবে তার জীবন প্রদীপ ও আগেই নিভে যাবে বলে ধারণা করা হয়।

নক্সার ঃ অচায় ও সমাজ পরিষদের পদাধিকারীগণও পাড়া চকদ্রীসহ অন্যান্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসানোর জন্য আলাদাভাবে বাঁশের মাচাং অর্থাৎ টং ঘরের মতো তৈরী করা স্থানকে নকসার বলা হয়। এখানেই চাল, তুলা, দুর্বা দিয়ে সাজানো থালায় হিয়ালি মানে উপহার দেওয়া হয়। এখানে মহিলাদের বসার নিষেধ। তাদের দেখা শুনা ও পরিবেশনার জন্য সমাজ থেকে একজন কাইথার ও সেঙাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মহিলাদের
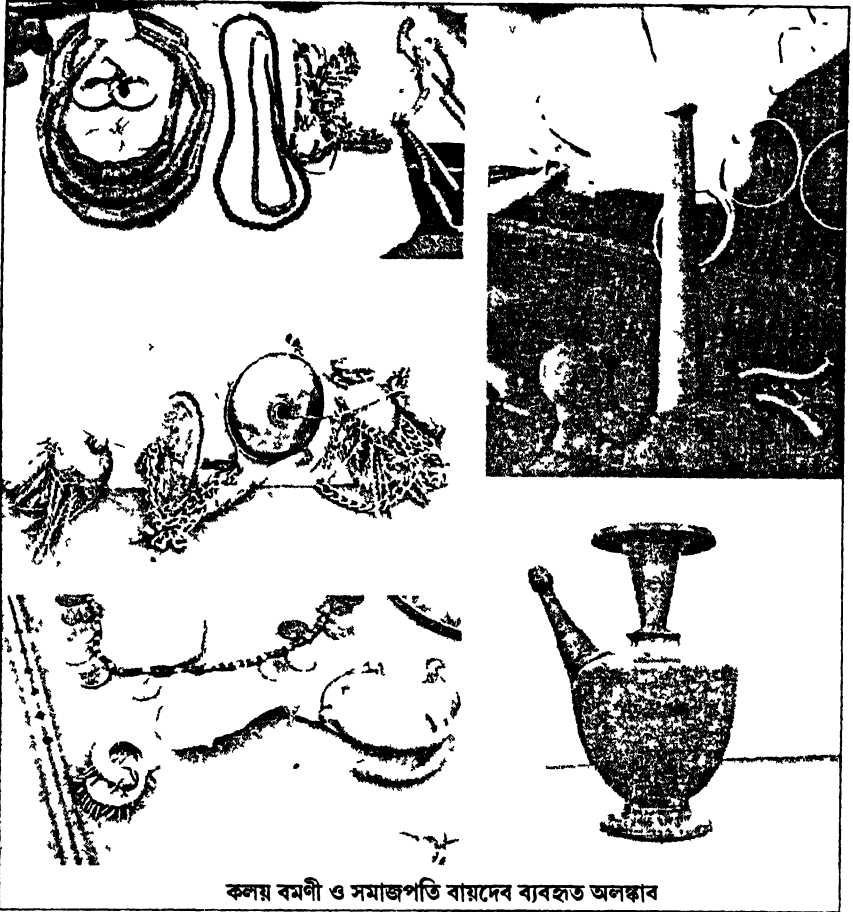
কলয় বমণী ও সমাজপতি বায়দেব ব্যবহৃত অলঙ্কাব

জন্য আলাদাভাবে বসাব ব্যবস্থা কবা হয, এবং সেখানে তাদেব পবিবেশনার জন্য একজন কাইথারকে নিয়োগ কবা হয।

ভাণ্ডারী ঃ— ভাণ্ডাবী মানে ষ্টোর কিপাব। বিবাহেব প্রযোজনীয কিছু জিনিষপত্র ও অতিথি আপ্যায়নেব জিনিষ পত্র অর্থাৎ পান, বিড়ি, তামুক, সুপাবী ও অন্যান্য জিনিষ পত্র তাকে ঘরেব একজাযগায জমা কবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। যখন যা প্রযোজন তাব কাছ থেকে নিতে হবে। বাড়ীর মালিককে খোঁজাখোঁজির প্রয়োজন হয় না।

আয়া বিদায় ঃ— বিবাহ অনুষ্ঠানের পর্ব শেষ হতেই বিবাহ কার্য সম্পন্নকারী আয়াজুক, আয়াচলা, ভাণ্ডারী, অচায়দের চার/পাঁচ হাত লম্বা মার্কিন কাপড় ও কিছু অর্থ দিয়ে এব জায়গায় সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে সম্মানের সহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এবং এর সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন পদাধিকারীদের চকগ্রীসহ অন্যান্য সম্মানিত

আমন্ত্রিতদের একই নিয়মে ৪/৫ হাত মার্কিন কাপড় উপহার দিয়ে সম্মান ও বিদায় জানানো হয়। সবাইকে মনাক হমচাং জ্বালিয়ে বাড়ীর উঠান পর্যন্ত বাদ্য -যন্ত্র বাজিয়ে বিদায় জানানো হয়।

মদ তৈরীর যন্ত্রপাতি (পাতনি)   নকখায়, লাঙা, খুক্রু
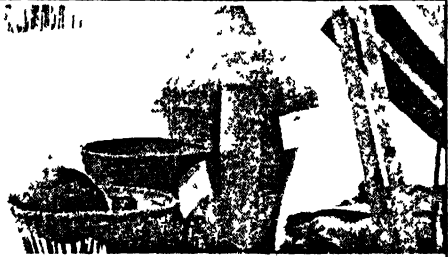
ফুংবালি ঃ বিবাহের পরের দিন পাড়ার সবাইকে নিয়ে এবং যারা বিবাহ অনুষ্ঠানে রান্না-বান্নাসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগীতা করেছে তাদেরকে নিয়ে নতুন জামাই বউ নিয়ে আনন্দোসব ও খাওয়া-দাওয়া করার নামই ফুংবালি। ফুং শব্দের অর্থ সকাল। যদিও অনুষ্ঠানটি সকাল বেলার তবু অনুষ্ঠান সারা দিনই চলে।

অসবর্ণ বিবাহ ঃ কলয় সমাজে অসবর্ণ বিবাহে বাঁধা নেই। তবে ছেলে যদি অন্য জাতি -গোষ্ঠীর মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে তাহলে কলয় সমাজের নিয়মানুযায়ী সামাজিক ভোজ সভা দিতে হয় যেমন বৌ-ভাতেব মতো, আর যদি কন্যা হামজোক নিযে এসে ছেলের বাড়ীতে বিয়ে হয় তাহলে সম্পূর্ণ কলয় সমাজের নিয়মেই করা হয়। আর কলয় মেয়ের বিয়ে যদি মেয়ের বাড়ীতে করা হয় তাহলেও পাত্র পক্ষের আপত্তি না থাকলে সমাজের নিয়মেই বিয়ে দেওযা হয়। তবে কলয় মেয়ে বা ছেলে যদি অন্যজাতি - গোষ্ঠীর বা সমাজের মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সমাজপতি কলয় রায়ের নিকট মং ৫১ (একান্ন) টাকা ফি দিয়ে অনুমতি নিতে হয়।

বিধবা বিবাহ ঃ কলয় সমাজে বিধবা বিবাহ স্বীকৃত। তবে স্বামী-স্ত্রী নেই অর্থাৎ বিধবা ও স্ত্রী মারা গেছে এমন পুরুষদের (স্বধবা) মধ্যে বিবাহ সাধারণভাবে ঘরের ভেতরেই করানো হয়। আর যদি কোন পুরুষ স্ত্রী মারা যাবার পর কুমারী মেয়েকে এবং বিধবা মহিলা যদি কুমার যুবককে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ মন্ডপে সামাজিক নিয়মেই করা যায়।

একাধিক বিবাহ ঃ কলয় সমাজে একাধিক বিবাহে আপত্তি নেই। তবে প্রথমা স্ত্রী সমাজপতির নিকট আপত্তি জানালে দ্বিতীয় স্ত্রী সামাজিক স্বীকৃতি পায় না এবং স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত ও জরিমানা করা হয়।

অসামাজিক বিবাহ ঃ বিবাহের আশ্বাস দিয়ে বা প্রলোভবন ও ভয় দেখিয়ে কোন যুবতী মেয়েকে ধর্ষণ করলে এবং যুবতী মেয়ে গর্ভবতী হলে সামাজিক বিচারেই তাদেরকে

জরিমানা ও বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। যুবক যুবতী যদি গোপনে কোথাও বিয়ে করে আসার পর যদি কোন সামাজিক ভোজসভা না করে তাহলে এই বিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পায় না।

মৃত দেহ সৎকার ঃ— বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হলে হিন্দু প্রথানুযায়ী দাহ করা হয় এবং তিন বৎসরের শিশুসন্তান মারা গেলে কবর দেওয়া হয়। যুবক-যুবতী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে মৃতঃ দেহ মাং মানে শ্মশানে তুলার সময় সঙ্গে কলা গাছ কেটে দেওয়া হয়।

শ্রাদ্ধোনুষ্ঠান ঃ বয়স্ক ব্যক্তির স্বাভাবিক মৃত্যু হলে দাহ করার দিন থেকে ১৩ (তের) দিনের মাথায় শ্রাদ্ধ -অনুষ্ঠান করা হয় আর দুর্ঘটনায় বা আত্মহত্যা করলে শনিবার মঙ্গলবার বা অমাবস্যা -পূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। ৩ (তিন) বৎসরের শিশুদের কোন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয় না।

মৃত ব্যক্তির পুরুষ আত্মীয়দের সান্দায় বলা হয় এবং তারা ১৩ দিন নিরামিষ খেতে হয় আর মহিলারা মানে অক্‌জুকরা তিনরাত্র নিরামিষ খাবে।

উভয় ক্ষেত্রেই সকালের দিকে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অর্থাৎ বাড়ীর উঠানে কাপড়ের বেড়া দিয়ে আসন বসিয়ে আসনে পাগরি রেখে ভোজন দেওয়া হয়। নানা প্রকারের রান্না-বান্না, ফল, বিস্কুট, মদ সবই খাওয়ানু হয়। পাগরিতে ফুলের মালা পড়ানো হয়। খাওয়ার পর হাত ধূইয়ে দিতে হয়, বিড়ি-সিগারেট বা তামুক ও পান খাওয়াতে হয়। এসব কাজ সবই বাঁ হাতে করতে হয়। এসব কাজ বড় ছেলে বা ভাই এর ছেলে বাতিজাকে করতে হয়। শেষে পেছন ফিরে উল্টা হাত করে বাঁ হাতে আগুন দেখিয়ে চলে যায+যাওয়ার সময পেছনে ফিরে তাকানো নিষেধ। এই অনুষ্ঠানকে মায়খ্‌লায় রিমানি বলা হয়। এরপর সানদাই যারা ১৩ দিন নিরামিষ খেয়েছে তারা সবাই একটি ঘরে বসবে। তখন উজায় বা অচায় দা-দিয়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দেবে। প্রত্যেকের মাথায় তুলা দেবে। পাথর বাড়ি দেবে। এরপর একমুঠো ভাত নিয়ে সকলের মুখে মুখে ছোঁয়াবে। তারপর সবাই ক্‌খা মানে শুকনা মাছ দিয়ে তিতা জাতীয় তরকারীর রান্না দিয়ে বাঙগুই পিঠা খাওয়ার মধ্য দিয়েই নিবামিষ খাওয়া শেষ হবে এরপর লাঙি, মদ যারা খায় তারা খাবে।

মৃতঃ ব্যক্তির সৎকারের তিন দিনের দিনে শ্মশানে গিয়ে দাহ করার ছাই বা থাপলা এবং পূড়া লাকরি জমা করে ফেলে দেবে। তার আগে কপালের অর্থাৎ তালুকের হাড় ও পয়সা খোঁজে রাখবে। এটাকে বলে অস্তি খচামানি বা থাপলা হোক-মানি।

তারপর এই অস্তি মকর সংক্রান্তিতে তীর্থস্থানে ফেলে দেওয়া হয়।

খুমকানরি মানি বা চোয়াক খানমানি ঃ— ১৩ দিন বা শ্রাদ্ধের পরের দিন সকালে শ্মশানে গিয়ে মৃতঃ ব্যক্তির আত্মাকে পিঠা, ভাত খাওয়ানো হয়, মদ খাওয়ানো হয়। প্রথমে ফুলের মালা পড়ানো হয়। তারপর শ্মশানে ফুল, ফলের গাছ, কলা গাছ, তুলসী গাছ এসব লাগানো হয়।

কলয় অধ্যুষিত গ্রাম ঃ— কলয় অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে সমাজ পরিষদের কাজের

সুবিধার্থে ৪(চার)টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। ১) অমরপুর, ২) বড়মুড়া, ৩) খোয়াই ও ৪) ধলাই।

১) অমরপুর অঞ্চল ভুক্ত গ্রামগুলির নাম ঃ— ১। তৈদু ২। তৈদুখামার ৩। পঙ্খু ৪। জাক্‌সুয়া ৫। লক্ষ্মীধন ৬। রামবাবু ৭। রাবন পাড়া, ৮। রবিরায় ৯। বাজুরায় পাড়া ১০। যন্ত্রণা পাড়া। ১১। হরিপুর ১২। বৈশ্যমনি খামার ১৩। কালাচাঁন ১৪। হলুয়া ১৫। বৈশ্যমানি পাড়া ১৬। মন্দার কামি ১৭। তৈসেন ১৮। সিনাইকামি ১৯। সেরথুম ২০। তাকুম বাড়ী।

২) বড়মুড়া অঞ্চল ঃ— ১। বড়মুড়া কলয় পাড়া ২। তুইবাগলায় ৩। ওয়ায়ঘাটি ৪। জেলুয়া ৫। বাহাত্তর কামি ৬। থেলাখুং ৭। চাম্পাশর্মা ৮। দ্বারকায় ৯। তুইসা রাংচাক ১০। বাতা পাড়া ১১। কন্দ্রা ১২। বৈরাগী পাড়া।

৩) খোয়াই অঞ্চল ঃ— ১। ব্রহ্মাছড়া, ২। ব্রহ্মাবিল ৩। খাসিয়া মঙ্গল ৪। তুইকয়, ৫। সর্দ্দূকরকরি, ৬। রূপাছড়া ৭। তুইসিন্দ্রাই ৮। তুইকয় বসক ৯। চাম্বল ছড়া।

৪) ধলাই অঞ্চল ঃ— ১। ঘন্টাছড়া ২। কাসিম তুইসা ৩। পাতাবেড়ি ৪। ধুমাছড়া ৫। জামিরছড়া ৬। খেঁদাছড়া।

স্বাক্ষরতা ঃ— কলয়দের মধ্যে শতকরা ৯৯ শতাংশ (নিরান্নব্বই) স্বাক্ষর।

জনসংখ্যা ঃ— সঠিক কোন তথ্য না থাকলেও রাজ্যের সদর, উদয়পুর, তেলিয়ামুড়া, অমরপুর, আমবাসা, লংতরাই ভেলী ও কাঞ্চনপুর মহকুমার মোট ৪৭টি গ্রামে ২১১৫ পরিবারে আনুমানিক প্রায় ১৫,০০০ মতো জনসংখ্যা ।

জনপ্রতিনিধি ঃ— ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য ঃ দেবব্রত কলয় (১৯৮২, ১৯৯০, ২০০০) শ্রাবন কলয় (১৯৮৫) প্রবীর কলয় (২০০৫।

বিধান সভার সদস্য ঃ— দেবব্রত কলয় (১৯৯৩) শ্রীমতি বৈজন্তী কলয় (১৯৯৮)

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ঃ— মৃতঃ গুণমনি সর্দার (কলয়) প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহের সময়ে রাজ্যের প্রথম নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের জোড়া বলদ চিহ্ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বহুবার দিল্লীতে তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। গুণমনি সর্দার পাড়া, তেলিয়ামুড়া, মৃতঃ পর্বমনি সর্দার, তৈদু, অমরপুর, জাতীয় কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা, কলয় সাংস্কৃতিক ও নাচ-গান নিয়ে রাজ্য ও দিল্লীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ। রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

মৃতঃ হিলিনন্দ কলয়, যন্ত্রণাপাড়া, অম্পিনগর, অমরপুর জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। মহারাজ কিরীট বিক্রমের আনুগত্য। মহারাজ কিরীট বিক্রম বহুবার ওনার ওখানে গেছেন এবং সভাসমিতি করেছেন।

মৃতঃ ব্রজেন্দ্র কলয়, বৈশ্যমনি পাড়া, অম্পিনগর, গাওসভার প্রধান ছিলেন এবং যুব সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী, সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি কলয় সাংস্কৃতি দল নিয়ে শান্তি নিকেতনের বসন্ত উৎসবে যোগদান করেছিলেন।

মৃতঃ নীলপূর্ণ কলয়, সর্দুকরকরি, তেলিয়ামুড়া, জনশিক্ষা ও গণমুক্তি পরিষদের স্থানীয় একনিষ্ঠ কর্মী। প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেবের খুবই কাছের এবং বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।

শ্রী শম্ভুনাথ কলয়, বাহাত্তর কামি, থেলাখুং, উদয়পুর, জনশিক্ষা আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। বর্তমানে সি. পি. আই. এমের উপজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদের অন্যতম নেতা।

শ্রী দেবব্রত কলয়, বৈশ্যমনি পাড়া, অম্পিনগর, অমরপুর, ছাত্রজীবনে ১৯৭২ সালে (টি. এস. এফ.) উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত টি. এস. এফ-র রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত উপজাতি যুব সমিতির সহকারী প্রচার সম্পাদক ও চিনি কক্ সাপ্তাহিক পত্রিকার বার্তা সম্পাদক, হুজলায় পত্রিকার (পাক্ষিক) স্বত্তাধিকারীও প্রধান সম্পাদক ১৯৮৩ সালে টি. এইচ. পি. পি (পার্বত্য লোকদল) গঠন ও রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক।১৯৯৭ সালে THPP, TTNC, TNV, ছাত্র সংগঠন TSF ও কর্মচারী সংগঠন TUKS মিলে IPFT গঠন ও রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক। ২০০৩ সালে IPFT ওTUJS মিলে INPT গঠন ও রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি। ২০০৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান ও TPCC -র সদস্য।

১৮৮২ সালে অম্পিনগর উপজাতি সংরক্ষিত আসনে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের (৭ম তপশীল) প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য, ১৯৯০ সালে (৬ষ্ঠ তপশীল) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য। ১৯৯৩ সালে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত। ২০০০ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত ও মুখ্য কার্য নির্বাহী সদস্য হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ।

স্মরণীয় ঘটনা ঃ ১। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজ্য শাসনকালে হাতি-ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা ও কুস্তি প্রতিযোগিতা হত। এই কুস্তি প্রতিযোগিতায় ও শক্তি প্রদর্শনে জনৈক রামপদ কলয় প্রতিযোগীদের মধ্যে সেরা নির্বাচিত হন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য , রামপদ কলয়ের শক্তি প্রদর্শনে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের স্বাক্ষরিত প্রশংসা পত্রে ঘোষণা করা হয় যে, "এখন থেকে রামপদ কলয়, রামপদ সিংহ কলয় নামে পরিচিত হবেন এবং স্বাধীন ত্রিপুরার সমস্ত কলয় প্রজাগণ নিজ নিজ নামের সঙ্গে "সিংহ" উপাধি লিখতে পারবেন।" তখন থেকেই কলয় সম্প্রদায় পদবীর আগে ও পরে সিংহ উপাধি লিখে থাকেন।

২। এক সময় মহারাজ ঘোষনা করেন যে, প্রজারা সবাই "বর্মা" উপাধি লিখতে পারবে। কিন্তু কি উপলক্ষ্যে বা কোন মহারাজার সময়ে এই ঘোষনা হয়েছিল জানা যায় নি তবে কলয়দের একটা অংশ তখন কলয় পদবী বাদ দিয়ে দেববর্মা লিখতে শুরু করে। সদরের মাধব বাড়ী, রবিচরন ঠাকুর পাড়া, জম্পুইজলা, ও কালীকান্ত পাড়ার দেববর্মাদের মধ্যে কলয়দের গোষ্ঠী এখনও আছে।

৩। আবার কলয় সমাজে ডাইন মানে "স্কাল" এবং মারাত্মক অর্থাৎ ক্ষমার অযোগ্যদের সমাজ থেকে এবং সংশ্লিষ্ঠ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। তখন তারা অন্য জাতি গোষ্ঠীতে মিলে যেত।

কলয় সমাজে অর্ন্তভুক্তি ঃ যে কোন জাতি গোষ্ঠী দীর্ঘ্যদিন কলয়দের সঙ্গে বসবাস করার পর ঐ ব্যক্তি যদি কলয় সমাজে অর্ন্তভুক্তির ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তাকে কলয় সমাজের যে কোন একটা পরিবারের সদস্য হিসাবে অর্থাৎ ঘরজামাই হিসাবে, ধর্মপুত্র বা ধর্মের যে কোন সামাজিকসম্পর্ক দিয়ে ঐ পরিবারের সদস্য হতে হবে এবং সে ঐ কলয় পরিবারের. হদার বা পাঞ্জির হবে। সে ঐ হদার লোক হিসাবেই গণ্য হবে এবং কলয় সমাজ পরিষদে সংশ্লিষ্ট হদার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব ও করতে পারবে।

কলয় সমাজের যে কোন পরিবার যদি যে কোন জাতি- গোষ্ঠীর শিশু সন্তানকে পালন করে, নিজের পরিচিতি প্রদান করে তাহলেও সে কলয় হিসাবে গণ্য হবে।

জীবন -জীবিকা ঃ

কৃষি ঃ— কলয় সমাজের অধিকাংশই সমতলবাসী ও কৃষি কাজে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। সম্পূর্ণ জুম চাষের উপর নির্ভর কলয় গ্রামগুলি হল, বমরা, তুই বাগলায়, চাম্পা-শরমা, ওয়ায়ঘাটি জেলুয়া ও চাম্বুল ছড়া। আবার এদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবার জুম চাষের সাথে সাথে লুঙ্গা জমিতেও চাষাবাদ করে থাকেন। আবার বৈশ্যমনি, হলুয়া, সেরথুম, তৈছেন, জামিরছড়া , ঘন্টাছড়া ও কাসিম তুইমা গ্রামের বাসিন্দারা অনেকেই সমতল কৃষি জমি চাষের সাথে সাথে তরিতরকারিও শাক-সব্জির জন্য জুম চাষ ও করে থাকেন।

ফলের বাগান ঃ— রাবার বাগান, নারিকেল, সুপারি , আনারস ও কমলা লেবুর বাগানে খুবই আগ্রহ দেখা যায় এবং এর মধ্যে অনেকেই এসব বাগান থেকে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করছেন।

মৎস্য চাষ ঃ— আরও লক্ষনীয় বিষয় হল কলয় গ্রামে কম বেশী জলাশয় দেখা যায়, অনেকে মৎস্য চাষের মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন।

ব্যবসা ঃ— কলয়দের মধ্যে শাক-সব্জি উৎপাদনে ও বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় এবং পুরুষ ও মহিলাদের গ্রামের হাট বা বাজারগুলিতে নিজেদের উৎপাদিত শাক-সব্জি বিক্রি করতে দেখা যায় আবার অনেকে ব্যবসাও করে থাকেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশেষ করে নিজ গ্রামে বা ছোট খাটো হাট-বাজারে বাজে মালের দোকান, ষ্টেশনারী ও চা-বিস্কুটের ব্যবসাও করতে দেখা যায়।

পশু-পালন ঃ— এছাড়াও প্রায় বেশীর ভাগ গ্রামবাসীরাই পশু পালন করে থাকেন, যেমন হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, শুকর ইত্যাদি গৃহপালিত পশু।

সরকারি চাকুরী বিত্তির মাধ্যমেও অনেকেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। অনেকে

আবার ধূপ কাঠির শলা তৈরী করেও আয় করে থাকেন।

ঘরবাড়ী ঃ— গ্রাম দেশের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর মতোই বেশীর ভাগ মাটির দেওয়ালে টিনের বা ছন-বাঁশের চালাঘর দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল কিছু দালান-পাকা বাড়ীঘর দেখা যায়। সম্পূর্ণ টং-ঘরে বসবাস নাই বললেই চলে । তবে কলয়রা বাড়ীঘর সাজিয়ে গুছিয়ে এবং আশ-পাশ পরিস্কার পরিছন্ন ভাবে থাকতে ভালবাসেন। কলয়রা নিজেদেরকে বিশেষ করে মেয়ে লোকেরা অবসর পেলেই নিজেদেরকে এবং বাচ্চা ছেলে মেয়েদের সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালবাসেন।

শারীরিক গঠন ঃ— কলয়দের শারীরিক গঠন একটু মাঝারি ধরনের বলা যায়। তবে তুলনামূলকভাবে তৈদু এলকার আবেল হদাদের শারীরিক গঠন সবল প্রকৃতির। কলয়দের বেশীর ভাগই ঘায়ের রঙ ফর্সা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাতলা শ্যামবর্ণ বা পিতবর্ণের হয়ে থাকে।

জাতি ও ভাষা ঃ কলয়রা ককবরকে কথা বললেও উচ্চারণে নিজস্বতা ও কিছু কিছু শব্দে ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন, কক্‌কে কলয়রা কাউ বলে, কক্ সাদি (কথা বল) কলয়রা কাউ সাদি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কলয়রা ককবরকের "য়" ব্যবহারের জায়গায় 'জ' ব্যবহার করে থাকেন, যেমন — য়াক (হাত)কে জাক্, তেমনি য়াকংকে জাকং, য়াকসিকে জাকসি, আবার দোলাইকে (ঘায়ের চাদর) বান্‌জোয়া।

কলয়দের শারীরিক গঠন, চেহারা অর্থাৎ চোখ, নাক, কান, মুখ কপাল প্রভৃতি গায়ের রং কৃষ্টি এককথায় নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষনে অন্যান্য মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সাদৃশ্য ও মিল খোঁজে পাওয়া যায়। এ হিসাবে কলয়দেকে মঙ্গোলীয় জাতি-গোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত বলেই ধরে নেওয়া হয়। আর ভাষাগত ভাবে তিব্বত- বর্মীয় ভাষা গোষ্ঠী ভুক্ত।

কলয়দের কিছু প্রচলিত প্রবাদ বাক্য ঃ

1. Chwla kwbang phaklai sok -ia
Bwrui kwbang Naila Mon-ia,
অর্থাৎ বেশী লোক থাকলেই যেমন কাজ হয় না
তেমনি বেশী মহিলা দিয়েও জমি চাষ হয় না।

2. Ati Khum kwbang motom - ia
Ati thau (thok) kwbang milik-ia.
অর্থাৎ সব ধরনের ফুল একত্রে রাখলে যেমন সু-গন্ধি বেড়োয় না,
তেমনি সব ধরনের তৈল মিশিয়ে গায়ে মাখলে
শরীর মসৃণ হয় না।

3.Raja khajna, Rang kwrui sia,
Watwi, bigra Nok kwrui sia.

অর্থাৎ রাজার খাজনা, টাকা নাই বুঝে না
তেমনি বৃষ্টি, গরীবের ঘর নাই বুঝে না।

বাগদ্বারা ঃ— 1."Bumung Kasla, Tola pat-la.
অর্থাৎ নাম বড় গামলার মতো
কিন্তু নীচে পাতলা অর্থাৎ কাজে কিছুই না।

2. Cha-nai tau (Tok) si,
Bujak nai Rijong.
অর্থাৎ উদূর পিণ্ডি, বুধুর ঘাড়ে।

3 Damra huk tang, Chekhra Mung Thang,
অর্থাৎ কাজ করে একজন নাম যায় অন্য জনের

4. Watwi no Asai, Rignai-o swtui,
অর্থাৎ বৃষ্টি কে আশা করে শাড়ীতে প্রসাব করা।

প্রশ্ন - উত্তর ঃ- (Kok phumok mani):

1. Twi bising bising, Abisa muthu,?
Ans : – Sorcheng.
অর্থাৎ জলের ভেতর বাচ্চা ঘুম পাড়ানো - কি?
উত্তর ঃ মাছ ধরার চায় পাতা।

2. Buma kabu, Bwsa Toru
Ans :– Chorkhi
অর্থাৎ মা কাঁন্দে আর বাচ্চা বড় হয়।
উত্তর ঃ— চরকা দিয়ে সূতা তৈরী করার
সময় চরকা কেং কেং শব্দ করে
আর ববিনে সূতা জমতে জমতে
বড় আকার ধারন করাকেই বলে।

প্রাচীন লোক গীতি ও নৃত্য ঃ— কলয়দের প্রাচীন লোকগীতি বলতে সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের লোকগীতি বা গান প্রচলিত। কলয় সমাজের বিবাহের পর আয়াজুক আয়া-চলা ও অচায়দের বিদায় জানাতে হয়। তখন প্রথমে অচায় বা উজায় গান গেয়ে বিদায় চাইবে। যেমন chaia bu cha-kha, nung-ia bu nung kha. Thang nani Bidai ridi, অনেক খাওয়া - দাওয়া হয়েছে এখন বিদায় দাও।

তারপর আয়াজুক গাইবে Aia le bidai ni ....
Tau (Tok) ma rom jak-ia Tong kha.
Kwpal ni sindur chak si si siba,
jadu Tong ma si ble,
kung chu ni bailik jilik jlak ba

jadu ni jarui si ble,

অর্থাৎ কপালে সিন্দুর চক্ চক্ করে, নাকের ফুল জ্বল মল করে স্বামী আছে বলেই।

Hamjwk kwtal ni buma (কন্যার মা)
Kiting le tor-ia khu,
Twi huk pai - ia khu,
langi sa pai-oi ridi.
Kiting Tor -ia khu mai-twk pai-ia khu.

Tukhu -sa pai-oi ridi. -------- অর্থাৎ আমার আদরের মেয়ে এখনও বড় হয় নাই। জলের কলসী নিতে পারবে না, ছোট লাণ্ডি কিনে দাও, আমার মেয়ে কিতিং এখনও বড় হয় নাই, সে ভাতের ডেক তুলতে পারবে না তাকে ছোট পাতিল কিনে দিও।

বরের বাবা ঃ— (Chamari Kwtal ni bu-pha)
Haduk cholong ni kerang kormo
swi swng-iai man mani --------
অর্থাৎ পাহাড়ের লুঙ্গায় কুকুর ঘেউ ঘেউ না করতেই
হলুদ রঙের কাট্রা পেয়েছিলাম —

Chuak khan mani :– (মৃতঃ ব্যক্তির আত্মাকে মদ খাওয়ানো বা ফুলের মালা পড়ানো)

১৩ দিন শ্রাদ্ধের পরের দিন সকালে বা অগ্রায়ন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মৃতঃ ব্যক্তির আত্মাকে ফুলের মালা পড়ানো হয় ও মদ খাওয়ানো হয় শ্মশানে গিয়ে। অনুষ্ঠান শেষের পর একটি জায়গায় সবাই জমায়েত হয়ে মদ, লাণ্ডি খাবে এবং পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করবে। তখনই কিছু লোক গান গাইবে -----

A- lia kona Nokha Somoi phai ka,
phaidi chwng thang lai sinai,
Mandar bubar laichak mrau mrau,
sarusa mrau mrau,
kami sikla cha-lai rau,
phai paidi mrau mrau

অর্থাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আসছে চল এবার আমরা যাই। মান্দার গাছের ফুল ফুটে আছে। পাখিরা কল কল করছে চল যুবক যুবতীরা আমরা সবাই এখন যাই - ।

তারপর বাড়ীর উঠানে গিয়ে আবার গাইবে —
Jakhlik khong phang, skal thuriphang
Dogar phiaudi Nokphang-
অর্থাৎ উপমা দিয়ে ছন্দ মিলিয়ে মৃতঃ ব্যক্তির ঘরের
লোককে দরজা খুলতে বলা।

ঘরের ভেতর থেকে ঃ—

Mwtai do phai ka, Atai do phaika
Dogar phiogwi -oi man -ia.

অর্থাৎ তোমরা বুড়া দেবতা না কে এসেছ?
দরজা খুলা যাবে না।

উঠান থেকে আবার ঃ Mutai bu phai-ia, A-tai bu phai - ia, Ama mai nungma phaiu.

অর্থাৎ কোন খারাপ দেবতা আসেনি, ঘরে লক্ষ্মী এসছে।

গড়িয়া নৃত্য ও গান ঃ —

Chaitro ba thangkha, Baisak ba phaika. Goria Raja phaikha, maiphang san khlai, mai bu kalang-o khulpuang san kl , khul bu kalang-o. Baba Goria Raja, Jak bai tak mani Rignai Takhom Tui, Tini si kan naui sal jak bai takmani Risa takhom tui tni si sornani sal - - - - --- - - - - - -

অর্থাৎ চৈত্র গিয়ে বৈশাখ এল, গড়িয়া রাজা এসছে। ধান চাও, কার্পাস চাও সবই দিয়ে যাবে বাবা গড়িয়া রাজা, হাতে বুনা পাছড়া ও রিসা আজকেই তো পড়ার দিন।

রায় বালমানি পাণ্ডা অনুষ্ঠানে রায়, গাইলেম ও কামি সিকাউ বলং সুয়ার মানি সুন্দর ভাবে ফুল দিয়ে সাজানো দোলনার মতো পালকিতে বসার আগে রায়। দেবদেবীদের দোহাই দিয়ে গান করতে হয়,

যেমন — Pubo sal kau, posim -o sal thang-o,
Duhai sangrom mani Duhai, --
Twi-o klaiu Drum pui Bwthai, Duhai Dormo Mwtai,
maiyung katui kachlong nani,
korai katui ka-chlong nani,
khaklu-sa-tui sak hili-ganu chwang,khaklu cha-ia,
orai sak -kwtwi sak heleng nani chwng le orai si cha-u .

(অর্থাৎ পূর্বে সূর্য্য ওঠে পশ্চিমে অস্ত যায়, হে পৃথিবী মা তোমাকে দোহাই দিচ্ছি। আরাধ্য দেবতা সাংগ্রম মাকে দোহাই দিয়ে হাতি ও ঘোড়ার পিটে চড়ার মতো যেন হয়। চাল কুমড়ার মতো যেন আমাদের শরীর ভারী না হয় তারজন্য আমরা চাল কুমড়া খাইনা, পাতার মতো হালকা হওয়ার জন্য - আমরা অড়াই পাতা খাই।)

ঠিক এই ধরনের গান গাইলেম ও কামি সিকাউ যাদেরকে খাং চাং - এ করে নিয়ে যাওয়া হবে তারাও গাইবে।

তারপর কলয় রায়কে যখন তার বাড়ীতে নিয়ে যাবে তখন রায়জুক্ অর্থাৎ রায়ের স্ত্রী

গান গেয়ে রায়কে অভ্যর্থনা জানাবে। যেমন—

Kang kang bai king king khorang khna-u,
chini song sok paikhna,
Dudum bai Dadam khorang khna-u,
chini song sok-pai khna,
koncha blai ni duma boi man-o,
chini song sok pai khna.

অর্থাৎ চেচা মেচি, ক্রম দ্রাম শব্দ শুনা যাচ্ছে, মনে হয় আমাদের রাজা এসছে, কনচা পাতার তামুক গন্ধ পাচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার সাথী এসছে।

জবাবে তখন রায় গাইবে ঃ

Jamthai tiari Bosa-oi Tonsau ba,
bahai chwng phaima Nau si,
Tilau Twi motom kha-oi Ton sau ba,
bahai chwng phai-ma nau si,
Maituk mai motom song-oi ton sau ba,
bahai chwng phaima nau si,

(অর্থাৎ পাতি বিছানো, তিলাউ দিয়ে খাবার জল তোলা, সু-গন্ধি ভাত রেঁধে রেখেছ, তোমরা কি করে জানলে, আমরা এসছি।)

ভালবাসার গান (Love Song)

জুমের দুটি টং ঘর, একটিতে যুবক একা এবং তার টং ঘরটি জুমের কিছুটা উঁচু জায়গায় আর একটি টং ঘরে একা যুবতী। কিছুটা জুমের ঢালু জায়গায় এমন সময় কলয় যুবতী তার টং ঘরের পেছনের বারান্দায় (নুগুল) দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করে গাইছে, -

Kuchu sampari kan - na muchui bu,
khol hai dada song kwrui,
hati (bazar) thau motom phul-na muchui bu,
pai nai dada song kwrui,

যুবক এই গান শুনে, তার টং ঘর থেকে সামনের বারান্দায় বেড়িয়ে এসে জবাবী গান গাইছে —

Kuchu sampari kholoi bu Naikha,
Kan nai Abang (yonger sister) song kwrui,
Hati thau (oil) moton pai-ui bu naikha .

কলয় যুবতী

Phul nai Abang song kwrui,

অর্থাৎ চাঁপা ফুল তুলেও রেখেছি, নেওয়ার মতো বোন নেই, বাজার থেকে সু-গন্ধি তেল কিনে রেখেছি, গায়ে মাখার বোন নেই।

যুবতীর উত্তর ঃ— O - dada -oi,

Kuchu sampari khol nai dada song
Tongu sia ba,
Hati thau moton pai nai dada song
Tongu siaba, Tong tw twi
Bwkha nı jala thak -ıa,
Bwkha nı kau no salai sı- uanu,
O-dada -oi ani gaireng-o phaidı

(অর্থাৎ , চাঁপা ফুল, তৈল এনে রেখেছ, আমার জানা ছিল না, দাদা, তুমি আমার টং ঘরে এস)

যুবক ঃ Nini gai reng-o phaı-oı le mano
Taukha mokdam chauanu,
ani gai reng-o phaıdi

অর্থাৎ - তোমার টং ঘরে আসতে পারি কিন্তু কাক মকদান খাবে।

তুমিই বরং আমার টং ঘরে এস।

কলয় সমাজে শ্রমদান প্রথা ঃ— কলয সমাজে এখনও শ্রমদান প্রথা চালু রয়েছে। গ্রামের কোন কলয় পরিবার যদি অসহায় হয়ে পড়ে তাহলে যুবক যুবতী বা গ্রামের লোকজন মিলে তাকে সাহায্য করে যেমন বাড়ীঘর তৈরী বা মেরামতে সাহায্য করা, জমির চাষাবাদে সাহায্য করা বা গ্রামের উন্নতির জন্য রাস্তা তৈরী করা, জলাশয় বাঁধ দেওয়া প্রভৃতি।

কোমর তাঁতে তৈরী রিসা-তাখমতুই

মালায় বি- মানি ঃ— চাষাবাদের জন্যই হোক আর বাড়ি ঘর তৈরীতে কয়েক জনের সাহায্য চাওয়াকে বলা হয় মালায় বি-মানি। তাতে কোন প্রকার মজুরী দিতে হয় না।

জাওয়াল খিলিমানি ঃ— যুবক-যুবতী বা পুরুষ মহিলারা দল বেঁধে দলের প্রত্যেকের বাড়ীতে সবাই একদিন একদিন করে কাজ করবে। এভাবে যতদিন পর্যন্ত কাজ শেষ না হয় ততদিন কাজ করে যাবে। দলের যে কোন লোক হঠাৎ অসুস্থ বা অন্য কোন জরুরী কাজে যেতে না পারলে তার পরিবারের যে কোন লোক তার পরিবর্তে কাজে যেতে পারবে। আর যদি কেহই যেতে না পারে, তাহলে অন্য সময়ে হলেও তাকে যার বাড়ীতে কাজ ছিল তার বাড়ী একদিনের কাজ করে দিতে হবে। তাকে জাওয়াল সু-মানি বলা হয়। জমিতে ধান রোয়া দেওয়া, ধান পাট খেতে জঙ্গল পরিস্কার করা। ধান, পাট কাঁটা, জুম কাটা, জুমে ধান লাগানো সবই এভাবে করা হয়। এই প্রথা বর্তমানেও প্রচলন আছে।

রি-কানরি মানি ঃ কলয় সমাজে আনুষ্ঠানিকভাবে কাপড় পড়ানো হয়। যেমন নবজাত শিশুকে "আবুর সু-মানি" অনুষ্ঠানে অর্থাৎ মা ও শিশুকে পবিত্র করে ঘরে তোলার সময় নবজাত শিশুকে নতুন কাপড় পড়ানো হয়।

কলয় মেয়েরা যৌবনে পর্দাপনের সময় অর্থাৎ ১০/১২ বয়সী মেয়েদের কলয়দের হাতে তৈরী রিসা তাখমতুই আনুষ্ঠানিকভাবে বুকে বেঁধে দেওয়াকে "রিসা - সররিমানি" বলা হয়। বর্তমানে এসবের প্রচলন খুব বেশী একটা দেখা যায় না।

বিবাহের সময় বর-কনেকে বিবাহ বেদীতে নিয়ে যাওয়ার আগে পবিত্র গঙ্গা জলে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পড়িয়ে বর-কনেকে সাজানো হয়।

মৃত ঃ ব্যক্তিকে সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে মৃতঃ ব্যক্তিকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় বা বিবাহের সময় ব্যবহার করা কাপড় পড়িয়ে সকলের দর্শনের ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শুইয়ে রাখা হয়। মৃতঃ ব্যক্তির পায়ের দিকে "মাইপক" চালও শাক-সব্জি দিয়ে রান্না করাকে "মাইপক" বলে। বাঁশ বেতের তৈরী পাত্রতে রাখা হয় এবং মুরগী ছানা আগুনে সেঁকে রাখা হয়। অচায়ের মাধ্যমে। সৎকারের বা দাহের পর শ্মশানে একটি মুরগ ছেড়ে দেওয়া হয় ও সাদা কাপড়ের নিশান টাঙ্গানো হয়।

তাঁত শিল্প বা কুটির শিল্প ঃ— পূর্বে কার্পাস তুলা দিয়ে তৈরী সূতা দিয়ে কোমর তাতে কাপড় বুনা হত এবং এই কাপড় দিয়ে গামজ্লিী বরক ও রিত্রাক তৈরী করা হত। বর্তমানে বাজারের বিভিন্ন বরকমের এবং রং-বেরঙের সুতা দিয়ে রিগনায় বরক (পাছড়া) ও আচল তৈরী করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন নক্সা করা আধুনিক ডিজাইনের কাপড়, কলয় রমনীরা কোমর তাঁতে তৈরী করে থাকেন।

কলয়রা বাঁশ - বেত দিয়ে ব্যবহার্য অনেক জিনিষপত্র তৈরী করে থাকেন। যেমন, খুক্রু ঢাকনা দেওয়া খাড়া) নক্‌খায় (খাড়া) লাঙা (খাড়ার মতোই পাতলা করে বানানো) জাংখং, (ধান রোদে দেওয়ার পাতি) জামথায়, জামফ্রাক, উড়া (তুকরি) ধূলা, চেম্‌পায়,

সরচেং, চকা, হাত্রায় ধল এক ধরনের তুকরি) বাইলেং, ডালাক, তাউখক্ এসব প্রভৃতি তৈরী করে থাকেন। বাঁশে কাঠি দিয়ে তৈরী চিরুনী দেখতে খুবই সুন্দর।

পোষাক - পরিচ্ছদ ঃ— সাধারণতঃ পুরুষেরা হাতে বুনা সাদা কাপড়ের গামজি্লী বরক ও ধুতি বরক হাটু পর্যন্ত করে পড়ে থাকেন। মহিলারা বিশেষ অনুষ্ঠানে কলয়দের হাতে বুনা রিসা তাখমতুই ও রিগনায় তাখমতুই পরিধান করে থাকেন।

অলংকার ঃ— সাধারণতঃ মহিলারা পয়সার তৈরী মালা / (রাংতাং) কানে ওয়াখম্ ও তয়া, নাকে লুলু ও কয়লিক হাতে বালা বা মাথিয়া, এছাড়াও চন্দ্রাহার, গাছি পায়ে খাড়ুক ও খোপায় সুড়াং ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে শিক্ষা ও আধুনিকতার ফলে এসবের প্রচলন বা ব্যবহার নাই বললেও চলে। বয়স্কা বৃদ্ধাদেরই কেবল ব্যবহার করতে দেখা যায়।

অস্ত্র - শস্ত্র ঃ— প্রাচীন কালে কলয়রা হিংস্র প্রাণী ও শত্রুদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য কলঙ্গা (বর্শা) তীর-ধনুক, বাদুলফং দা- ব্যবহার করত। তাছাড়া অনেকেই হাতে তৈরী গাঁদা বন্দুক ও সমাজের সর্দার বা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সরকারি লাইসেন্স করা এক নালা ও দু নালা বন্দুক ব্যবহার করত। তখনকার দিনে বন্য প্রাণী বাঘ, ভাল্লুক, শুকর, হরিণ শিকার করা একশ্রেণীদের মধ্যে একটা নেশা ছিল এবং শিকার পাওয়ার পর গ্রামের সবাইকে কম-বেশী ভাগ করে দিত নতুবা আমন্ত্রণ করে খাওয়াত।

কৃষিকাজে ও সংসারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত জিনিষ পত্র ঃ— সমতল জমিতে হাল চাষের জন্য — লাঙল, দা-বরক, দা-ওয়ানজুই, চেখ্রা (কাঁচি) দাত্রা, নেড়াকাঁচি, কুযা (কুড়াল) খন্তি (খন্তা) গদাল (কোঁদাল) প্রভৃতি। বর্তমানে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় ট্রাক্টর সহ বিভিন্ন যনত্রপাতি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

রায় বালমা পাণ্ডায় রায়সহ সমাজ পরিষদের বসার আসন

ধর্ম ও দেব-দেবী ঃ— কলয় সমাজ ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী, তবে অধিকাংশ পরিবারই হিন্দু- ধর্মাবলম্বী। হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অচায় বা উজায় দিয়ে পূজা -পার্বন করার প্রচলন এখনও বর্তমান। অনেকে আবার ব্রাহ্মণ দিয়েও করে থাকেন। এর মধ্যে কোন বাধ্য- বাধকতা নেই। কলয়রা সাধারণতঃ কেরপূজা, লাম্রা-পূজা, তুই খুলুম মানি অর্থাৎ গঙ্গা পূজা, মাইনুংমা, নকসুমতায়, বুড়াসা, স্কাল মতায়, থুনিরাউ - বনিরডি, — গড়িয়া পূজা, (সার্বজনীন) সঙঃত্রাম্ (হাড়িয়ে যাওয়া জিনিষ পাওয়ার জন্য বা কোন শুভকার্য সিদ্ধির জন্য) প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা পার্বন অচায় দ্বারা সম্পাদিত হয়। যে কোন পূজা বা শুভ কাজ করার আগে লাম্প্রা ওয়াথদ দেওয়ার নিয়ম।

কলয়দের সমাজের প্রধান আরাধ্য দেবতা ও সমাজের পরিচিতি হচ্ছে হাতি ও ঘোড়া (মাইয়ুংসা, কড়াইসা) সর্বদাই কামি সিকাউ-ই রক্ষনা- বেক্ষন ও পূজা করে থাকেন কলয় সমাজের সর্বাধিক উন্নতি সাধনের জন্য। কলয়দের মধ্যে আবার অনেকেই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং বেশ কিছু গ্রামে হিন্দুদের বিভিন্ন মন্দিরের মতো খ্রীষ্টানদের গীর্জাঘরও দেখা যায়। বর্তমানে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণে আগ্রহ দেখা যায়।

কলয়দের মধ্যে হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্ম বাদে অন্য ধর্ম নাই বললেও চলে।

বাদ্য-যন্ত্র ঃ— কলয়দের মধ্যে আদি বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে চংক্রেং, দান্দু, সারিন্দা, বাঁশের তৈরী সু-মুই, বাঁশের বাঁশি, খাম (ঢোলক)। এছাড়াও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে, পারিবারিক কিছু শুভ অনুষ্ঠান ও গ্রামের মন্দির গুলিতে খোল - কীর্ত্তনের রেওয়াজ কলয় সমাজে বিশেষ করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে।
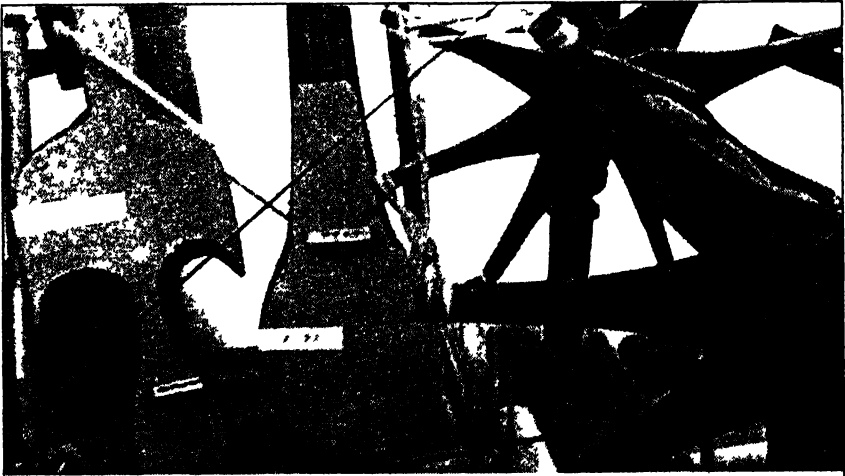
সারিন্দা, চংক্রেং ও চরখা

শিক্ষা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী ঃ— কলয়দের মধ্যে শতকরা (৯৯ শতাংশ) নিরান্নব্বই জনই স্বাক্ষর। বেশীর ভাগই প্রাথমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী পাঠরতা, বর্তমান যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেশীর ভাগই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা বলা যায়। এম. এ পাশ করা খুবই কম তবে বি. এ বা সমতুল্য পাশের সংখ্যা প্রায় শতাধিক হবে।

কলয়দের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে উচ্চপদে চাকুরীরত দের সংখ্যা প্রায় পনের ষোল (১৫/১৬) জনের মতো। এদের মধ্যে রয়েছেন, সুরেশ কলয় (DSP) Asst. command ins officer, 2nd BN, TSR, ধনু কলয় (DSP) দেবমনি কলয় Section offcier,Revenue, secrtariate, কমিশনার কলয়, (BDO) বিল্লা কলয়, SDO (Water Resousece এপোলো কলয় (MBBS) তরুন কলয় (MBBS) বিমল কলয় (MBBS) বংশীপদ কলয় Head master (class -X school) , আন্দ্রিয় কলয় (Engineer) রমেন্দ্র কলয় (Engineer) তারিণী সিন্দু কলয়, Head Master, (Class -X, School) সঞ্জয় কলয (CDPO) শ্রীমতি গৌরী কলয় (CDPO)

কলয় সমাজের হদা বা পাঞ্জি অনুসারে বিভিন্ন সময়ে যারা সমাজপতি 'রায়' বা পদবীতে ভূষিত হয়েছেন তাদের নামের তালিকা ও ঠিকানা।

ঃ ওয়াকবুর (Wakbwr) হদা ঃ

১। ৺তাউলা কলয় রায়, মায়ামতলা হাদুক
২। ৺ভাগ্য মন্ত — ঐ —
৩। ৺মহি চন্দ্র — বৈরাগী কামি, টাকার জলা
৪। ৺ নন্দ রায় — ত্রিনালী, উদয়পুর
৫। ৺ রামচন্দ্র — টাকার জলা,
৬। ৺ তৈদু রায় — পল্কু কামি, তৈদু।
৭। ৺ মিলিধন — ব্রহ্মাবিল, তেলিয়ামুড়া।
৮। শ্রী মালিকদার — সর্দ্দূকরকরি, তেলিয়ামুড়া।
৯। শ্রী নরেন্দ্র — পল্কু কামি, তৈদু।

ওয়াপ্লম (Waplom) হদা

১। ৺সুলদেব রায় — মায়ামতলা হাদুক,
২। ৺মায়াম — ঐ
৩। ৺ মনিয়া — লাউগাঙ হাদুক , বিলোনিয়া।
৪। ৺তাউলা রায় — লাউগাঙ হাদুক, বিলোনিয়া।
৫। ৺লাসু রায় — তুইসা ক্থাং
৬। ৺গুপ্ত — ঐ —

৭। ঁমহাদেব রায়	—	বাতিবন
৮। ঁপদ্মলোচন	—	বাটি বিশালগড়
৯। ঁহালাম রায়	—	ঝাড়া খাক্রাপ
১০। ঁলোকচরাম	—	কল্দ্রা তুইমা।
১১। ঁজমা রায়	—	কনিয়া তুইসা।
১২। ঁখরা রায়	—	চাম্পাশরমা।
১৩। ঁনাসো রায়	—	থেলাখুং। উদয়পুর।
১৪। ঁনন্দ মনি	—	পিত্রা, উদয়পুর।
১৫। ঁরাজচন্দ্র ।।	—	জাক্ সুইয়া, তৈদু।
১৬। ঁসত্যরাম ।।	—	গংগা রায় কাসি, উদয়পুর।
১৭। ঁহরিচন্দ্র ।।	—	ব্রহ্মাছড়া, তেলিয়ামুড়া।
১৮। ঁপুইলা রায়	—	সাধুরাম বংশ।
১৯। ঁআচং বায়	—	ঐ
২০। শ্রী বিন্দু রায়	—	দ্বারকায়, জম্পুইজলা।

আবেল (Abel) হদা

১। ঁওয়ানজুই রায়	—	বাটিবন।
২। ঁকান্দু রায়	—	ঐ
৩। ঁফুদু রায়	—	সায়মারুয়া, উদয়পুর
৪। ঁচরন সিং	—	তৈদু।
৫। ঁপূর্ণ চন্দ্র	—	ঐ
৬। ঁমঙ্গল চন্দ্র	—	হলুয়া, অম্পিনগর
৭। ঁবলরাম	— ঐ —	

৮। কর্ণদাতা কলয় (বর্তমান রায়) — হলুয়া, অম্পিনগর।

চড়াই (Chorai) হদা

১। ঁথুজুমনি রায়	—	
২। ঁগুপিয়া রায়	—	
৩। ঁধরচন্দ্র	—	সাইমারুয়া, উদয়পুর।
৪। ঁইন্দ্র রায় ।।	—	বাটিবন,
৫। ঁদুলু চন্দ্র ।।	—	সাইমারুয়া, উদয়পুর
৬। ঁবৈকুণ্ঠ ।।	—	তৈদু,

৭। ঁইন্দ্রমনি	—	সাইমারুয়া, উদয়পুর।
৮। ঁপদ্মমনি	—	পাতাবেরী, আমবাসা
৯। শ্রী রতনা রায়	—	ধনলেখা, অম্পিনগর।
১০। শ্রী রমনা রায়	—	জামির ছড়া, লংতরায় ভ্যালি।

রোজুগুই (Rwjugui) হদা

১। ঁবনবীর রায়	—	বাটিবন।
২। ঁজলেরাম	—	সিঙ্গি নালা।
৩। ঁদশরথ	—	বাহাত্তর, উদয়পুর।
৪। ঁগগন চন্দ্র	—	মেলার মুখ,
৫। - - - - -	—	মেলচি, দাগমুড়া
৬। ঁবাস্র্যা রায়	—	রূপছড়া, তেলিমুড়া।
৭। ঁরাধাচরন	—	তুইকয়, তেলিয়ামুড়া।
৮। ঁচাঁদ রায়	—	টাকার জলা
৯। ঁদরখাস্ত রায়	—	হলুয়া, অম্পিনগর
১০। শ্রী দয়াল কলয় রায়	—	বৈশ্যমনি, অম্পিনগর।

বুকাং (Bukang) হদা

১। ঁমহামনি রায়	—	এ রামকামি, উদয়পুর,
২। ঁখুশী রায়	—	ঐ
৩। ঁসূর্য্যমনি	—	বৈশ্যমনি পাড়া, অম্পিনগর।
৪। ঁরাধাকান্ত ।।	—	ব্রহ্মাছড়া, তেলিয়ামুড়া।
৫। ঁসরথায় সিং ।।	—	—
৬। ঁসাচীরাম ।।	—	খুম্পুইলুং, উদয়পুর।
৭। ঁমিত্র রায় ।।	—	বৈশ্যমনি, অম্পিনগর
৮। শ্রী মাধব রায়	—	ঐ

কুসু (Kusu) হদা

১। ঁকমলা কান্ত রায়	—	সাইমারুয়া, উদয়পুর।
২। ঁসুমন্ত রায়	—	এ রাম কামি, উদয়পুর।
৩। ঁলালবাদুর রায়	—	তেতুই, অম্পিনগর।
৪। ঁধনমনি রায়	—	ব্রহ্মাছড়া, তেলিয়ামুড়া।

৫। কামিনি রায় — পঙ্ক কামি, তৈদু।
৬। শ্রী প্রবীর কলয় — কালাচান্, অম্পিনগর।

বর্তমান সমাজ পরিষদ
(২০০৮-২০১০ ইং)

১। কর্ণদাতা কলয় (আবেল) রায়
২। নিকুঞ্জ কলয় (রোজুগুই) গাইলেম
৩। শচীন্দ্র কলয় (ওয়াকবুর) কার্মিসিকাউ
৪। উমাকান্ত কলয় (বুকাং) গাবুর
৫। বৈষ্ণব কলয় (কুসু) জাকসুম
৬। মঙ্গলপদ কলয় (ওয়াপ্রম) খুকসুম
৭। মহেশ কলয় (চরাই) সেঙা

মুদি ঃ রাজকুমার কলয়, মুইলা ঃ শ্রাবণ কলয়

দেবব্রত কলয়

পশ্চিম ত্রিপুবা জেলাব তেলিযামুড়া মহকুমার গুণমণি সর্দার পাৱায ১৯৫৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীতে জন্ম। পিতা স্বর্গীয় মনীন্দ্র কলয়। প্রাথমিক শিক্ষা তেলিয়ামুড়া জে. বি ইস্কুলে, পরে বোধজং উঃ মাঃ বিদ্যালযে এবং এম বি বি কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে বি কম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রী কলয় ত্রিপুরার অন্যতম একজন উপজাতি নেতা হিসেবে সুপরিচিত। তিনি একাধিকবার ত্রিপুরার উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং ২০০০ সালে উপজাতি জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন।

রূপীনি

সম্প্রদায় - আদি ও বর্তমান বাসস্থান

রূপীনি সম্প্রদায়ের আদিবাসস্থান "তৌই রূপীনি" নামক নদীর উৎপত্তিস্থল এলাকায় বলিয়া কথিত হয়। ইহাও কথিত হয় যে এই স্থানটি প্রাচীন আসাম দেশে। রূপীনি নামের একটি নদী লঙ্কা এলাকায় এখন ও বর্তমান। আর এক জনশ্রুতি বর্তমান মিজোরাম স্টেটের সংলগ্ন চীন হিলস-এ ইহার অবস্থিতি। সে যাহাই হউক এই স্থানটি যে ভারতের পূর্ব বা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের কোন এক স্থানেই হইবে ইহা নিশ্চিত। কারণ মঙ্গোলীয় গোষ্ঠির বড়ো বা বরো গ্রুপের মানুষ যে এই অঞ্চলেই প্রথমে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা ইতিহাসে সাক্ষ্য প্রমাণ মিলে। আর রূপীনিরাও মঙ্গোলীয় গোষ্ঠিভুক্ত বড়ো তথা কক্‌বরকভাষী গ্রুপের উপজাতি সম্প্রদায়। বর্তমানে এই স্থান নির্দ্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কারণ কালের স্রোতে এই বিবর্তনশীল জগতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই নদীর অস্তিত্ব আজ আর নাই। ইহাও হইতে পারে যে পূর্ব্বের সেই "তৌই রূপীনি" নাম পরিবর্তিত হইয়া বর্তমানে অন্য কোন নাম ধারণ করিয়াছে।

বড়ো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর একটি অংশ আসামের দক্ষিণ-পশ্চিম তথা বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে বহু হাজার বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় ককবরক ভাষী রূপীনীদের আদিবাসস্থান ভারতের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চল ভারত বলিতে আসাম, মনিপুর, ত্রিপুরা নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশগুলিকে বুঝায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে রূপীনি সম্প্রদায় কক্‌বরক্‌ভাষী হইলেও ত্রিপুরার রাজ বংশের ইতিহাস বলিয়া পরিচিত রাজমালা ও জাতিমালায় রূপীনিদেরকে বারখিল হালাম-এর "এক হালাম" অর্থাৎ উপসম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কিন্তু হালামদের ভাষা কুকী গ্রুপের ভাষা বলিয়া পরিচিত। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্য হিসাবে যোগদানের পর (যোগদানের তারিখ - ১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯ইং) ভারত সরকার ও রূপীনি সম্প্রদায়কে পূর্ব্ব নির্দিষ্ট অনুযায়ী হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া ত্রিপুরার উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দান করে। কিন্তু যেহেতু রূপীনিরা কক্‌বরকভাষী, সুতরাং তাহারা কোন অবস্থাতেই কুকী গ্রুপ ভুক্ত জনগোষ্ঠী নহে। তাহারা কক্‌বরক্ ভাষী গ্রুপের একটি সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত হওয়া উচিত ও প্রয়োজন এবং রূপীনি উপজাতি ত্রিপুরার একটি স্বতন্ত্র উপজাতি হিসাবে গণ্য ও স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।

সেই স্মরণাতীত কালে কোনও একদিন রূপীনি সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ, নাম—"রাম্‌নি চাপিয়া", "তৌই রূপীনি" নদীতে স্নান করিতে গিয়া একটি 'হলং" অর্থাৎ পাথর প্রাপ্ত হয়। নদীতে নামিবার সময়ে পা-বাহিয়া একটি পাথর উঠিতেছে এইরূপ অনুভূত হইলে তিনি ঐ পাথরটিকে হাতে লইয়া নদীর ভাটির দিকে ছুঁড়িয়া ফেলেন। পরদিন আবার স্নান করিতে গেলে ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাহাতে চিন্তার কারণ হয় এবং তিনি পাথরটিকে তুলিয়া আনিয়া ঘরে "চাঁপা"-য়ে অর্থাৎ বাঁশ বেতের তৈরী ঝাঁপিতে ভরিয়া রাখেন। ঐ দিন রাত্রিতে স্বপ্নে এইভাবে তিনিং আদিষ্ট হন - "আনি মুং -তান্ ফাং রায় - কও তৌই রূপীনি মৌতাই- না-ও আনী খুলুমদি -

নাও যাঁত্তাহীন্ রূপীনিসা", — অর্থাৎ আমি এই তাঁই রূপীনি নদীর দেবতা আমার নাম "তানফাং রায়", তোমরা সকলেই এই নদীর সন্তান, আমাকে তোমরা সকলে মিলিয়া পূজা করিও — তোমাদের মঙ্গল হইবে আর তোমরা রূপীনি জাতি হিসাবে পরিচিত হইবে"। সেই হইতে তানফাং রায়ের উপাসকরা নিজেদেরকে "রূপীনি সা" হিসাবে পরিচিতি দান করে এবং রূপীনিরা এখনও প্রতিবৎসর সমষ্টিগতভাবে এই "রূপীনি দেবতা" কে পূজা করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবেও এই দেবতাকে পূজা দেওয়া হয়। পূজার নৈবেদ্য - "তাওচ্লা কুফুত্' - সাদা মোরগ "পুন্দুওয়া কুফুত্" - সাদা রং -এর পাঁঠা অথবা "মথ্না কুফুত্ " - সাদা গবয়।

রূপীনিরা জিবিকার উদ্দেশ্যে তাহাদের আদিবাসস্থান হইতে বিভিন্ন জায়াগয় ছড়াইয়া পড়ে এবং ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যে "রূপীনি সম্প্রদায়" হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া অনাদিকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছে। রূপীনি সম্প্রদায়ের লোককে ত্রিপুরায় প্রধানত সদর, খোয়াই, কৈলাশহর ও ধর্মনগর মহকুমাগুলিতে দেখা যায়। সদর মহকুমার "বোং "অর্থাৎ গ্রামগুলিতে আছে ততবাক-চম্পকনগর, চন্দ্রসাধুপাড়া, রক্তিয়াপাড়া, ভৃগুদাস পাড়া, রাইমা হারুং, ভাণ্ডারী হাদু কামী, তালুক ওয়াকতুকু, তাঁই কলই, আথুক কাঁথাং পাড়া, গান্থালাঁং, তাঁইসা সিত্রামা, বেলফাং, খামথিং, তাঁইক্রুপ, নারেং বরদোয়াল, সিকাম তাঁইসা, চাম্পা, ওয়ানা লাঁং প্রভৃতি। খোয়াই মহকুমায়, মরহারুং, মানদারলাঁং, দাঁন্চিক্মা, তাঁই-কাঁচাক্মা, সিকাম তাঁইচাক্মা, ছনলাঁং, হাওয়াই কামী, তাঁইসিন্দ্রাই, রূপাছড়া, গনিয়াবিল, লুংবের গীগিরি প্রভৃতি পাড়া। কৈলাশহর মহকুমায় মনুগেইট ছৈলেংটা, ঘাগ্রাছড়া, গয়নামা, ময়নামা, মরাছড়া, ধুমছড়া ইত্যাদি পাড়া। ধর্মনগর মহকুমায় দামছড়া, কৃষ্ণটিলা, মাছমারা, শান্তিপুর, পেচারতল, আসিদ্রুন্, বৈরাগীপাড়া, মধুবন, আনন্দনগর, রাজনগর ইত্যাদি পাড়া।

আসামে কাছাড় জেলা ও অন্যান্য স্থানে বড় বড় বোং বা অঞ্চলে রূপীনিদের বসবাস। কথিত আছে ত্রিপুরায় বড়মুড়া পাহাড় রূপীনিদের আদি বাসস্থান। বরদোয়াল, খামথিং, নারেং প্রাচীনতম পাড়া।

রূপীনিরা চার দফায় বিভক্ত ও বার পান্চি

যথা - ১। কাঁচাম রাস্তি (পুরাতন রাস্তি) ২। কাঁতাল রাস্তি (নূতন রাস্তি) ৩। থাইথাক্ ৪ পাইথাক। পুরাতন রাস্তি ও থাইথাক দফার লোক সংখ্যাই বেশী। যতদূর জানা যায় এই দফা বিভাজন পূর্ব্বে রূপীনিদের মধ্যে ছিল না। ইহা ত্রিপুরার রাজারা তাহাদের শাসন কার্য সুবিধা করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রতিটি দফার যার যার সামাজিক কাঠামো আছে, অর্থাৎ চার দফার চারজন "রায়" এবং তাহাদের নিজ নিজ পারিষদ বর্গ। (সামাজিক কাঠামো অন্যত্র দ্রষ্টব্য) । তাহা ছাড়া ও এই সম্প্রদায়ের লোক "পানচি' (গোষ্ঠী) প্রথায় নিজেদের চিহ্নিত করে। বার প্রকার "পানচি' বা "পানজি"র অস্তিত্ব দেখা যায়। যথা — ১) কাজারী ২) টিয়াল ৩) ফুংচাউ ৪) কেরজাং ৫) ফারুতে ৬) মুরীয়া ৭) সুতার ৮) পাইতক্রা ৯) ছোটোবড়ইসা ১০) চোয়ান মাঁচামসা ১১) সাঁমজাং ১২) মাঁরসাঁফাংসা। এই গোষ্ঠীকরণ সৃষ্টি হইয়াছে শিবরাই বা সুবরাই রাজার বিবাহোৎসবের সময় হইতে। উৎসবে যে যে ধরনের বা প্রকারের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে সেইরূপ কাজের নিরিখে তাহাদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠী হিসাবে নামকরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে

তাহাদের নিজ নিজ বংশধররাও ঐরূপ গোষ্ঠী বা "পানচি'-র লোক বলিয়া পরিচিত হয়।

বিভিন্ন পানচি-র উপর দায়িত্ব বর্তানো কাজকর্ম

১। কাজারী

দলপতির বংশধর। "রূপীনি রাজা" (দেবতা)র বিশেষ পূজার অনুষ্ঠানে নরবলি দেওয়ার সময়ে হোতা। রাজার নির্দেশে বলির জন্য লোক সংগ্রহকারী।

২। টিয়ল

সমাজের লোককে নিয়ন্ত্রণ করে বা রাখে। আচার -বিচারের জন্য ভারপ্রাপ্ত- অত্যন্ত বাকপটু গোষ্ঠী।

৩। ফুংচাউ

বার্তা বাহক। সমষ্টিগত সামাজিক অনুষ্ঠানের সংবাদ দেওয়া সহ ভাণ্ডারী ও খাজানচি কাজের ভারপ্রাপ্ত।

৪। কেরজাং

রাজার ছত্রধারী। সমাজের লোকজনকে রক্ষা করিবার দায়িত্বে থাকে। রাজার আদেশে যুদ্ধের সময়ে লোক, বিশেষত যুবক যোগানদার।

৫। ফারুতে

"অচাই" অর্থাৎ পুরোহিত সম্প্রদায়। দেবতায় ভোগ প্রদানকারী।

৬। মুরিয়া

বাদ্যকরের কাজ করে। সমাজের বিশেষ কাজের সময়ে, আপদ-বিপদের সময় গবয শৃঙ্গের ফুকারে সকলকে জানানো কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত।

৭। ছুতার

শিল্প কাজে দক্ষ। নংখাই, চেম্পাই, তুইছেং, দিংক্রা, চাপা বেত্রা ইত্যাদি তৈরীর কাজে পাবদর্শী এবং রাজাকে ঐ সমস্ত সরঞ্জাম সরবরাহকারী।

৮। পাইথক্রা

পাহারাদারের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বংশধর। তাহাবা রাজার মন্দিব পরিষ্কার কাজে ও নিযুক্ত হইয়াছিল।

৯। ছুটো বড়ইসা

জল উত্তোলন বা সরবরাহকারী।

১০। চোয়ান মীচীম্‌সা

সমষ্টিগত সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠানের জন্য " চোয়াক - আরাক " অর্থাৎ মদ তৈয়ারী করিয়া যোগান দেওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত গোষ্ঠী রাজার জন্য মদ তৈরী করে।

১১। সীমজাং

যোগালী কাজে নিযুক্ত লোকদের বংশধর।

১২। মীরসীফাংসা

প্রধানত জুমের মরিচ, তরিতরকারি, শাক-সব্জী ইত্যাদি যাবতীয় যোগানদার।

দৈহিক গঠন

রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা গৌরবর্ণ, লম্বায় অন্যান্য সকল যেমন — ত্রিপুরী (দেববর্মা) রিয়াং, জমাতিয়া ইত্যাদি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকের তুল্য। চোখ ছোট, নাক চেপ্টা, ভুরু-দাড়ি, মোচ বিহীন, কৃষ্ণবর্ণ চুল, মুখায়ব স্বাভাবিক লম্বা, গোলাকৃতি নহে, দেহ ঈষৎ খর্ব কিন্তু অত্যন্ত সুঠাম ও কর্মক্ষম। কুৎসিত চেহারার পুরুষ কিংবা মেয়ে খুব একটা দেখা যায় না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রূপীনিরা সবল, শান্ত, সত্যবাদী ও সাহসী। ঝগড়াটে স্বভাবের লোক তাহারা নহে। তাহারা অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ। আনন্দ স্ফূর্তি করিয়া প্রায় সকল সময়ই থাকিতে ভালবাসে। রূপীনি সম্প্রদায়ের মেয়েরা ফুল অত্যন্ত ভালবাসে। ফুল দিয়া নিজেকে সাজাইয়া রাখিতে চায়। মাথার চুলের খোপা ভর্তি করিয়া ফুল পরিতে তাহাদের খুবই প্রিয়। বনের সুগন্ধি ফুল যেমন — "মাকুনদাঁই" " খেলেংবার" ইত্যাদি জুমে লাগানো "সনাবাঁই"(গাঁদাফুল), সুগন্ধি কুসুম ফুল, বাড়ীর উঠানে লাগানো "উরিবার"(জবাফুল), "খুম্‌তাওজের" (ভুঁইচাপা), "খুম্‌ফাঁই" (দোলন চাপা), "খুমচাক", "খুমমাঁতাই" "খুমলাইরু", "গাংগনা" (কাঁটা নাগেশ্বর, "খুমআতর" করবী গোলাচি, হেংবা প্রভৃতি। বাড়ীর অদূরে কোন বাগানের এক কোনে অথবা স্নানের ঘাট সন্নিকটবর্তী নদীর তীরে লাগানো "কেওয়া" (কেয়াফুল) ও "মাছেংতুমপা" ফুল রূপীনি মেয়েদের পছন্দ।

রূপীনি বাড়ীতে অন্নপ্রাশনে গৃহকর্তাসহ সমবেত অতিথিবৃন্দের ছবি

জীবিকা

অন্যান্য উপজাতির ন্যায় জুম চাষ রূপীনিদের প্রধান জীবিকা। ক্রমে তাহারা নীচু জমিতে স্থায়ী চাষাবাদ করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ্ করিতে আরম্ভ করে। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক স্থায়ী চাষবাসে অভ্যস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু উন্নত প্রথায় চাষবাসের ব্যাপারেও এই

সম্প্রদায়ের চাষীরা বেশ পারদর্শিতা প্রর্দশন করিতেছে। রূপীনিদের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত রহিয়া জীবিকার্জন করিতেছে।

প্রধান খাদ্য

রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকের ভাতই প্রধান খাদ্য। মাংস ও তাহাদের প্রিয় খাদ্য। মোরগ ও শূকর মাংস তাদের অধিকতর প্রিয়। বর্তমানে মাছের প্রতি ও তাহাদের আসক্তি হইতেছে। সিঁদল (শুকনা পুঁঠি মাছকে একপ্রকার তেলে ভিজাইয়া মাটির নীচে রাখা হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে ইহা তুলিয়া ব্যবহার করা হয়) ও শুকনা মাছ প্রিয় খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। সমুদ্র সংলগ্ন অধিবাসীদের এই খাদ্য কালক্রমে পূর্বাঞ্চলের সমগ্র উপজাতির মধ্যে তাহাদের প্রধান খাদ্যের একটি হিসাবে প্রচলিত হয়।

জুমে উৎপাদিত শাকসব্জি তাহারা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে। সাধারণতঃ তাহারা জুমে "চাকুমড়া" "খাখ্‌লু", লুবিয়া", "সীবাই", মাঁইকং", কক্‌খেলেং" "ফানথাও" যথাক্রমে মিষ্টিকুড়ো, খাখুম, লটছই, সীম, ঢেঁড়শ, অড়হর, বেগুন প্রভৃতি তরিতরকারি ফলায়। বাঁশের করুল, বন কলার থোড় এবং অন্যান্য বন্য শাক্‌সব্জি আহার কবে। "মগদানা" অর্থাৎ ভুট্টা জুমে প্রচুর ফলায এবং সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করে। জুমের "কুড়িয়ামা" বা "মাইমিল" অর্থাৎ বিন্নীধান দ্বারা তৈরী 'চুয়াক বাঁতাঁক' অর্থাৎ কলসেব মদ বা পাচ্চুয়া ও "আরাক' অর্থাৎ বোতলের মদ পান করে। সাংসারিক আচাব অনুষ্ঠানে ও সামাজিক পূজা-পার্বণ প্রতিটি ব্যাপারে মদের ব্যবহার অপরিহার্য।

পোষাক -পরিচ্ছদ

রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা মেয়ে পুরুষ উভয়ই নিজেদের তাঁতে বুনা কাপড় ব্যবহার করে। তাঁত যন্ত্রকে রূপীনিরা "থান্তি" বলে। এই থান্তি দ্বারা তাহারা মেয়েদের পরিবার জন্য "একনাই" বা রিকনাই" (অর্থাৎ পাছড়া), "ইসা" বা "রিসা" (বক্ষ আবরণী) পুরুষদের জন্য "পুৎদ্রি" এবং "ওতি' (ধুতি) কান্‌চাঁলাঁই"(সার্ট) "ঈসৎ" (পাগড়ি) তৈয়ার করিয়া লয়। ইহা ছাড়াও "বাসেক' (পিঠে বাচ্চা বাঁধিয়া বহন করিবার জন্য নির্দিষ্ট কাপড়), "ইত্রাক' বা "রিত্রাক' (গায়ের চাদর), "বীর্‌কিঁ' (বিছানা চাদর) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ নিজেদের তাঁতে তৈয়ার করে। জুমে উৎপাদিত কার্পাসকে বীজ ছাড়ানো যন্ত্র "চরখি" র সাহায্যে "তুলায়"— তারপর তুলা হইতে "ফান্‌সাঁই" এবং ফানসাঁই হইতে চরখা-র সাহায্যে সূতা তৈয়ার করিয়া নেয়। এই "চরখি" ও "চরখা" - তাহারা তাহাদের প্রাচীন রীতি নমুনায় নিজেরা কাঠ দ্বারা প্রস্তুত করিয়া নেয়।

জঙ্গলে একপ্রকার গুল্ম জাতীয় গাছ নাম — নেলা। ইহার পাতা হইতে কাল রং এবং "আসু" গাছের শেকড় দ্বারা লাল রং প্রস্তুত করা হয়। পাতা ও শিকড় আলাদা ভাবে ক্ষার ও তিল তৈল সহযোগে সিদ্ধ করিয়া এই কাল ও লাল রং তৈয়ার করে এবং সেই রং দ্বারা সাদা সূতাকে রঙ্গীন করে।

রূপীনি মেয়েরা সকলেই কোমর তাঁত অর্থাৎ "থান্তি"—তে কাপড় বুনিতে পারে। বুননে দক্ষ মেয়েরা রঙ্গীন সূতা দ্বারা সুন্দর সুন্দর বুমুল" অর্থাৎ নকসা বা ডিজাইন তৈয়ারী করে।

সেই রকম "বুমুল" -এর কয়েকটি নাম — সার্বাঙ্গী, জংকতক এবং মুফুখিতং। সাধারণতঃ রূপীনি মেয়েদের কোমরে পরিধেয় "এক নাই" বা "রিকনাই" (পাছড়া) সাদা জমিনে লাল পাড়। লাল সাদা সংযোগ স্থলে বুমুল থাকে। ইসা বা রিসা- লাল জমিন কাল পাড় লাইনিং; জমিন ও পাড়ের সংযোগ স্থলে পুর্ব্বোক্ত সার্বঙ্গী, জংকতক কিংবা মুফুখিতং বুমুল" (নকসা) দেওয়া হয়। পুরুষদের পরিধেয় "পুৎদ্রি এবং "উতি' (ধুতি), মাথায় পেচাইয়া পরিবার (সাড়ে পাঁচ হইতে ছয় হাত বিশিষ্ট) বস্ত্র "ঈষৎ" এবং "কান্‌চৌলাই (সার্ট) সাদা সূতায় তৈয়ারী হয়। "বাসেক', 'ইত্রাক' ও "বৗরকি' সাদা সূতায় তৈয়ারী হয়।

ভাষা

রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের মাতৃভাষায় কথা বলে। এই ভাষা ককবরক-এর অর্ন্তগত। কয়েকটি শব্দের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহা অতি নগণ্য, উচ্চারণের বৈষম্য ব্যতীত শব্দ ও অর্থগত ব্যাপারে ককবরক ভাষী অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মাতৃভাষার সঙ্গে আর কোন পার্থক্য নাই। উল্লেখ্য অতীতে ত্রিপুরার মহারাজাদের দ্বারা রূপীনি সম্প্রদায় "বার খিল হালাম"— এর এক হালাম" বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল এবং বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক ও উপরোক্ত বার খিল হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতি হিসাবে ঘোষিত হয়। রূপীনিদের ন্যায় কলই" সম্প্রদায়কে ও "বারখিল হালাম এর এক হালাম করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ককবরক ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। হালাম সম্প্রদায়ের লোকেরা কিরাত বা কুকী উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত। সেই হেতু " রূপীনি" এবং "কলই" সম্প্রদায় দুইটিকে হালামে অর্ন্তভুক্ত করিবার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ স্বল্প সংখ্যক জন সংখ্যা বিশিষ্ট ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়কে (যেমন মলছম্, কাইপেং, রাংখল, করবং, বংচের রূপীনি, কলই ইত্যাদি) সমন্বয় করিয়া বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করিবার জন্যই "বার খিল হালাম নামাকরণ করা হইয়াছে।

ধর্ম

অতীতে রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষ কোন ধর্ম বিশ্বাসী ছিল না - অর্থাৎ বৌদ্ধ হিন্দু খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্মের প্রতি বিশ্বাস বা তাহাতে দীক্ষিত নয়। তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্বাস লইয়া চলিত। পাহাড়-পর্বত বাসী জুম চাষ তাহাদের প্রধান জীবিকা। ইহাকে ঘিরিয়া সাদাসিদা জীবনযাত্রা। ঈশ্বর বা অদৃশ্য শক্তির প্রতি বিশ্বাস ও সরল সোজা। দুই ধরনের দেবতার অস্তিত্বের তাহাদের বিশ্বাস। একটি মঙ্গলময়ী ও অন্যটি অনিষ্টকারী।

'শিবরাই" বা "সুবরাই" তাহাদের "মৗতৗই কতর" অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রধান উপাস্যদেবতা। অন্যান্য উপদেবতা যথা — থুপনাইরাও, "বনিবাও", "বুড়াছা", নকসুপমা প্রভৃতি এবং বস্তু যেমন, সাল (সূর্য্য), তাল (চন্দ্র), তৗই (জল) হর (অগ্নি) প্রভৃতির পূজা করে।

এই সমস্ত পূজার ঘরের উঠানে, নদীর জলের উপর, জঙ্গলে বিরাট বৃক্ষের তলে ঘরের কোণে, নদীর কিনার বালুচরের উপর, রাস্তার তেমাথা বা চৌমাথার সংযোগস্থলে করা হয়। তাহারা মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড় ফুঁক ইত্যাদিতে বিশ্বাসী। রোগারোগ্যের জন্য মন্ত্র দ্বারা ঝাড় ফুঁক ও পূজায়

বলিদান করে। বনৌষধিও ক্ষেত্রও প্রয়োজন বিশেষ ব্যবহৃত হয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজাদের বিশেষ করিয়া বীরচন্দ্র মাণিক্যের আমল হইতে, তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু তথা বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার হইতে আরম্ভ করিলে এই সম্প্রদায়ের লোকজন ও এই ধর্মে দীক্ষিত হইতে থাকে। সাধু বৈরাগী ভেকধারী হইবার প্রবণতা প্রচুর দেখা যায় এবং বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ এই হিন্দুধর্মে সর্বাধিক সংখ্যক লোক দীক্ষিত হয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ গোঁসাইদের নিকট হইতে কর্ণমন্ত্র নিতে মহারাজা কর্তৃক বাধ্য করা হয়। বর্তমানে রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা খৃষ্টান ধর্মে ও প্রভাবিত হইতেছে। ইহা হিন্দু ধর্মীয় শোষণের কারণেই হইতেছে বলিয়া ধারণা।

কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও নাচ গান

রূপীনিরা গল্পকে "কাওতীমা" বা "কেরাং কাওতীমা" বলে। যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত " কেরাং কাওতীমা" গুলি বংশানুপরমপরায় লোকমুখে কথিত হইয়া আসিতেছে। এই গল্পগুলি কাব্যের পর্যায়ভুক্ত। বই পুস্তক লিখিত না থাকায় এই "কেরাং কাওতীমা"-র অধিকাংশ বর্তমানে বিস্মৃতির তলে তলিয়া যাইতেছে। কারণ বর্তমানের মাতা-পিতারা শিশুদের আদর যত্ন কিংবা দোলনায় ঘুম পাঁড়াইবার সময়ে ঐ সমস্ত প্রাচীন কেরাং কাওতীমা শুনাইতে পারিতেছে না বা শুনাইতেছে না। যেমনটি প্রাচীন- প্রাচীনারা তাহাদের শিশুদিগকে বলিতেন বা শুনাইতেন তাহা সত্বেও যে সকল কেরাং কাওতীমা বর্তমানেও লোকমুখে ফিরিতেছে সেইগুলির মধ্যে রহিয়াছে, যথা "জংখাংফানি কেরাং কাওতীমা ২। আচু থেংকাংসানি ৩। নাওয়ইসানি, ৪। চুবুসানি, ৫। সক্‌নারাইসানি, ৬। পেংরামসানি, ৭। মীসাসানি, ৮। রান্দি চীক্‌মানি ইত্যাদি।

রূপীনিদের গান খুবই সুন্দর এবং গানগুলি জুম ও প্রকৃতি ভিত্তিক। তাছাড়া বিভিন্নসময় ও উৎসব অনুষ্ঠানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া গান বাজনাও করা হয়। যেমন — "তাংব্রানি রীচাবমুং" অর্থাৎ জুমের সময়ের গান "ফাইলেরনি" - (এইখানে আস) পান্দানি রীচাব্‌মুং" অর্থাৎ সামাজিক অনুষ্ঠানের গান। এই সম্প্রদায়ের প্রধান গান হিসাবে চিহ্নিত দুইটি — 'মায়াগাছু ' ও 'ছাড়াগাছু' অর্থাৎ প্রেম- বিরহের গান। অতীতে এই দুই প্রকারের গান সমাজের বহুল যুবক যুবতীদের দ্বারা গীত হইত। বর্তমানে এই গানগুলির পদ প্রায় বিস্মৃতির অতল তলে। বয়স্কদের ভিতর হয়ত বা কতকজনের জানা থাকিতে পারে তাহা ও সম্পূর্ণ নহে আংশিক। "মায়া গাছু " ও "ছাড়া গাছু" এবং জুমে গাওয়া হয় এই রূপ গানের কিছুপদ পরিশিষ্টাংশে তুলিয়া ধবা হইল।

রূপীনিদের বিভিন্ন ধরনের নাচ

১। গড়িয়া মীসামুঙ"— নূতন বৎসরের সর্বপ্রথম পূজা, নৃত্য এই পূজার প্রধান অঙ্গ। ২। "তাংব্রানি মীসামুঙ" - মেয়ে পুরুষ যুবক-যুবতী মিলিয়া নৃত্য সহকারে বিশেষ কোন কাজ সম্পাদন করিবার নাচ। জুমের ধান কাটিয়া আনিবার পর 'মায়ামনক্‌অ' - অর্থাৎ ধানের গোলা ঘরে পয়দলে ধান মাড়াইবার সময়ে এই নাচ করা হয়। ৩। "পান্দানি মীসামুঙ"- কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বা আনন্দ উৎসবে "চুয়াক আরাক' - অর্থাৎ মদ্য পান করতঃ নাচ করা হয়। সাধারণতঃ এই নাচ বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারাই করিয়া থাকে। ৪। "মামিতা মীসাঙ এই নাচ জুমের ফসল ঘরে উঠিবার পর "মাইকীতাল চামীন - অর্থাৎ নবান্ন উৎসবের অঙ্গ। আনন্দ ও সুখ প্রকাশ করিবার

নাচ। বলা বাহুল্য নাচের সঙ্গে গান ও গাওয়া হয়। জুমের ভাল ফসল প্রদানকারী "মাইনকমা মীতাই" অর্থাৎ ধন সম্পদের দেবতার স্তুতি করিয়া নাচ। ৫। "বাতলমীন মীসামুঙ" এই নাচ পাড়ার যুবক যুবতীরা মিলিয়া পাড়ার প্রতিটি পরিবারের ঘবের উঠানে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত করে । প্রতিদানে গৃহস্থ যুবক-যুবতীদের চাউল, ডিম কিংবা জুমেব কুমড়া খাখ্‌লু ইত্যাদি প্রদানে বিদায় করে। এইভাবে পাড়ার সমস্ত বাড়ীতে পবিক্রমার পর সংগৃহীত চাউল, ডিম ইত্যাদি দ্বাবা যুবক যুবতীরা নির্দিষ্টকোন স্থানে গিয়া বান্না করিযা ভক্ষণ করে এবং আনন্দ স্ফূর্তি করে।

রূপীনিদেব বাদ্য বাজনার মধ্যে আছে — "খামমা" - (ঢোল) "সুমুল" - নিজস্ব প্রকাবে তৈরী বাঁশের বাঁশী, "চংপ্রেং" দুতাবার ন্যায বাদ্যযন্ত্র বাঁশেব পাতলা আববণ কবত ও তৎদ্বারা ছানি দেওয়া হয় এই যন্ত্রের নিম্ন অংশে এবং "মাইবুক'- অর্থাৎ পাঁঠা কিংবা হবিণেব নালি শুকাইয়া যন্ত্রের শিলা করা হয় ও "স্রান্দা" (সাবেঙ্গী) ও দাংদু - মধ্যে ছোট চেপ্টা লিভাব সহ বাঁকা লোহাব শলাকা।

রূপীনি বাড়ীতে অন্নপ্রাশনের ছবি

পূজা পার্বণ

এই সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, আনন্দ- উৎসব ও পার্বণ, যথা— ১। "সেনা", ২। "মাইনক্‌মা খুলুমমুঙ" (লক্ষীপূজা) ৩। "কেরমুঙ" (কেরপূজা), ৪। "হাংবান্ন" (পৌষপার্বণ।

সেনা - এই পার্বণ ত্রিপুরা সনের প্রথম মাস বৈশাখের ১লা তারিখে অনুষ্ঠিত হয় (বাংলা সনের বৈশাখের ৭ তারিখ)। গড়িয়া পূজার শেষ দিনের উৎসব। পুলিপিঠা ও নানা প্রকার ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত করত ঐদিন সকলেই নিজ নিজ গৃহে ভক্ষণ করে। আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদেবকেও

নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হয়। ছোটরা গুরুজনদিগকে ধুপ ধুনা সহকারে ভক্তি করিয়া আর্শীবাদ প্রার্থনা করে।

মাইনক্‌মা মীতাই খুলুম্‌মীন (লক্ষ্মী পূজা) জুমের ধান ঘবে তুলিবার পর প্রতিগৃহে এই পূজানুষ্ঠান করা হয়। আশ্বিন কিংবা কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে সাধারণত সন্ধ্যায় এই পূজা দেওয়া হয়। হিন্দুদের কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার তিথির সহিত একই দিনে পড়িয়া যাওয়ায় দীর্ঘদিন আগে হইতেই এই মাইনকমা পূজাকে কোজাগবী লক্ষ্মী পূজা এই ধারণা করিয়া আসা হইতেছে। অথচ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে আদৌ কোনরূপ যোগসূত্র নাই।

নূতন ধানের চাউল পূর্ণ নির্দিষ্ট ভাণ্ডকে মাইনকমাব প্রতীক করা হয়। এই পূজায় মোরগ ও শূকর বলি দেওয়া হয়। আজকাল চিড়া, কলা, বাতাসাও অন্যান্য ফলমূল দ্বারাই এই পূজার কাজ সারা হইতেছে।

" কেরমীন" (কেরপূজা) ঃ— রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া টিলা বা স্থল জায়গায় বসবাস করে। নির্দিষ্টস্থানে স্থান সংকুলান অনুযায়ী কুড়ি, চল্লিশ কিংবা আরও বেশী এমনকি একশতাধিক পরিবার বিশিষ্ট পাড়া তৈয়ারী করিয়া বসবাস করে। রূপীনিরা পাড়া বা গ্রামকে " বোম বা বোং" বলে। এইরকম প্রতিটি বোং এ বৎসরে একবার কিংবা কোন বিশেষ কারণে দুইবার কের পূজা করা হয। কার্ত্তিক কিংবা অগ্রহায়ণ মাসেই এই পূজা করিবার প্রশস্ত সময়। এইপূজা করিবার উদ্দেশ্য গ্রামকে পবিত্র করা ইহা সামাজিক ধর্মীয় আচার। " বোং- এ স্বাভাবিক মৃত্যু, দৈব্য র্দুঘটনায় মৃত্যু কিংবা অন্য যে কোন ও কারণে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে বোং অর্থাৎ গ্রাম অপবিত্র হইয়াছে বলিযা পরিগণিত হয়। এই অবস্থায় কের পূজা করিতে হয়। তাহাছাড়া কোন প্রকার রোগশোক কিংবা রোগের মহামারী রূপ যাহাতে গ্রামে না ছড়ায় বা না হয় সেই বিশ্বাসেও এই কের পূজা করিবার নিয়ম। সর্বোপরি বৎসরে অন্তত একটি বার গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সকলেই এই কের পূজার উপলক্ষে পরস্পর মিলিত হইবাব সুযোগ ঘটে। কের পূজার অঙ্গ হিসাবে পূজানুষ্ঠান ছাড়া ও বোং - এর সকলেই একত্র বসিয়া খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বলাবাহুল্য পূজা এবং খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি যাবতীয় খরচ গ্রামের প্রত্যেক পরিবার হইতে সমহারে সংগৃহীত অর্থ ও চাউল দ্বারা মিটানো হয়। এই কের পূজায় প্রধান দেবতা শিব্রাই অথবা সুবরাই অর্থাৎ মহাদেব। রূপীনিরা এই দেবতাকে মঙ্গল দায়ী সর্বশক্তিমান হিসাবে মান্য ও ভক্তি করে। আসলে কেরপূজায় "লাম্প্রা" পূজাই করিতে হয়। একজোড়া "তাওছা" অর্থাৎ বাচ্চা মোবগ দ্বারা পূজা দিতে হয়।

কের পূজার নিয়মবিধি ঃ— পূজানুষ্ঠান করিবার সময় " বোং" কে কাঁচা বাঁশের চেলি দ্বারা "মাংখং" তৈয়ার করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিবার বিভিন্ন রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় ভোর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত। ঐ সময়ে কের কবলিত গ্রামে অন্য গ্রামের কোনও লোক প্রবেশ করিতে পারে না। যদি কেহ প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহাকে এক বোতল "আরাক' অথবা একটি কলস চোয়াক দণ্ড দিতে হয়।

"হাংরায়" (পৌষ পার্বণ) ঃ— হাংরায় "আওয়ান" (পিঠা) ও অন্যান্য তিতামিঠা, ভালমন্দ খাওয়ার দিন। পৌষমাসের শেষ বা সংক্রান্তি দিনে এই উৎসব করা হয়। এই দিন কোন বিশেষ

দেবতার পূজা অনুষ্ঠানের প্রচলন নাই। হাংরায় - এর দিনে মৃত পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয় - স্বজনের পূজিয়া রাখা "অস্তি" (অস্থি) তীর্থে বিসর্জন করিতে হয়। হাংরায় - এর দিনে অস্থি বিসর্জন মানসে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিবারের লোকেরা সামর্থ্য অনুযায়ী বিসর্জনের কয়েকদিন আগে হইতেই ইচ্ছানুযায়ী তীর্থের দিকে রওনা হইয়া যায়। পিতৃপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য ও ঐদিন সামর্থ্য অনুযায়ী লোকভোজন দেওয়ার নিয়ম আছে। এই ধরনের লোকভোজন অন্য সময়ে ও করিতে পারে। তবে হাংরায় -এর দিনই সবচেয়ে ভাল এবং ফলদায়ী বলিয়া এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশ্বাস করে।

সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান ছাড়াও রূপীনিরা বিভিন্ন পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং এই ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান - "নুখুংনি সামুঙ তাংমীন্" অর্থাৎ পরিবারে সকলেই সুখে শান্তিতে থাকা ও সাংসারিক উন্নতি বাসনায় দেবতাকে তুষ্ট করিবার অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে ও "লাম্প্রা" (শ্রীসুকুন্দ্রাই শ্রীমুকুন্দ্রাই) ও "তাঁই"(গঙ্গা) পূজা করিতে হয়। প্রতিবেশী কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়।

হস্তশিল্প

বাঁশবেত ও বয়ন শিল্প — বাঁশ বেতের শিল্প কাজে রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা খুবই পারদর্শী। "উারুক্' অর্থাৎ বাঁশের বেত দ্বারা তাহারা নিজেদের সাংসারিক ব্যবহারের জন্য - "নংখায়", চেম্পায়", "তুইছেং", "দিংক্রা", "কাইম্রেং", বাইলেং", "দাইলাক',"সুরছেং", "জাংগিনী", "উরা", "জামখং", "মলুওয়া", খুল তুরুক', চাপা" " বেত্রা", "দো", চক্রা, তাওখক্' "চপ্রা", ওয়ায়েং প্রভৃতি সামগ্রী তৈয়ার করে।

নংখায় (খারা) — প্রায় সর্বক্ষণই সংসারের কাজে ব্যবহৃত হয়। জিনিষ পত্র বহন, জুম বা অন্যত্র স্থান হইতে ধান, চাউল, পাট কিংবা তরিতরকারি সংগ্রহ, বাজার করা ধানকাটা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে এই নংখায় অবশ্য প্রয়োজনীয়। "নংখায় সিখ্লা "— মিহি ও সূক্ষ্ম বেত দ্বারা তৈয়ার করা হয় - যাহা যুবক ও যুবতীরাই প্রধানতঃ ব্যবহার করে।

চেম্পাই — জুমে বা জঙ্গলে কাজে যাইবার সময় প্রয়োজনীয় জিনিয বহন করিয়া লইবার জন্য খারা জাতীয় সামগ্রী শুধু পুরুষরাই ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কম জিনিষপত্র বহনের কাজে ব্যবহার হয়। বিবাহের জন্য স্থিরীকৃত মেয়ের বাড়ীতে জামাই খাটার উদ্দেশ্যে রওনা হইবার সময় ভাবী জামাইকে অবশ্যই "চেমপাই" সঙ্গে লইতে হয়। ইহা চিক্কন ও মসৃণ বেত দ্বারা তৈরী করিতে হয়। চেমপাই - এর নীচের অংশ চেপ্টা থাকে।

দিংক্রো ঃ— অমসৃণ বড় বড় বেত দ্বারা বানানো বড় মাপের নংখায় বলা যায়। ইহা সাধারণতঃ জুমের ধান বহন করিয়া বাড়ীতে আনিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কাইম্রেং ঃ— খুবই চিক্কন বেত দ্বারা অত্যন্ত ছোট মাপের নংখায় নমুনায় বানানো হয় যাহা জুমধান্য রোপনের কাজে ব্যবহার হয়। জুম বীজ, যথা- ধান, কার্পাস, তিল, ভুট্টা, ইত্যাদির বীজভর্ত্তি কাইম্রেং মেয়ে পুরুষ যুবক যুবতী নির্বিশেষে কোমরে বাঁধিয়া জুম রোপন কাজে ব্যবহৃত হয়।

তুইছেং ঃ— ইহার নমুনা নংখায় - এর মতই। শুধুমাত্র সবুজ অংশের বাঁশ বেতকে মসৃণ

করিয়া বুননে ফাঁক ফাঁক ডিজাইনে তৈরী জল ভর্ত্তি কলস, "তাঁইলাউ" প্রভৃতি বহনে ব্যবহৃত হয়। আদিতে রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেরা পাহাড় পর্বতেই বেশ সংখ্যায় বসবাস করিত। তাই ঝরনার জল, পাহাড়ের নীচে ছড়া বা কূয়া হইতে জল তুলিয়া বহন করিয়া লইতে এই ধরনের সরঞ্জাম বিশেষ প্রয়োজন হয়।

বাইলেং ঃ— বাঁশবেতের ঠাসা বুনটে তৈরী চাউল ও ধান ঝাড়াই কাজে ব্যবহৃত হয়। "বাইলেং" - এর আকার গোলাকৃতি। বাঁশেরই একটি চাক্তি লাগাইয়া শক্ত ও মজবুত হয়।

দাইলাক ও জাম খং — অমসৃণ বড় বড় বেত দ্বারা তৈরী। দাইলাক বাইলেং এর মত বাঁশের চাকতি লাগানো গোলাকৃতি রৌদ্রে ধান শুকাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জাম খং আয়তক্ষেত্রাকার সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৫ হাত ও ৪ হাত হয়। ইহাও ধান ও অন্যান্য জিনিষ শুকাইবার কাজে ব্যবহার হয়।

খুল তুরুক ঃ— ইহা ও বেতের তৈরী। খুবই মসৃণ করিয়া বেত চাছিতে হয় এবং এক বর্গফুট ক্ষেত্রাকার তল বিশিষ্ট - উচ্চতায় ২১/২ হইতে ৩ ফুট উপরদিকে গোলাকার অর্থাৎ প্রায় নংখায় এর নমু না বিশিষ্ট। উপরে খুল তরুকের একটি ঢাকনি ও থাকে। বলাবাহুল্য এই ঢাকনিও বেতের দ্বারাই তৈরী। সংসারের প্রয়োজনে সংগ্রহ করা বিভিন্ন প্রকারের নূতন কাপড় যাহা এক্ষণে প্রয়োজন নাই এইগুলিই খুলতুরুকে-এ তুলিয়া রাখা হয়। ইদানিং খুলতুরুকের বিকল্পে কাঠের সিন্দুক এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

চাপা ঃ— ইহাও বেতের তৈরী সূক্ষ্ম কারুশিল্পের কাজ। সংসারের বিভিন্ন প্রকার জিনিষ রাখিবার জন্য ব্যবহার হয়। বাংলায় এই জিনিষটিকে ঝাঁপি বলা হয়।

মলুওয়া ঃ— বিছানার নীচে পাতিয়া নিবার জন্য আয়তক্ষেত্রকার মসৃণ বেতের তৈরী ঢাড়ী। সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাত ও প্রস্থে ৩ হাত বা ৫ হাত ও ৪ হাত মাপের হয়।

চপ্রা ঃ— ফাঁক ফাঁক বুননে বেতের চৌকোন পাত্র যাহা রান্না ঘরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ ভরিয়া রাখিবার কাজে লাগে।

সুরছেং জাংগিনী ঃ— বেতের তৈরী চালুনী জাতীয় জিনিষ। ধান সরিষা ও রাই ইত্যাদির চালুনীর জন্য এবং মাছ বা মাংস ও অন্যান্য ভিজা, কাঁচা খাদ্য দ্রব্য রৌদ্রে অথবা উনুনের উপর রাখিয়া শুকাইবার কাজে ব্যবহার হয়।

দো ও চক্রা ঃ— বাঁশ ও বাঁশবেতের তৈরী মাছ ধরিবার বা মারিবার দুই প্রকারের ফাঁদ।

তাওখক্ ঃ— বেতের তৈরী মোরগ ধরিয়া রাখিবার জন্য খাঁচা এবং অন্যান্য গৃহপালিত পক্ষী রাখিবার জন্য ও লাগে।

উরা ঃ— ধান্য বা সংসারের অন্যান্য জিনিষ আনা নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য ইহা মসৃণকৃত বেত দ্বারা তৈরী।

ওয়ায়েং ঃ— বাচ্চা দোলাইবার দোলনা। অপেক্ষাকৃত বড় বেত দ্বারা তৈরী বিভিন্ন মাপের হয়।

বেত্রা ঃ— সুচিক্কন মসৃণ বাঁশের দিয়ে শলাকা দিয়ে বেত্রা তৈরী করা হয়। আদিতে রূপীনিরা ইহা দ্বারা চুল আঁচড়ায়। বর্ত্তমানে খুব একটা দেখা দেয় না। বেত্রা বাঁধিবার কাজ তত সহজ নহে। জানা লোকের নিকট হইতে ভাল করিয়া শিখিয়া লইতে হয়। যুবকরা "চামীরাই" (জামাই উঠা)

যাওয়ার সময় অতি সুন্দর বেত্রা তাদের ভাবী স্ত্রীর জন্য অতি অবশ্যই নিতে হয়।

রূপীনি মেয়েদের ব্যবহার্য্য অলংকার

নাকের অলংকার

আদিতে রূপীনি মেয়েরা নাকে কোন কিছুই পরিত না। পরবর্তী সময়ে রুপার তৈরী (বানিয়াদের) ''বিতীন্'' (চিরতনের ন্যায় আকৃতি) বা নাফুল অনেকটা মিষ্টি কুমড়ার বীচির ন্যায় এবং কয়েকটি ছড়া যুক্ত ব্যবহার করে। রূপার তৈরী ''বাইলিক' (অর্ধচন্দ্রাকার বিশিষ্ট চেপ্টা সিকি মুদ্রার গোল সমানাকৃতি অলংকার) ও মেয়েরা নাকে পরে।

কানের অলংকার ঃ— ''ওয়াথং'' বা ''ওয়াখম্'' - ''ওয়ামিলিক' (রুফাই বাঁশ) বাঁশের ছোট টুকরা আধা ইঞ্চি পরিমাণ ব্যস যুক্ত, লম্বায় প্রায় ইঞ্চি, উপরের সবুজ অংশ চাছিয়া ফেলিয়া খুবই মসৃণ করা হয় এবং ''খুনচুবাক' (কানের নিম্ন অংশ) ছিদ্র করিয়া পরে। পরবর্তী সময়ে বানিয়াদের তৈরী রূপার ''ওয়াখম'' (কান পাশা) পরিতে আরম্ভ করে। কানের উপরের অংশে প্রথমে অপেক্ষাকৃত ছোট ''ওয়াথ্রাং'' পরিত এবং পরে তাহাও পরিত্যক্ত হয়। ইহার স্থলে বানিয়াদের তৈরী অবশ্য রূপীনিদের নিদের্শিত ডিজাইন অনুযায়ী অলংকার পরিতে আরম্ভ করে। এই অলংকার কে রূপীনিরা ''তইয়্যা'' বলে। রূপীনির মেয়েরা ''বরজুং বাঁথাই'' অর্থাৎ বরজুং নামক গাছের ফল কানে ঝুলাইয়া অলংকার হিসাবে পরিত । পরবর্তী সময়ে ঐ রূপ বরজুং ফলের মত করিয়া রূপার টাকা ভাঙ্গিয়া বানিয়া দ্বারা গড়াইয়া নেয়। যাহা ঝুমকা পাশা নামে পরিচিত।

গলায় পরিবার অলংকার — লাইরপ্কীচাক '' ''লাইরপ কুফুত' (রাম্ভা কলা গাছ) গাছের ফলের বীচিকে সিদ্ধ করিয়া ভিতরের শাঁস ফেলিয়া দিয়া সূতা দ্বারা গাঁথিয়া গলায় পরে। ইহাকে ''চাংকে বাঁচালাই'' -এর মালা বলে। আকৃতিতে খুবই ছোট ছোট বেল মালার ন্যায়, রং কাল, দেখিতে খুব সুন্দর। পরবর্তী সময়ে রঙ্গীন পাথরের মালাছড়া, রূপার টাকা, আধুলি ও সিকির ছড়া বানিয়াদের তৈরী, পরিতে আরম্ভ করে। ইহা ছাড়া ''রাংনি সেচা'' (রূপার তৈরী) ও পরে।

হাতের অলংকার

রূপীনি মেয়েরা আদিকালে বাঁশ বেতের নিজেদের হাতে তৈরী ''ওয়ারুকনি মাথিয়া'' হাতের কব্জিতে অলংকার হিসাবে পরিত। পরবর্তী সময় বাজার হইতে ''রাংনি মাথিয়া'' (রূপার চুড়ি) এবং বর্তমানে বাজারে চল সমস্ত প্রকার চুড়ি (মাথিয়া) ক্রয় করিয়া পরে।

আঙ্গুলে পরিহিত অলংকার

পূর্বে বাঁশ বেতের তৈরী ''ওয়ারুকনি জাসতাম (আঙ্গুরীয়) পরিবার চল আছে। পরে বাজার হইতে বিভিন্ন প্রকার ধাতুর নির্মিত অঙ্গুরীয় কিনিয়া বা বানিয়া দ্বারা গড়াইয়া পরিতে আরম্ভ করে।

পায়ের গহনা

পায়ে পরিবার জন্য নিজেদের তৈরী কোন গহনা প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা জানা যায় না। পিতল বা রূপার তৈরী ''খারু'' নামের অলংকার পরিতে দেখা যায়। বর্তমানে ইহার চল উঠিয়া গিয়াছে।

খোপার অলংকার

বাঁশের তৈরী "ছুরাং" মেয়েরা খোপায় পরে। পুরুবাঁশের শলাকা তিন কিংবা চার আঙ্গুল পরিমাণ লম্বা, আধা ইঞ্চি পাশ বিশিষ্ট এক মাথায় চেপ্টা বা গোল রাখিয়া অন্য দিকে ক্রমশঃ ছোট করিয়া খুব মসৃণ করিয়া চাঁছা হয়, প্রান্তটি সূচাগ্র ন্যায়। পরে চিকন লোহার শলাকা যেমন ছাতির শিক, ইত্যাদি বাঁকাইয়া খোপার কাঁটা তৈয়ার করিয়া পরিতে আরম্ভ করে, ইহাকে "ছুরিৎ" বলে।

রূপীনি মেয়েদের কতক পছন্দের ফুল (বাড়ীর উঠানের ও জুমের)

রূপীনি সম্প্রদায়ের মেয়েরা বিশেষ করিয়া যুবতী ও দুই এক সন্তানের মায়েরা মাথায় চুলের খোপা ভর্তি করিয়া ফুল পরিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ফুল দিয়া নিজেকে সাজগোছ করিতে খুবই পারঙ্গম। তাই রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকেদের প্রায় প্রতিটি বাড়ীর উঠানে ও জুমে বিভিন্ন প্রকারের ফুল লাগানো হয়।

বাড়ীর উঠানে বা সীমানার ভিতরে লাগানো হয় এইরকম কয়েক প্রকারের ফুল

১। খুম ফাঁই - দোলন চাঁপা
২। কেনদ্রাজী - গন্ধরাজ
৩। খুম লাইরু -
৪। খুম তাওজের -
৫। খুম সারাই
৬। খুম আতর -
৭। কেওয়া -
৮। কুসুমফুল -
৯। ওরিবার - জবা
১০। দুক্করবী - লতা করবী
১১। মাছেং তুম্পা

জুমে লাগানো ফুল

১। খুমচার - এইফুল দিনের শেষে পড়ন্ত বেলায় ফোটে। এই ফুল ফুটিলে জুমের কাজে ক্ষান্ত দেওয়া হয়।
২। খুমচাক -
৩। সনারাই - গাঁদা ফুল
৪। খুম থুব বেগুনী রং 'তব'আকারের
৫। খুনথুর - ইহার পাতার রসে হাত লাল রং করে যুবক-যুবতী-রা।
৬। খুমমাই কাই - এই ফুল ফুটিলে জুমে খুম মাইকেক ধান রোপন আরম্ভ হয়।

রূপীনিদের প্রিয় বনফল

১। খাইচাং - ডুমুর ফল জাতীয় কাণ্ড হইতে শিকড় বাহির হইয়া ঐ শিকড়ে ফল ধরে।
২। তাওখাইচাং - ঐ ছোট

কতক পছন্দের বনফল

১। আজাংকি - সাদা রং, অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত ছড়া করিয়া ফোটে- আকার ছোট ছোট।
২। খুমখেরাং- ধুতরা ফুলের আকার কিন্তু ছোট, রং হরিদ্রাভ লালসিরা যুক্ত লম্বা লম্বা ছড়া যেন প্রকৃতি নিজেই

৩। ঈশাম বায় - গুচ্ছ আকারে ফল,
ফলের আকৃতি গোল পাকিলে সিয়া রং
হয়।
৪। থাইফ্লুত - চালিতা
৫। থাইবায় লতা জাতীয় মিষ্টি কুমুড়
আকৃতি ফল। পাকিলে বিচির
ভিতরের শাঁস অত্যন্ত সুস্বাদু মাখন /
তৈলাক্ত জাতীয়।
৬। ব্রাম্থাই - চামল গাছের ফল, কাঁঠালের
মত কোষ থাকে।
৭। থাইসোয়াল - লতানে গাছ ফল
জুমের খাখু আকৃতি, রং কাঁচা অবস্থায়
সবুজ, পাকিলে লালচে হলুদ। ফলের
ভিতরের কোয়া বীচিশুদ্ধ গলাধঃকরণ
করা যায়।
৮। থাইব্রেম - গাছ বেশ বড় (বড় বৃক্ষ জাতীয়)
ফল ছোট ছোট, গোলাকৃতি, স্বাদ টক।
পাকিলে কিছুটা মিষ্টি হয়।
৯। কররক্থাই - অনেকটা ঈশামবাই ফলের মত
চামড়া অত্যন্ত পাতলা
১০। ডেমফল
১১। ওয়াই কেক্
১২। গাও
১৩। থাইমল
১৪। জংঅৎপ্রভৃতি
"কাওফিল"

ফুলের মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছে।
৩। মারুন দাঁই - মাধবী লতা, অত্যন্ত
সুঘ্রাণ।
৪। সামফারাঁই - চাঁপা - অত্যন্ত সুঘ্রাণ
৫। বলংখুংগ্রী - কেয়া ফুলের ন্যায়
বলা যায় জঙ্গল কেয়া ফুল।
৬। বল খুম বাইকাং
৭। খুম তাওসা -
৮। লেওয়াং -

জন্ম ঃ আচার - অনুষ্ঠান

রূপীনি সমাজে সন্তানের জন্ম সময়ে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্প্রদায়ের বিবাহিত স্ত্রীলোক সন্তান সম্ভবা হওয়ার আট মাস পূর্ণ হইলে গৃহকর্তা কর্তৃক একটি পূজানুষ্ঠান করিতে হয়। পূজানুষ্ঠানের নাম "উছাং কিবাঁই"। "উছাং কিবাঁই"পূজায় এই দেবতারা স্থান পায়, যথা — "মহাদেব", "মহাদেবী", "মীতাই কাহাম". লাম্প্রা (সুকুনব্রাই-মুকুন্ব্রাই) "তাঁই", সাংগ্রং", 'বনিরাও" (কররাই-কারারাই), "থুপনাইরাও" (শ্রীযমদু - শ্রী দুদু), "বুড়াছা" ও নক্সুপমা"।

বলাবাহুল্য, পূজা "অচাই" - এর মাধ্যমে করিতে হয়। প্রসব বেদনা উত্থিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে

আর ও একটি পূজা অনুষ্ঠান করিতে হয়। পূজার নাম "মাইজারী কারমীন্"। প্রসূতি যাহাতে নিরাপদে প্রসব করিতে পারে ইহার জন্যই এই পূজা। এই পূজা ঘরের উঠানে করিতে হয়। এছাড়া "তৗই" অর্থাৎ গঙ্গা পূজা দিতে হয়। বুড়াসা পূজা ও করিতে হয়। সমস্ত পূজাই "তাওসা" অর্থাৎ বাচ্চা মোরগের দ্বারা দিতে হয়। বর্তমানে কলা বাতাসা দ্বারা পূজা অনুষ্ঠান করিবার ও প্রচলন ঘটিয়াছে।

সন্তান প্রসব হওয়ার পর সাতদিনের দিনে আর একটি পূজা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে সন্তানের নাভি ও খসিয়া পড়ে। "লম্প্রা", তৗই" ও "সাংগ্রং" পূজা একসঙ্গে দিতে হয়। পূজার সামগ্রী মোরগ পূজানুষ্ঠানের দিনে সামাজিক রীতি ও আচার অনুযায়ী পাড়া-পড়শীদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে হয়। সন্তানের মাতা উপস্থিত বয়স্ক সকলকে মাথায় এবং শরীরে তৈল মাখিয়া দেয় এবং সন্তানের জন্য আর্শীবাদ প্রার্থনা করে। নিমন্ত্রিতদের তিন কলস "চোয়াক' ও দুই বোতল "আরাক" পান করিতে হয়। নিমন্ত্রিত বয়স্করা নবজাত সন্তানকে মাথায় "মাই খুল" অর্থাৎ ধান -তুলা দিয়া আর্শীবাদ্ দান করে। কেহ কেহ্ আর্শীবাদের চিহ্ন হিসাবে সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বা ২টাকা প্রদান করে। অনুষ্ঠানে নবজাতক বা জাতিকার নামকরণ করা হয়। নাম করণের রীতি - তিন, পাঁচ বা সাতটি প্রদীপ প্রস্তুত করা হয়। প্রদীপ "লাইফাং বেলুয়া" অর্থাৎ কলাগাছের খোল, দ্বারা তৈয়ারী হয়। প্রদীপে সমপরিমাণ তিলের তৈল ও সমলম্বা কার্পাস সূতার সলিতা দিয়া প্রতিটি প্রদীপের নাম দেওয়ার পর একই সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। একটি প্রদীপের জন্য একজন ব্যক্তিকে নাম প্রদান করিতে হয়। যে নামের প্রদীপ সকলের শেষে প্রজ্জ্বলিত থাকিবে সেই নামেই জাতক বা জাতিকার নাম রাখা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে "আবুর সুমীন্" অর্থাৎ শুদ্ধ করন বলা হয়।

রূপীনি সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠান

বিবাহউপযুক্ত ছেলের মাতাপিতা মেয়ের বাড়িতে তাহার মাতা-পিতার সহিত এক বোতল মদ সহকারে বিবাহের জন্য প্রথম কথাবার্তা করিতে হয়। বলাবাহুল্য কথাবার্তার সংযোগ স্থাপক একজন ঘটক নিযুক্ত হয়। ঘটককে "রাইবা" বলা হয়। ছেলের বা মেয়ের পছন্দ - অপছন্দের কোন প্রশ্ন থাকে না। উভয়পক্ষের পিতা-মাতারা পছন্দ করিয়া বিবাহ দিতে রাজি হইলে হইল। এই অনুষ্ঠানকে "সানকুছু" বলা হয়। ইহার পর "সানকতর" অনুষ্ঠান প্রয়োজন ও সুবিধা সময়ে কবিতে হয়।

এই "সানকতর অনুষ্ঠানে পাড়ার ও সমাজের গণ্যমান্য ও বয়স্ক ব্যক্তিগণ এবং আত্মীয়স্বজন নিমন্ত্রিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছেলে এবং মেয়ের উভয় পক্ষই প্রত্যেকে দুই বোতল "আরাক' এবং একটি মোরগ দিতে হয়। এই অনুষ্ঠানেই ছেলে, মেয়ের বাড়ীতে "চামীরাঁই কান্' অর্থাৎ জামাই খাটিবার জন্য আরম্ভের দিনক্ষণ স্থির হয়। সাধারণতঃ বৈশাখ মাসের "সেনা" পরবে ছেলে, মেয়ের বাড়ীতে জামাই খাটিবার জন্য যাত্রা করে। মেয়ের বাড়ীতে ছেলের এই যাত্রা বা পাঠানোকে "চামীরাঁই থাংমীন্ বা "তুনমীন্" বলে। ছেলের সমবয়স্করা "সুমুল", স্রান্দা, সহ গান করিয়া ছেলেকে মেয়ের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিয়া আসে।

এই রূপ জামাই খাটিবার জন্য যাইবার আগে " সানকতর" অনুষ্ঠানের পর ছেলেকে মেয়ের

বাড়ীতে গিয়া বেশ কয়েক মাস, অন্ততঃ তিন হইতে ছয় মাস কোন কোন ক্ষেত্রে এক বৎসর ও হইয়া যায়, "তাংছন - তাইছন " অর্থাৎ কাজকর্ম করিতে হয়। উদ্দেশ্য, বিবাহের আগে ছেলে মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাইবার জন্য এই ব্যবস্থা। ঐ সময় ছেলে মেয়ের সঙ্গে এক ঘরে বা এক বিছানায় থাকিতে পারে না। একই বিছানায় না থাকিয়া একে অন্যের প্রতি ভাব আকর্ষণ উদ্রেক করাইবার পদ্ধতি। যদি দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে হবু শ্বশুর - শাশুড়ী কিংবা মেয়ে-ছেলের কাজ কর্মের প্রতি অপছন্দ জাগিয়াছে তখন সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ছেলের আর এখানে জামাই উঠা হয় না। তবে এইরূপ ঘটনা খুবই বিরল। ইহাকে রূপীনিরা "চামীরাই অম্পা কামীন্" - বলে।

আধুনিক প্রথায় রূপীনি বিবাহ

সাধারণতঃ মেয়ের বাড়ীতে ছেলের জামাই খাটার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর - তাহার কম বা বেশি নহে। অবশ্য মেয়ের মাতা-পিতা ইচ্ছা করিলে ৫ বছরের কম সময় ও জামাই খাটাইতে পারে। ইহা স্থির হয় তখন যখন ছেলের জামাই উঠার তিনবছর পূর্ন হইবার পর ছেলের মাতা-পিতা এক কলস "তাইহুক" (পাচ্ছুয়া) ও একবোতল "আরাক" সহ মেয়ের বাড়ীতে গিয়া মেয়ের মা-বাবার সহিত পান আহার করিতে হয়। এই পান - আহার করিবার ব্যাপারকে "বছরজরানি কাও সাংমীন্" বলা হয়। ঐ সময়েই স্থিব হয় পুরা ৫ বছর খাটিবে না কম হইবে। যদি এই রূপ স্থির হয় যে ছেলে পাঁচ বছরই জামাই মেয়ের বাড়ীতে খাটিবে, তখন মেয়ের মা-বাবা মেয়ে - জামাইকে আলাদাভাবে ধান কার্পাসের জুম করিতে দিতে হয়। ইহাকে "চরাই খীলাইমীন" বলা হয়। জামাই শ্বশুরের সংসারে থাকিয়াও আলাদাভাবে করা জুমের উৎপাদিত ধান কার্পাস বিক্রয়ের

টাকা জমাইয়া তুলিয়া রাখিবে ভবিষ্যতের জন্য যখন তাহারা স্বামী - স্ত্রীতে একটি নূতন ভিন্ন সংসার পাতিবে।

পাঁচ বৎসর কিংবা তিন বৎসর জামাই খাটিবার পর ছেলে তাহার স্ত্রীকে লইয়া নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার দিনে ছেলেকে একটি অনুষ্ঠান করিতে হয়। অনুষ্ঠানের নাম "সান্‌দায় নক্ কার্মান্"। স্ত্রীর ভ্রাতার সম্মানার্থে এইরূপ অনুষ্ঠান। কারণ ফিরিয়া যাইবার দিনে স্ত্রীর যে কোন এক ভাই, বড় কিংবা ছোট তাহাদের সঙ্গে অবশ্যই যাইতে হয়। ইহাতে ১টি শূকর, ১টি "তাঁইছুক" (পাচ্ছুয়া) ও ১ বোতল "আরাক" (মদ) এর প্রয়োজন হয়। মেয়ের কোন ভাই না থাকিলে এই ধরনের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। পরে ছেলের মাতা-পিতা মেয়ের এইরূপ অর্থ প্রদান ছেলের বাড়ীতে ফিরিয়া আসার ১ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময় করিলে ও চলে। টাকার সঙ্গে ১টি "ঈত্রাক্" (হাতে তৈরী গায়ের চাদর), ১টি শূকর, ১ বোতল আরাক ও এক কলস চোয়াক ও দিতে হয়।

ছেলে, মেয়ের বাড়ীতে জামাই খাটিবার জন্য যাইবার পর বিবাহের অনুষ্ঠান হয়। বিবাহের দিনে বর-কন্যাকে ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি নূতন "ঈত্রাক" বা "বীবকি" (গায়ের চাদর বা বিছানা চাদর) বিছাইয়া বসাইতে হয়। "অচাই" অর্থাৎ পুরোহিত দ্বারা "লাম্প্রা", "তাঁই" এবং "সাংগ্রাং" পূজা করিতে হয়। পূজা শেষ হইবার পর প্রথমে "অচাই" চুফং - এ রক্ষিত দেবতার আর্শীবাদের পবিত্র জল বর -কন্যার মাথায় প্রদান করে। পূজায় নিবেদিত ফুল ও উভয়ের কানে গুজিয়া দেওয়া হয়।

"অচাই" — এর পর ছেলে এবং মেয়ের মাতা পিতাগন, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের মান্য গণ্য ব্যক্তিগণ বর-কন্যাকে মাথায় অবিচ্ছিন্ন ধারা রাখিয়া তিনবার একের পর এক পালাক্রমে পূর্বোক্ত "চুফং" - এ রক্ষিত পূত জল প্রদান করে। "চুফং" দুইটি বাঁশের চোঙ্গা একত্র করিয়া বাঁধা। "অচাই" পূজা করিবার সময়ে দেবতার উদ্দেশে জল প্রদান করিবার জন্য ইহা তৈয়ার করিয়া লয়। বাঁশের চোঙ্গার নীল অংশে ডোরা কাটা করিতে হয়।

উপরোক্ত অনুষ্ঠানের পর খাওয়া দাওয়ার পালা। এই সময় বর ও কন্যার প্রত্যেক তরফ হইতেই "আরাক" (মদ) ৪ বোতল তিনটি চোয়াকৃতীক - একটি বড় ও ২টি ছোট কলসের পাচ্ছুয়া দিতে হয় অনুষ্ঠানের উপস্থিত গণ্য মান্য ব্যক্তিদের জন্য। খাওয়া দাওয়ার পর "অচাই" ও সমাজের পাত্র ব্যক্তি গণ মেয়ে-পুরুষ উভয়ই "খাম্মা" (ঢোলক) ও "সুমুল" (নিজেদের কায়দায় বানানো বাঁশের বাঁশী) বাজাইয়া নাচ শুরু করে এবং আনন্দ ফূর্তি করে। নাচের জন্য বর কন্যা উভয় পক্ষই এক বোতল "আরাক" ও একটি ছোট কলসের "চোয়াক" দিতে হয়।

পারলৌকিক বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্ম

রূপীনি সম্প্রদায়ের লোকের মৃত্যু ঘটিলে পর সঙ্গে সঙ্গে আত্মাবিহীন "কাঁথাইমাং" - কে (মৃতদেহ) স্নান করানো হয়। ইহাতে বিশ্বাস, দেহকে গঙ্গাজলে পূত-পবিত্র করা। পরে নূতন কাপড় পরাইয়া বাড়ীর উঠানে উত্তর দিকে মাথা স্থাপন করতঃ শোয়াইয়া রাখা হয়। মানুষের জীবিতাবস্থায় পূর্ব ও দক্ষিণ শিয়রে শয়ন করিবার নিয়ম বলিয়া এই সম্প্রদায়ের লোকেদের বিশ্বাস। দূরের আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়ার পর সকলে উপস্থিত হইয়া শেষ দেখা হইয়া গেলে

গ্রামের নিকটবর্তী কোন ও ছড়া বা নদীর কিনারে নির্দিষ্ট শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয় এবং দাহ্ করা হয়। মৃতদেহ বহন করিবার জন্য বাঁশ দ্বারা "তরায়" তৈয়ারী করা হয়।

বাড়ীর উঠানে শোয়ানো অবস্থায় মৃতের পায়ের নিম্ন দিকে কিছুদুরে একটি শুকর মারিয়া মৃত ব্যক্তিকে ভাত দেওয়ার নিয়ম। উক্ত শুকর মারাকে "নুকনা তক্থারী" বলে। মৃতদেহ দাহ কালে কতক্ষণ পর পর মাটি পিতল কিংবা কাঁসার ঘটি দ্বারা জ্বলন্ত চিতায় প্রতিবারে তিনবার করিয়া জল ঢালিতে হয়। ঢালিবার সময়ে মন্ত্রের ন্যায় কতকগুলি কথা বলিতে বা উচ্চারন করিতে হয় —

যেমন — "ব্রহ্মা তৌইঝারি তাও-অঐ থাং-আনি তৌই কাংখীনা নীংদি" হাফং থাইসিনি কাসাই থাং আনি - তৌইবু বুসিনি তাও অঐ থাং আনি খা- রান্খীনা তৌই নীংঔই থাংদি"— অর্থাৎ ব্রহ্মাকুণ্ড রাস্তা অতিক্রম, বিশাল সাতটি পর্বত আরোহন করিয়া সাত সাতটি সুদীর্ঘ নদী হাঁটিয়া অতিক্রম করিবার সময় নিশ্চয়ই অতিতৃষ্ণা পাইয়াছে, জলপান করতঃ আত্মা শীতল করিয়া চলিয়া যাও।"

মৃত ব্যক্তির দেহের গতি সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের লোকদের বিশ্বাস মানুষ যেভাবে শূকর মোরগ, পাঠা প্রভৃতি নিধন করিয়া ভক্ষণ করে তেমনি মৌতাই অর্থাৎ দেবতারা ও মানুষকে মারিয়া মৃতদেহকে তাদের ভোগে লাগায়। আর দুই প্রকারের দেবতা আছে বলিয়া ধারণ করে। একটি নিপীড়নকারী এবং অন্যটি শুভানুধ্যায়ী। অশুভ দেবতার কোপে মানুষের মৃত্যু ঘটে - সঙ্গে সঙ্গে শুভ দেবতা মৃত ব্যক্তির ফলা অর্থাৎ আত্মাকে লইয়া চলিয়া যায় পরলোকে সৃষ্টিস্থানে।

সাতটি বৃহত্তম পর্বত ও সুদীর্ঘতম সাতটি নদী অতিক্রম করিয়া সর্বশেষে "লারিমা"-র পর্বতে গিয়া উপস্থিত হয় এই শুভ দেবতা আত্মাকে সঙ্গে করিয়া। সেখানে পর্বতের চূড়ায় সাতটি দরজা বিশিষ্ট সর্বসুখ শান্তি বিরাজিত মৃদু শীতল কোমল বায়ু সতত স্পর্শিত একটি সুরম্য গৃহ বিদ্যমান। ভিতরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাতা "লারিমা" বুকে অফুরন্ত স্নেহ ও মায়া সহকারে আগ্রহে বসিয়া আছেন দেদীপ্যমান আসনে। আত্মাকে কোলে তুলিয়া "আবুকতৌই" অর্থাৎ স্তন্য পান করান ও "লারি মাই প্লাও" খাওয়াইয়া দেন এবং পরে "তৌলাউ তৌই কীচাং" অর্থাৎ জুমে উৎপাদিত লাউ - (জল রাখিবার পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত) এ রক্ষিত শীতল জল ও পান করান। যে ঐশ্বরিক দুধ, ভাত ও জল গ্রহণের পর মানুষ সংসারের যাবতীয় জিনিষ ভুলিয়া যায়—ভুলিয়া যায় সংসারের স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজন, ঘর - দরজা ও বিষয় সম্পত্তির কথা। মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তি লাভ করে। মর্ত্যলোকে পূর্ব অবস্থান কালের কর্মফল অনুযায়ী পৃথিবীতে আবার নূতন মাতা-পিতার গৃহে ধনী কিংবা গরীব ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে লারি মাতার প্রদত্ত "তালিখা" অর্থাৎ ভাগ্য অনুযায়ী। স্বর্গ কিংবা নরকের ধারণা তাহাদের মধ্যে নাই।

মৃত ব্যক্তির সৎকার করিবার পর শ্মশানে গিয়া যাহারাই মৃতদেহে আগুন দিয়াছে তাহারা সকলে মৃত ব্যক্তির বাড়ীর উঠানে আসিয়া জড় হয়। উঠানে তখন প্রজ্বলিত করিয়া রাখা আগুন সকলকে স্পর্শ করিতে হয়। তারপর পূর্বে তৈয়ার করিয়া রাখা চাউলের গুড়ার জল তুলসী পাতা দ্বারা যে কোন একজন (যে শ্মশানে যায় নাই) শ্মশানের ফেরত লোকগুলির মাথায় ছিটাইয়া দেয়। বিশ্বাস এইভাবে অশুচি মুক্ত হয়। শ্মশান ফেরত লোকগুলিকে অবশ্যই নদীতে স্নান করিয়া

ফিরিতে হয়।

"হর বীথাত্মীন" (আগুন নিভানোর) আচার

কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর নিকট আত্মীয় স্বজন শোকে মুহ্যমান হইয়া কান্নাকাটি করিবার সময়ে বিহ্বলতায় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের কুদৃষ্টি বা তোন যাদুর কারণে এই মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া অনিচ্ছা কৃত উচ্চারিত হইয়াও থাকিতে পারে। এইরূপ কোন কিছু হইলে মৃতের সৎকারের পর তাহার ঘরের উঠানে পাড়ার মান্যগণ্য ও সমাজের "লক' - র দুইএকজন সদস্যের উপস্থিতিতে পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য ঝগড়াঝাটি এড়াইবার জন্য নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ নিষ্পত্তিকরণ কে "হরবীথাত্মীন" বলা হয়। এই "হর বীথাত্মীন" অনুষ্ঠানে "অচাই" কে কয়েকটি কথা বলিতে হয়। যেমন "ফনা থাঁইমীনি বাগ আঁই খরকসানী হাময়া - চায়্যা হীনাই কাপ্ চাক্মীনদীয় তং, হীন্চাকমীনদীয় তং? উপস্থিত অপর সকলে বলিবে "কীরাই- কীরাই"। অচাই আবাব তখন বলিবে — আসীক্ হীন্খঅয় তিনিহীন্ ক্ষর তাঁই আঁংগাইবী রান্খা, হরক্ষাংগাইবী থাইখা। অর্থাৎ কান্না কাটির সময়ে কাহারও গাল মন্দ করিলেও তাহা অনিচ্ছাকৃত, ইহাতে কাহারো মনে কিছু নেওয়ার নেই। অত্র ব্যাপারে আজ এখানেই শেষ করা হইল। এই অনুষ্ঠানের জন্য মৃত ব্যক্তির ঘরের লোক উপস্থিত শ্মশান যাত্রী ও পাড়ার লোককে দুই বোতল "আরাক' প্রদান করিতে হয়।

মানুষের মৃত্যুর পর "হরসিনি" অর্থাৎ সাত রাত্রি অতিবাহিত হইলে আটদিনের দিনে আত্মার শান্তির জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে এবং পাড়ার লোকজনকে উপস্থিত হইবার জন্য খবর দেওয়া হয়। তাহাছাড়া নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক পদাধিকারী ব্যক্তিগণ ও (যথা রায় কামচ্কাও, কারিম প্রভৃতি) অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয় ও উপস্থিত থাকেন।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিয়ম কানুন— শ্রাদ্ধের দিনে ভোরে মৃত ব্যক্তির শ্মশানে আত্মীয় স্বজনরা গিয়া "হাংকার" অর্থাৎ দাহাবশেষ ভস্ম কুড়াইয়া "নংখাই"— এ অর্থাৎ খারা কিংবা ঝুড়িতে বহন করিয়া নিকবর্তী নদীতে ফেলিয়া দেয়।"হাংকার" কুড়াইবার সময় ২ বা তিন খণ্ড কপালের "অস্তি" বা অস্থি" - তুলিয়া বাঁশের কৌটায় পুরিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ "অস্তি" - কৌটা ঘরের চালে কিংবা উঠানে তুলসী গাছের ধারে পুঁতিয়া একটুরো নূতন কাপড় দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হয়। এই অবস্থায় শ্রাদ্ধেব দিন পর্যন্ত রাখা হয়। শ্রাদ্ধের সময়ে সেই অস্থিকে গঙ্গার জলে ধোয়াইয়া একটি পিঁড়িতে নূতন কাপড়ের আসন পাতিয়া দিয়া ইহার উপর রাখা হয়। "অস্তি" কে ফুল ও ফুলের মালা দেওয়া হয়। দক্ষিণ কিংবা পূর্ব মুখো করিয়া উক্ত পিড়ির আসন পাতিতে হয়। তারপর সমস্ত আত্মীয় স্বজনের দেওয়া খাদ্য সামগ্রী রান্না করা ভাত বিভিন্ন তরকারী, পিঠা, "চাখাই" অর্থাৎ ক্ষারযোগে রান্না করা তরকারি এবং অন্যান্য ফল মূল থালা বা কলা পাতায় করিয়া ভোগের জন্য মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে দেওয়া হয়। মৃতের প্রতি ভাত বা খাদ্য দেওয়ার সময়ে নিকট আত্মীয়-স্বজনরা কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। জ্ঞাতব্য যে 'অস্তির' উপস্থিতিতে ভাত দেওয়ার সময়ে মৃত ব্যক্তির জন্য মাথার পাগড়ী তৈয়ারী করিয়া পিঁড়িতে রাখিবার নিয়ম নাই। কিন্তু অস্থি বিসর্জন দেওয়ার পর বৎসরান্তে মৃত ব্যক্তির ভাত দেওয়ার সময়ে পবিত্র কাপড় দ্বারা পাগরী

তৈয়ার করিয়া ফুলের মালা পরানো অবস্থায় পিঁড়ির উপর স্থাপন করিতে হয়। মৃত ব্যক্তির "অস্থি" ডুম্বুর কিংবা অন্যান্য তীর্থে বিসর্জন করিবার নিয়ম। তীর্থক্ষেত্রে "অচাই" দ্বারা পূজা করিয়া মৃত ব্যক্তির অস্থি বিসর্জন করিতে হয়। হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ দ্বারা তীর্থ ক্ষেত্রে "অস্তি" বিসর্জন দেওয়ার প্রথা চালু হয়।

সামাজিক বিচার ব্যবস্থা

রূপীনি সমাজে নানা প্রকার অপরাধ দমনের জন্য নিজস্ব বিচার ব্যবস্থা আছে। কোন নির্দিষ্ট দফায় সামাজিক বিচারকমন্ডলিতে বড় হইতে ক্রমান্বয়ে ছোট পদাধিকারীগণ কোনও বিশেষ 'দিয়ান্' - এ (মিটিং-এ) দফায় বয়স্ক লোকগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে "খুমতাং" (ফুলের মালা) প্রদান করা হয়। "খুমতাং" কানে পরাইয়া দিতে হয়। এই খুমতাং ধারী ব্যক্তিগণই সমাজে বিচার কার্য পরিচালনা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই খুমতাং ধারী বিচারক মন্ডলীকে এক কথায় "লক" বলা হয়। খুম্‌তাং ধারীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হইলেন "রায়"। আদিতে "কামচ্‌কাও" সর্বেসর্বা। পদাধিকারীগণ সর্ব নিম্ন পদ হইতে নির্বাচিত হইয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হয়।

নির্বাচিত হইবার পর কোন ব্যক্তি প্রাপ্ত পদাধিকারে থাকিয়া পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বিচার কার্যে অংশগ্রহণ করিতে পারেন। রূপীনিদের মধ্যে এই বিচার ব্যবস্থায় প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়ে পুরুষ সংক্রান্ত ব্যাপারে বিচার সংঘটিত হয়। কারণ অন্যান্য সামাজিক অপরাধ, যেমন — চুরি, ডাকাতি, খুন ইত্যাদির ব্যাপারে কোন বিচার সাধারণতঃ করিতে হয় না। ঐ সমস্ত অপরাধ তখন সমাজে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ধর্মাধর্ম ভাবে প্রগাঢ় বোধ, সত্যনিষ্ঠআচরণ, একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসা, সরল জীবন যাপন, জীবিকা নির্বাহে সবকিছুর প্রাচুর্য ইত্যাদিই বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ।

"লক বা বিচারকমন্ডলীর কাঠামো ও পদগুলি নিম্নরূপ

"দিয়ান্ - এ "লক" এ-র সদস্যদের আসনগ্রহণে নিয়ম কানুন ঃ

"দিয়ান্" খুমতাং ধারী যে কোন ব্যক্তির বাস ভবনে করিতে হয়।

প্রথমে "রায়" মিটিং স্থানে আসন গ্রহণ করে। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অর্ধ বৃত্তাকারভাবে অন্যান্য সদস্যরা আসন গ্রহণ করে। "রায়" এর ডানদিকে গৃহের মালিক তথা একজন খুম্ তাং ধারী বসিতে হয়। তাহারও ডানদিকে সংশ্লিষ্ট দফার সর্দার গণ একে একে ক্রমান্বয়ে বসে।

রায় - এর বাম দিকে ক্রমান্বয়ে কারিম, কামচ, কাবুর বসিতে হয়। কাবুর-এর পর "পাতীর" বসে। পাড়ার বা গ্রামের বয়স্ক মান্যগণ্য ব্যক্তি "পাতীর" নির্বাচিত হয়। নির্বাচন করেন "লক"। পাতীর - এর বাম দিকে চাপিয়া কতর, তারপর চাপিয়া কুছু, ইহার পর "জাক্‌সুঙ" এবং সর্বশেষে "খু-সুঙ" বসে। খুমতাং ধারী গণের মধ্যে "ছেংজা" (ক্রাক্ ও কুছু) এবং "খানদল" দিয়ান - এ বিচারক মন্ডলীর সহিত এক সঙ্গে আসনগ্রহণ করিতে পারে না। তাহারা সভাগৃহে "দিয়ান"- এ উপস্থিত অন্যান্যদের সহিত বসিতে হয়। শ্রোতা বা দর্শকদের আলাদাভাবে বসিবার নিয়ম।

মিটিং -এর সময় রায় প্রয়োজন বোধে "চাপিয়া কুছুও "খুসুঙ" কে মিটিং সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজ করিবার জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং সেই আদেশ তাহারা মানিতে বাধ্য। অর্থাৎ তাহারা

সেই আদেশ ছেংজা ও খানদল দ্বারা কার্যকরী করে। ছেংজাগণ ও খানদল হুকুম তামিল করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হয়।

বিশেষ উল্লেখ্য যে "কাম্‌চ্‌কাও"- এর সঙ্গেও "ছেংজা থাকে যদিও বিচারক মণ্ডলী কাঠামোতে ইহাদের স্থান দেওয়া হয় না। রায় এবং কাম্‌চ্‌কাও প্রত্যেক চারজন করিয়া ছেংজা নিযুক্ত করিতে পারে। পান্‌চি প্রতি একজন করিয়া ছেংজা নিযুক্ত হয়।

বিচার পদ্ধতি - স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ দৈহিক মিলনের বিচার

স্ত্রী পুরুষের অবৈধ দৈহিক মিলনকে রূপীনি সমাজে সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ বলিয়া চিহ্নিত হয় এবং এইসব কোন ঘটনা বা ব্যাপার ঘটিলে আইন-কানুন অনুযায়ী বিচার করা হয়। বিচারে বিচারক মণ্ডলী অভিযুক্তদিগকে দৈহিক আঘাত এবং "চোয়াক' পরিবর্তে অর্থ উভয় প্রকার দণ্ড দিতে পারেন অথবা শুধু অর্থ দণ্ড দিয়াও বিচারের রায় প্রদান করা হয়।

বিচারের সময় বাদীপক্ষ কম পক্ষে দুইজন উর্ধ্বে তিন জন সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাদী পক্ষকে দোষী প্রমাণ করিতে হয়। বাদী সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের স্ত্রী কিংবা স্বামী কিংবা অন্য কেহ ও হইতে পারে। স্বাক্ষীরা অভিযুক্তদের দৈহিক সংযোগের প্রত্যক্ষ দর্শী হইতে হইবে অথবা স্থান কাল সহ বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রমাণ দিতে হইবে যাহা দ্বারা বিচারকেরা দণ্ডের আদেশ দিতে পারেন। অন্যথায় অভিযুক্তরা খালাস পাইয়া যায়। সেই ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ অভিযুক্তদের 'চোয়াক' - 'আরাক' (কলস ও বোতলে মদ) দিয়া সম্মান ফিরাইতে হয় এবং "দিয়ানে" (মিটিং) উপস্থিত বিচারক মণ্ডলী ও গ্রাম বাসীগণকে এক কলস চোয়াক দাবী দিতে হয়। এই এক এক কলস চোয়ক দেওয়াকে "রেদেম" বলা হয়। সম্মান ফিরানো স্বরূপ প্রদত্ত চোয়াক আরাক এবং দিয়ান - এ দাবীর চোয়াকও আরাক সমস্তই দিয়ানে উপস্থিত সকলে মিলিয়া পান করে।

কোন অবৈধ দৈহিক সংযোগের ব্যাপারে বিচারে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ই নির্দেশিত পরিমাণ চোয়াক - আরাক (কলস ও বোতলের মদ) দণ্ড দিয়া মুক্তি পাইতে হয়। সাধারণতঃ অভিযুক্ত পুরুষ ও মহিলাকে যথাক্রমে দুই কলস চোয়াক ও দুই বোতল আরাক এবং শুধু দুই কলস চোয়াক দণ্ড করা হয়। উক্ত সম্যক দণ্ডিত চোয়াক আরাক অবশ্যই চলতি দিয়ান - এ দিয়া দিতে হয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চোয়াক আরাক না থাকিলে জিনিষের সমমূল্য বা শুধু নিদ্ধারিত অর্থ দণ্ড দ্বারাও বিচার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করা হয়। সেইমতে শুধু অর্থদণ্ড আদেশের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত পুরুষ ও মহিলাকে যথাক্রমে মং ২৫ (পঁচিশ) ও মং ২০ (কুড়ি) টাকা দণ্ড আদায় দিতে হয়। আদায় কৃত টাকা হইতে দণ্ড আদায়ে মুক্তি প্রাপ্তা মহিলাকে মং .৫ পাঁচ) টাকা সম্মান ফিরাইয়া দেওয়া স্বরূপ প্রদান করা হয়। সমাজের লোক তখন তাহাদিগকে (মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলাকে) নির্দোষ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেয় এবং কোন প্রকার দুর্ণাম রটনার আর কেহই করিবে না। একই পুরুষ ও মহিলা এই ধরনের বিচারে বার বার তিন বারে দোষী সাব্যস্ত হইলে শেষ বারের (তৃতীয়বারের) বিচারে দৈহিক নির্যাতন সহ 'চোয়াক' - 'আরাক' কিংবা অর্থ দণ্ড করা হয়। পুরুষকে ২০ বার এবং মেয়েলোককে কম করে ও ১০ বার চপেটাঘাত করা হয়। অবস্থার গুরুত্ব বিচারে বেত্রাঘাত (রাইদাংবায় তগী) ও করা হয়।

· বাদী - বিবাদীর বক্তব্যের এবং স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষ্য প্রদানে সত্যমিথ্যা নির্ণয়ে ঘোরতর ও

চরম অসুবিধা দেখা দিলে এবং তাহাতে বিচারের রায় দিতে সম্ভবপর না হইলে বিচারক মণ্ডলী সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্য বিচার কার্যের জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট নিয়ম পন্থার সাহায্য নেন। এই নিয়ম পন্থার নাম - "তৌইলীব্‌মীন"— অর্থাৎ জলে ডুব দিয়া প্রমাণ করা - পক্ষে বিপক্ষে উভয়েরই দোষী কিংবা নির্দোষ।

তৌই লীব্‌মীন্ - নি রাইদ্যা (জলে ডোবাইয়া বিচার পদ্ধতি)

প্রথমে 'ডুমখল' করিতে হয় অর্থাৎ শপথ নিতে হয়, 'মাইনক্‌মা' 'খুল নক্ মা', সেং -মহর্ ইত্যাদি স্পর্শ করিয়া। ইহার পর বাদী-বিবাদী প্রত্যেককে একটি করিয়া তাওসা (বাচ্চা মোরগ) দিতে হয়। আর লক অচাই নিযুক্ত করে। দুইটি তাওসা দ্বারা যার যার নামে গঙ্গা পূজা করা হয়। পূজা স্থানে এক মানুষ কিংবা গলা সম গভীর জলে ৫ বা ৭ হাত দূরত্বে দুইটি বাঁশ পুঁতা হয়। বাঁশ অগ্রভাগে কিছু পাতা সমেত পুরা লম্বা অবস্থায় পুঁতিতে হয়। দুই জন ছেংজা প্রত্যেক একটি ঐ পেতা বাঁশ দম বন্ধ করিয়া ধরিয়া রাখে। বিচারকগণ ও দর্শকগণ সকলেই "তৌইরুকং - এ (জলের পাড়ে) অবস্থান করিয়া দেখিবে। বাদী ও বিবাদী উভয়ই তখন নির্দিষ্ট যার যার বাঁশ ধরিয়া জলে ডুব দিবে। দুই জনের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত আগে দম শেষ হইবার কারণে জলের উপর ভাসিয়া উঠিবে সংশ্লিষ্ট বাঁশ ধরা ছেংজা তাহাকে একটি থাপ্পড় কান বেড়াইয়া গালে মারিবে এবং সেই পরাজিত হইয়াছে বলিয়া তিরস্কৃত হয়। পরে দ্বিতীয় জন ভাসিয়া উঠিলে তাহাকে ও ঐরূপ ভাবে থাপ্পড় দিতে হয় এবং এই কাজটি সংশ্লিষ্ট বাঁশ ধরা ছেংজাকেই করিতে হয়। তখন বিচাবক মণ্ডলী দ্বিতীয় জনের, সে বাদী কিংবা বিবাদী যেই হউক, বক্তব্যকেই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেয় এবং সেই মতে বিচারের রায় প্রদান করা হয়। বর্তমানে এইরূপ বিচার ব্যবস্থা কতটুকু যুক্তিযুক্ত এবং ইহা দ্বারা প্রকৃত সত্য মিলে কিনা এই সম্বন্ধে সমাজের লোক জনের নিকট হইতে প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমার মতে এই পদ্ধতি সঠিক এবং যুক্তিপূর্ণও। কারণ দোষী ব্যক্তির মানসিক চঞ্চলতা ও নির্দোষ স্থিরতাই স্বাভাবিক। মানসিক চাঞ্চল্যে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হওয়ার জন্যে জলের ভিতর বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, দোষী ব্যক্তি সেই অবস্থায় দ্রুত জলের ভিতর হইতে তাহাকে ভাসিয়া উঠিতেই হইবে।

অবিবাহিত যুবক -যুবতীদের অবৈধ দৈহিক মিলনের ক্ষেত্রে চোয়াক - আরাক ও অর্থদণ্ডের পরিমাণ কম - যথাক্রমে এক কলস চোয়াক এক বোতল আরাক এবং শুধু এক কলস অথবা অর্থ দণ্ড ১০্ (দশ) টাকা ও ৫্ (পাঁচ) টাকা। বর্তমানে টাকার অবমূল্যায়নের ফলে উক্ত পরিমাণ অর্থদণ্ড খুবই নগণ্য মনে হয়। কিন্তু যে সময়ে রূপীনিদের পূর্ব পুরুষগণ এই সকল বিধান করিয়াছিলেন তখন টাকার মূল্য খুবই বেশী ছিল। এমন কি বর্তমানের দশগুণ - এর চেয়েও বেশী হইতে পারে বলিয়া আনুমানিক হিসাব করা যায়।

দিয়ান - এ উপস্থিত বিচারকমণ্ডলী ও গ্রাম বাসীগণ বিচারের দণ্ডে আদায়কৃত অর্থের অর্ধেকের মত, অবশ্য সম্মান ফিরাইয়া দেওয়া স্বরূপ মং ৫্ (পাঁচ) টাকা সংশ্লিষ্ট মহিলাকে প্রদানের পর, খরচ করিয়া পাচ্চুয়া ও মদ ক্রয় করিয়া পান করে। যাহারা পাচ্চুয়া ও মদ পান করিবে না তাহাদের জন্য অন্য ভোগ্য দ্রব্য যেমন মাইমিনি আওয়ান (বিন্নি চাউলের পিঠা) ইত্যাদি ব্যবস্থা হয়। পরবর্তী সময়ে চিড়া-মুড়ি বাতাসা ইত্যাদির ব্যবস্থা ও বিধান করা হয়। শেষাংশ অর্থ রায় -

এর নিকট তোলা থাকে। বৎসর বা দ্বিবৎসরান্তে জমাকৃত টাকা খুমতাং ধারীদের পদমর্যাদা অনুসারে কম বেশী, যাহার পার্থক্য খুবই নগণ্য, হিসাবে ভাগ করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ জমাকৃত টাকা বা তহবিলকে "আনজিৎ"বলা হয়।

ওয়াইচীক্ - ওয়াইচ্চা সাক্ নাং চাই মীন্‌নি বিচার - (পুরুষের ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ও মেয়েলোকের ছোটবোনের স্বামীর সহিত দৈহিক সংস্পর্শ কারণ জনিত বিচার)

রূপীনি সমাজে কোন বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত স্ত্রীলোক তাহার ছোট বোনের স্বামীর সহিত (উল্টাভাবে কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীর বড় বোনের সহিত) একে অন্যে যে কোন প্রকারেই হউক স্পর্শ হইতে নিষেধ। অনুরূপভাবে কোন বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষের উপরও, তাহার ছোটভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে (উল্টাভাবে কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর বড় ভাইয়ের সহিত) এইরূপ নিয়ম আরোপিত, অর্থাৎ একে অন্যের সহিত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দৈহিকভাবে লাগিতে পারিবে না। যদি ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় বা দৈবক্রমে ও কোন সময় দেহ লাগিয়া যায় এবং অপরে তাহা দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে - উভয় -পক্ষই এক আদি করিয়া মদ জরিমানা দিতে হয়। মদ দিতে না পারিলে তাহার বদলে প্রত্যেক মং ৫ (পাঁচ) টাকা আদায় দিতে হয়। ইচ্ছাগত ভাবে বারে বারে দেহ লাগাইলে বা আলিঙ্গে "হালা ও চায়ানি" (বিরূপ সম্পর্কের) জরিমানা মং ১৫ (পনর) টাকা এবং "পাবী" জরিমানা ও পুরুষ মং ২৫ (পঁচিশ) টাকা ও মেয়ে লোক মং ২০ (কুড়ি) টাকা দিতে হয়।

কোন "খুমতাং ধারী" যদি ঐরূপ অভিযোগ অভিযুক্ত ও তাহা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত জরিমানা ছাড়াও আরও মং ১০ (দশ) টাকা জরিমানা দিতে হয়। এই জরিমানাকে "দল রকর্ মীন্‌নি" জরিমানা বলা হয়।

উপরোক্ত জরিমানা ছাড়াও অভিযুক্ত পুরুষ তাহার আপন স্ত্রীর যে কোন এক ভাইকে স্ত্রীর সম্মান হানি ঘটানোর জন্য - অর্থাৎ নিজ স্ত্রীর বর্তমানে অপর স্ত্রীলোকের প্রতি লোভের, দণ্ড মং ১০ (দশ) টাকা দিতে হয়। এই জরিমানা দেওয়াকে "রিসি" দেওয়া বলে।

।। রূপীনি সমাজের কোন মেয়েলোকের সহিত অপর কোন সমাজের লোকের বিবাহে বিচার।।

রূপীনিদের সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহ ব্যাপারে একটি নিয়ম খুবই কঠোরভাবে মানা হয়। তাহারা তাহাদের সমাজের কোন বিবাহ যোগ্যা মেয়েলোককে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের নিকট বিবাহ দিবে না। নিজের সম্প্রদায়ের যুবক ও ভিন্ন কোন সম্প্রদায়ের যুবতীকে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই নিয়ম রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় বহন করে। কালের গতিতে এই নিয়ম ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিয়াছে।

রূপীনি যুবতীকে অন্য কোন সম্প্রদায়ের, যেমন ত্রিপুরী জমাতিয়া, রিয়াং ইত্যাদি কোন যুবক ভালবাসা বা যে কোন বিবাহের উদ্দেশ্যে ফুসলাইয়া লইয়া গেলে বিচারে যুবতীর মাতা পিতা বা অভিভাবককেই শুধু, সংশ্লিষ্ট যুবককে দণ্ডনীয় জরিমানা সহ, জরিমানা দিতে হয়। ভিন্ন সম্প্রদায়ের উক্ত যুবক কিংবা তাহার মাতা-পিতা বা অভিভাবককে বিচারে ডাকা হয় না। বিচারে যুবতী মেয়ের পিতা-মাতাকে "পাবী" পুরুষের জন্য মং ২৫ (পঁচিশ) টাকা এবং মেয়ের জন্য মং

২০৲ (কুড়ি) টাকা মোট ৪৫৲ (পয়তাল্লিশ) টাকা জরিমানা করা হয়। সঙ্গে দুই কলস 'চোয়াক' ও এক বোতল আরাক দিতে হয়। রূপীনি মেয়েলোক ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাজে চলিয়া যাওয়ার কারণে আরও মং ১০০৲ (একশত) টাকা জরিমানা করা হয় এবং তখন হইতে উক্ত যুবতী মেয়েলোক রূপীনি সম্প্রদায়ের নয় বলিয়া বিবেচিত হয়। ভবিষ্যতে যদি এইরূপ কোন ঘটনা ঘটে যে উক্ত মেয়েলোক স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ার কারণে ছাড়াছাড়ি হইয়া তাহার মাতাপিতার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে সমাজের 'লক' - র নিকট ইহা জানান দিতে হয়। তখন আবার উক্ত লোককে জরিমানা করা হয়। অর্থাৎ রূপীনি সমাজকে মান্যতা প্রদর্শন না করিয়া সমাজে আসিয়া মাতাপিতার সহিত বসবাস করিতে পারিবে না। সম্মান বা মন্যতা প্রদর্শনের জন্য দুই কলস চোয়াক ও এক বোতল আরাক দিতে হয়।

রূপীনি যুবক অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েকে বিবাহ করিলে শুধু দুই কলস 'চোয়াক' ও এক বোতল 'আরাক' 'লক' -এর দাবি দিতে হয়।

রূপীনি সমাজে "কাক্চাইমীন - এর বিচার (বিবাহ বিচ্ছেদের বিচার) ঃ—

বিভিন্ন কারণে যৌবন সময়ে স্বামী - স্ত্রীর বনাবনি না হইলে, স্বামী কিংবা স্ত্রী যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থী হইলে সাধারণতঃ বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমোদন দেওয়া হয়। যুবক পুরুষ মেয়ের বাড়ীতে জামাই খাটার সময়ে স্বামী কিংবা স্ত্রী পর পুরুষ অথবা মেয়েলোকের সঙ্গে দৈহিক অবৈধ সম্পর্ক জনিত কারণেই এইরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের বিচার ব্যবস্থা বেশী হয়। নূতন দম্পতি আলাদাভাবে নূতন সংসার পাতিলে পর, সন্তানাদি জন্মের পর সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদন করা হয় না। বিচারে বিবাহ-বিচ্ছেদ অর্থাৎ ছাড়া ছাড়ির অনুমোদন হইলে যে ছাড়িতে চাহে তাহাকে মং ৬০৲ (তিন কুড়ি) টাকা 'লক' -র নিকট জরিমানা দিতে হয়, যাহাকে ছাড়া হয় তাহাকেও মং ৩০৲ (খল পেৎচি ত্রিশ) টাকা দিতে হয় কারণ তাহার দোষের জন্য এই ছাড়া ছাড়ি। স্বামী -স্ত্রী উভয়ই উভয়কে ছাড়িতে চাহিলে সমানভাবে জরিমানা টাকা দিতে হয়। অর্থাৎ ৬০৲ + ৩০৲ = ৯০৲ টাকাকে দুই সমান ভাগে মং ৪৫৲ টাকা। তাহাছাড়া ও 'লক' - কে মান্যতার জন্য দুইবোতল 'আরাক' ও দুই কলস চোয়াক করিয়া উভয়ই প্রদান করিতে হয়।

"সিখাও"- নি (চুরির) বিচার ঃ—

রূপীনি সমাজে চুরি-চামারির ঘটনা খুবই বিরল। যদিও বা কোন চুরির ঘটনা ঘটে তাহা শুধু গৃহ পালিত পক্ষী অর্থাৎ মুরগীর চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মুরগীর চুরি ধরা পড়িলে চোরকে মং১৫৲ টাকা জরিমানা দিতে হয় আর চুরিকৃত জিনিষের ন্যায্য মূল্যও দিতে হয়। কিন্তু উক্ত জিনিষ ফেরত প্রদান করিলে আর মূল্য দিতে হয় না।

রূপীনিদের খেলাধূলা

১) সুকুই খীংমুং (সুকুই ঘুঁটির খেলা)

সুকুই বীচির খেলা ঘরের উঠানে করিতে সবিধা। ইহা সাধারণতঃ দুইজনের খেলা। পাঁচ বা সাতটি সুকুই বীচি উঠানের একপ্রান্তে গভীর করিয়া দাগ দেওয়া একটি সরল রেখার উপর বসাইতে হয়। ৪ কিংবা ৬ আঙ্গুল ফাঁক রাখিয়া ঘুটিগুলি খাড়াভাবে বসানো প্রয়োজন। খেলা

আরম্ভে একজনে একটি সুকুই ঘুটি পায়ের পাতার উপর বহন করিয়া উঠানের অপর প্রান্ত হইতে (পনের ষোল হাত দূরত্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়) সোজা একপায়ে দৌড়াইয়া আসিতে হয়। দৌড়ানো অবস্থায় বসানো ঘুটির লাইনের ২ বা তিন হাত দূর থাকিতেই পায়ের সুকুই দ্বারা বসানো ঘুঁটির যে কোন একটিকে তাক করিয়া ছুড়িয়া মারিতে হয়। পায়ের সুকুই-এর আঘাত লাইনে বসানো সমস্ত ঘুঁটি ঐভাবে ফেলিয়া দিতে পারিলে একমান হইয়াছে বলা হয়। অন্যথায় মান করিতে পারিবে না।

পায়ের সুকুই প্রথম বারেই ছুঁড়িবার সময় যদি লাইনের সুকুই-এর একটিও না লাগে তাহা হইলে অপর পক্ষের নিকট ঘুঁটি চালিয়া যাইবে। প্রথমে লাগানোর পরের বারগুলির কোন বারে বসানো ঘুঁটিতে আঘাত নাও লাগিতে পারে। সেই রূপ ক্ষেত্রে তিনবার পর্যন্ত সুযোগ দেওয়া হয়। তিন বারের যে কোন বারেও ঘুঁটি লাগাইতে না পারিলে তাহার খেলা বাতিল গণ্য হয়। তখন অপর পক্ষ তাহার খেলা আরম্ভ করে।

(সুকুই গাছ বড় লতানো গাছ; গহন অরণ্যে বিশাল বিশাল বৃক্ষ এই লতানো গাছের অবলম্বন। সুকুই গাছের ফলের নমুনা তেঁতুল গোটায় ন্যায় চেপ্টা ও লম্বা, অল্প পরিমাণ বাঁকা। ২১/২ হইতে ৩/৪ ইঞ্চি পরিমাণ প্রশস্ত ও চেপ্টা, লম্বায় ঢেড় হইতে পৌনে দুই হাত। ভিতরের বীচি চেপ্টা গোলাকৃতি দেঢ় হইতে দুই ইঞ্চি ব্যাস এবং তেঁতুলের বীচির ন্যায়ই সারিবদ্ধ ভাবে ফলের ভিতরে ৫/৭টা বীচি থাকে। পক্ক সুকুই বীচি লাল রংয়ের হয়।

২) দুর্খা - (কাপড়ের বল - নিক্ষেপ)

এই খেলায় কম পক্ষে চারজন এবং উপরে যতখুশী সংখ্যা খেলোয়াড় নিয়া খেলা করা যায়। খেলোয়াড়গণ নিজেরাই সম সংখ্যক ভাবে দুই দলে বিভাজিত হয়। খেলার মাঠে একটা "তাঁই" - অর্থাৎ সীমারেখা লম্বা করিয়া টানা বা দাগ দেওয়া হয়। দাগের উভয় দিকে এক একদল করিয়া দণ্ডায়মান হয়। উভয় দিকেই কোনরূপ শেষ সীমানা নির্দিষ্ট নাই। খেলার সরঞ্জাম - ৫ কি ৬ হাত লম্বা বিশিষ্ট গামছা কাপড়কে গোল করিয়া বলের আকারের ন্যায় শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়। বলটি অর্থাৎ কাপড়ের গোলকটি হাতের মুঠো দ্বারা ধরিয়া রাখা যায়। এ রকম আকার হইতে হইবে।

প্রথমে যে কোন দল বলটিকে দ্বিতীয় পক্ষের দিকে ছুঁড়িয়া দিবে এবং বেশ উচ্চ করিয়া। দ্বিতীয় পক্ষের যে কোন জন বলটিকে লুফিয়া ধরিবার চেষ্টা করিবে বা সকলেই ধরিবার জন্য চেষ্টিত থাকিবে। যদি লুফিয়া ধরিয়া লইতে পারে তবে যে পক্ষ বল ছুঁড়িয়াছিল সেই পক্ষের যে কোন একজনকে "তাঁই" অর্থাৎ সীমানার দাগের উপর আসিয়া দাঁড়াইতে হয় ও নাচের ভঙ্গি করিয়া দাগের উপর দিয়া হাঁটিতে হয়। দাগের উভয় প্রান্ত পর্যন্ত এদিক ওদিক স্পর্শ করিয়া হাঁটিয়া নাচিতে পারে। বল লুফিয়া ধৃতকারী ব্যক্তি তখন উক্ত নাচিয়ে লোকটির গায়ে লাগাইবার জন্য বল ছুঁড়িয়া মারিবে। গায়ে বল লাগিলে নাচিয়ে লোকটি যে বল ছুঁড়িয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের দলে যোগ দিতে হবে। আর বল গায়ে না লাগিলে সেতাহার নিজ দলেই থাকিবে। এইভাবে কোন দল নিঃশেষিত হইয়া গেলে পরাজিত হয় ও খেলা সাঙ্গ ঘটে। খেলিতে হইলে পুনরায় নূতন দল গঠন করিয়া লইতে হয়।

৩) রমল নীত্মীন্ (উদু ঠেলাঠেলি খেলা)

দুই বা চারজন মিলিয়া এই খেলা করিতে হয়। খেলার সরঞ্জাম একটি "রমল" (ছোটকা) অথবা যে কোন শক্ত বাঁশ (৪ কি ৫ হাত লম্বা বিশিষ্ট) খেলোয়াড়গণ সমসংখ্যক দুইভাই হইয়া "রমল" বা বাঁশটির দুই প্রান্তে বগলে চাপিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া একদল এক প্রান্তে। দুই দলের মধ্য স্থানে মাটিতে একটি বাঁশের শলাকা বা খুঁটি দ্বারা দাগ দিয়া লইতে হয়। এই দাগটি সীমানা। উভয়ে বা উভয় দল পরস্পরে সম্মুখের ঠেলিবে। যে ব্যক্তি বা দল সীমানা পার করিয়া অপর পক্ষকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে সেই ব্যক্তি বা দল জয়ী হয়।

৪) শত্চাচমীন্ (কুস্তি) ঃ—

এই খেলা দুই জনের। প্রথমে দুইজনই মুখোমুখি দাঁড়ায়। তারপর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। এরপর ধস্তা-ধস্তি করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে হয়। যে জন অপরজনকে মাটিতে ফেলিয়া উপরে থাকিয়া চাপিয়া রাখিতে পারে তাহারই জিত। তবে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয় -হার মানিয়াছে কিনা। যদি উত্তর - না হয় তাহা হইলে আরও মাটিতে ঘসা দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয় - এইবার হারিয়াছে কিনা। এইভাবে যতক্ষণ না নীচের জন হারের স্বীকৃতি দেয় ততক্ষণ খেলা চলে। কারণ নীচের জন ও হঠাৎ কোন কায়দা করিয়া উঠিয়া উপরের জনকে নীচে ফেলিয়া দিতে পারে। সেই অবস্থায় প্রথমে যে উপরে ছিল সে ও উপবে উঠিতে পাবিলে এবং দুইবার নীচে পড়িয়া গেলে সমান হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

৫) লতা তাঁইসামীন (ঘটি উত্তোলন)

এই খেলা খেলিতে দুই জনের প্রয়োজন। একজনে বসিয়া শক্ত করিয়া পা দুঁইটি দুই হাতে বেড় দিয়া ধরিয়া থাকিবে। বসিবার কায়াদা ঠিক এইভাবে হইবে হাঁটু দুইটি মুড়িবে অথচ পাছা মাটিতে লাগিবে না। অন্য জন তাহার কোমরে ধরিয়া এক ঝটকায় কাঁধে তুলিতে হইবে। ইহা অনেকটা বর্তমানে প্রচলিত ভার উত্তোলন খেলার অনুরূপ, কেহ তুলিতে পারে। কেহ পারে না। ইহাই খেলার আনন্দ।

৬) ডেংডল সেক্মীন্ (মোটারি ছিনাইয়া নেওয়া)

ইহা দুইজনের খেলা। একজন "ডেংডল" - মুলি বাঁশের গুড়ির দিকে আধা হাতের মত লম্বা করিয়া টুকরা করা, (বার্তা তৈরীর সরঞ্জাম অনুরূপ) গোড়ার দিকে মুঠ করিয়া ধরিতে হইবে। মুঠি মাটির সঙ্গে লাগিয়া থাকিবে। অন্য জন " ডেংডলে এর উপরিভাগ ধরিয়া মুচড়াইয়া একটানে তুলিয়া আনিবে। যদি তুলিতে পারে সে বিজয়ী হিসাবে গণ্য হইবে। না পারিলে অর্থাৎ অপরদিকে যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে সে বিজয়ী হইবে।

৭) রমল সীমীন্ (উদুটানা)

দুইজনে বা তাহার অধিক মিলিয়া খেলিতে পারে। খেলার জন্য দুইটি 'রমল (ছেকাত) এর প্রয়োজন হয়। একটি ছেকাত মাটির উপর শোয়াইয়া রাখিয়া ইহার দুই পাশে দুই জন বা দুইদলে পা লম্বা করিয়া বসিবে এবং ছেকাতের উপর পা-য়ের গোড়ালি লাগিয়া থাকিবে দুই দলেরই। ইহার পর অন্য ছেকাতটিকে হাতে উভয় পক্ষ শক্ত করিয়া ধরিতে হয়। অন্য একজন লোক দাঁড়াইয়া থাকিয়া খেলা আরম্ভের সংকেত দেওয়ার সাথে উভয়ে বা উভয় দল যার যার দিকে টান

দিবে।

যে ব্যক্তি বা দল নিজের দিকে অপর পক্ষকে টান দিয়া লইয়া আসিতে পারিবে সে বা সেই দলই বিজয়ী।

৮) বাংপ্রোং বিরমীন্ (বাং প্রোং পতঙ্গের ন্যায় উড়া)

এই খেলায় একটি পা একটি পালার সঙ্গে মাটি হইতে প্রায় দুই হাত উঁচুতে কিছু ঢিল করিয়া বাঁধিতে হইবে। অপর পাটিকে বাঁধার স্থান হইতে নীচের দিকে আধা হাত স্থানে পালার উপর রাখিয়া ৯০ নব্বই ডিগ্রি কোন সৃষ্টি করিয়া পালাটিকে ঘুরিতে হইবে। এই খেলায় হার জিতের কোন সৃষ্টি করিয়া পালাটিকে ঘুরিতে হইবে। এই খেলায় হার জিতের কোন ব্যাপার নাই।

৯) বাইলেং বাত্মীন্ (ডালা টপ্‌কানো) ঃ—

এই খেলা বিপজ্জনক। ইহা ডালার দুই ধার ধরিয়া লাফ দিয়া ডালাটিকে পার হইতে হয়। যে পার হইতে পারে সে প্রশংসিত হয়। ইহা বিশেষ করিয়া যুবকদের খেলা। ''বাইলেং'' অর্থডালা। রূপীনি এবং অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ধান, চাউল তিল ইত্যাদি যাবতীয় জিনিষ বাঁশের বেত দ্বারা তৈরী সরঞ্জাম।

রূপীনি রীচাপ্মুং (রূপীনিদের গান)

১ (ক) নং গান — ফাইলেরনি (প্রেমের গান)

ছিখ্রী - মাছেং সিয়ারি পাম্তাই কাক্জাখ

অদনসং থাংফাইজাখ।

কক্খেলেং ফাংঅী কুকজুং বায়াখ

অদনসং থাংফাইজাখ।

খরাং খীলাইয়াই খরাং লাচাক্জা

অদন ফাইলিয়া নাদী

ছিখলা - খুরমো আজাংকি বংবীরাই খরাং,

অদন মধুনি খরাং।

সায়ছং কয়রিরি তংচামীন্ তীলাই

চিনি কাইরেং আঁযাইদি - চিনি কাইরেং আই চুসীরী - সীরী,

নকবার নাংসীরী সীরী

নাওনি কাইরেং - আই সিখেরেং-খেরেং

থাম্ফাইমা বেরেং - বেরেং।

ছিখ্রি - নাওনি কাইরেং আঁ ফা-আনাই মুচুংঅী,

নেনেসং তেন্ তাইয়ানী।

নাওনি কাইরেং আঁ ফা-আনাই মুচুংঅী,

তাওখা মগদান চানী।

ছিখ্রা - তাওখা চামীনাই খুনসাসে চানী

খুনসানি খুন্নাই রীনী।

(অনুবাদ)

যুবতী — শীতের কুয়াশার শিশির এখনো শুকায় নাই
"অদনসং" (ভালবাসার পাত্র ও সঙ্গীরা) এখনো যায় নাই।
অড়হর গাছে এখনো কুক্‌জুং বসে নাই
"অদনসং" এখানো পার হইয়া যায় নাই।
করিয়া গলার আওয়াজ, প্রত্যুত্তর পায় নাই,
ভালবাসার পাত্র আজ, বোধ হয় আসে নাই।
যুবক — গহন অরণ্য পাহাড়ের ভ্রমরার গুঞ্জন সম,
শুনি কণ্ঠস্বর প্রিয় পাত্রীর মম।
টংঘর আমাদের উচ্চ, আরাম প্রদ মৃদু মন্দ বাতাস স্পর্শিত সতত।
টংঘর তোমাদের অসুন্দর নীচে
উড়িয়া বেড়ায় মাছি প্রচুর সেখানে।
যুবতী — আছে ইচ্ছা আসিতে টংঘরে তোমার
করিবে গালমন্দ তখন, মাতা আমার।
আছে ইচ্ছা আসিতে টংঘরে তোমার,
খাইবে কাকে ভুট্টা, হেথায় তখনে।
যুবক — যদি খায় কাকে ভুট্টা খাইবে একটা;
দ্বিগুনে তোমায় দিব ফিরাইয়া ভুট্টা।

তরণীমোহন রূপীনি

জন্ম ১৯৩৯ ইং সনের ১লা জুন; পিতা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ রূপীনি। জন্মস্থান চম্পকনগর এলাকায় ততবাককামী (বিশ্বমণি রূপীনি সর্দার পাড়া)। চম্পকনগর লোকশিক্ষালয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু, উচ্চশিক্ষা বীরবিক্রম কলেজ, আগরতলা (আই. এস. সি)। টি. সি. এস অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শেষ করে ১৯৯৭ ইং সনে অবসর গ্রহণ করেন।

চাকমা

নাম পরিচয়

চাকমারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় দেয় 'চাঙমা'(Changma) নামে। কিন্তু প্রতিবেশী বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায় ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকদের নিকট তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন , ত্রিপুরীরা তাঁদের বলেন 'ছাখমা', বাংলাদেশের ত্রিপুরা আদিবাসীরা বলেন 'চংমা' বা 'কুরুমু'। মারমা তথা মগ আদিবাসীরা বলেন 'সাঃক' বা ' ঠেক', মিজোরা বলেন, 'তাকাম' মিজোরামের লাখেররা বলেন 'তুইচেক', বাংলাদেশের পাংখুয়া আদিবাসীরা 'আইএং', চাকমাদের এক উপগোষ্ঠী তঞ্চঙ্গ্যারা বলেন 'আনক্যা' এবং চট্টগ্রামের বাংলাভাষী লোকেরা বলেন 'চাম্মুয়া'। ব্রিটিশরা চট্টগ্রামে আসার পর চাকমাদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে লিখেন 'চুক্মা'(Chukma) পরে তা হয়ে যায় 'চাকমা' (Chakma)।

জনগোষ্ঠীর নামের ব্যুৎপত্তি

চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, তারা গৌতম বুদ্ধের বংশধর অর্থাৎ শাক্য বংশজ। তাঁদের এই বংশগত পরিচয়মূলক 'শাক' শব্দটি বার্মিজদের উচ্চারণে কখনো হয়েছে ' থেট বা 'থায়েট' (Thet or Thayet) কখনো 'সাক' (Tsak), কখনো 'চাক' (Chak)। চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমাদের আগমনের পর সেখানকার অধিবাসীরা তাদের চাম্মুয়া (Chammua) নামে সম্বোধন করেন। হয়তো এই বর্মী-বিরোধী নবাগতদের তারা শ্যাম বা থাইল্যাণ্ডবাসী 'চাম' সম্প্রদায়ের লোক ভেবেছিলেন। অথচ চাকমারা নিজেদের জাতীয় নাম উচ্চারণের সময় 'চাঙমা' (Changma) শব্দটি বরাবর ব্যবহার করে থাকেন। সম্ভবত সেকারণে তিব্বতী বৌদ্ধপণ্ডিত লামা তারানাথ তাঁর বিখ্যাত 'ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে কোকিভূমিতে বসবাসকারী বৌদ্ধ অনুগামী দ্বাদশ শতাব্দীর অতীতবাহন - কে 'চাগমা'(Chagma) রাজা রূপে উল্লেখ করেন। আসলে চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের কেবল শাক্যবংশীয় বলে পরিচয় দিলেও তাঁরা ছিলেন শাক্যদেরই 'চাতুমা' গোষ্ঠীর লোক। এই চাতুমা শব্দটি ধ্বনি-বিবর্তনের কারণে চাঙমা হওয়া স্বাভাবিক। এবং লামা তারানাথের ক্ষেত্রে হয়তো শব্দের প্রতিবর্ণী করণে ত্রুটির কারণে এই চাঙমা শব্দটি 'চাগমা'- তে রূপান্তরিত হয়েছে। যাহোক, চট্টগ্রামে ব্রিটিশদের আগমনের পর তাঁরা 'চাঙমা' শব্দটি লিখতে থাকেন 'চাকমা' রূপে। বর্তমানে এই নামটিই সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক। নৃ-তাত্ত্বিক স্যার এইচ. এইচ. রিজলে (১৮৮১)-এর মতে চাকমাদের দেহে ৮৪.৫ শতাংশ মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তাঁদের গায়ের রঙ সুন্দর (ফ্রান্সিস বুকানন ঃ ১৭৯৮) এবং ফর্সা, মুখমণ্ডল গোলাকার, ওষ্ঠাধর পাতলা, চুলগুলো সোজা, চোখের মণি ও চুলের রঙ কালো, দাঁড়ি ও গোঁফ কম, দেহ প্রায় কেশহীন; গড় উচ্চতা পুরুষদের ৫ ফুট ৫-৬ ইঞ্চি আর স্ত্রী-লোকদের ৫ ফুট ৪-৫ ইঞ্চি - ৪ ইঞ্চি।

জনসংখ্যা

ত্রিপুরায় চাকমাদের জনসংখ্যা ২০০১ সালের আদম সুমারি অনুযায়ী মোট ৬৪,২৯০ জন। ১৯০১ সালে এ রাজ্যে তাঁদের জনসংখ্যা ছিল ৪৫১০ জন। ত্রিপুরা ছাড়া ভারতের মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও মিয়ানমার-এর আরাকান ও চিনহিল প্রদেশে চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকদের বসবাস রয়েছে। মিজোরামে চাকমাদের জনসংখ্যা ৯০ হাজারের মতো, অরুণাচলে ৮০ হাজার, আসামে ২০ হাজার এবং বাংলাদেশে চাকমাদের জনসংখ্যা তঞ্চঙ্গ্যা উপগোষ্ঠীর লোকেরা সহ আনুমানিক চার লক্ষের উপর। মিয়ানমারে উল্লিখিত দু'টি প্রদেশে 'দৈংনাক' বা 'দৈনদাক' নামে পরিচিত চাকমাদের জনসংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক। সেখানেও তাঁরা নিজেদের মধ্যে 'চাঙমা' নামটি ব্যবহার করে থাকেন।

ত্রিপুরায় বসতি বিস্তার

চাকমারা ত্রিপুরার মূল অধিবাসী নন। অন্যান্য অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো চাকমারাও বহির্ত্রিপুরা থেকে এসে এ রাজ্যে বসতি নিয়েছেন স্থায়ীভাবে। ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ত্রিপুরায় চাকমাদের প্রথম আগমন ঘটেছে ১৮৭২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন চাকমারাজ্য তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের তথ্য মোতাবেক চাকমাদের এ রাজ্যে আগমনের কারণ নাকি তখনকার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটিশের লুসাইদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং প্রায় একই সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃটিশদের জরীপের কাজের জন্য পার্বত্যবাসীদের মধ্য থেকে কুলি সংগ্রহ জনিত ভয়। এই উভয় কারণেই ১৮৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মোট চারশো সংখ্যক চাকমা স্বপরিবারে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে গোমতী নদীর উজানে আশ্রয় নিয়েছিলেন (ডব্লিউ. ডব্লিউ.হান্টার ঃ ১৮৭৬)। এ সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেছিলেন — উল্লেখিত অনুপ্রবেশকারী চাকমাদের ফেরত পাঠাবার আবেদন জানিয়ে তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলার কালেক্টর মিঃ রবন (Mr. Raban) ত্রিপুরার মহারাজাকে চিঠি পাঠালেও মহারাজ তাদের ফেরত পাঠাননি। কারণ, সেই সময়ে কুকিদের আক্রমণের ফলে গোমতীর ঐ অঞ্চলটি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এদের বসতির ফলে ঐ অঞ্চলে পুনরায় জনবসতি গড়ে উঠবে, সেই উদ্দেশ্যেই নাকি ওদের ফেরত পাঠানো হয় নি।

ত্রিপুরায় চাকমা বসতি গড়ে-ওঠার প্রসঙ্গে চাকমা ইতিহাস 'রাজনামা' (মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মি ঃ১৯৪০) - এর এক তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় — ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য (১৭৪৮ -৮৩ খ্রিঃ) - এর রাজত্বকালের মাঝামাঝি সময়েও নাকি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জনৈক কিষ্ট কিশোর দেওয়ান-এর নেতৃত্বে হাজার খানেক চাকমাপ্রজা ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করে অমরপুরের চেলাগাঙ অঞ্চলে বসতি নিয়েছিলেন। উল্লেখিত কিষ্টকিশোর দেওয়ান ঐ সময়ে নাকি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মহারাজা কৃষ্ণমাণিক্যকে কুকিদের উৎপাত দমনে সহায়তা করেছিলেন। তাতে খুশি হয়ে মহারাজা তাঁকে 'নারান' উপাদি প্রদান করেন। সেই থেকে চাকমাদের মধ্যে তিনি 'নারান দেওয়ান' নামে খ্যাত হন। অবশ্য পরে নাকি মহারাজার সঙ্গে এক ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে কিষ্ট কিশোর তথা নারান দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিয়ে যান। তবে তাঁর অনুগামীদের বৃহদংশ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে থেকে যান।

এছাড়া ইতিহাসের আরেক সূত্র থেকে জানা যায় — এই ঘটনারও বেশ কিছুকাল আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে আরেকদল চাকমা জনগোষ্ঠীর লোক রাজনৈতিক কারণে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঘটনাটি হচ্ছে — চাকমা রাজা সাত্তুয়া (১৬০৭ -১৪ খ্রিঃ) প্রজা বিদ্রোহের দ্বারা নিহত হলে তাঁর বিধবা স্ত্রী ও কতিপয় ঘনিষ্ঠ অনুগামী ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করেন (বিরাজ মোহন দেওয়ান ঃ চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত - ১৯৬৮)। সুতরাং লক্ষ্য করা যায়, অতীতের বিভিন্ন সময়ে ত্রিপুরায় চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকদের বিভিন্ন ঘটনার সূত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিহাস 'রাজমালা'-য় সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। কেবল উল্লেখ আছে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহারাজা ত্রিলোচনের সময় থেকেই নাকি চাকমারা ত্রিপুরার প্রজা হিসেবে গণ্য ছিলেন। সে যাহোক, এটা অনুমান করা সঙ্গত যে, ঐতিহাসিক যুগে চট্টগ্রাম এলাকার চাকমারা কোন-না-কোন সময়ে ত্রিপুরার মহারাজাদের করতলগত ছিলেন। কারণ, ত্রিপুরার পরম শক্তিশালী রাজন্যবর্গ একাধিকবার সমগ্র চট্টগ্রাম ভূ-ভাগ সহ আরাকানের একাংশ অবধি নিজেদের অধিকারভুক্ত করেছিলেন। সেই ঘটনাদি সূত্রে ত্রিপুরার ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে অতীতের বিভিন্ন সময়ে চাকমা সম্প্রদায়ের লোকদের ত্রিপুরার বর্তমান ভৌগোলিক এলাকায় অভিবাসিত হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট প্রবল ছিল।

ত্রিপুরায় চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল

ত্রিপুরায় চাকমা বসতিগুলো গড়ে উঠেছে প্রধানত বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম সীমান্ত বরাবর উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে। এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে— বিলোনীয়া মহকুমার মুহুরিপুর ও শান্তির বাজার; সাব্রুম মহকুমার শিলাছড়ি, অমরপুব মহকুমার করবুক, জলায়া, নতুন বাজার; গণ্ডাছড়া মহকুমার রইস্যা বাড়ি, কালাঝারি, ধলাঝারি, তুইচাকমা, নারায়ণপুর, গণ্ডাছড়া; লংতরাইভ্যালী মহকুমার ছামনু, মাণিকপুর, দুর্গাছড়া, লালছড়া, ছৈলেংটা, ময়নামা, মনু এবং কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা, কাঞ্চনপুর, লালজুরি, মাছমারা, পেঁচারতল ইত্যাদি অঞ্চল। এরমধ্যে প্রায় দু'শতাধিক ছোট-বড় চাকমা গ্রাম বা পাড়া রয়েছে। প্রায় সব গ্রামই মিশ্র-জনবসতিপূর্ণ। চাকমা গ্রামসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রায় প্রতিটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে একটি করে বৌদ্ধমন্দির বা বিহার রয়েছে। ধর্মাচরণের সুবিধার্থে প্রতি মন্দিরে একাধিক জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ নিযুক্ত থাকেন। ছোট -বড় প্রতিটি গ্রামে তাঁদের নিজস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

সামাজিক বিচার ব্যবস্থা

চাকমা সমাজে সামাজিক বিভিন্ন প্রকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্য যে সামাজিক বিচার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন স্বয়ং চাকমা রাজা। এই বিচার ব্যবস্থা অনুযায়ী সমাজের প্রত্যেক সামাজিক মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি হওয়ার কথা গ্রামের কারবারীর দরবারে। সেখানে যদি মামলার নিষ্পত্তি না হয়, তা যাবে দেওয়ান - তালুকদার বা হেডম্যান - এর দরবারে এবং সেখানেও নিষ্পত্তি না হলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য মামলাটি যাবে চাকমা রাজ-দরবারে। এই প্রক্রিয়ায় সুদীর্ঘকাল ধরে চাকমাদের সামাজিক বিচার-ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় বসবাসকারী চাকমাদের মধ্যে এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা ভিন্ন। এখানে গ্রামীণ স্তরে কারবারীর দরবার বা "আদাম সালিজি" - তে প্রথমে মামলার নিষ্পত্তির চেষ্টা করা হয়। সেখানে

মামলার নিষ্পত্তি না হলে নিজ এলাকায় ৮/১০ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত 'চাগালা সালিজিতে' তা বিচারের জন্য যাবে। সেখানেও মামলার সুরাহা না হলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য দেওয়ান বা তালুকদারের দরবারে গঠিত 'যুলআনি সালিজি' -তে মামলাটি নিয়ে যাওয়া হবে। এই যুলআনি সালিজি'র রায় প্রত্যেকে মানতে বাধ্য। অন্যথায় ঐ ব্যক্তিকে 'কীত্তিমঙ্গলা' আখ্যা দিয়ে সামাজিক বহিষ্কার মূলক চরম শাস্তি দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরায় যুলআনি সালিজিগুলো গড়ে উঠেছে নদীকেন্দ্রিক চাকমা বসতিসমূহ ভিত্তি করে। যেমন — দেরগাং (দেও নদী) যুলআনি সালিজি, মনু গাঙ যুলআনি সালিজি, গুমেতকুল যুলআনি সালিজি প্রভৃতি।

সামাজিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের সাধারণত অর্থদণ্ড হয়ে থাকে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অপরাধীকে অর্থ দণ্ড সহ শুকর, মোরগ ইত্যাদির জরিমানাও করা হয়। এমন কি, বিচারশালায় উপস্থিত সকল গ্রামবাসীদের জন্য ভোজ আয়োজনের দায়ও অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীকে বহন করতে হয়। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় বেত্রাঘাতের আদেশও হতে পারে।

অবৈধ যৌনসম্পর্ক, ছিনাল ধরনের অপরাধ অথবা কিডন্যাপ ইত্যাদি ঘটনার বিচারগুলো সাধারণত প্রচলিত সামাজিক বিধি অর্থাৎ Customary Law অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। এ ধরনের অপরাধের কোন মোকর্দ্দমা যদি কেউ কোর্টেও নিয়ে যায়, সেক্ষেত্রে 'চাগালা সালিজি' বা যুলআনি সালিজির পক্ষ থেকে কোর্টের নিকট আবেদন জানিয়ে সামাজিক বিচারালয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহামান্য কোর্ট তা মঞ্জুরও করেন।

সামাজিক কাঠামো

চাকমা সমাজের নিজস্ব একটি সামাজিক কাঠামো রয়েছে। সেই সামাজিক কাঠামো অনুযায়ী সমগ্র সমাজের প্রধান হলেন রাজা। অতীতে চাকমা রাজারা ১৭৩৭ খ্রিষ্টাব্দ - এর পূর্বকালীন সময়ে মুলিমা, ধামেই (ধাবেং), চেংগে, খীসা ইত্যাদি নামের সমাজপতিদের মাধ্যমে সমাজের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখে রাজত্ব করতেন। ১৭৩৮ খ্রিষ্টাব্দে মুলিমা, ধামেই, চেগে ইত্যাদি পদ লুপ্ত করে 'দেবান' (দেওয়ান) পদটি সৃষ্টি করা হয়। রাণী কালিন্দীর রাজত্ব কালে (১৮৪৪-৭৩ খ্রিঃ) দেওয়ান পদের পাশাপাশি তালুকদার পদ সৃষ্টি করা হয়। পূর্বে দেওয়ান প্রতিটি গ্রামের প্রধান অর্থাৎ 'কারবারী' - দের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহ করে নিজের নির্দিষ্ট হারের রাজস্ব রেখে দিয়ে বাকী অংশটি রাজাকে সমর্পন করতেন। তখন দেওয়ানের পক্ষে খীসারা-ই এই খাজনা সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতেন।

ত্রিপুরায় বসবাসকারী চাকমাদের ক্ষেত্রে মূল সামাজিক কাঠামোকে বজায় রেখে সমাজের প্রধান হিসেবে দেওয়ানকে সমাজের সর্বপ্রধান ধরে নেওয়া হয়। ত্রিপুরারাজ্যে যেহেতু চাকমাদের রাজা ছিলেন না সেহেতু এখানে দেওয়ান নিযুক্তির উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই এখানকার চাকমা জনসাধারণ মিলে সর্বসম্মতি ক্রমে একজন যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে দেওয়ান মনোনীত করতেন। ত্রিপুরার মহারাজাগণ প্রশাসনিক ও খাজনা সংগ্রহের সুবিধার্থে তাঁদের 'সর্দার' আখ্যা দিতেন। এই সর্দার বা দেওয়ানদের হয়ে খাজনা সংগ্রহ করতেন গ্রামের মোড়ল 'কারবারী'গণ। দেওয়ানগণ তা নির্দিষ্ট হারে মহারাজাদের পূণ্যাহের দিনে রাজকোষে জমা দিতেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আমলে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেওয়ান ও তালুকদারদের পরিবর্তে

‘ হেডম্যান’ পদ সৃষ্টি করা হয়। তখন অঞ্চলগুলোকে এককেটি মৌজায় পরিণত করা হয়। এই মৌজার প্রধান ছিলেন হেডম্যান। ফলে সেখানে তখন চাকমাদের সামাজিক কাঠামো ‘রাজা - হেডম্যান - কারবারী’ রূপ ধারন করে। ত্রিপুরাতেও রাজআমলের শেষ দিকে ‘সর্দার’ বা দেওয়ান পদের পাশাপাশি তালুকদার পদ সৃষ্টি করা হয়। সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল কেবল মাত্র চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের জন্য। এই তালুকদারগণ মহারাজার পক্ষে নিজ নিজ তালুক থেকে খাজনা সংগ্রহের উত্তরদায়ী ছিলেন।

প্রচলিত সমাজবিধি ঃ গ্রাম্য সমাজ

গ্রামের প্রধান হলেন ‘কারবারী’। বলা যায় — ইনি গ্রামের দায়িত্ব প্রাপ্ত শান্তিরক্ষক। গ্রামের শান্তি রক্ষার ব্যাপারে ইনি সর্বদা তৎপর থাকেন। তিনি গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন। গ্রামবাসীরাও তাঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে চলেন। গ্রামের অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন — বৌদ্ধভিক্ষু, লোরি বা লুরি (তান্ত্রিক বৌদ্ধপুজারী), বৈদ্য (গ্রাম্য চিকিৎসক), অঝা (গ্রাম্য পূজারী), গেংখুলি (চারণ কবি ও লোকগীতি গায়ক), পাদু অঝা (ধাত্রী) — এঁরা সকলেই গ্রামবাসীদের সম্মান পেয়ে থাকেন।

প্রাচীনকালে চাকমাদের গ্রামীন সমাজে গভীর ঐক্যবোধ ও ঘনিষ্ঠতা বিরাজমান ছিল। তখনকার দিনে গ্রামগুলো গড়ে উঠতো গঝা ও গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে। তাই গ্রামবাসীরা পরস্পরের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা ও মমত্ববোধ খুঁজে পেতো। ফলে গ্রামের যে কোন পারিবারিক ও সামাজিক কাজে গ্রামবাসীরা পরম আন্তরিকতা ও ঐক্যবদ্ধ ভাবে এগিয়ে আসতো। এ সম্পর্কে এখানে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

১. পানবাদা ঃ— প্রাচীন সামাজিক রীতি অনুযায়ী গ্রামের কোন পরিবারে ছেলে বা মেয়ের বিবাহের আলাপ থেকে আরম্ভ করে বিবাহের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রথমে কারবারীকে আমন্ত্রণ জানানো হতো। এক্ষেত্রে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পাত্র বা পাত্রীর পিতা গ্রামের মোড়ল তথা কারবারীকে এক বোতল মদ ও একটি ‘পানবাদা’ (পান ও সুপারীর পুঁটলি) উপঢৌকন স্বরূপ সমর্পন করেন। এই সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোড়লকে আমন্ত্রণ জানানোর ফলে এই বিবাহের যাবতীয় কাজকর্মে সাহায্য - সহায়তার দায়-দায়িত্ব গ্রামবাসীর উপর বর্তাতো। এমন কি বিবাহের শান্তি -শৃঙ্খলা রক্ষার দায় ন্যস্ত হয়ে যেতো গ্রামবাসীদের উপর।

২. মালেইয়া ঃ— গ্রামের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পরিবারের কেউ জুমের কাজে অথবা হল-কৃষি কাজে সংকটাপন্ন হলে গ্রামের কারবারীর নিকট আবেদন জানিয়ে সাহায্য চাইলে গ্রামবাসীরা কাজের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতো। এই সাহায্য চাওয়াকে বলা হয় ‘মালেইয়া’। নিয়ম অনুযায়ী তখন প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তি এক বা দু’দিনের জন্য কাজ করে চলে যেতো। সম্ভব হলে সাহায্য প্রার্থীর বাড়িতে ছোট - খাটো ভোজের ব্যবস্থা হতো।

৩. ভাত মজা দেনা ঃ — ‘ভাত মজা’ শব্দের অর্থ হলো কলাপাতা মুড়িয়ে ভাতের পুঁটলি করা। চাকমা সমাজে কোন প্রসূতি সন্তান প্রসব করলে তার আত্মীয় - স্বজন ও পাড়া পড়শীরা তার জন্য পুষ্টিকর তরকারী সহযোগে ভাতের মোচা শুভেচ্ছা স্বরূপ দিতে যায়। এতে প্রসূতি ও নবজাতকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই প্রথাকে চাকমারা ‘ভাতমজা দেনা’ বলে।

৪. বালা ধারাধারি ঃ— জুম বা হলকৃষি কাজে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আনন্দ উপভোগের জন্য মিলেমিশে কাজ করার নিয়ম চাকমা সমাজে প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থায় চার -পাঁচ ঘরের যুবকরা মিলে একত্রে কোন এক জনের ক্ষেতে একনাগাড়ে দু'তিন দিন ধরে কাজ করে। এবং এইভাবে তারা পর্যায়ক্রমে ঐ চার-পাঁচ সদস্যের সবার ক্ষেতে কাজ করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় সম্মিলিতভাবে কাজ করাকে বলে বালা ধারাধারি।

৫. সাগা ঃ — 'সাগা' শব্দের অর্থ চিহ্নিতকরণ। জুমচাষের পক্ষে উপযোগী কোন অরণ্যভূমির একটুখানি অংশ সাফ করে তাতে দু'টকুরো বাঁশ কেটে ক্রুশচিহ্নের মতো আড়াআড়ি ভাবে সেখানে পুঁতে এলেই এই অরণ্যময় স্থানটি ঐ ব্যক্তির মালিকানা স্বত্বরূপে চিহ্নিত হয়ে যায়। তখন গ্রামের প্রতিবেশী কেউ এই চিহ্নিত স্থানকে জুমচাষের জন্য নির্বাচন করেন না। এইভাবে অরণ্যে ফুটন্ত মাশরুমের ক্ষেত্র, মাছধরার স্থান ইত্যাদি সাগা দিয়ে চিহ্নিত করা হলে গ্রামবাসীরা সাগা দেওয়া ব্যক্তির অধিকার মেনে নেন।

৬. থানমানা ঃ— গ্রামের শান্তি, স্বস্তি ও কল্যাণার্থে প্রতি বছর গ্রামবাসীরা মিলে গ্রামের প্রবহমান নদীতে এক সর্বজনীন পূজার আয়োজন করেন। এই বাৎরিক পূজার নাম 'থানমানা'। প্রত্যেক পরিবার এই পূজার চাঁদা অথবা চাল, মুরগি, ছাগল, শুকর (সামর্থ্য অনুযায়ী) ইত্যাদি উপাচার দিয়ে পূজার আয়োজন করা হয়। এতে 'থান' অর্থাৎ ক্ষেত্র দেবীসহ চৌদ্দজন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। গ্রামের প্রবীন ওঝা এই পূজা সম্পাদন করেন। পূজা শেষে কারবারীর গৃহে বিপুল ফুর্তি ও আনন্দ - উৎসবের মধ্য দিয়ে একত্রে খাওয়া দাওয়া হয়। এইভাবে গ্রামবাসীদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

গঝা ও গুথি

চাকমাদের সমাজ-কাঠামোর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভিত্তি হলো 'গঝা' (Sept) এবং 'গুথি' (Clan) ভিত্তিক সমাজবন্ধন। সমগ্র চাকমা সমাজে ৪৪ টি গঝা (স্যার রিজল ঃ ১৮৯১) এবং ১৩৩ টি 'গুথি' (সতীশ চন্দ্রঘোষ ঃ চাকমা জাতি -১৯০৯) বিদ্যমান। (প্রকৃত পক্ষে এই সংখ্যা দু'টি আরো বেশি)। গঝা শব্দের অর্থ জনসমষ্টি বা দল। শব্দটি সম্ভবত আরাকানী শব্দ 'গংসা' থেকে এসেছে। আরাকানী ভাষায় 'আগং', সংক্ষেপে 'গং' শব্দের অর্থ মাথা। আর 'সা' মানে সন্তান। এখানে 'সা' শব্দটি লোক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বহু মানুষের মাথা অর্থে জনসমষ্টি বা দল। আর 'গুথি' শব্দটি বাংলা 'গোষ্ঠী' শব্দের রূপান্তর। গঝা সংগঠনটির উদ্ভব সম্পর্কে বলা যায় — অতীতের কোন এক সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা একত্রে মিলে একেকটি দলপতির অধীনে সংঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করতো। তখন ঐ দলপতির নামে অথবা বসতি স্থানের নামে গড়ে উঠেছে একেকটি গঝা। অপর দিকে গুথি বা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে একই উৎসজাত তথা রক্ত সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ গুথির নামাকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি, মাছ, অন্যান্য জলজ প্রাণী ও বৃক্ষাদির নাম লক্ষ্য করা যায়। তাতেই মনে হয়, আদিকালে গুথি নামের ঐ সমস্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ সমূহ তাঁদের নিজ নিজ গোষ্ঠীর 'টোটেম' রূপে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানে এই টোটেমের বিষয়টি মানা হয় না। তবে প্রতিটি গুথি তাঁদের ঐতিহ্যবাহী 'ট্যাবু' এখনও মান্য করে চলে।

চাকমা সমাজের এই গঝা-গুথির বন্ধনটি এতই প্রগাঢ় ও জরুরী যে, দু'জন অপরিচিত চাকমার হঠাৎ দেখা হলে প্রথমেই পরস্পরের নাম জানাজানির পর প্রচলিত অভ্যাস বশে অবশ্যই উভয়ে উভয়ের গঝা ও গুথির নাম জানতে চায়। পরস্পর একই গঝা ও গুথির লোক হলে তখন নিজ নিজ বংশধারার বিবরণ উল্লেখক্রমে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্কটি তারা জেনে নেয়। বলাবাহুল্য, সম্পর্কটি ঘনিষ্ঠতর হলে প্রথমজন এই নবাগত আত্মীয়টিকে অন্ততঃ একবার নিজ বাড়িতে আথিত্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাবেই, তাতে ব্যতিক্রম নেই। চাকমা সমাজের গঝা ও গোষ্ঠীভিত্তিক সুদৃঢ় এই বন্ধনটির রহস্য জানতে পেরে তাই নৃ-তাত্ত্বিক স্যার রিজলে মন্তব্য করেছেন — "সম্ভবত গ্রীক ও রোমানদের মত চাকমাদেরও তাদের ইতিহাসের শুরুতে দলগুলো সংগঠনের একক হিসেবে নির্দিষ্ট জনস্বার্থ ভূমিকা পালন করেছিল।" বাস্তবিকই, চাকমাসমাজে স্মরণাতীত কাল থেকে গঝা-সংগঠনের প্রধানরাই চাকমা রাজার অধীনে থেকে চাকমা জন-সাধারণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যাহোক, এখানে চাকমাদের গঝা ও গুথি সমূহের নামগুলো তুলে ধরা হলো —

গঝা	গুথি
১। বগা	ধুর্যা, নিনান্দ্যা, কাঠেওয়া, রামদালিয়া, মুলি খাজা, ভেলে, কাত্তুয়া, বোয়া, নাদুকতুয়া, পোয়াকামার্য্যা ইত্যাদি।
২। দার্য্যা	কোমরেং, নাদুকতুয়া, কাওয়া ইত্যাদি।
৩। পোমা	জান্দর, গুইয়া, তুদা ইত্যাদি।
৪। পুয়া	কাক্কিনা, ফাত্তুয়া, কয়ল ইত্যাদি।
৫। চেক্‌বা	ভিদ্দিলী, ওয়াংঝা, গজাল, পীড়াভাঙা, মেন্দর ইত্যাদি।
৬। তোন্যা	কুর্য্যা, ধুর্য্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।
৭। ওয়াংঝা	কাঙারা, শেঠ্যা, পুংঝা ইত্যাদি।
৮। ফেদুংজা	মুলিয়া, কবাল্যা, কালামানিক, উন্দুর তালা, কালাপিলা বাপ ইত্যাদি।
৯। লচ্চর	ভিদোলী, পুংঝা ইত্যাদি।
১০। বড়চেগে	খাট্যাল, লোহ্‌কথা, চেলীপুনা, উন্দর তালা, ইত্যাদি।
১১। কাম্ভেই	মেন্দর, কালাপেনজাঙি ইত্যাদি।
১২। মুলিমা	ধাভানা, মিধ্যা, নোয়ান্যা, কার্বুয়া, সিংহাসর্প, আনন্দ্যা, কলা, রাঙা সিলন্যা, বাদালী, শুক্য, মানিয়া, চাদং, করম্যা, সল্যা, পজা, ইজ্যাপজা, ক্ষাংথং, বামন চেগে, সেবার্যা, বামন চেগে, বেঙ ইত্যাদি।
১৩। মুলিমা চেগে	সকুয়া, শেলপাত্যা, শেলচ্যা ইত্যাদি।
১৪। বংঝা	কাঙারা, মোষচরা, চর্কডা ইত্যাদি।
১৫। ফাকসা	বালকা, ধরেবেজা, কলাসেম, কাঙ, তিনভেদা, বড়কুর্য্যা চিগোন কুর্য্যা ইত্যাদি।
১৬। আমু / আঙু	গোদা, ধুর্য্যা, মঘ, সিঙিরিপুনা ইত্যাদি।

১৭। খিয়্যং চেগে	চেদানী, চানে, দোজা, কবাল্যা, সম্সর্দাব, কাগনিকাল, রেৎকাবা।
১৮। লেবা	সুবক, লোয়া পাত্তয়া, ইত্যাদি।
১৯। উচ্চোরী	আগুনপুন ইত্যাদি।
২০। কুরাকুট্যা	নেন্দাব, সুরেশ্বরী, তেদৈয়া, আঘন্যাপুনা, কাউয়া, ভদং, ভুগু, ক্যক্দড়া, অমরী ইত্যাদি।
২১। নারান	পার্বুয়া, জাদি, পীড়াভাঙা, পেজাং, বাদালী, রাজাকাবা, সাদাঙা, তদেগা, লোরখজ্যা ইত্যাদি।
২২। রাঙী	লুয়া পাত্তুয়া, ভেঙেয়্যে, কাল, মেন্দর ইত্যাদি।
২৩। বুঙ	আমু, সরাইয়া, বরেইয়্যা, রমস্যা, কমস্যা, কেন, উজ ইত্যাদি।
২৪। কুদুগো	ভুলা, কালাবাঘা, পিজোরভাঙা ইত্যাদি।
২৫। লার্মা	পিড়াভাঙা, চার্য্যা, বগা, ভবা, তদেগা, সাঙজা, সাতভেইয়্যা, চাহ্রি, জাল্যা, ঘুন, তালুকদার ইত্যাদি।
২৬। পেদাংছরী	কুর্যা, মুলিয়া, পৈয়ব ইত্যাদি।
২৭। হৈয়্যা	জাল্যা, সল্যা, ইত্যাদি।
২৮। চাদং	সর্দার, শেচ্যা, রসিরি ইত্যাদি।
২৯। বাবুরা	বাবুরা, গজাল্যা, মানেইয়া, লোয়াকথা, ভগতপ, ভেজেইয়া প্রভৃতি ।
৩০। দাজ্যা	কোমরেং, নানুকত্তয়া, কাত্তয়া ইত্যাদি।
৩১। ধামেই	চাওন্যা, হাঘারা, সুরেশ্বরী, বাঘঅঝা, করেং গিরি, বান্যাবাক্, রাক্যবাপ, কাঙারা, হাতী, রোজেগা, কাংখং, পিড়াভাঙা, সকুয়া, ইত্যাদি।
৩২। চেগে	চৈদানী, ছানে, দোজা, সম, বেতকাবা, নেনাঙ্যা, কক্কেঙ্যা, বুগুল্যা, ইত্যাদি।
৩৩। বরবুয়া	কাংছুরি, ফেজেরা, বাদালি, রণপাগালা, মগ, বিলেইঘু, সাঙজা, কুঙুঝা, তভা, ফরা, বেঙ ইত্যাদি।
৩৪। বংসা	কাঙারা, সেত্যা, মোকচরা, চদগা, পংজা, ফেমা ইত্যাদি।
৩৫। হিয়াংগে	চৌধুনী, বাঙাল, নাবিত, চো-আজা, তিবিরা ইত্যাদি।
৩৬। ফেদুংঝা	মুলিয়া, কবাল্যা, কালামাণিক, উন্দুরতালা, কালাশিলা বাপ প্রভৃতি।
৩৭। ফাক্সা	বর্ ফাক্সা, গুরো ফাক্সা, বালসা, কেরেঙা, চামজ্যা, তিনভেদা, চেলা, কাঙ, বরইবেজা প্রভৃতি।
৩৮। খিয়েংচেগে	চানৈ, দোজা, কাগুনিকাল, সম ইত্যাদি।
৩৯। তেইয়্যা	চিলা, নাবালিকা, কাঙ, কলাসেম ইত্যাদি।

৪০। পুরান তেইয়্যা — তেইয়্যা, বামন, বহ্‌লা ইত্যাদি।
৪১। লেবা — গুথি নাম সংগৃহীত হয় নি।
৪২। ফেমা — গুথি নাম সংগৃহীত হয় নি।
৪৩। ফিত্তিংয়্যা — গুথি নাম সংগৃহীত হয় নি।
৪৪। বড় বুং — গুথি নাম সংগৃহীত হয় নি।
৪৫। বড় কাম্ভে — গুথি নাম সংগৃহীত হয় নি।
৪৬। চিগোন কাম্ভে — গুথি নাম সংগৃহীত হয় নি।

এখানে উল্লেখ্য যে, গুথি বা গোষ্ঠীর নামগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, একই গোষ্ঠীর নাম একাধিক গঝার মধ্যে রয়েছে। তার কারণ, একই গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের বসতি স্থান পরিবর্তন হেতু বিভক্ত হয়ে একাধিক গঝার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সেই কারণে 'বরবুয়ো' গঝার মধ্যে প্রায় সবগোষ্ঠীর নাম দেখতে পাওয়া যায়।

ভাষা

নৃ-তাত্ত্বিক বিচারে চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকেরা মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত হলেও তাদের ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার সমগোত্রীয়। তাই চাকমা ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার পালি, প্রাকৃত, পৈশাচী প্রাকৃত ও সংস্কৃতের এবং নব্য - ভারতীয় আর্যভাষার বাংলা, অসমীয়া ও হিন্দি ইত্যাদি ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে এই ভাষার শব্দভাণ্ডারের মধ্যে আরাকানী, ককবরক, থাই, অহোম ইত্যাদি ভাষার প্রচুর শব্দের সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো— মঙ্গোলীয় জাতি থেকে উদ্ভূত এই জনসমাজের মাতৃভাষা স্বাভাবিকভাবে মঙ্গোলীয় ভাষা-পরিবারভুক্ত হওয়ারই তো কথা? এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ্য যে, সামাজিক বিবর্তন ও জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভাষার পরিবর্তন ঘটে থাকে। এ ধরনের ভাষা - পরিবর্তন (ল্যাঙ্গুয়েজ শিফ্‌ট) - এর অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমাদের ঘরেব পাশের উদাহরণ — মেঘালয়ের খাসি আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর লোক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির উৎস অস্ট্রিক জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং, মনে করা যায়, চাকমাদের ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ শিফ্‌ট ঘটেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো — কবে থেকে এই পরিবর্তনের সুত্রপাত ঘটেছে?

চাকমারা দাবী করেন — তারা শাক্য বংশোদ্ভুত। পণ্ডিতদের অনেকেই এ কথাটির আমলই দেন না। হয়তো মনে করেন — স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধির অভিপ্সায় এই অহেতুক দাবী। যেই বংশে বুদ্ধের মতো মহামানবের আর্বিভাব ঘটেছে, তাঁর উত্তরসূরীদের এই ম্রিয়মান অবস্থা হবে কেন! কিন্তু, গিলগিট ও লাদাখের 'দ্রুক-পা' আদিবাসীরা যদি প্রাচীন সুসভ্য গ্রিক ও রোমানদের উত্তরসূরী হতে পারেন, চাকমাদের প্রাচীন কপিলাবস্তুর শাক্য বংশীয়দের উত্তর সূরী হওয়ার ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যের কী আছে? কারণ শাক্য বংশীরাও তো মঙ্গোলীয় জাতিভুক্ত এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত লোক ছিলেন।

সে যাহোক, ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা চাকমা ভাষাকে নির্দ্বিধায় ভারতীয় আর্যভাষার অর্ন্তভুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। তার মধ্যে আবার কেউ কেউ এভাষাকে বাংলার

'উপভাষা'(dialect) বা 'বিভাষা'(sub-dialect) রূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু, এটা কেবল বাংলার উপভাষা বা বিভাষা হতে যাবে কেন? বাংলাভাষার সঙ্গে চাকমা ভাষার যেমন ভাষাতাত্ত্বিক সাদৃশ্যগত সম্পর্ক, অনুরূপ সাদৃশ্য তো অসমীয়া ভাষার সঙ্গেও রয়েছে। তাই, এটাকে অসমীয়া ভাষার উপভাষা বলা হবে না কেন? তাহলে, তা কি কেবল বাংলা ভাষা-অঞ্চলের সঙ্গে তার বর্তমান ভৌগোলিক নৈকট্যের কারণে? সুতরাং এটা বলা সঙ্গত যে, চাকমা ভাষা ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বী-মাগধীর বিভিন্ন ভাষা-উপভাষার সমগোত্রীয় পৃথক একটি বর্গীকৃত (Classified) ভাষা।

চাকমা লিপি

চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব লিপিমালা রয়েছে। নাম — 'চাঙমা হরক' । লিপির সংখ্যা ৩৯ টি। এছাড়া রয়েছে স্বরবর্ণের চিহ্ন এবং সংখ্যা লিখনের দশটি লিপি। ঠিক কবে থেকে চাকমা সমাজে এই লিখন পদ্ধতি চালু হয়েছে, তা জানা যায় না। তবে এটা ঠিক যে, বহু প্রাচীনকাল থেকে লিপিচর্চার এই অভিজ্ঞান তাদের মধ্যে অবশ্যই প্রচলিত ছিল। কারণ, চাকমাদের মধ্যে এই লিপিতে লেখা বহুখণ্ড বিশিষ্ট 'আগরতারা' (প্রাচীন বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্মশাস্ত্র) 'তালিক শাস্ত্র'(ভেষজ চিকিৎসা শাস্ত্র), 'বৈদ্যালী পুথি,(মন্ত্র সাহিত্য), ' যোগ-কালাম' ও 'ফগিরি-কালাম' (যোগ শাস্ত্র ও নাড়ীতত্ব) , 'বিজোক' (জাতীয় ইতিবৃত্ত) ইত্যাদি পুঁথি খুঁজে পাওয়া যায়, যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় অজা (গ্রাম্যপূজারী) ও বৈদ্য (গ্রাম্য চিকিৎসক) উপাধিধারী লোকেরা তালপাতায় কিংবা তুলোট কাগজে লিখে রেখে ছিলেন। এগুলোর রচনাকাল উল্লেখ নেই। তবে, 'গোজেন লামা' - নামের হাতে-লেখা যে একখানি পুঁথি পাওয়া গেছে.তাতে রচনাকাল উল্লেখ রয়েছে এগার শো চুরাশি সাল অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দ।

চাকমাদের এই লিপিমালা প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মীলিপির উৎসজাত। এই লিপিব সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপি থেকে সৃষ্ট বার্মিজ, খামতি ও অহোম লিপির সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অন্যতম ভাষা-সমীক্ষক জি.এ গ্রিয়ার্সন তাঁর 'লিঙ্গয়স্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (১৯০১ খ্রিঃ) পুস্তকে চাকমা লিপি সম্পর্কে বলেছেন— কম্বোডিয়া, লাওস ইত্যাদি দক্ষিণ -পূর্ব এশিয়ার মন-খমের লিপির সঙ্গে চাকমালিপি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তুলনীয়। কেননা মন-খমের লিপিমালায় স্বরবর্ণের নির্দিষ্ট রূপ নেই। স্বরবর্ণের পরিবর্তে কেবল তার প্রতীক চিহ্নগুলোই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। চাকমা লিপির ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। চাকমা লিপিমালায় স্বরবর্ণের ব্যবহার সম্পর্কে গ্রিয়ার্সনের এই অভিমত পুরোপুরি সত্য। বর্তমানে চাকমা লিপিতে স্বরবর্ণের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও আজ থেকে একশো বছর পূর্বে কেবল স্বরবর্ণের প্রতীকগুলোই ব্যবহৃত হতো। তবে, এই বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য থেকে মন-খমের লিপি থেকে চাকমা লিপি উদ্ভবের কথা স্বীকার করা যায় না। কেননা অক্ষরের রূপ-সাদৃশ্যের দিক থেকে ব্রাহ্মীর, বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয় কদম্ব লিপির সঙ্গে চাকমা লিপির সাদৃশ্য অত্যন্ত প্রকট। তাই সঠিক ভাবে বলতে গেলে, চাকমা লিপির মূল উৎস ব্রাহ্মী হলেও তা ব্রাহ্মীলিপির দক্ষিণ ভারতীয় রূপ কদম্বলিপির ধারাই চাকমা লিপিতে বিদ্যমান। এর একটি সূত্রও অনুমান করা যায়। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী নাগাদ দক্ষিণ ভারত থেকে কদম্বলিপি সমুদ্র পথে ব্রহ্ম দেশে পৌছে গিয়েছিল। অপর দিকে, চাকমারা

চাক্‌মা বর্ণমালা

চ্যাঙ্গ্যা - ক | গুজাঙ্গ্যা - খা | চান্দ্যা - গা | তিনধাল্যা - ঘা | চিলাম - ঙা
দিধাল্যা - চা | মোজর্জ্যা - ছা | দিপদল্যা - জা | উরাউরি - ঝা | চিলাচ্যা - ঞা
দিহাদাত্ত - টা | ফুদাদিরাত্ত্ - ঠা | হাদুভাঙাত্ - ডা | লেজ্জভরাত্ত - ঢা | পেত্তুয়া - ণা
ঘঙসাত্ - তা | জগদাত্ত্ - থা | দোলনিয়ত্ত - দা | ভলমুয়াত্ - ধা | ফারবান্যা - না
পাল্যা - পা | উবরপদল্যা - ফা | উবরমুয়া - বা | চেইরধাল্যা - ভা | বুগডপদলা - মা
জিল্যা - যা | দিদার্জ্যা - রা | ভলমুয়া - লা | বাঝোনা - ওয়া | উননদুয়া হা
ছুদিবুক্যা - সা | চিমোজ্যা - য়া

অ | আ | ই | উ | এ
ও | ঐ

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে উচ্চ-ব্রহ্মদেশে বসবাস করতেন। সুতরাং মনে করা সঙ্গত যে, অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে কোন এক সময় চাকমারা বার্মিজদের কাছ থেকে তাঁদের এই লিপিমালাটি গ্রহণ করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা

চাকমারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে। চাকমাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছে সেই ব্রিটিশ আমাল থেকে। বৃটিশরা চাকমা অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলার মুখ্য প্রশাসনিক কার্যালয় স্থাপন করেন এবং ১৮৬২ সালে সেখানে প্রথম 'চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুলের' প্রতিষ্ঠা করেন। তাতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত 'চাকমা ক্লাসে' বাংলা ও ইংরাজী এবং 'বার্মিজ ক্লাসে' বার্মিজ ও ইংরাজী পড়ানো হতো। বলা যায়, ঐ সময় থেকেই চাকমাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষালাভের সূচনা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'শিক্ষাঙ্গনে চাকমা জাতির অগ্রগতি' (কুমুদ বিকাশ চাকমা ঃ ২০০২) নামের পুস্তক থেকে জানা যায়— পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের মধ্যে প্রথম এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন রাজা ভুবন মোহন রায় ও অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান ১৮৯৩ সালে এবং মহিলাদের মধ্যে মনোরমা দেওয়ান ১৯৩৮ সালে। প্রথম স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পুরুষদের মধ্যে যামিনী রঞ্জন দেওয়ান ১৯১৩ সালে এবং মহিলাদের মধ্যে অঞ্জলি তালুকদার ১৯৬৩ সালে কোলকাতা থেকে। ত্রিপুরায় চাকমাদের মধ্যে প্রথম মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সত্যপ্রিয় চাকমা ১৯৫৬ সালে এবং মহিলাদের মধ্যে প্রতিমা দেওয়ান ১৯৬৭ সালে। ত্রিপুরায় চাকমা এলাকায় প্রথম নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উত্তর জেলার মাছমারায় ১৯৩৫ সালে। ভারতের মধ্যে প্রথম বিদেশ সেবা আয়োগ (আই. এফ. এস) প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হন কোলকাতা থেকে মুকুর কান্তি খীসা ১৯৫৮ সালে। তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদূত হিসেবে মধ্য- প্রাচ্য ও ল্যাটিন আমেরিকায় কর্মরত ছিলেন এবং ভারতের প্রথম চাকমা আই. এ. এস, (মনোনীত) হন ২০০৪ সালে নগেন্দ্রলাল চাকমা মিজোরাম থেকে।

শিক্ষায় অগ্রসরতার দিক থেকে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা অনেক এগিয়ে। সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উচ্চশিক্ষা ধারী চাকমা ইউরোপ আমেরিকায় পাড়ি দিয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অন্যান্য সরকারী -বেসরকারী দপ্তরে কাজ করছেন।

মাতৃভাষায় শিক্ষা

ত্রিপুরায় ১৯৮৪ থেকে চাকমাদের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য ত্রিপুরা সরকার 'চাকমা ভাষা উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটি', গঠন করলেও লিপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরোধের কারণে চাকমা মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রক্রিয়া কুড়ি বছর বিলম্ব হয়। অবশেষে ২০০৩ থেকে বাংলা লিপিতে এখানে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান চাকমাদের মধ্যে চালু হয়। অপরদিকে মিজোরামে চাকমা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ১৯৯৯ থেকে চাকমা লিপিতে ও চাকমা ভাষায় শিক্ষাদান চালু হয়। বর্তমানে সেখানে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মাতৃভাষায় ও ইংরাজীতে পড়াশুনা চলছে। পূর্বোত্তরের অপর রাজ্যে অরুণাচল প্রদেশে চাকমাদের মধ্যে হিন্দী ও ইংরাজীতে পড়াশুনো চলছে।

জীবন ও জীবিকা

চাকমাদের জীবনধারা মূলত ছিল জুমকেন্দ্রিক। কিন্তু তৎসত্বেও তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন একই স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। আশ-পাশের এলাকায় অরণ্যভূমিতে বন-জঙ্গল কেটে তাঁরা জুম বা ক্ষেত্রান্তরী চাষ করলেও এক সময় তাঁরা তাঁদের নির্দিষ্ট গ্রামে চলে আসতেন। কলেরা, বসন্ত, চরম খাদ্যাভাব বা দূর্ভিক্ষের প্রার্দুভাব না হলে সহজে তাঁরা নিজগ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যান না। সতত সঞ্চরণশীল পরিযায়ী জীবনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এদের সমাজ জীবনে যুথবদ্ধ যাপনের এক সুসংবদ্ধ জীবন-প্রণালী স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেছে। তাই তো, তেমন সুপরিব্যাপ্ত না হলেও অন্তত লোকগ্রাহ্য গ্রামীণ শিল্প-সংস্কৃতির এক প্রবহমান ধারা, লোকসাহিত্য ভিত্তিক জীবনভাবনা ও জীবনচর্যা এবং কম-বেশী লিখিত সাহিত্যের ঐতিহ্য এদের মধ্যে রয়েছে।

চাকমাদের জুমকেন্দ্রিক জীবন ধারায় অরণ্যের স্থান পবিত্রতম। তাই চাকমাদের লৌকিক

ধারনা অনুযায়ী - তাঁদের অধিকাংশ লৌকিক দেব-দেবীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হল অরণ্যভূমি। এঁরা কেউ থাকেন বৃক্ষকে আশ্রয় করে, কেউ অরণ্যের স্যাঁতস্যাঁতে জলাভূমিতে, কেউ নদীর পারে, কেউ উঁই ঢিবিতে কিংবা কেউ বৃক্ষের ডালে। স্বয়ং অরণ্য দেবতা 'হাজংমা' অবস্থান করেন পরগাছাময় প্রকাণ্ড বৃক্ষে। তবে, অরণ্যের যে কোন দেবী ও দেবতা ওঝার আহ্বানে পূজাস্থলে সংস্থাপিত পত্রময় যে-কোন বৃক্ষের ডালে খুশিমনে চলে আসেন ভক্তদের নৈবেদ্য গ্রহণার্থে। অরণ্যে উপজাত বৃক্ষের বাকল, রস, মূল, ফুল, ফল, পাতা, বীজ, লতা-গুল্ম ইত্যাদি দিয়ে তৈরী ভেষজ ঔষধের দ্বারা রোগ নিরাময় হয়। অভাবের দিনে অরণ্যের ফল-মূল তাঁদের বিকল্প খাদ্য যোগায়। সংস্কৃতির অন্যতম এক আদিম উপাদান হল লোকগীতি। চাকমা ভাষায় তার নাম উভোগীত। অর্থ অরণ্যগীতি। তাই বলা যায় অরণ্যই ছিল এই জনসমাজের আদি আশ্রয়স্থল। কেউ কেউ তাই চাকমাসহ সকল আদিবাসী সংস্কৃতিকে বলেন 'অরণ্য সংস্কৃতি'।

কোমর তাঁত বুনছেন চাকমা যুবতী

জীবন-বৃত্ত

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গ্রামের একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত চাকমা স্বাভাবিক পরিবেশে কী কী অবস্থার মুখোমুখি হতে পারে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো। যেমন— মাতৃগর্ভ থেকে শিশুটি যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সন্তানটির নাড়ী কেটে দেন ধাত্রী। যদি ছেলে হয়, সন্তানের পিতা ও পরিবারের সকলে অধিক খুশি হন। কেননা, সকলের ধারনা এই ছেলে বংশ রক্ষা করবে। কিন্তু মায়ের কাছে ছেলে বা মেয়ে উভয়ই সমান। সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানকে কোন কোন সময় নামকরণ করেন স্বয়ং ধাত্রী (অঝা)। পরিবারের লোকদের সে নাম পছন্দ না হলে পরে পাল্টিয়ে দেন। উল্লেখ্য, সাধাবণত পিতা বা মাতা সন্তানের নামকরণ করেন না। প্রচলিত বিশ্বাস

এই যে, তাতে নাকি সন্তান সৌভাগ্যবান হয় না। তাই পরিবারের কোন বয়স্ক সদস্য বা অন্য কোন বিজ্ঞ গুরুজন সন্তানটির নামকরণ করে দেন। সদ্য সন্তান প্রসূত মায়ের দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিশুটির সুস্বাস্থ্যের কামনায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় জনেরা এবং পাড়া-পড়শীদের অনেকেই পুষ্টিকর ও সুখাদ্য সহযোগে 'ভাত মজা' (ভাতের পুঁটলি) পরপর প্রায় পক্ষকাল বা একমাস যাবৎ প্রসূতি মা-কে দিয়ে যান। তাতে একদিকে যেমন প্রসূতির স্বাস্থ্যের উপকার হয়, তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সুপ্রতিবেশী সুলভ সম্প্রীতি গভীর হয়।

শিশু-সন্তানের বয়স দেড়-দু'মাস হলে তখন প্রসূতি মায়ের পরিশুদ্ধিমূলক 'ঘিলা-কজই পানি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ধাত্রী প্রসূতি মা-কে পাশের নদীতে নিয়ে গিয়ে বিধি সম্মত আচার পালন ও মন্ত্র পড়ে নদীর জলে স্নান করান। সেদিন ধাত্রী বা অঝা শিশু-সন্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে মায়ের কোলে তুলে দিয়ে আর্শীবাদ করেন। বিনিময়ে প্রসূতি মা ধাত্রীকে অঙ্গবস্ত্র (পিনোন-খাদি), যৎসামান্য টাকা এবং এক বোতল মদ উপহার দেন। সেদিন আত্মীয়জন ও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীদের নিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়। শিশুর বয়স এক-দু বছর হলে তাকে দোলনায় তোলা হয়। তখন থেকে মা, মাসি , পিসি অথবা ঠাক্‌মা -ঠাকুর দিদিরা শিশুকে দোলনায় দুলিয়ে 'অলি' (ঘুমপাড়ানি গান) শোনাতে থাকেন। তাতে ক্রন্দরত শিশুটি ঘুমিয়ে পড়ে। মাতৃদুগ্ধ পান করতে করতে শিশুটি বড় হয়। এক সময় সে শিশু অবস্থা থেকে হয় বালক। তখন সে মা, পিসি, ঠাকুরদিদির কাছে রামকথা শোনে, পশ্চন (রূপকথা) শোনে। বালকের কল্পনার জগৎ ক্রম-প্রসারিত হয়। বন্ধুদের সঙ্গে সে রাম-রাবণের খেলা ও অন্যান্য খেলা খেলে। এরপর সে কিশোর থেকে তরুণ হয়। এই বয়সে একবার গ্রামের বৌদ্ধ-মন্দিরে (কিয়োং-এ) গিয়ে তাকে ধর্মীয় প্রথা মতো 'চামিনি'(শ্রমণ) হতে হয়। মন্দিরের যাবতীয় ধর্মীয় আচার পালন করে মুণ্ডিত মস্তক হয়ে এবং গৈরিক বসন শরীরে ধারণ করে তাকে সাত, নয় অথবা এগার দিন মন্দিরে ব্রহ্মাচারীর মতোই থাকতে হয়। অন্তিম দিনে বাড়ীতে পাড়া-পড়শীদের ডেকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের আহার নিবেদন ও দান-দক্ষিণা দিয়ে ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়। এবপর যুবক বয়স। এই বয়সে যুবক ছেলেটি সাধারণত বাড়িতে কমই রাত্রিযাপন করে। পাড়ার কোন বন্ধুর বাড়িতে অন্য যুবকদের সাথে দলবেঁধে তারা একত্রে শোয়। আগেকার দিনের যুবক এইভাবে গ্রামের সকল যুবকরা মিলে গ্রামের একপাশে তৈরি উঁচু টংঘরে আনন্দ-উৎসব ও নাচ-গানের মাধ্যমে রাত্রি যাপন করতো। তখনকার দিনে ঐ উঁচু টংঘরের নাম ছিল 'জহ্‌লতুঙি' (youth dormitory) । এখন সে ব্যবস্থা নেই। তাই এই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে বন্ধুর বাড়িতে অন্য যুবক বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে রাত্রিযাপন করে। তবে এই বিকল্প 'জহল তুঙি ঘরটি তার নিজের গৃহও হতে পারে।

এই বয়সে যে-কেউ সঙ্গিনী লাভের আকাঙ্খী হতেই পারে। তাই যুবকটি তখন থেকে জুমের কর্মক্ষেত্রে, কোন প্রতিবেশীর বিবাহ অনুষ্ঠানে, গ্রামীণ মেলায় অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মনে মনে ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনীর সন্ধান করতে থাকে। এই অবস্থায় কোন যুবতীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেলে বা পছন্দ মতো কারোর সন্ধান পাওয়া গেলে সেই খবরটি ঠাকুরদিদি, ঠাকুর দাদা কিংবা ভগ্নিপতির মাধ্যমে মা-বাবার কানে পৌঁছে যায়। তখন মা-বাবা বা অন্য গুরুজনদের দ্বারা ঐ যুবতীর পিতা-মাতার নিকট খবরটি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পাত্রীর পিতা এ সম্পর্কে

খোঁজ খবর নিয়ে ভালো -মন্দ একটি প্রত্যুত্তর পাঠান। সম্মতিজ্ঞাপক খবর হলে পাত্রের পিতা তার নিজ বন্ধু-বান্ধব ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এক-দু'জনকে নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ আলাপের জন্য এক বোতল মদ ও সামান্য উপহার সামগ্রী সহ পাত্রীর পিতার গৃহে পৌঁছে যান। প্রথামতো এভাবে তিনবার বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে যেতে হয়। অন্তিম বারে উভয় পক্ষের গ্রামের মোড়ল ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের উপস্থিতিতে বিবাহের দিন-ক্ষণ ও 'দাভা' (পাত্রী পণ অর্থাৎ পাত্রের পিতা কর্তৃক পাত্রীর পিতাকে এই পণ দিতে হবে) নির্ধারিত হয়। অন্যকোন অসুবিধা দেখা না দিলে নির্দিষ্ট দিনে পাত্র ও পাত্রী এই উভয় পরিবারে বিবাহভোজ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করা হয়। তবে বিবাহের মূল অনুষ্ঠানটি হয় পাত্রের পিতার গৃহে। এই অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'চুমুলাং'। সমগ্র বিবাহ-পর্বে পাত্রও পাত্রীকে পরিচালনা করার জন্য একজনকে নিযুক্ত করা হয়। তিনি সাধারণত পাত্রের ভগ্নিপতি সম্পর্কের হয়ে থাকেন। এই ব্যক্তিকে বলা হয় 'সাভালা'। বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবার পর তিন-চার দিনের মাথায় পাত্র- পাত্রীকে সাভালা, পাত্রের ছোট বোন (জেঠতুতো বা খুড়ততো হতে পারে), ঠাকুর দিদি (শারীরিকভাবে সক্ষম থাকলে) গ্রামের একজন মধ্যবয়সী মহিলা ইত্যাদিদের সঙ্গে নিয়ে প্রয়োজনীয় মদ্য পানীয় ও পিঠে-পায়েস ইত্যাদি উপহার সামগ্রী সহ পাত্রীর পিতার বাড়িতে যেতে হয়। এই বেড়াতে যাওয়াকে বলা হয় 'বিয়াসুধভাঙা'। এরপর আরেকবার অর্থাৎ বিঝুর দিনে নব-দম্পিতিকে প্রায় একই দ্রব্য- সামগ্রী ও লোকজন নিয়ে পাত্রীর পিতার বাড়ীতে বেড়াতে যেতে হয়। তাকে বলা হয় 'বিঝু-বেড়ান'।

বিবাহের পর এক-দু' বছরের মাথায় নব-দম্পত্তি হয়তো প্রথম সন্তানের অধিকারী হয়। এরপর থেকে এই নব-দম্পতিকে সমাজের একজন সদস্য ও সদস্যা রূপে গণ্য করা হয়। তখন স্বামী-স্ত্রী যথাক্রমে 'পরবাপ'(জনক) এবং 'পর্‌মা'(জননী) রূপে চিহ্নিত হন। লোকে তাঁদের সন্তানের নামে অমুকের পিতা ও অমুকের মাতা বলে ডাকবে। তখন থেকে এই 'পরবাপ' লোকটি প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে পারেন। শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গেলেও আত্মীয়জনেরা মদ্য পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করে থাকেন। এই বয়সে লোকটির পারিবারিক ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব বেড়ে যায়।

লোকটি তাঁর পারিবারিক জীবনে হয়তো চার-পাঁচ কিংবা ততোধিক সন্তান-সন্ততির জনক হয়ে যান। কেননা জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন বালাই নেই। এইভাবে স্বাভাবিক জীবন প্রক্রিয়ায় ষাট-সত্তর বয়সে এক সময় লোকটি পরলোক গমন করেন। ছেলে, নাতি-নাতনী এবং আত্মীয়রা মিলে প্রথামতো দাহকার্য ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু ডেকে এনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। এরপর লোকটির আত্মা কেবল মাত্র বছরে একবার এই পরিবার থেকে পিণ্ডভোগের অধিকারী হয়।

সমতলে চাষ

ত্রিপুরায় চাকমাদের মধ্যে সমতলে চাষাবাদ শুরু হয়েছে খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। সম্ভবত চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ধীরে ধীরে ত্রিপুরার চাকমা অধ্যুষিত সমতল এলাকায় হলকর্ষণের মাধ্যমে চাষাবাদ শুরু হয়। তবে হলকর্ষণ ব্যতীত সমতল এলাকায় লুঙ্গা জমিতে একধরণের জলজ লম্বা খড় জাতীয় ধানের চাষ চাকমাদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই প্রচলিত

ছিল। এই চাষপদ্ধতির নাম ছিল 'গর্জা খুন্দো'। এই প্রক্রিয়ায় ধান ও মাছের চাষ একসঙ্গেই করা যায়। যেমন, প্রথমে চাকমারা বৈশাখ - জেষ্ঠ্যমাসে দুই পাহাড়ের মাঝখানের লুঙ্গা ধরনের সমতল জায়গায় বন-বাদাড় ও ঝোঁপ -ঝাঁড় কেটে নেয়। তারপর দীর্ঘ মাস দু'এক তা রৌদ্রে শুকানোর পর আগুনে পোড়া দেয় এবং পোড়া জায়গায় মোটা কাঠগুলো সাফ করে নেয়। এরপর এই লুঙ্গার নালাটির উপর বাঁধ দিয়ে জল জমতে দেয়। এইভাবে লুঙ্গাটি জলে ডুবিয়ে মাস খানেক রেখে দেয়। এরপর আশ্বিন - কার্ত্তিক মাসে 'গর্জা' নামের বিশেষ এক প্রজাতির ধান গেঁজানো অবস্থায় বাঁধের এই স্থিরজলে ছড়িয়ে দেয়। এর তিন-চার দিনের মাথায় বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়া হয় এবং তাতে যা মাছ জন্মায় তা ধরা হয়। এ দিকে ধানের চারাগুলো ধীরে ধীরে পাতা মেলতে থাকে। এরপর বাঁধটি পুনরায় বেঁধে দেওয়া হয়। এদিকে ক্রমশঃ জল বাড়তে থাকে এবং ধানের চারাগুলো মাথা উঁচু করে বেড়ে উঠতে থাকে। জলস্তরের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রেখে ধান গাছগুলো বড়ো হয়। পৌষ মাস নাগাদ এই ধান পেঁকে যায়। এরপর পুনরায় বাঁধের জল ছেড়ে দিয়ে প্রথমে মাছগুলো নালা থেকে ধরে নিয়ে গেরস্থ ধানের ফসল ঘরে তুলে নেন। উল্লেখ্য, এই চাষ ব্যবস্থা নিম্ন-ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে অধিক প্রচলিত ছিল। ১৮৫০ সাল নাগাদ ব্রিটিশরা ব্রহ্মদেশের দখল নিলে ধানচাষের এই আদিম পদ্ধতির পরিবর্তে তাঁরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে কর্মঠ মুসলমান হল চাষীদের সেখানে নিয়ে যায় এবং কয়েক দশকের মধ্যে সেখানে অপর্যাপ্ত ধান উৎপাদন করে, তা তখনকার সময়ে ব্রিটিশ ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র রপ্তানি করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মদেশ থেকে আগত অরুণাচলপ্রদেশের খামতি ও সিংফো আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের ধান ও মাছ একসঙ্গে চাষ করার আদিম পদ্ধতি এখনো দেখা যায়।

বর্তমানে ত্রিপুরায় চাকমাদের মধ্যে প্রায় সত্তর শতাংশ পরিবার হলকৃষির সঙ্গে যুক্ত। তার মধ্যে অধিকাংশই প্রান্তিক চাষী। তবে হলকৃষির সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলোই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সঠিকভাবে নিতে পারছে।

অন্যান্য জীবিকা

চাকমাদের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হলেও উচ্চপদে আসীন কর্মচারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। আশীর দশক পর্যন্ত চাকমাদের মধ্যে আরক্ষা ও সামরিক বিভাগে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। বর্তমানে এই সংখ্যাটি ক্রমশঃ বাড়ছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে এদের এখনো কোন আগ্রহ সঞ্চারিত হয়নি। ফলে বলা যায় ত্রিপুরায় চাকমাদের মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যা শূণ্য। পূর্বে জুমচাষ ও সমতলে কৃষিকাজ ব্যতীত চাকমা সমাজের লোকেরা অন্যকোন পেশার সঙ্গে আদৌ যুক্ত ছিল না। এখন কিছু কিছু পরিবার মাছ চাষের দিকে ঝুঁকছে। দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া অঞ্চলে এবং উত্তর জেলার পেঁচারতল ব্লকের নবীন ছড়া অঞ্চলে অল্প সংখ্যক চাকমা পরিবার সরকারী প্রকল্পের অধীনে রাবার চাষে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে।

বিবাহ

বিবাহ চাকমা সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। সুস্থ ও সামাজিক বিধিসম্মতভাবে বিবাহসম্পন্ন হওয়ার জন্য সমাজ তথা গ্রামবাসীর একটা দায়বদ্ধতা থাকে। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষ এই দুই পরিবারের মধ্যে বিবাহের আলোচনা চূড়ান্ত হয়ে যাবার পর উভয় দিকের গ্রামবাসীরা

সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিবাহকার্য্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। চাকমা সমাজে এই বিবাহ অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত লৌকিক বিধিব্যবস্থা ও আচার পালনের মধ্যদিয়ে সম্পন্ন হয়। তাতে বৌদ্ধ-পুরোহিতরা অনুপস্থিত থাকেন।

চাকমা কোমর তাঁতের টানা অবস্থার একটি দৃশ্য

চাকমাদেব বিবাহের বীতি-নীতিসমূহ খুবই অদ্ভুত ও চিত্তাকর্ষক। অবশ্য প্রাচীন কালে যে-সমস্ত সামাজিক বীতিনীতি প্রতিপালিত ছিল তা কালেব বিবর্তনে অনেকগুলো হারিয়ে গেছে বা বদল হয়েছে। উদাহবণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, আগেকার দিনে বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্রীব পিতা-মাতাব পক্ষ থেকে যে-হারে 'দাভা' অর্থাৎ পণেব টাকা এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যাদি, যেমন পাত্রীর সকল মামা ও কাকাদেব জন্য পবিধেয বস্ত্র দাবী করা হতো (যাকে বলা হতো 'মোইল্যাপাব ও 'খুত্তোপাক' ইত্যাদি), তা কালের গতিতে শতাধিক বৎসর পূর্বে অচল বা বাতিল হয়ে গেছে। এ ধরনের পরিবর্তনেব পবেও বর্তমানে যা আছে, তা যথেষ্ট আকর্ষণীয ও মৌলিকত্ব দাবী রাখে। এখানে আজকের যুগেব একটি বিবাহের সূচনা থেকে অন্তিম পর্ব অবধি ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্তরূপ তুলে ধরা হলো।

· বিবাহে সাধারণত অভিভাবকদের অভিমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয। বিবাহ আলাপের সূচনাপর্বে পছন্দের পাত্রীর পিতার নিকট প্রাথমিক মতামত যাচাই করার জন্য আত্মীয় বা বন্ধুশ্রেণীর এক ব্যক্তিকে পাঠানো হয়। ইনি কথাপ্রসঙ্গে পাত্রের পিতার ইচ্ছার কথাটি পাত্রীর পিতার নিকট ব্যক্ত করেন। পাত্রীর পিতা যদি আকারে-ইঙ্গিতে সম্মতিজ্ঞাপক মনোভাব প্রকাশ করেন, তখন একদিন পাত্রের পিতা স্বস্ত্রীক এবং এক-দু'জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে একবোতল মদ ও খাদ্য জাতীয উপহার সামগ্রী নিযে পাত্রীর পিতার বাড়িতে আনুষ্ঠানিক বিবাহ আলাপের জন্য

উপস্থিত হন। বিবাহের আলাপ নিয়ে প্রথমবারের জন্য পাত্রীর পিতার বাড়িতে যাওয়াকে বলে 'বৌ-চাহ্না' এবং প্রথম বিবাহ আলাপকে বলে 'একপুর'। এই দিনের আলোচনায় দ্বিতীয়বারের অর্থাৎ 'দি-পুর'-এর আলোচনার তারিখ নির্ধারিত হয়। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার দিনেও পাত্রের পিতা মদ্যপানীয়, কিছু পরিমাণ পিঠে জাতীয় খাদ্যদ্রব্য, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন এবং দু'একজন বিচক্ষণ গ্রামবাসী সঙ্গে নিয়ে যান। এই পর্বের আলোচনায় পাত্রীর পিতাকে প্রদেয় 'দাভা (কন্যাপণ) -এর পরিমাণ ও অন্যান্য দাবীর বিষয়ে মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরবর্তী আলোচনা পর্ব 'তিনপুর'-এর তারিখ ঠিক হয়। এই 'তিনপুর' দিনটির আলোচনায় বিবাহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও বিবাহের দিনক্ষণ ঠিক হয়। এই দিনের আলোচনার আসরে উভয় পক্ষের আত্মীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা সহ উভয় গ্রামের মোড়লরাও উপস্থিত থাকেন। সেদিন পাত্রীর পিতার বাড়িতে ছোটখাটো একটি ভোজের আয়োজন করা হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো - পাত্রপক্ষের তরফ থেকে সেদিন উপস্থিত দু'পক্ষের মোড়ল অভিভাবকদের উপস্থিতিতে পাত্রীর পিতাকে মদ্যপানীয়, পিঠে ও অন্যান্য উপহার সামগ্রীতে পূর্ণ একটি মদের ঝুড়ি, চাকমা ভাষায় 'মদ পিল্যাং' সমর্পণ করা হয়। পাত্রীর পিতার দ্বারা এই মদ পিল্যাং গ্রহণের পর দু'পক্ষের কেউ বিবাহ বাতিলের প্রস্তাব আনতে পারবেন না। অনিবার্য কারণে এরপর যদি কোন এক পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বিবাহ বাতিল হয়ে যায়, তাহলে সামাজিক বিচারে সেই পক্ষকে বিপরীত পক্ষের বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা পর্বে এ যাবৎ যা খরচ হয়েছে, তা অর্থমূল্যের হিসেবে জরিমানা অর্থাৎ 'লাজভার' দিতে হবে।

এই 'তিনপুর' বা 'মদ পিল্যাং' সমর্পণের মাধ্যমে বিবাহের আলাপ চূড়ান্ত হয়ে গেলেও পরবর্তী বিয়ের দিন পর্যন্ত পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সেদিন উভয়পক্ষের সহমতের ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়। অসুখ-বিসুখ অথবা অন্যকোন অনিবার্য কারণবশত দু'পক্ষের কোন এক দিকে কোন প্রকার অসুবিধা সৃষ্টি হলে এবং তাতে বিবাহের তারিখ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে পুনঃআলোচনার জন্য তিনি দু'পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী এই ব্যক্তির নাম 'শালিক্যা'।

এরপর শুরু হয় পাত্র ও পাত্রী উভয় দিকে বিবাহ আয়োজনের পালা। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী বিবাহের মূল অনুষ্ঠানটি হয় পাত্রের পিতার গৃহে। কিন্তু বিবাহের জাঁকজমক কম-বেশী পাত্রীর পিতার গৃহেও হয়ে থাকে। তা নির্ভর করে পাত্রীর পিতার সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক অবস্থার উপর। নির্দিষ্ট দিনে পাত্রপক্ষ বরযাত্রীর দল সাজিয়ে বৌ আনতে পাত্রীর পিতার বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই বরযাত্রী দলে থাকেন বরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, গ্রামের যুবক-যুবতীর দল, বরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন— মাসি, পিসি ইত্যাদি সহ পাড়া প্রতিবেশী। এই দলে কোন বিধবা মহিলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। এটা সামাজিক ট্যাবু। এছাড়া এদলে থাকেন পাড়ার মোড়ল বা একজন বয়স্ক ব্যক্তি, যিনি বরযাত্রী দলকে নেতৃত্ব করবেন। থাকেন একজন মধ্যবয়সী মহিলা, যিনি পাত্রী বা বৌ-কে সঞ্চালন করবেন। তাকে বলা হয় 'বৌ-ধরনী'। থাকবে একজন কিশোরী বা যুবতী, যে বৌ-এর অলঙ্কার ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদিতে পূর্ণ একটি সুসজ্জিত ঝুড়ি অর্থাৎ 'ফুরবারেং' বহন

করে নিয়ে যাবে। এবং অবশ্যই থাকবেন 'সাবালা' নামধারী এক ব্যক্তি, যিনি বিবাহপর্বে পাত্র ও পাত্রীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন। এখানে উল্লেখ্য, ফুরবারেং বহনকারী কিশোরী বা যুবতীটি সাধারণত পাত্রের কনিষ্ঠা ভগিনী সম্পর্কের হবে এবং 'সাবালা' নামের লোকটি পাত্রের ভগ্নিপতি সম্পর্কের হবেন। এই বরযাত্রী দলে বাজনাদার থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। বরযাত্রী দলের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। তা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশবা ততোধিক হতে পারে। তবে একটি নিয়ম আছে যে, এই বরযাত্রী দলের সঙ্গে পথিমধ্যে কেউ সহযাত্রী হতে পারে না এবং এই দল পাত্রের নিজ গুখির (অর্থাৎ গোষ্ঠীর) গৃহ ব্যতীত অপর কোন গৃহস্তের গৃহে বিশ্রাম বা রাত্রিযাপন করতে পারবে না।

বরযাত্রী দলটি সাধারণত দুপুর নাগাদ পাত্রীর গৃহে পৌছে যায়। পৌছার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বিবাহগৃহে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে উঠোনে কিছু সময়ের জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এবং পাত্রীপক্ষ থেকে বলা হয় -- ''আমরা আড়াই দিনের রাজা। সুতরাং আপনাদের কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে।' এই আড়াই দিন হচ্ছে -- আজকের পাত্রীর পিতার গৃহে বিবাহের একদিন, আগমীকাল পাত্রের পিতার গৃহে মূল বিবাহ অনুষ্ঠানের পুরোদিন এবং তার পরের দিন অপরাহ্ন অবধি। অর্থাৎ পুরো বিবাহপর্ব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পাত্রীপক্ষ যথোপযুক্ত সম্মানের অধিকারী -- এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এই নিয়ে উভয় পক্ষর যুবক-যুবতীদের মধ্যে তখন হাসি-ঠাট্টামূলক কথাবার্তা চলে। তবে এই কথা থেকে এটাও অনুভব করা যায় যে, আগেকার দিনে খুব কাছাকাছি গ্রাম থেকে বিবাহ সম্পর্ক করার নিয়ম প্রচলিত ছিল, যার ফলে আড়াই দিনের মধ্যেই পুরো বিবাহপর্বটি সম্পন্ন হতো।

বরযাত্রী দলকে উঠোনে কিছুক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার পর তাঁদের গৃহে প্রবেশের আহ্বান আসে। এখন ঘরের মুখ্য দরোজায় পাত্রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রথমে প্রণাম করে পাত্রের পা দু'টি ধুইয়ে দেয়। সে একটু একটু করে সবার পায়ে জল ঢেলে প্রণাম করে। এরপর সমাদরে পাত্র পক্ষকে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যুবক-যুবতীদের বসতে দেওয়া হয় ঘরের বাইরের দিকের একটি সুসজ্জিত কক্ষে, বয়স্ক মহিলাদের ঘরের ভিতরের দিকের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে এবং বয়স্ক পুরুষদের বসানো হয় প্রশস্ত বারান্দা (চাকমা ভাষায় 'সিংগবা') জুড়ে সম্মানিত অতিথিবর্গের সঙ্গে। যুবক-যুবতীদের সঙ্গে থাকেন বর, সাবালা, বৌ-ধরনী এবং ফুরবাবেং বহনকারী কিশোরীটি। বরকে দূর থেকে চেনা যায়। তার পরনে থাকে সাদা ধবধবে ধুতি, সাদা জামা এবং মাথায় পাগড়ী। সাধারণ পোষাকের সাবালাকে চেনা যায় গলায় জড়ানো একটি সাদা কাপড় ও কাঁধে ঝোলানো জোড়বাঁধা দু'টি মদের চুঙ্গা দিয়ে। এদের বসার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় বরযাত্রীদের আপ্যায়নের পালা। এদিকে ঘরের অন্দর মহলে কনে বসে থাকে তার বান্ধবী দলের বেষ্টনীতে।

আপ্যায়ন পর্বের শেষে বরযাত্রীদের দলের পরিচালকের তদারকীতে এবং বারান্দায় বসে-থাকা সকল অতিথিবর্গ ও গুরুজনদের আদেশক্রমে সাবালা তৎপরভাবে একটি কুলোয় অলঙ্কারাদি ও বস্ত্র সমূহ সাজিয়ে মদের চুঙ্গা দু'টি সহ পাত্রের পিতাকে নিবেদন করেন। কিন্তু এই নিবেদনের প্রাক-মুহূর্তে তিনি চিৎকার করে বলেন -- এসব নিবেদনের হুকুম আছে কিনা? সভাস্থ তখন সমস্বরে চিৎকার করে বলেন -- আছে-আছে। পাত্রীর পিতা তা গ্রহণের পর অলঙ্কারাদির কুলোটি

সেই সভাস্থলে উপস্থিত সবাইকে যাচাই করে দেখতে এবং আশীর্বাদ করতে বলেন। সবাই কুলোটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন ও আশীর্বাদ করেন।

এরপর সাবালা অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বৌ-কে সাজনোর অনুমতি নেন। সমস্বরে সবাই অনুমতি দেন। তখন নিজের দলের কতিপয় যুবতীর সহায়তায় কনেকে ঐসব অলঙ্কারাদি ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে সাজাবার ব্যবস্থা করেন। কনে সাজানো শেষ হলে সাবালা পুনরায় সভাস্থলে এসে চিৎকার করে বর-কনেকে জোড়বাধার অনুমতি নেন। সভাস্থ সকলের অনুমতিক্রমে সাবালা যুবক-যুবতীদের সমবেত আসরে বর ও কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে একটি সাদা কাপড় দিয়ে দু'জনকে জড়িয়ে বাঁধেন এবং তৎসঙ্গে একটি সেদ্ধ ডিম ও কিছু পরিমাণ ভাত এক সঙ্গে মেখে জড়াজড়ি অবস্থায় একে অপরকে খাইয়ে দিতে বলেন। চাকমা ভাষায় এই জোড়বাধাকে বলা হয় 'জদন'। মোটামুটি পাত্রীর পরিবারের দিকে পালনীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহ এখানেই শেষ হয়। এরপর খাওয়া-দাওয়ার পর্ব। খাওয়া-দাওয়ার শেষে উপস্থিত অতিথি-অভ্যাগতদের নিকট থেকে বর-কনের আশীর্বাদ গ্রহণের পালা শুরু হয়। সাবালা লোকটি এই কার্যটি সুচারু রূপে সম্পন্ন করেন। তিনি উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিদের সকলের নিকট বর-কনেকে নিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বলেন এবং কিছু পরিমাণ চাল ও তুলো রাখা একটি থালা প্রত্যেকের সামনে রাখেন। আশীর্বাদকারী একটু করে তুলো ও সামান্য পরিমাণ চাল হাতে তুলে নিয়ে তা বর ও কনেব মাথায় আলতোভাবে ছড়িয়ে দেন এবং মুখে থুঃ-থুঃ শব্দ করে আশীর্বাদ করে থালায় অথবা বর-কনেব হাতে সাধ্যমতো টাকা উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। আশীর্বাদ পর্বেব শেষে বরযাত্রী দলের ফেরার পালা।

কনেকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যুবক-যুবতীদের দল আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। কনের পিতা পাড়ার মোড়লকে বরযাত্রী দলের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। সেই অনুযায়ী পাড়ার মোড়ল, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের একটি দল তৈরি হয়। এই দলে কনের পিতা-মাতা থাকেন না। তাঁরা যাবেন পরের দিন সকালে কতিপয় আত্মীয়বর্গ ও বন্ধুব্যক্তিদের সহযোগে। কারণ, কনের পিতা-মাতা বরযাত্রীদের সঙ্গে যাওয়ার নিষেধমূলক একটি প্রচলিত ট্যাবু আছে।

পাত্রের গৃহে বরযাত্রীর দল পৌঁছে গেলেই হৈ-হুল্লোর পড়ে যায়। বাজি ফাটে -- ছেলেব দল চিৎকার করে ওঠে। প্রথামতো কনেকে আনুষ্ঠানিক বরণ করার জন্য পাত্রের ছোট বোন বা ভাই দরজার সামনে জলপাত্র নিয়ে এগিয়ে যায়। সে নববধূকে প্রণাম করে পা ধুইয়ে দেয়। এদিকে সাবালা পুনরায় চিৎকার করে বলে ওঠে -- বৌকে ঘরে তোলার অনুমতি আছে কিনা? সবাই সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন -- আছে আছে। তখন পাত্রের মা বৌ-কে জড়িয়ে ধরে ঘরের ভিতবে নিয়ে যান এবং বৌ-মাকে নিয়ে তোলেন সুসজ্জিত 'ফুলঘরে'। এদিকে ছোট বোন বা ভাইটি একে একে সবার পা ধুইয়ে দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গঝা বা গোষ্ঠীভেদে ভিন্নতা কিছুটা আছে। কোথাও কোথাও দেখা যায় -- শ্বাশুরী বৌ-এর ডান হাতের কনে আঙুলে সাতপাক সুতো বেঁধে নিয়ে টেনে ঘরে তোলেন। সেদিন রাতের খাওয়া সাধারণভাবে হয়। বর ও কনে পৃথকভাবে শোয়। কনে শোয় নিজের 'ফুল ঘরে' বরযাত্রী হয়ে আসা নিজ গ্রামের যুবতীদের সঙ্গে।

পরের দিন প্রত্যুষকাল থেকে শুরু হয় বিবাহের মূল আচার-অনুষ্ঠানসমূহ। উষালগ্নের সাথে সাথে প্রথামতো ছয়জন যুবতীসহ একজন সধবা মহিলা বৌ-কে নিয়ে নদীর ঘাটে যায় 'আগপানি' অর্থাৎ মাঙ্গলিক জল আনতে। এই জল দিয়ে বিয়ের মূল ও পবিত্র অনুষ্ঠান বর ও বধুর চুমুলং পূজা হবে। নদীতে নববধূ সহ যুবতীরাও পবিত্র স্নান সেরে নেয় এবং কলসীতে জলভবে সধবা মহিলাটি সহ বাড়িতে ফিরে আসে। নববধূর পূর্ণ কলসটির গলায় সাতপাক সুতো বেঁধে বেখে দেওয়া হয় চুমুলাং পূজার জন্য। এরপর চুমুলাং পূজা সম্পাদনকারী ওঝাটি যথাসময়ে এসে উপস্থিত হন। তিনি ঘরের মধ্যঅংশে মূল প্রকোষ্টে পূজামণ্ডপটি সাজিয়ে তোলেন নকশা করা বাঁশের কঞ্চি ও ফুল দিয়ে। সেখানে ছোট ছোট দু'টি মাটির বেদী স্থাপন করা হয়। তার চুমুলং দেবতা ও আরেকটি পোরমেশ্বরীর জন্য। আসলে এই পূজায় আরেক দেবতার উপস্থিতি কল্পনা কবা হয়। তিনি হচ্ছেন 'বিয়াত্রা'। এখানে তার বেদীর প্রয়োজন হয় না। তাঁর উদ্দেশ্যে বলি ও নৈবেদ্য চড়িয়ে দিলেই সেরে যায়। এরপর দু'টি ডিম বেদী দু'টির উপর স্থাপন করা হয়। নববধূর বয়ে আনা মঙ্গল কলসটি সেখানে রাখা হয়। সেখানে দু'পাশে রাখা হয় একঝুড়ি ধান ও এক ঝুড়ি চাল। ওঝা 'ঘিলা' ও 'কজই' নামের ফল দু'টি মেশানো পবিত্র জল অর্থাৎ 'ঘিলা-কজই পানি' ছিটিযে পূজাক্ষেত্রটি পবিত্র করে তোলেন। তখন ডেকে আনা হয় বর ও বধূকে। তারা দেবতাদের ভক্তি নিবেদন করেন। ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা আরম্ভ করেন। তিনি তিন দেবতার উদ্দেশ্যে তিনটি মোরগ বলি দেন। চুমুলং দেবতার উদ্দেশ্যে একটি শুকুরও বলি দেওয়া হয়। পূজার নৈবেদ্য চড়ানোর পর বর-বধূ আরেকবার দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। এইভাবে চুমুলং পূজা শেষ হয়। পূজার শেষে ওঝা সাতনালের সুতো বরের ডান হাতে এবং কনের বাম হাতে বেঁধে দেন।

দুপুরে বিবাহ ভোজের পালা। ইতিমধ্যে গ্রামের প্রতিবেশী ও দূর-দূরান্ত থেকে আমন্ত্রিত অতিথি-অভ্যাগতরা এসে পড়েন। পৌছে যান পাত্রীর পিতা-মাতা ও তাদের সহযাত্রীরা। শুরু হয় হৈ-হুল্লোড়। মদ্যপান। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিদের মদ্যদ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। খাওয়া-দাওয়া আরম্ভের সময় বিবাহ আসরের এক পাশে ওঝাকে বসানোর স্থান করে দেওয়া হয়। তার জন্য একটি বিশেষ 'পই' (আহারের থালা) সাজিয়ে দেওয়া হয়। তিনি খাওয়া-দাওয়া চলাকালীন সময়ে চুমুলং পূজার শুভাশুভ লক্ষণ, নবদম্পতির ভবিষ্যৎ বাণী ব্যক্ত করেন। খাওয়া-দাওয়ার শেষে সেই একই ভাবে বব-বধূকে আশীর্বাদের দান করা ইত্যাদি।

বিবাহের অন্তিম পর্বে আয়োজিত হয় 'খানা -সিরানা' এবং 'বৌ-গজানি' অনুষ্ঠান। 'খানা-সিরানা' মানে একটি বিশেষ ভোজ সম্পন্ন করা আর 'বৌ-গজানি' হল পাত্রী সমর্পণ। এই 'খানা-সিরানা' অনুষ্ঠান নবদম্পত্তিকেই আয়োজন করতে হয়। তাই এক্ষেত্রে সাবালার বিশেষ ভূমিকা থাকে। এই বিশেষ ভোজ বিয়ের সময় সম্ভব না হলে পরবর্তী বিবাহ বার্ষিকীতে হলেও সম্পন্ন করতে হবে। নতুবা ইতিমধ্যে নবদম্পতির কেউ মারা গেলে পাড়ার শ্মশানযাত্রীরা তাকে কাঁধে না তুলে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাবে। এই ভোজের বিশেষত্ব হলো তাতে পয্যাপ্ত মদ্য ও মাংসের প্রয়োজন পড়ে। এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন, পাত্র ও পাত্রী পক্ষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ ও পাড়ার মোড়লেরা সহ বয়স্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। বালক ও যুবক-যুবতীদের এই আসরে

স্থান নেই। এই অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়ার সাথে সাথে চলে পাত্র ও পাত্রী পক্ষের আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে পরিচয় জ্ঞাপন ও নানা প্রকার হাসি-ঠাট্টামূলক কথাবার্তা। এই অনুষ্ঠানের শেষদিকে আসরে আনা হয় নব-দম্পতিকে। তখন শুরু হয় বৌ-গজানি বা পাত্রী সমর্পণ। ঐ সময় পাত্রী পক্ষের একজন কথাশিল্পী অথবা একজন 'গেংখুলি' নামের চারণ কবি সমধুর বাক্যালাপের মাধ্যমে অথবা 'গেংখুলি' সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে নববধূকে তার শ্বাশুরীর নিকট সমর্পণ করা হয়। তখন আসরটি বেশ আবেগপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানটি শেষহতে কখনো রাত হয়ে যায়। সেদিন পাত্রী পক্ষের লোকেরা বিয়ে বাড়িতে রাত্রিযাপন করে। পরের দিন সকালে খেয়ে-দেয়ে তারা স্বগৃহে ফিরে যান। এইভাবে পুরো বিবাহপর্বটি সম্পন্ন হয়।

অন্য সমাজে বিবাহ

আগেকার দিনে চাকমা সমাজে অন্য সমাজের সঙ্গে বিয়েই হতো না। এমন কি নিজেদের মধ্যে ভিন্ন 'গঝা' (Sept)-তে কন্যার বিবাহ দিতে রাজী হতো না। সাম্প্রতিক কালে এই প্রাচীন আদিবাসী সুলভ রক্ষণশীলতা কমে এসেছে। এখন প্রতিবেশী অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন, অন্য আদিবাসী সম্প্রদারে মধ্যে ত্রিপুরী ও মগদের সঙ্গে ইদানিং সামাজিকভাবে অনেক বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। দেওয়া ও নেওয়া উভয়ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। তবে বাঙালী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সমাজস্বীকৃতভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এক্ষেত্রে এখনো অনড় অবস্থা উভয়পক্ষেই বিরাজ করছে।

মৃতের সৎকার

কোন লোকের মৃত্যু হলে তার মরদেহ সাদা কাপড়ে ঢেকে রাখা হয় পাশে একটি তুষের পাত্র জ্বেলে রাখা হয়। ঐ সময় ঢোল বাজিয়ে বিশেষ একটি তাল বাজানো হয়। ঢোলের তাল শুনে পাড়ার লোকেরা বুঝতে পারে কোন বাড়িতে কারোর মৃত্যু হয়েছে। তখন পাড়া-পড়শীরা খোঁজ-খবর নিতে আসে। এভাবে পাড়ার লোকেরা মৃতের সৎকারের জন্যে জড়ো হয়। এদিকে মৃত্যুর খবর পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেলে প্রতিটি গৃহস্তের বাড়িতে সদর দরজার পাশে তুষের পাত্রে আগন জ্বেলে রাখা হয় যাতে অপদেবতা ইত্যাদি অশুভ প্রেতাত্মারা ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

চাকমা সমাজে বুধবার দিনটি সবচেয়ে অপয়া দিন। সেদিন অথবা তার আগের দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারের বিকেলে কেউ মারা গেলে মৃতদেহকে বৃহস্পতিবারে অপরাহ্নের পর দাহ করার বিধি প্রচলিত আছে। কেননা, অপরাহ্নের আগে মৃতদেহ সৎকার হয় না।

শবদাহের দিন মৃতের পরিবারের নিকট আত্মীয় পরিজনরা এবং গ্রামবাসীরা সকলে সমবেত হলে মৃতদেহটি স্নান করিয়ে দিয়ে কাপড়-চোপড় পরানো হয়। ঐ সময় বৌদ্ধভিক্ষু ডেকে এনে মঙ্গলসূত্র পাঠের আয়োজন করা হয়। আগেকার দিনে 'লোরি' নামের বৌদ্ধতান্ত্রিক পূজারীরা 'আগরতারা'-র সূত্র পাঠ করে শোনাতেন। মৃতের আত্মীয়-পরিজন ও গ্রামবাসীরা মৃতের বুকে টাকা-পয়সা তুলে দেন। তার আগে মৃত ব্যক্তিকে ভাত খাওয়ানো হয়। শবদেহটিকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাঙ্গারী ধরনের একটি শবাধার বাঁশ-বেত দিয়ে বানানো হয়।ঐ শবাধারের নাম 'আলং'। মৃত দেহটি বাড়ি থেকে নামানোর মুহূর্তে মৃতদেহ সমেত আলংঘরটি গৃহের খুঁটিতে

পাঁচ বার বা সাত বার টুক্ টুক্ শব্দে ঠেস লাগিয়ে গৃহের সঙ্গে আলং-এর সংযোগ লাগানো সাতনাল সুতো ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং ঘরের বেড়ার একটুখানি ভেঙ্গে ফেলা হয়। শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় শব বহন করেন মৃতের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণ। শ্মশান ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা শবদাহ করার জন্য জঙ্গলের কাঠ নিয়ে যায়। মৃত লোকটি পুরুষ হলে পাঁচ এবং স্ত্রী-লোক সাত স্তর কাঠ দিয়ে চিতা সাজাতে হয়। এরপর মৃত দেহকে আলং ঘর সহ কাঁধে নিয়ে পুরুষ হলে পাঁচ বার এবং স্ত্রী লোক হলে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়ে চিতায় তোলা হয়। তখন বুদ্ধের জয়ধ্বনি দিয়ে প্রথমে পরিবারের লোকেরা পরে আত্মীয়বর্গ ও অন্যান্যরা চিতায় আগুন দেয়। এই চিতার উপরে চার দিকে চারটি উচুঁ বাঁশ পুঁতে একটি সাদা কাপড় টানাটানি করে বাঁশের আগায় বেঁধে চন্দ্রাতপ লাগিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তা মৃতের আত্মাকে ছায়াদান করে। সেদিন শ্মশানে দাহকার্যে অংশগ্রহণকারী সকলে সরাসরি নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ না করে স্নানের কাপড় চেয়ে নিয়ে ঘাটে স্নান করার পর দরজায় রাখা তুষের চুলায় হাত গরম করে ঘরে ঢোকে এবং ঘরে গিয়ে তোতো খাদ্য একটা কিছু খায়। মৃতের ঘরে সেদিন রাত্রে মৃতের বিদেহী আত্মার জন্য কাঠি না ছুঁইয়ে ভাত রান্না করে রেখে দেওয়া হয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, রাত্রে মৃতের আত্মা এসে অল্প কিছু ভাত খাবে। পরের দিন সকালে মৃতের বড় ছেলে বা স্বগোত্রের কেউ সঙ্গী-সাথী নিয়ে শ্মশানে যায় এবং চিতাভস্ম থেকে কয়েকটি হাড়ের টুকরো ও ছাই সংগ্রহ করে নেয়। এরপর চিতা পরিস্কার করে তাতে একটি কলাগাছ পুঁতে চিতার চারদিকে পাতলা একটি বেড়া দেয় এবং বেড়ার অভ্যন্তর ভাগে চিতার উপর একটি জলের কলসী, একটি তামাকের হুঁকো, একটি পুরনো দা, একটি ভাঙ্গা ঝুড়ি ইত্যাদি রেখে দিয়ে আসে। সেদিন পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে শ্রাদ্ধের দিন ঠিক হয়। তা সাত দিন, নয় দিন, এগার দিন অথবা একুশ দিন হতে পারে। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নির্দিষ্ট দিনে একজন বা পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ডেকে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মীয় আচার অনুযায়ী এবং প্রথাগত কোন কোন প্রাচীন নিয়ম মেনে 'মঙ্গলসূত্র' পাঠ ও মৃতের পূণ্যার্থে সাধ্যমতো বৌদ্ধভিক্ষুদের দান-দক্ষিণা দিয়ে, সহস্রপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন অথবা 'ফদনা' (আকাশ প্রদীপ) উড়িয়ে দিয়ে পাড়া-পড়শীদের জন্য ভোজের আয়োজন করে শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করা হয়।

তবে সমাজের বিশেষ সম্মানিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই প্রচলিত নিয়মের বাইরে রথ বা গাড়িটানা নামের একটি ব্যয়-বহুল অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। এই নিয়মে মৃতের দাহকার্য সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন হয় না। পরিবর্তে মৃতদেহকে ঔষধ-পত্র মেখে একটি কাঠের বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। বৎসরান্তে পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রামের সাহায্য নিয়ে চারটি বিরাট চাকাযুক্ত রথ বানিয়ে রথের উপর মৃতদেহটি স্থাপন করে মহা সাড়ম্বরে রথ বা গাড়ীটানা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে বৌদ্ধভিক্ষু ও দর্শনার্থীরা এসে যোগ দেন। ইদানিং এমন গাড়ীটানা শ্রাদ্ধ উৎসব কালেভদ্রে দেখা যায়।

লোকসাহিত্য

চাকমাদের লোকসাহিত্যকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— মৌখিক ও লিখিত লোকসাহিত্য। মৌখিক লোকসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে— ছড়া, লোকগীত, প্রবাদ, ধাঁ-ধাঁ, লোককথা

বা রূপকথা ইত্যাদি। লিখিত লোকসাহিত্যের মধ্যে রয়েছে কাহিনী ভিত্তিক পালাগান, বারমাসী গান ও মন্ত্রসাহিত্য। এখানে উল্লেখ্য যে, লিখিত সাহিত্যকে সাধারণত লোকসাহিত্যের পর্যায়ে ধরা হয় না। তবে চাকমাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, তাদের মধ্যে লোক-পরম্পরাগত ভাবে দীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখে প্রচলিত থাকা এমন কিছু কাহিনীভিত্তিক লৌকিক পালাগান আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর আগে চাকমা লোকগীত গায়ক তথা 'গেংখুলি'-রা সম্ভবতঃ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এক ধরনের তুলোট কাগজে বা তালপাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাই আমরা সে-সব লোকসাহিত্যকে লিখিত লোকসাহিত্য হিসেবে উল্লেখ করেছি।

লোকসাহিত্য বিষয়ে আলোচনার পর্যায়ে প্রথমে আমরা লিখিত লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবো। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সেই কাহিনী নির্ভর পালাগান (ballad) সমূহের কথা। এসব পালাগান সমূহের মধ্যে রয়েছে— ১. রাধামন - ধনপুদি পালা, ২. লোরবো - মিদুঙী পালা, ৩. চাদিগাং ছারা পালা, ৪. লক্ষীপালা বা সিরিখিপথম পালা, ৫. বুদ্ধলামা (বুদ্ধের জীবনী মূলক পালাগান), ৬. নরধন-নরপুদি পালা এবং ৭. গোজেন লামা। উল্লিখিত পালাগান সমূহের মধ্যে কেবল শেষোক্ত গোজেন লামা-এর রচনাকাল ও লেখকের নাম জানা যায়। বাকী পালাগান সমূহ কখন বা রচনা করেছেন জানা যায় না।

আসলে চাকমাদের ঐতিহ্যবাদী এসব পালাগান গুরু-শিষ্য পরম্পরাগতভাবে গানের সুরে আয়ত্ব করেন চাকমা সমাজের উল্লিখিত গেংখুলি নামক গায়কেরা। এঁরা নিজ নিজ গুরুর নিকট এই পালাগান শিক্ষালাভ করে লোকসমাজে উৎসব বা পূজা-পার্বণের দিনে রাতভর বেহালা বা সারিন্দা বাজিয়ে গানের সুরে সুরে পরিবেশন করে থাকেন। এই পালাগান পরিবেশনের সময় গেংখুলিরা একটি কুলোয় -ধান্য-পুষ্প-তুলো ও তণ্ডুল সমাহারে মঙ্গলঘট সাজিয়ে তার উপর প্রদীপ, চাকমা ভাষায় 'ধর্ম-চেরাগ' জ্বালিয়ে প্রথমে ইষ্টদেবতার বন্দনার মধ্য দিয়ে গানের সুরে পালাগান শুরু করেন। এই গানের বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে গুরু-শিষ্য পরম্পরার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে বলে লোকসমাজে তা এক অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারায় টিকে থাকে। তবে প্রত্যেক গেংখুলি নিজ দক্ষতা ও রচনা শক্তির গুণে মূলগানের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা সমকালীন কোন ঘটনার বিষয় জুড়ে দেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন লোকভাষায় প্রচলিত শব্দমালা ও প্রকাশ ভঙ্গী প্রয়োগের মাধ্যমে পালাগানকে শ্রোতাদের নিকট অধিক আকর্ষণীয় করে তোলেন। সেই কারণে পালাগানের ভাষাও অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে সমকালীন রূপ গ্রহণ করে থাকে।

পালাগান সমূহের মধ্যে রাধামন-ধনপুদির পালাটি সর্বসাধারণের নিকট জনপ্রিয়। এটি একটি প্রণয়কাহিনী মূলক মিলনাত্মক পালাগান। পালাগানটি সাতটি পর্ব বা অধ্যায়ে বিভক্ত। পালাগানের প্রধান চরিত্র রাধামন(নায়ক) ও ধনপুদি (নায়িকা) -এর বিষয়ে চাকমাদের জাতীয় ইতিবৃত্ত 'বিজোক' নামের হাতেলেখা পুঁথিতে গুরুত্বের সহিত উল্লেখিত আছে। সেখানে রাধামনকে অন্যতম যোদ্ধা তথা জাতীয় বীর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এই চরিত্র দু'টির প্রতি শ্রোতা সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ ও পক্ষপাতিত্ব থাকারই কথা।

রাধামন -ধনপুদি পালার পরিপূরক অংশ হচ্ছে "চাদিগাং ছারা পালা"। এই পালাগানে প্রাচীন চাকমা রাজ্য চম্পকনগরের যুবরাজ বিজয় গিরির 'মগলৌ' রাজ্য চাদিগাং (রূপোর নদীর

অঞ্চল অর্থাৎ চট্টগ্রাম) জয়ের বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হয়েছে। এই বিজয়গিরির প্রধান সেনাপতি ছিলেন রাধামন। কাহিনীতে রাধামনের চরিত্রটি অতুলনীয় বীরত্বে উজ্জ্বল ও গৌরবময়। পালাগানের বিভিন্ন স্থানের বর্ণনায় 'মেঘনা দর্য্যা' (মেঘনা নদী), কালাবাঘা (চাকমা বিজক অনুযায়ী প্রাচীন শ্রীহট্ট), কাঞ্চন দেশ (রিয়াং রাজ্য), জালিপাগর্য্যা (পরবর্তীকালের নোয়াখালির ভুলুয়া রাজ্য), রোয়াং (আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্য) অক্সা দেশ (বার্মা রাজ্য) ইত্যাদি রাজ্য বা অঞ্চলের কথা উল্লেখ আছে। চাকমা ইতিহাস প্রণেতাদের মতে-এটি ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি পালাগান।

লোরবো - মিদুঙীর কাহিনীটিও প্রণয়ভিত্তিক। বিয়োগান্তক এই প্রণয়কাহিনীর ঘটনাবলী নাকি বার্মার কলাডান নদীর পারে একদা চাকমাদের অবস্থানকালে সংঘটিত হয়েছিল। তাই এই পালাগানে বার বার কলাডান (চাকমা ভাষায় 'কলাত্তেং') নদীর কথা উল্লেখ আছে। লোরবো - মিদুঙীর প্রণয় কাহিনীর সঙ্গে অবশ্য কেউ কেউ দৌলত কাজীর ' লোর-চন্দ্রানী' (বা সতী ময়না) কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে করেন। অনুরূপ প্রণয় বিষয়ক সল্পখ্যাত পালাগান 'নরধন-নরপুদি পালা'। কাহিনীর সাদৃশ্য বিচারে এটি লোরবো-মিদুঙী পালার অনুকরণে পরবর্তীকালে সৃষ্ট বলে বলে মনে হয়।

'লক্ষীপালা বা সিরিথি পথম' পালাগানটি চাকমাদের সুপ্রাচীন কালের কথকতা বা মিথ অবলম্বনে সৃষ্ট। এই পালাগানে বিশ্বা-ব্রহ্মাণ্ড, প্রাণী-উদ্ভিদরাজী ইত্যাদি সৃষ্টির অতিকল্পনা, মানব প্রজাতির বেঁচে থাকার সংগ্রাম, খাদ্য যোগানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে জুমচাষ প্রচলনের জন্য মনুষ্য হিতকারী অন্যতম দেবতা 'বিয়াত্রা'-র আমন্ত্রণে মাহ্-লক্ষী মা (মহালক্ষী মা) - এর মর্ত্যে আগমন ও অলস মিচ্চিঙ্যা বুড়ো কর্তৃক প্রথম জুমচাষ প্রচলনের কথা বিবৃত হয়েছে। এটিও খুবই জনপ্রিয় একটি পালাগান।

'গোজেনলামা' হচ্ছে গোজেন অর্থাৎ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে বর প্রার্থনা বিষয়ক একটি কাব্য। এটি ৭টি লামা বা খণ্ডে বিভক্ত। কিন্তু বর্তমানে কেবল ৬টি লামা লভ্য। এই পালাগানের রচয়িতা কবি শিবচরণ। রচনাকাল ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

উল্লেখিত পা লাগানগুলো ছাড়াও 'কুগিডর বা চরামিত্তু প লা' নামে অপর একটি পালাগানের নাম উল্লেখ করা হয়, যা বহুল প্রচারিত নয়। এটি সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চাকমা রাণী কালিন্দীর সময়ের রচনা।

এখানে পালাগান সমূহের রচনার নমুনা হিসেবে গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো ঃ—

'উজোনি ছরা লামোনি ধার
ন এল সিরিথি জলৎকার,
পানিউগুরে বস্যে থল
বানেল গোজেন জীব সগল।'— গোজেনলামা

ভাবার্থ ঃ— ছোট নদীর ঢালু স্রোত নিম্নবাহী। পূর্বে এই পৃথিবী ছিল না— সবাই ছিল জলময়। এই জলের উপরই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী এবং জীবকুল।

'অজল পাগোচ্য নিজো ঝুপ,

দিন দিন পড়েত্তি কলিযুগ।

কলিযুগত সত্য নেই

বুক্ক্য চিরি দেখেলেঅ পত্য নেই।' — লরবো - মিদুঙী পালা

ভাবার্থ ঃ— সুউচ্চ বটগাছের ঝোপ নীচু হয়ে ঝুলে পড়েছে। কলিযুগ ঘনিয়ে আসছে। এ যুগে সত্যের বালাই নেই। বুক চিড়ে দেখালেও প্রত্যয় আসে না।

'জুনপর্য্যা ভুই হাদে

পরান ন-জুড়োয় তুই বাদে,

বেল্যা ডগম্ম্য তিধি পেখ

বেড়ত বাচ্যেম্বি নিঝিরেত,

নিঝি রেদোত জাগিবে

ভাবনা থেলে লামিবে।' — লরবো - মিদুঙী পালা

ভাবার্থ ঃ— জোছনা রাতে পথে-প্রান্তরে হাঁটছি। বুঝতে পারছি তোমাকে ছাড়া চিত্ত প্রশমিত হওয়ার নয়। নিশুতি রাতে তিত্তির পাখি যখন ডেকে উঠবে, তখন আমি তোমার কুঞ্জে এসে সাড়া দেবো। আমার প্রতি তোমার প্রণয় ভাবনা থাকলে তুমি (মাচাং) ঘর থেকে নেমে আসবে।

বুদ্ধলামা ঃ— বুদ্ধলামাকে 'সাদেংগিরি পালা-ও' বলা হয়। সাদেংগিরি হচ্ছেন পূর্বোল্লিখিত চাকমা 'বিজোক' -এ বর্ণিত সুপ্রাচীন এক চাকমারাজা অর্থাৎ রাজা বিজয়গিরির পূর্বজ। চাকমাদের প্রাচীন উপাখ্যানে উল্লেখ আছে— রাজা সাধেংগিরি ছিলেন একজন সাধনসিদ্ধ পুরুষ। তাই তাঁর নাম হয় সাধনগিরি বা সাধেংগিরি। বলা হয় তিনি স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেছিলেন। চাকমাদের আঠারো খণ্ডের প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র 'আগরতারা' -য় তাঁর নামাঙ্কিত একটি ত্মরা বা ধর্মস্কন্ধ আছে নাম 'সাধেংগিরি তারা'। এই বুদ্ধলামা হচ্ছে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত এই সাধেংগিরি তারারই কাব্যরূপ। তাই নাম বুদ্ধলামা হলেও এরমধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। এর মূলবক্তব্য হলো — ইহলৌকিক স্বরূপ বর্ণনা। সংসারে পাপী লোকদের মৃত্যুর পর তাদের কীরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় তারই বিশদ বর্ণনা রয়েছে এ কাব্যে। ফলতঃ এর সঙ্গে চাকমাদের বর্তমান হীনযানী বৌদ্ধ ধর্মীয় দর্শনের কোন সামঞ্জস্য নেই। চাকমা সমাজে অধুনালুপ্ত মহাযানী তথা তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের পূজারী লোরী বা লুরি নামের পুরোহিতরা সমাজে কারও মৃত্যুর পর শ্মশানে এটি পাঠ করেন। আমাদের মনুষ্যশরীর যে নশ্বর, বুদ্ধলামার তার কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ—

কুলোত মারি পাম্নে সাব। জুরো পোরি যার রাম্নো চাব।।

দড়ি ছিনি কাম্ম্যং পোল। গদা কইয়্যান জুরো হোল।।

যক্কে হাদিবে দ্বিবে চোগ। লোরি যেব কেইয়্যা ধক।।

সংসার ন দেবে চোগেদি। কথা ন-শুনিবে কানেদি।।

বৈয়্যের ন যেব নাগেদি। কথা ন শুদিব মুয়েদি।।

বল ন থেব লোরিবার। গিরিত কুল নেই তরিবার।।

ইত্য-কুদুমে কানিবাক। গমে চেহ্দাক ডোরেবাক।।

ঠাগুর - লোরি আনিবাক।	আগরতারা মাদেবাক।।
ধর্মপুধি গেই দিবাক।	বাঝি-সারেন্দা বেই দিবাক।।
ইত্য-কুদুমে চেহ্বাক্কি।	বেক মানেই লগে দেবাক্কি।।
লুগে চেহ্বাক্কি দূরত্তুন।	উমেয়্যা বাচ নিঘিলিব মুয়োত্তুন
নাগে - ময়ে জুয়োর বেঙ।	মানেই গড়ন ন থেব।।
আদাম্যাউনে থুভেবাক।	গাঙকুল সিধু বোই নিবাক।।
বানেবাক তারা রুভোকুর।	কানজাবা ভাত খেবাক কুগুরে।।
রুভোকুরত তুলিবাক।	লোরিয়ে আগত্তারা পড়িবাক।।
যক্কে আগুন জ্বলিব।	মাদি-পিত্থিমী জাগিব।।
ন থেব আর নিজেচ দম।	লুঙিবগি কালা যম।।
চান্নোকানিত বোই থেব।	আগত্তারা মাদাদে শুনিব।।
যমচেলায় বানিব।	সক্কে মানেই কানিব।।
পঞ্চ হ্রক মোরিব।	পঞ্চ আপ্তা ছাড়িব।।
রুঘিনী চার্নান ঘুম যেব।	ছারা পেংজুরো হাঙিব।।
রোহ্ যেবগে যমপুরিত।	ঈধোত্তান থেব পিত্থিমীতি।।

ভাবানুবাদ ঃ হিম-শীতল মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে, প্রাণটা ছিড়ে পড়বে। যখন দু'টো চোখ মুদবে, শরীরের গড়ন সব নড়ে যাবে। সংসার আর চোখে দেখবে না, কথাও কানে শুনবে না। শ্বাস-প্রশ্বাস বইবে না নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে কথাও বেরুবে না। এতটুকু সামর্থ থাকবে না নড়ার আর যে সব ধন-সম্পদ জমিয়েছ, তাও তোমার নিজের থাকবে না। ঠাগুর (হীনযানী বৌদ্ধভিক্ষু) , লোরি (মহাযানী পুরোহিত) ডেকে এনে আগরতারা পাঠ করে শোনাবে, ধর্মশাস্ত্র গাইবে, বাঁশি - সারিন্দা বাজাবে। সব আত্মীয়-স্বজন আসবে, সবাই দেখবে কিন্তু দূর থেকে, যেহেতু তোমার দেহ থেকে পুঁতিগন্ধ বেরুবে। নাক-মুখ দিয়ে শেষ প্রবাহ বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে, মানুষের গড়ন থাকবে না কিছুই। গ্রামবাসীরা একত্রিত হবে, তারপর তোমার দেহ বয়ে নিয়ে যাবে নদী কুলে। তারা রুভোকুর (কাঠের দাহ মঞ্চ) বানিয়ে, সেখানে তোমার দেহ স্থাপনের পর ঠাগুর (হীনযানী পুরোহিত) চাদাং (মুখাবরণ) ধরে তোমাকে শেষ কথা- শোনাবে — হীনয়ানী লোরি আগরতারা পাঠ করবে। আর তোমার জন্য রাখা আহারের অন্ন কুকুরে খাবে। এরপর আগুন জ্বলবে, মাটির পৃথিবী তপ্ত হবে। তোমার নিঃশ্বাস-দম কিছুই থাকবে না। তখন কালোযম চান্নোকানিতে (চন্দ্রাতপে) বসে থাকবে আর এদিকে আগরতারা পাঠ চলবে। যুমদুতে তোমাকে বাধার সময় তোমার আত্মা ভয়ে কাঁপবে। তোমার পঞ্চ - অক্ষর নড়ে উঠবে, পঞ্চ-আত্মাও তোমাকে ছেড়ে যাবে, ইহকালের আশা-আকাঙ্খারও শেষ হবে, তখন তোমার প্রাণবায়ু যমপুরীতে চলে যাবে আর পৃথিবীতে পড়ে থাকবে কেবল তোমার স্মৃতি।

চাদিগাং ছারা পালা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে চাদিগাং ছারা পালাটি একটি ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক পালাগান। বাস্তবিক পক্ষে এই পালাগানে ইতিহাসের অনেক তথ্যও প্রাচীন স্থাননাম লক্ষ্য করা যায়, যা

থেকে চাকমাদের সুপ্রাচীন কালের প্রব্রজনের একটি রূপরেখা অনুমান করা যায়। —

যেমন —

পিঝে রোয়াংরাজ হ্‌দিল।	রাধামন সমারে ন জিদিল।।
সে জেরে জিদিলাক কাঞ্চন দেঝ।	ফিরি পলাকেঁ পূগর দেঝ।
পূগর রেজ্য কালঞ্জর।	সিত্তুন পূগে দিলাক লর।।
কালঞ্জর জয় গন্নাক শেঝ।	ঝাভেই পলাকেঁ অক্‌সা দেঝ।।

অর্থাৎ অবশেষে রোয়াং রাজ চট্টগ্রামে পরাজিত হলেন। রাধামন সে রাজ্যটি জয় করলেন। তারপর তিনি জয় করলেন কাঞ্চন দেশ (রায়-কাঞ্চন বা রিয়াং রাজ্য।), ফিরে গিয়ে তারা পৌছলেন কালঞ্জর (ধন্যবতী রাজ্যে)।

এছাড়াও এ পালাগানের হাঘারা গাং (হাওড়া), দিওমুরো (দেবতা মুড়া), মেঘনা দর্যা (দরিয়া বা সাগর তুল্য মেঘনা নদী), পেঙ্গমা ছড়া (প্রাচীন শ্রীহট্টের পেন্নাং নদী) ইত্যাদির নাম উল্লেখ আছে।

বারমাসী গান

ঊনবিংশ শতাব্দীতে চাকমাদের মধ্যে বারমাসী গান রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন বাংলা লৌকিক কাব্য ও বাংলা বারমাসী গানের প্রভাব। এর ভাষাও অনেকাংশে বাংলা ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। ঐ সময়ে রচিত জনপ্রিয় বারমাস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে— চান্দবী বারমাস, মেয়্যাবী বারমাস, তান্যাবী বারমাস, রঞ্জনমালা বারমাস, কিরব্যাবী বারমাস, মা-বাপ বারমাস প্রভৃতি। এখানে মা-বাপ বারমাসের অংশ বিশেষ নমুনা হিসাবে তুলে ধরা হলো —

বৈঝেখ মাজেত্তে মা-বাপ হ্‌লগৈ নিধন।
সেবিত্তে নদিল বিধি মা-বাঁপ চরণ।।
ফুদিল মালত্তী ফুল তুম্বাচ অনসুর।
মরে ছাড়িনে মা-বাপ গেল স্বর্গপুর।।
স্বর্গপুরত যেই মা-বাপ বেক পাঝেরেল।
দুধর তজিম মেয়্যা কারে গোজেই গেল।।

বাংলা অনুবাদ ঃ—

বৈশাখ মাসেতে মা-বাপ হলেন নিধন।
সেবিতে না দিলে বিধি মা-বাপের চরণ।।
ফুটিল মালতী ফুল সুগন্ধ ছড়াল।
আমাকে ছেড়ে মা-বাপ স্বর্গপুরে গেল।।
স্বর্গপুরে গিয়ে বা-বাপ সবই পাশরিল।
দুধের মোহন যাদু কাকে সমর্পিল।।

চাকমা সমাজে এই বারমাসী গান রচনার প্রবাহ খুব বেশীদূর এগোয়নি। তবে, এসব বারমাসীগানের কাহিনীর সরসতা, কোন কোন রচনায় সাংসারিক তত্বকথা এবং তৎকালীন

সমাজচিত্রের প্রতিচ্ছবি ইত্যাদির কারণে এখনো গ্রামীণ অর্দ্ধ শিক্ষিত এলাকায় চাকমা লিপিতে অনুলিখিত অর্বাচীন ও সল্পখ্যাত বারমাসী গান খুঁজে পাওয়া বিচিত্র নয়।

মন্ত্র সাহিত্য

চাকমা লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগ হচ্ছে মন্ত্রসাহিত্য। ছড়া বা পদ্যের আকারে সৃষ্ট এসব মন্ত্রের মধ্যে চাকমা সমাজের প্রাচীন সর্বপ্রাণবাদের লৌকিক বিশ্বাস, ধর্মাচরণ, পূজার্চনা ইত্যাদি লোক সাংস্কৃতিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও ভক্তিনিবেদনের ছন্দোময় বাণীরূপ হচ্ছে মন্ত্র। চাকমাভাষায় মন্ত্রকে 'মন্দর' বলা হয়।

চাকমা সমাজে মন্ত্রের প্রচলন রয়েছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চাকমা তান্ত্রিক ওঝারা এই তান্ত্রিক মন্ত্রাদি আয়ত্ব করে তা ব্যবহারিক জীবনে রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। চাকমা ভাষায় এসব তান্ত্রিক ওঝাদের বলা হয় 'বৈদ্য'। উদাহরণ স্বরূপ এখানে একটি মন্ত্রের নমুনা তুলে ধরা হল ঃ—

বুরপারা মন্দর

দে- রে গঙা — দে- রে পানি
অবুঝ মানেই শুদ্ধ গবং।
শুদ্ধ গরি পাধাং ঘর
মরনাঙ দেবীর পুত শিব-শঙ্কর।।

জুরো ছড়া জুরো পানি
সুরন গবং উরং মনি
সুজং নালে ভরং পানি।
দে- রে গঙা — দে - রে পানি
অবুঝ মানেই শুদ্ধ গরং
শুদ্ধগরি পাধাং ঘর
মর নাঙ দেবীর পুত শিব-শঙ্কর।।

শিল ভাঙি পাথর গবং
পাথর ভাঙি দর্যা গরং
দর্যা পানি হুজে তুলং।
সুজং নালে ভরং পানি
অবুঝ মানেই শুদ্ধ গরং
শুদ্ধ গরি পা ধাং ঘর
মর নাঙ দেবীর পুত শিব - শঙ্কর।।

বাংলা ভাষান্তর

জল পরিশুদ্ধি মন্ত্র

দাও মাতা গঙ্গা জল দাও
অবোধ মানবদের পরিশুদ্ধ করি,
পরিশুদ্ধ করে (তাদের) গৃহে পাঠাই
আমার নাম দেবীর পুত্র শিব - শঙ্কর।।

শীতল স্রোতস্বিনীর শীতল জল
স্মরণ করছি (গুরু) উরংমণিকে
প্রবহমান স্রোতে জলভরি
অবোধ মানবদের পরিশুদ্ধ করি।
আমার নাম দেবীর পুত্র শিব-শঙ্কর।।
নুড়ি ভেঙে পাথর গড়ি
পাথর ভেঙে সমুদ্র গড়ি
সমুদ্রের জল গণ্ডুষে তুলি।
প্রবহমান স্রোতে জল ভরি
অবোধ মানবদের পরিশুদ্ধ করি
পরিশুদ্ধ কবে (তাদেব) গৃহে পাঠাই
আমার নাম দেবীর পুত্র শিব-শঙ্কর।।

মৌখিক সাহিত্য

ছড়া ঃ—

চাকমাদের মৌখিক সাহিত্যের ভাণ্ডারে ছড়ার স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগে নানা বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিশুমনের উপযোগী রচনা লক্ষ্য করা যায়। এই ছড়াগুলো কে সৃষ্টি করেছেন জানা যায় না। চাকমা ভাষায় ছড়া-কে বলা হয় 'অলি'। অলি মূলতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন— ১. ছেলে ভুলানো ছড়া, ২. শিশুক্রীড়া বিষয়ক ছড়া এবং ৩ লোক শিক্ষা বা আচারমূলক ছড়া। নিম্নে কয়েকটি ছড়ার উদাহরণ দেওয়া হলো ঃ—

ছেলে ভুলানো ছড়া

১. দেবায় গরের ঘুরুং ঘারাং
আর দিল রোদ,
লাঘা-বান্দচ্যা বৌ আনিল
পিত্তান জঘা দোদ।

বাংলা ভাষান্তর ঃ—

আকাশ করছে গুড় গুড় (শব্দ)

তবু ছড়াল রোদ,
লাঘা (জাতের) বাঁদরটি বিয়ে
করলো
পিঠটি জুড়ে দাউদ।
২. জুনিরে জনি
ত' ঘর কুনি?
— মুরোত্তলে।
কি আঘে সেই
মুরোত্তলে?
সাতরাজার ধন
মানেক জ্বলে।
মানেকবী কিয়া
কানের সালে?
কানের কধু —
নোনেই গালে।
বাংলা ভাষান্তর ঃ—
জোনাকি রে জোনাকি
কোথায় তোমার ঘর?
— পাহাড়ের খাদে।
কি আছে সেই
পাহাড় খাদে?
সাত রাজার ধন
মানিক জ্বলে।
মানেকবী তবে
কেন কাঁদছে?
কাঁদছে কোথায়,
আহ্লাদই করছে।

বাহ্না (ধাঁ-ধাঁ)

১. কামাহ্ উগুরে গাচ্য
নরে, মাত্তর ন পরে।
[খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছটা,
নড়ে, কিন্তু পড়ে না।]
উঃ- চোখের ভ্রু।

২. উখে ঝন্ ঝনায়
পড়তে পাক খায়,
আমন' আঘার
পবরে জুগায়।
[উঠতে ঝন্ ঝন করে
পড়তে পাক খেয়ে পড়ে,
নিজের খাদ্য
অন্যকে যোগান দেয়।]
উঃ- মাছধরার উড়োজাল।

৩ এ- কুয়ো পানি উ-কুয়োত যায়,
মধ্য কুয়োবো শুখুনো থায়।
[এই কুয়োর জল ঐ- কুয়োতে যায়,
মাঝের কুয়োটি শুঘনো থেকে যায়।]
উঃ -মদ চোলাই করা।

৪. এ দেখে, এ নেই
এ দেঝত তে নেই।
[এই দেখছি, এই নেই
এই দেশে সে নেই।]
উঃ-বিজলীর চমক।

৫. চাল আঘে, তলা নেই
পঝা থবার জাগা নেই।
[চাল আছে, তলা নেই
দ্রব্য রাখার জায়গা নেই।]
উঃ- ছাতা।

৬. মাধাত ছাদি, কাঙেলত লুধি
পুনত্তলে ডাঙর এক্ক্য ভুদি।
[মাথায় ছাতা, কাঁকালে লাঠি
পোঁদের নীচে বড় এক গাঁটরী।]
উঃ- ওল কচু।

৭. ফেল্ল্যং কাল্যা জিরা,
উদিল সদরক চারা।
[ছড়িয়েছি কালো জিরা,
অঙ্কুরিত হলো গাঁদা ফুলের চারা।]
উঃ- তিসি।

৮. খেলে এক কুরুম,
ন খেলে এক কুরুম।
[খেলেও এক ঝুড়ি,
না খেলেও এক ঝুড়ি।]
উঃ- শামুক।

৯. আগা আঘে, গরা নেই
ঢেলা আঘে, পাদা নেই।
[আগা আছে, শেকড় বিহীন
ডাল আছে, পত্রবিহীন।]
উঃ- স্বর্ণলতা।

১০ উগুবে চালা, তলে মালা
থক দি দি, বেড়ায় ভালা।
[উপরে চালা, নীচে মালা
(অর্থাৎ নারকেলেব মালা)
থেস দিয়ে দিয়ে বেড়ায ভালো।]
উঃ- কচ্ছপ।

১১। লুদি টানিলে মোন গুজুরে।
[লতা ধরে টান দিলে পাহাড়ে
গুঞ্জরণ ওঠে।]
উঃ- খেংগরং (Jewsharp)

১২. খায়দ্যে গুলোত্তুন বুধু নেই।
[খাওয়া হয যে ফলটি, তার বোঁটা নেই।]
উঃ- ডিম।

১৩. গাঝঅ উগুরে পানি কুয়ো।
[গাছের আগায় জলের কুয়ো।]
উঃ- ডাব।

১৪. মা কান্দে পুঅ ডাঙর হয়।
[মা কাঁদতে থাকে, ছেলে বড় হয়।]

উঃ- চরকায় সুতো কাটা।

১৫. এক হাত গরি গাচ্য,
গুলো ধরে পাচ্য।
[এক হাত মাত্র গাছটি,
ফল ধরে পাঁচটি।]

উঃ- হাতের পাঁচ আঙুল।

১৬. শন চিড়ি চিড়ি সাপ ধায়।
[শনঘাস চিড়ে চিড়ে সাপ পালিয়ে যায়।]
উ ঃ- কাপড়ে বোনার 'বিয়ং' যা দিয়ে সুতোর মাঝখানে বয়নের সময় আঘাত করতে হয়।

১৭. হারেলে তগায়, পেলে ন আনে।
[হারিয়ে গেলে খোঁজা খোঁজি হয়, খোঁজ পেলে কেউ কুড়িয়ে নেয় না।]

উঃ- পথ।

১৮. কাজা লক্কে ভেক্ভেক্যা, পাগিলে সিন্দুর ।
যে ভাঙি নপারে, তে গুখি সুদ্ধ উন্দুর।
[কাঁচা অবস্থায় ভস্ভসে, পাকলে
যেন সিন্দুর।
যে এই ধাঁধাঁর উত্তর জানেনা
তিনি গোষ্ঠী সমেত ইঁদর।]

উঃ- মাটির হাঁড়ি।

১৯. কালা পোহরত মালা ভাঝে।
[পুকুরের কালো জলে যেন একখানা
নারকেলের মালা ভাস্ছে।]
উঃ- নীল আকাশের চাঁদ।

২০. খায়দে শাক্কানর ফুল নেই।
[যে শাকটা খাই তার ফুল হয় না।]

উঃ- পান।

২১. কায় কায় উড়ি উড়ি থায়
কেয়্যাত বাঝি যায়, মাত্তর ধরা ন যায়।
[কাছাকাছি উড়তে থাকে,
শরীরেও লেগে যায়, কিন্তু ধরা যায় না]

উঃ- বাতাস।

২২. শিরা নেই পেদা, মানুচ গিলে গদা।
[মাথা নেই, শুধুই পেট, কিন্তু আস্ত
মানুষ গিলে খায়।]

উঃ- জামা, শার্ট।

২৩. জেদারে মরায় গিলি খায়।
[জ্যান্তকে মৃত গিলে খায়।]

উঃ- জামা, গেঞ্জি।

২৪. দ্বি-ভেইয়ে লড়ালড়ি।
[দু- ভাই একে অন্যকে দৌড়ায়।]

উঃ দুই পা।

২৫. ঝাড়ত্তুন নিঘিলি ভজা,
পনুত পাদা, মাধাত কাদা।
[বন থেকে বেরুল ভজা (বিড়াল) ,
পোঁদে পাতা, মাথায় কাঁটা।]

উঃ- আনারস।

২৬. একুলে থুম্থাম্ - উকুলে বিয়া,
ভাঙা নারেকুল জরা দ্যা।
[একুলে থুম্থাম্ (শব্দ) ঐকুলে বিয়ে,
জিনিসটি যেন ভাঙ্গা নারিকেল
অবিকল জোড়া দিয়ে রাখা হয়েছে।]

উঃ- বন্দুক।

২৭. শরধা আঘে, হ্েত নয়
গুজুরেত্তে বাঘ নয়,
উড়েত্তে পেঘ নয়, কি চেহই?
[শুঁড় আছে, হাতি নয়
গর্জন করে বাঘ নয়,
উড়ে যায় পাখি নয়, বলো তো কি?]

উঃ- ' কোমরেং' পোকা।

[এটি এক ধরনের পোকা। মুখে শুঁড়ের মতো একটি দাঁড় আছে। এর পাখা গজায়, উড়তে পারে এবং শব্দকরে বিকট ভাবে]

২৮. পাচ ভেইয়ে ধরে,
বত্রিশ ভেইয়ে ভিরে,
এক ভেইয়ে লাধি চত্তে
কামাদি গোচ্যেই দে।

[পাঁচ ভাইয়ে দৌড়ে গিয়ে ধরে, বত্রিশ ভাইয়ে জাপটে ধরে পিষে, একভাইয়ে গভীর খাদে গড়িয়ে দেয়]

উঃ- ভাত খাওয়া।

প্রবাদ

প্রবাদকে চাকমা ভাষায় বলা হয় 'ডাগ কধা'। অর্থাৎ ডাকের বচন। চাকমা সমাজে এই ডাকের বচনে বহুল প্রচলন রয়েছে। কথা প্রসঙ্গে কেউ উপদেশ দিতে গিয়ে প্রবাদ বাক্য বা ডাগকধা আওড়ালে তখন তিনি বলে ওঠেন— "সেত্যেই ডাগে কইয়্যেদে" অর্থাৎ "তাই তো ডাক বলেছে" ইত্যাদি। এরপর তিনি মূল প্রবাদ বাক্যটি আওড়ান। কিন্তু এই ডাক নামের ব্যক্তিটি কে ছিলেন, কেউ জানেন না। এ সম্পর্কে কেবল বলা হয় — তিনি একজন পণ্ডিত ছিলেন। আসলে ডাক কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। এই ডাক শব্দটি হচ্চে বৌদ্ধতান্ত্রিক এক সাধক সম্প্রদায়ের নাম। চাকমাদের ধর্মীয় ইতিহাস থেকে জানা যায়- চাকমারা এক সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। হয়তো এরই সুবাদে তারা এক সময় বৌদ্ধতন্ত্রযানের ঐসব ডাক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন অথবা নিজেদের মধ্যে ডাক নামধারী পণ্ডিতদের আর্বিভাব ঘটেছিল। সে কারণে কোন প্রাজ্ঞভাষণ বা নীতিকথা আওড়ানোর সময় ঐ ডাকনামের পণ্ডিতদের নাম উচ্চারণ করেন। এখানে নমুনা হিসেবে কতিপয় চাকমা প্রবাদ তুলে ধরা হলো ঃ—

১. অমানুঝে মানুঝ নিন্দে
সনারে নিন্দে পিদোলে,
জুনিপুগে মানেক নিন্দে
ঘি-রে নিন্দে সিদোল।

অর্থ ঃ— অমানুষেরা ভালো মানুষদের নিন্দা করে, যেমন পিতল সোনাকে, জোনাকি মানিক্যকে এবং শুঁটকি ঘি- কে নিন্দা করে।

২. হয় যনি সুজন এক সিজিত ন'জন,
হয় যনি কুজন ন' সিজিত ন' জন।

অর্থঃ— যদি লোক ভালো হয়, তবে এক শয্যায় নয় জন থাকতে পারে। আর যদি লোক খারাপ হয় তাহলে নয়টি শয্যায় নয় জনকে থাকতে হবে।

৩. পেখ্যঅ পড়িবার গঙ — পাদানঅ ঝরিবার গঙ।

অর্থ ঃ— পাখিটিও ডালে বসার মুহূর্ত — পাতাটিও ঝরে পড়ার মুহূর্ত। অর্থাৎ কাকতালীয় ভাবে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা একসঙ্গে ঘটতে পারে।

৪. যুক্যা নাজের থভা থভা,
যুগুনী নাজের কিয়া?
আড়ি পাবা মদ খেই
ডুমুনী নাজের থিয়া।

অর্থ ঃ— যুগী (সম্প্রদায়ের) লোকটি হাঁটু বাঁকিয়ে নাচছে, যুগিনীর কী হলো, সেও কেন নাচছে? আর আড়াই পোয়া মদ খেয়ে ডুমুনী (ডোমের স্ত্রী) সোজা হয়ে নাচছে।

অর্থাৎ — খারাপ লোকের সঙ্গে অন্য খারাপ লোকেরই সঙ্গ জুটে যায়।

৫. সেফ ফেলেলে গা'ৎ পড়ে — খুরোল মারিলে পা'ৎ পড়ে।

অর্থ ঃ— আকাশের দিকে মুখ তুলে থু থু ফেললে তা নিজের গায়েই পড়ে। আর কুড়ুল দিয়ে যেখানে সেখানে কোপ মারলে, কুড়ুলটি এক সময় নিজের পায়েই পড়ে।

অর্থাৎ — অকারণে অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে নিজেরই ক্ষতি হয়।

তুলনীয় ঃ— "আকাশে ফেলিলে থু থু পড়ে নিজ গায়ে।

৬. থেলেঅ বোক্যা মোর্চ্যচ,
ধেলেঅ বোক্যা মোর্চ্যচ।

অর্থ ঃ— ডালে বসে থাকলেও বকটি মরবে, পালিয়ে গেলেও বকটি মরবে। অর্থাৎ — উভয় সঙ্কট।

৭. আঘে কাবচ্যার আঘে জার,
নেই কাবচ্যার নেই জার।

অর্থ ঃ— যার প্রচুর কাপড়-চোপড় রয়েছে তার আরো শীতবস্ত্র লাগে। আর যার গায়ে চড়ানোর কাপড় নেই, তার শীতবস্ত্রেরই প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ — চাহিদার শেষ নেই।

৮. জাদে জাত তগায়,
কাঙারায় গাত তগায়,
উগোলমাহ্জে থুম তগায়।

অর্থ ঃ— জাতি তার জাতিত্বকে খুঁজে নেয়, যেমন কাঁকড়া খোঁজে তার গর্ত আর উকুল মাছ উজান বেয়ে নদীর উৎসের দিকে ছোটে।

অর্থাৎ — জাতিগত স্বভাব সহজে যায় না।

৯. ফাকফাক্যায় মাচ মারে
শিবা আগাত গরি আনে,
নিমোন্যায় মাচ মারে
দুলোত ভরেই আনে।

অর্থ ঃ— বাচাল ব্যক্তি মাছ ধরতে গিয়ে ছিপের আগায় মাছ ঝুলিয়ে আনে, আর নিবিষ্ট ব্যক্তি মাছ ধরতে গিয়ে খলুই ভরে মাছ আনে।

অর্থাৎ— নিবিষ্ট ব্যক্তিরাই সব কাজে সফল হয়।

১০. সিবিদি খেই জিল ঘা হইয়্যে, দৈ পিলা দেলে ডর গরে।

অর্থ ঃ— চুন খেয়ে জিহ্বায় ঘা হয়েছে, এখন দৈ-এর হাঁড়ি দেখলে ভয় লাগে।

তুলনীয় — 'ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়।'

১১. রাঙা খাদি অ ধয় পারা,
বড়গাঙ অ চায় পারা।

অর্থঃ— খাদি (লাল বক্ষ বন্ধনী) ধোয়ার জন্য, বড়নদীও দেখার জন্য।

তুলনীয় — 'রথ দেখা কলা বেঁচা।'

১২. কালত পড়িলে বাবা বাবা,

কাল ফুরেলে শালা।

অর্থ ঃ— বিপদে পড়লে 'বাবা বাবা' সম্বোধনে অনুরোধ করা। আর বিপদ কেটে গেলে 'শালা' নামে তিরস্কার করা।

তুলনীয় ঃ— 'ঘাট পেরোলে মাঝি শালা।'

ধর্মীয় বিশ্বাস

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জার্মানির ড. হেইন্স বেশার্ট প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেছেন — চাকমারা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মী। এমন কি তিব্বতী পণ্ডিত লামা তারানাথ-এর রচনাতেও চাকমারা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মী ছিলেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চাকমারা নিজেদের শাক্যবংশীয় বলে জোরালো দাবী করে থাকেন। সেই সুবাদে এরা সুপ্রাচীন কাল থেকে বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমান চাকমাদের লোকসামাজিক পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারাদির পাশাপাশি এঁদের মধ্যে তথাকথিত 'এনিমিজম' অর্থাৎ সর্বপ্রাণবাদের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান।

তবে, একথা সত্য যে, এক সময় চাকমারা মহাযানী বৌদ্ধমতের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অনুগামী ছিলেন। তার প্রমাণ চাকমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র 'আগরতারা'। এটি চাকমা লিপিতে লেখা মহাযানী ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে রচিত। বলা হয়, এই আগরতারা মোট ৪০ টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে কেবল ১৮ টি তারা বা পুঁথি খুঁজে পাওয়া যায়। এক সময়ে চাকমাদের বৌদ্ধধর্মীয় পুরোহিত নামে পরিচিত লোরি বা লুরি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই আগরতারা থেকে মন্ত্রাদি পাঠ করে চাকমা সমাজে তান্ত্রিক পূজার্চনা সম্পাদন করতেন। এই লোরি বা লুবি শব্দটি এসেছে সম্ভবত বাংলার 'রাউল' বা 'বাউল' শব্দ থেকে। গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই লোরি আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে বাউল দর্শনের কিছু কিছু বিষয় মিলেও যায়। তবে, বাংলার সহজয়ানের 'নাড়ীতত্ত্ব'— এর যে ধর্মীয় দর্শন, যা চর্যাপদের মূল আধারিত বিষয় তা এই লোরীবাদে প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম স্তিমিত হয়ে যাওয়ার ফলেই হোক কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের কারণে অথবা অবতারবাদী মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মমতের তান্ত্রিক তথা সহজযানের প্রত্যক্ষ প্রভাবের দ্বারাই হোক, এক সময় সমগ্র চাকমা সমাজ হিন্দুধর্মীয় ভাবাদর্শের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিলেন। তখন তাদের মধ্যে নবগ্রহ পূজা, শনিপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি হিন্দু আচারাদির প্রচলন দেখা যায়। এমন কি, সেই সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজ-দরবারে রাজপণ্ডিত হিসেবে জনৈক শাক্ত গ্রহাচার্যের নিযুক্তি এবং চাকমারাজের শীল মোহরে ও রাজকীয় মুদ্রায় 'জয়কালী' শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রাক্কালে তৎকালীন বার্মা, আরাকান ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্যতম যশস্বী বৌদ্ধধর্মীয় গুরু পূর্ব চট্টগ্রামের হারভাংবাসী সংঘরাজ

সারমেধ মহাথের কর্তৃক চাকমা রাণী কালিন্দী নিজ প্রজাবৃন্দ সহযোগে উল্লিখিত সেই বিকৃত বৌদ্ধধর্ম থেকে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে এযুগের অন্যতম বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রয়াত ধর্মাধার মহস্থবির তাঁর বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন' — নামের এক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে রাণী মহোদয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম থেকে থেরবাদী বৌদ্ধে পরিবর্তিত হইয়াছেন মাত্র। " সেই থেকে সমগ্র চাকমা সমাজ ক্রমশঃ তাঁদের লোরীবাদের আচার ও তান্ত্রিক পূজার্চনাদি পরিহার করে হীনযানী তথা থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করে আসছেন। তবে, এখনো প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাচীন লোরীবাদ সুলভ সংস্কারাদির অবশেষ তাঁদের লোক সমাজে রয়ে গেছে।

চাকমাদে ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে খ্রিষ্টধর্ম বিষয়ে চাকমাদের অবস্থান সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আদিবাসীদের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল তো বটেই, এমনকি সমগ্র ভারতেই প্রথম চাকমাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। কারণ, পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার নিজস্ব ভূখণ্ড হিসেবে প্রথম ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম সুবাকে অধিগ্রহণ করেন। সেই সময় থেকে চাকমাদের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই বিরোধ তথা সামরিক সংঘর্ষের অবসান ঘটে ১৭৮২ সালে তৎকালীন চাকমা রাজা কর্তৃক ব্রিটিশদের কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে। এবং তারই দশক খানেকের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্গত চন্দ্রঘোনায় ব্রিটিশরা খ্রিস্টান মিশন ও মিশনারী হাসপাতাল স্থাপন করেন, যা সমগ্র উত্তর - পূর্ব ভারতের প্রথম খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

চাকমাদের খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রায় শুরু থেকে পার্বত্য চট্রাগ্রামের চন্দ্রঘোনায় খ্রিষ্টান মিশন স্থাপিত হলেও বৌদ্ধধর্মী চাকমারা কোন সময়ে এই ধর্মের প্রতি আগ্রহ দেখাননি। সমগ্র ব্রিটিশ শাসনামলে আপ্রাণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চাকমা সমাজে কোন সময়ে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা পাঁচ শতাধিক হতে পারেনি। কোন কারণে প্রলুব্ধ হয়ে কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হলেও বছর খানেক পরে তারা স্বেচ্ছায় স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফলে কোন সময়ে এই সংখ্যাটি বাড়তে পারে নি। বর্তমানে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ভারতের খ্রিষ্টান রাজ্য মিজোরাম মিলিয়ে চাকমা খ্রিষ্টানদের সংখ্যা সাকুল্যে এক হাজারের মতো হতে পারে, তার অধিক নয়।

ব্রিটিশ আমলে এবং তারপরবর্তী কালেও চাকমাদের খ্রিষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া চালু রাখার উদ্দেশ্যে কোলকাতার শ্রীরাম পুর থেকে চাকমা এবং বাংলা লিপিতে চাকমা ভাষায় প্রভু যীশুর বাণী সম্বলিত ছোট ছোট পুস্তিকা নিয়মিত প্রচার করা হতো। এই ছাপার কাজ করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জনৈক ধর্মান্তরিত খ্রিষ্টান সোনারাম চাকমা নামের এক ব্যক্তিকে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। স্বাধীনোত্তর কালে উক্ত সোনারাম চাকমার বংশধরদের সঙ্গে কোলকাতাবাসী চাকমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ইদানিং কালে শ্রীরামপুরের ঐসব চাকমা সম্প্রদায়ের খ্রিষ্টীয় উত্তরসুরীদের কোন খবরই জানা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে ইসলাম ধর্মের বিষয়েও আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ, চাকমা ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায় — ১৭১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২ জন চাকমা নৃপতিদের নামের সঙ্গে ইসলাম উপাধি 'খাঁ' বা 'খান' যুক্ত ছিল এবং নামগুলোও ছিল আরবি বা ফারসি ভাষার শব্দ। সেই কারণে কেউ কেউ চাকমাদের মুসলিম উৎসজাত বলে মনে করেন। তাই এ বিষয়টি আলোচিত হওয়া দরকার। প্রথমে উল্লেখ্য যে, আদিতে এই 'খাঁ' বা 'খান' শব্দটি ছিল মঙ্গোলীয়ার মহারাজাদের এক উপাধি বিশেষ। তুর্ক-মোঙ্গল উত্তরাধিকার সূত্রে ইসলাম ধর্মী ভারতীয় মোঙ্গল বা মোগলদের উপাধি হয়ে যায়। সেই সূত্রে এই উপাধি ধারীদের সাধারণ দৃষ্টিতে ইসলাম ধর্মের অনুগামীরূপে ধরে নেওয়া হয়। উল্লিখিত চাকমা রাজাদের খাঁ বা খান উপাধি গ্রহণের পেছনে একটি ইতিহাস আছে। এটা সত্য যে, চাকমারা উচ্চবার্মার মোজাম্রু নামক স্থান থেকে বর্মী-আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হয়ে ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব চট্টগ্রামের শঙ্খ ও মাতা মহুরী নদীর অববাহিকা আলিকদম নামক স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তখন কিছু সময়ের জন্য ঐ অঞ্চলটি ছিল মুসলিমদের অধিকারভুক্ত। ফলতঃ আত্মরক্ষার্থে চাকমারা সেই সময় চট্টগ্রামের মুসলমান শাসকদের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। এরপর তাঁরা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনো ইসলামদের সঙ্গে বা কখনো বর্মী আরাকানিজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যে চাকমাদের বসত ভূমি কর্ণফুলি নদীব মোহনা অঞ্চল হাঙ্গরকুল এবং রাঙ্গুনিয়া অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে যখন বর্মী-আরাকানিজদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সহ সমগ্র পূর্ব-চট্টগ্রাম অর্থাৎ শঙ্খ ও মাতামুহুরী নদীর অববাহিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি মোগলদের অধিকারে চলে আসে তখন এই অঞ্চলের মধ্যবর্তী চাকমাদের অধিকারভুক্ত স্থানটি প্রথমে 'জুমবঙ্গো ' এবং পরে 'কাপাস মহল' নামে মোগল অধিকাবে চলে যায়। কিন্তু মোগলরা চাকমাদের পুরোপুরি বশংবদ হিসাবে গণ্য না করে বর্মীদেব বিরুদ্ধে তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং চাকমা এলাকা থেকে কার্পাস সংগ্রহের লোভে কেবল মাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্পাস কর প্রদানের শর্তে চাকমা রাজাদের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন মেনে নেয়। পরিবর্তে চাকমাবা মিত্রতা স্বরূপ মুসলিম রাজকীয় নাম ও খাঁ উপাধি গ্রহণ কবে নয়। তবে কোন অবস্থাতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এপ্রসঙ্গে এখানে আরো উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রামের পূর্ব-সীমান্তবর্তী আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যের নৃপতিরাও অনুরূপভাবে গৌড়ের সুলতানদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষার্থে ১৪৩০ থেকে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজকীয় মুসলমান নাম ও'শাহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরাও কখনো বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি।

সুতরাং ভিন্নধর্মীয় প্রভাবের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ব্যতীত খ্রিষ্টান বা ইসলাম ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব চাকমাদের উপর বাহ্যত দেখা যায় না। অবশ্য কোন এক সময়ে চাকমাদের মধ্যে কেউ কেউ সত্য পীরের সিন্নী করতেন। তা ছিল ব্যক্তি বিশেষের মানসীর কারণে। সেক্ষেত্রেও তা সম্পন্ন হতো সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে, কোন মৌলবী বা পীর-ফকির ডেকে এনে নয়। অপরদিকে, অনুরূপভাবে চাকমা সমাজের কোন কোন পরিবারে সত্যনারায়ণের সিন্নী, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি 'মানসী'-র কারণে সম্পন্ন হতে দেখা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও চাকমা ওঝা বা তান্ত্রিক বৈদ্যেরা নিজস্ব

তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূজা সম্পন্ন করতেন, হিন্দু পুরোহিতের দ্বারা নয়। একইভাবে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতিতে ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে জুমচাষীরা বন্য হাতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষার্থে লংতরাই পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। তাই বলা যায়, এগুলো হচ্ছে ইচ্ছানিরপেক্ষ প্রতিবেশী সুলভ লোক-সাংস্কৃতিক প্রভাব, যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় প্রভাবের ফল নয়।

ত্রিপুরায় বসবাসকারী চাকমারাও অন্যান্য অঞ্চলের চাকমাদের মতো থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামী। তাঁদের মধ্যেও আদিম আদিবাসী সুলভ সর্বপ্রাণবাদের আচার-অনুষ্ঠান প্রবলভাবে বিদ্যমান। ফলে তাদের লোক-সামাজিক পরিমণ্ডলে বৌদ্ধ থেরবাদের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব ও পূজার্চনা, যেমন— বুদ্ধ জয়ন্তী বা বুদ্ধ পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, ফালগুনী পূর্ণিমা বা মধু পূর্ণিমা ইত্যাদি যথারীতি পালিত হয়ে থাকে। সর্বত্র বৌদ্ধধর্মীয় শান্তি ও মৈত্রীর পরিবেশ রক্ষার কারণে এখানে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কখনো কোন ধর্মীয় বিরোধ বা সংঘর্ষ সংঘটিত হতে দেখা যায় নি। ফলে, এখানকার সম্পূর্ণ চাকমা অধ্যুষিত কোন গ্রামে বহিরাঞ্চলের কোন খ্রিষ্টীয় দল যদি কোন মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চায় চাকমারা তাতে আপত্তি জানায় না। কারণ, চাকমারা ধর্মীয়ভাৰে উদার ও সহনশীল এবং নিজেদের বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

লৌকিক পূজা-পার্বণ

প্রাচীন প্রকৃতিপূজার বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী চাকমারা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকার লৌকিক দেব দেবীর পূজার্চনা করে থাকেন। ফলে তাঁদের আরাধ্য লৌকিক দেব-দেবীদের তালিকাটিও দীর্ঘ। যেমন—

১. গোজেন — পরমেশ্বর
২. পোরমেশ্বরী — গোজেনের স্ত্রী
৩. চুমুলং — বিবাহের দেবতা
৪. থান — বাস্তু দেবতা
৫. মা- লক্ষ্মী মা — ফসল ও ঐশ্বর্যের দেবী
৬. গঙা মা — গঙ্গা; নদী, সমুদ্র ও জলের দেবী
৭. ধলেশ্বরী মা — বিদ্যার দেবী
৮. বিক্রমপুদি মা — কার্পাস ও বয়ন শিল্পের দেবী
৯. বিয়াত্রা — গঙ্গার পুত্র; সর্বপ্রকার হিতকারী দেবতা
১০. রাখ্যয়াল — ভূমি রক্ষক
১১. মোদ্যা — ব্যঘ্র দেবতা
১২. হ্যাদ্যা — অনিষ্টকারী পতঙ্গের দেবতা
১৩. ফুল কমরী — খোস পাঁচড়ার দেবী
১৪. মেল কমরী — বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি মহামারী রোগের দেবী
১৫. মোঘিনী — সম্মোহনের দেবী
১৬. বজস্মন্তী — ভূমিমাতা

১৭. সিজিলা — শিশুর অনিষ্টকারী দেবী
১৮. কালা খেদর — জ্বর ও বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টিকারী দেবতা
১৯. হৈয়্যা — নারীর উর্বরতার দেবী
২০. এদা — সাহস সৃষ্টিকারী দেবতা
২১. লংত্রেই (লংতরাই) — হাতীর দেবতা
২২. কালিয়া — লংত্রেই এর পুত্র; সর্বপ্রকার মঙ্গলকারী দেবতা
২৩. হাজংমা — বন্য শুকর ও অন্যান্য পশু-পাখির তথা অরণ্যের দেবতা

উল্লিখিত দেব-দেবীগণের পূজার্চনা ছাড়াও চাকমারা ভুতের রাজা, ' ডেন' (ডাইন) রাজা, সিজি-মাংসা ইত্যাদি অপদেবতাদের উদ্দেশ্যে অসুখ বিসুখ নিরাময়ের জন্য এবং দেবারাজ (আকাশের দেবতার) পূজা দেন। এসব পূজা সম্পন্ন করেন 'অজা' নামের পূজারীরা।

ঘর চুমুলং

এই পূজাটি গৃহস্থের বাৎসরিক মাঙ্গলিক পূজা। বিবাহের দেবতা চুমুলাং দেবতার উদ্দেশ্যে এটি অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় পোরমেশ্বরী ও বিয়াত্রার উদ্দেশেও নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। গৃহস্থের সার্বিক মঙ্গলের কামনায় এই পূজার আয়োজন হয়। সাধারণতঃ বৎসরের শুরু বৈশাখ মাসে গৃহস্থরা এই পূজার আয়োজন করে গ্রামবাসীর সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে পূজা উপলক্ষে ভোজের আয়োজন করেন। অবশ্য অন্য সময়েও এই পূজাটি অনুষ্ঠিত হতে পারে।

হোইয়্যা

এটাও পারিবারিক মাঙ্গলিক পূজা। তবে সকল পরিবারে এ পূজাটি হয় না। পুত্র সন্তানের কামনায় কিংবা কোন কঠিন রোগ থেকে মুক্তির জন্য কেউ 'মানসী' করলে এ পূজা দিতে হয়। তবে একবার এই পূজা দিলে প্রতি বৎসর (কমপক্ষে তিনবছর) সাধারণভাবে হলেও এই পূজা দিতে হয়। এই হোইয়্যা পূজায় গঙ্গা, বিয়াত্রা, মা-লক্ষ্মী -মা সহ মোট নয় জন দেব-দেবীর ভোগ দিতে হয়। তবে মূল আরাধ্যা দেবী হচ্ছেন বিক্রমপুদি -মা। তার উদ্দেশ্যে পূজা প্রাঙ্গনে উচুঁ বাঁশের খুটি গেড়ে তাতে বর্ণালী হাদি (মহিলাদের বক্ষ বন্ধনী) টাঙ্গিয়ে দিতে হয়।

নুয়োভাত

'নুয়ো ভাত' মানে নবান্ন। জুমের ফসল ঘরে তোলার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে মা-লক্ষ্মী - মার উদ্দেশ্যে এই পূজাটি দেওয়া হয়। এই পূজার মা- লক্ষ্মী -মা'র নৈবেদ্য হিসেবে শুকর বলি দিতে হয়। তবে মা- লক্ষ্মী মা'র উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য চড়ানোর আগে অবশ্যই পৃথকভাবে বিয়াত্রা দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ দিতে হয়। কারণ 'লক্ষ্মী পালা বা সিরিথি পথম'' পালাগানে উল্লেখ আছে যে, মা- লক্ষ্মী -মাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য স্বয়ং মা-লক্ষ্মী -মা নাকি বিয়াত্রা কে সকল দেবতার আগে পূজা পাওয়ার বর দিয়েছিলেন।

বিঝু উৎসব

'বিঝু' চাকমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। চৈত্রের শেষ দু'দিন এবং নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ— এই তিনদিন ব্যাপী এটি পালিত হয়। এই তিনদিনের প্রথম দিনটিকে বলা হয় 'ফুল বিঝু' দ্বিতীয় দিনকে মূল বিঝু এবং তৃতীয় তথা শেষ দিনকে 'গোয্যাপোয্যা বিঝু'।

বিঝুর এই মোক্ষম দিনগুলো ঘনিয়ে আসার প্রায় মাসাধিক আগে থেকেই প্রতিটি চাকমা গৃহস্থের ঘরে ঘরে বিঝুকে সাদরে ও যথাযোগ্য মর্যাদায় বরণ করার জন্য নানা প্রকার প্রস্তুতি ও কেনাকাটা শুরু হয়ে যায়। এ দিকে তখনই ঝোপের আড়াল থেকে "বিঝু পাখি" টি 'বিঝু এ যোক — বিঝু এ যোক' অর্থাৎ "বিঝু আসুক —বিঝু আসুক' সুর তুলে ডেকে ওঠে। ঐ সময়টি প্রকৃতিতে মধুময় বসন্তেব ভবপুর সময়। তখন এই "বিঝু এ যোক' শব্দে প্রকৃতি যেন আরও ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। এমনই মোক্ষম সময়ে বসন্তের ফুলের রঙে সেজেগুজে বলে আসে বর্ণময় রঙ্গিলা বিঝু।

চাকমাদের বিঝু লোকনৃত্য

বিঝুর প্রথম দিন অর্থাৎ ফলবিঝুর দিনটি মূলতঃ বিঝুকে বরণ করাব চূড়ান্ত প্রস্তুতির দিন। সেদিন ঘব-দোব ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ধোয়া-মোছা করা হয়। নেওয়া হয় পিঠা, পায়েস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য তৈবির আয়োজন। দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ মূলবিঝুর দিনে প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বেই পরিবারের সকলেই বিঝু স্নান সেরে নেন। এরপর সকাল থেকেই দলবেঁধে বিঝু-পরিভ্রমণ শুরু হয় প্রতি ঘরে ঘরে। কাবণ এই দিনটিই প্রকৃত উৎসবের দিন — আনন্দ করার দিন। যুবক - যুবতী, কিশোর - কিশোরী সবাই ঘরে ঘরে গিয়ে পিঠা, পায়েস ও অন্যান্য সুস্বাদু খাবার খায়। এক সময় গ্রামের কোন প্রশাস্ত উঠোনে জমে ওঠে লোক ক্রীড়ার আয়োজন। নানা প্রকার ক্রীড়া। ঘিলা খারা, নাদেং খারা, পোর খারা, পত্তি খারা ইত্যাদি। এদিকে বিবাহিত বা মধ্যম বয়সী গ্রামের কোন গৃহে জড়ো হয়ে জমিয়ে তোলে মদ্য পানের আসর। এই পরিত্রতম দিনে মদ্য পানের কোন বাধা নেই। বুদ্ধরা পূন্যলাভের আশায় বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে অষ্ট শীল পালন করে। অথবা নিজ নিজ

বাড়িতে ত্রিপিটক, রামায়ন মহাভারত পাঠ করে দিনটি উদ্‌যাপন করে। সন্ধ্যে বেলায় কোন এক সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে আয়োজিত হয় গেংখুলির পালাগান। রাতভার চলে এই পালাগানের আসর। তৃতীয় বা গোয্যা পোয্যা দিনে দুপুর বেলার গ্রামের মন্দিরে আয়োজন হয় বুদ্ধ পূজায়। সেখানে প্রতিটি গৃহস্থের নারী-পুরুষেরা বুদ্ধ পূজার উপাচার নিয়ে হাজির হয়। চলে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও পূজার্চনা। সন্ধ্যায় সেখানে আয়োজন করা হয় প্রদীপ পূজা। সবাই বুদ্ধেসর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করে — নতুন বছরটি যেন সবার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধিময় হয়ে ওঠে।

লোকগীতি

চাকমা ভাষায় লোকগীতিকে বলা হয় 'উভোগীত'। এই উভোগীতিগুলোর কোন নির্দিষ্ট রচয়িতা নেই। এগুলো প্রজন্মবাহিত হয়ে লোক সমাজে টিকে রয়েছে। এই লোকগীতি সমূহের মূল বিষয়বস্তু হচ্চে প্রেম। তাই এগুলোর আবেদন চিরন্তন। অবশ্য, ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর রচিত লোকগীতি রয়েছে।

চাকমা লোকগীতিতে লোকবাদ্য খুব কমই ব্যবহৃত হয়। কেবল গেংখুলি (চারণ কবি) -দের গানে বেহালা বা সারিন্দার ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য চাকমাদের বাঝি (বাঁশি), ধুধুক (বাঁশের তৈরি একধরনের বাদ্য), শিঙা (বাঁশের তৈরি), হেংগরং (জিউস হার্প), ঢুল (ঢোলক) ইত্যাদি যন্ত্র বৌদ্ধ সংকীর্তনে এবং মৃতের শবদাহ কার্যে ব্যবহৃত হয়। যা হোক, এখানে উভোগীতের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো।

শিলত্তুলে তুধিং ছঅ
কেয়্যা নদেঘং শুনং বঅ।
খেলন তাস খাঁরা রং বেইনেই
মেয়্যা জোরেলুং গম দেইনেই।
পানি খেইয়্যা পনত্তুন
নিত্য ন-যায় মনত্তুন।
উড়ের বরণী খুয়োত্তলে
পরান জুড়েব কুয়ৎ গেলে।
পানি খেইয়্যা দ্বিমালা
দিলে শরীলত কি জ্বালা।

ভাবানুবাদ ঃ— টিট্রিভ পাখির ছানাগুলো পাথরের আড়াল থেকে কিচির মিচির শব্দ করছে। তাদের শব্দ শুনতে পাই, কিন্তু দেখতে পাই না। বাতাস যেন তোমার মধুর সংলাপ বয়ে আনন্দে, অথচ তোমাকে আমি দেখতে পাই না। রঙের তাস নিয়ে যেমনি তাস খেলা চলে, আমি তোমার কাছে যেন তাই। সুনির্মল বারি পান করে যেমনি তৃষ্ণার্ত তৃপ্ত হয়, আমি তোমর স্মৃতি-সুধা পান করেই তেমনি তৃপ্ত। কুয়াশার জাল ভেদ করে যেমনি বরণী পাখি উড়ে যায়, তেমনি আমিও তোমার কাছে উড়ে যেতে চাই।

অনুরূপ প্রেম বিষয়ক অপর একটি লোকগীতিতে আছে —

মাঘে - ফাগোনে ফেল্ল্য হিৃন
দারু তুলি হরিং শিং
নিত্তিত তুলি মারং দিন
এক বুগি পজা — একবুগি দিন।
মাঘে -ফাগোনে ফেল্ল্য হিৃন
পেখ্য ডগরের চিং চিং চিং
মা - বাবে পালের কয়ব্য দিন
সদর নেগে পালো চিরদিন
পীড়া বুঝি দারু চিন
ঘড়া বুঝি চড়া জিন
গুজুরি পড়েল্লি নাগর দিন
বিনামা কাদিয়ার গাবুব দিন।

ভাবার্থ ঃ— মাঘ-ফাল্গুন মাসে হিমপাত হয়েছে। 'হরিং -শিং' ঔষধ সংগ্রহের এখনই সময়। এই সময়ে তোমার বিরহে দিনগুলি তুলাদণ্ড দিয়ে মেপে চলেছি।

মাঘ-ফাল্গুন মাসে হিমপাত হয়েছে। চিংচিং শব্দে পাখিরা ডাকছে। আমি জানি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে চিরকাল প্রতিপালন করবে না। তোমার স্বামী হলে সেই তোমাকে চিরকাল প্রতিপালন করবে।

অপর একটি গানে আছে —

কালি কুচ্যাল পেরেলুং
ধলা কুচ্যাল পেরেলং
নানান দেঝকুল বেড়েলুং
আঝায় আঝায় ভাঝিলুং
বারিঝ্যা বজকাল কাদেলুং।
নপেলুং কিওজন ত - ধোক্যা।
কামে - করজে তোদক্যা,
রূবে -রঙে চোদক্যা
নপেলুং কিওজন লক্ষ্মী রৈ ত-ধোক্যা।

ভাবার্থ ঃ— ইক্ষুগাছ পিষ্ট করে যেমনি ইক্ষুরস বের করা হয়, তেমনি নিজেকে পিষ্ট করে আমি অভিজ্ঞতার রস সঞ্চয় করেছি। আমি তোমার মত সুন্দরী নারী কাউকে দেখিনি। সত্যি, গোটা তল্লাটে তোমার তুলনীয় কাউকে আমি দেখিনি।

বাসগৃহ

চাকমারা সাধারণত নদীর পারে এবং নদীর নিকটবর্তী তুলনামূলক নীচু পাহাড়ের ঢালুতে খোলামেলা জায়গায় নিজেদের বসতি গড়ে তোলে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের অধিকাংশেরই বাসগৃহ ছিল অনেকটা পাটাতন দেওয়া উঁচু মাচাং ঘর যা ত্রিপুরায় স্থানীয়ভাবে বলা হয় 'টং ঘর'।

চাকমারা 'টং' বলতে বোঝে উচুঁ গাছের ডালের উপর জুম পাহারা দেওয়া কিংবা পশু শিকারের জন্য নির্মিত ছোট একটি ঘর যেখানে দু'তিন জন মাত্র বসতে পারে বা শুতে পারে। আসলে 'টং' শব্দটির অর্থ পাহাড়। এটি বার্মিজ শব্দ। চাকমারা নিজেদের উচুঁ মাচান যুক্ত ঘরেকে বলে 'আলগঘর' কেউ কেউ বলে 'জেৎঘর'। আদিকালে বলতো 'হ্াম'। ঘরের তলার অংশকে বলতো 'হ্ামত্তল'।

চাকমাদের ঘরগুলোর পাটাতন বা ফ্লোর - এর উচ্চতা মাটি থেকে ৪/৫ হাত হয়ে থাকে। এর উপরেই বসবাসের জন্য বেড়াযুক্ত কক্ষ ও চাল। পাটাতনটি যাতে মজবুত হয় তরা জন্য নীচের দিকে ঘন খুটি থাকে, এগুলোকে চাকমা ভাষায় 'থবাক' বলে। ঘরটি যাতে তুফানে হেলে না পড়ে তার জন্য বাঁশের বাঁকা ঠেস থাকে, যার নাম ফিবাক। চাকমাদের ঘরের বিভিন্ন অংশবে পাঁচ ভাগে করা যায়। যেমন — ১) ইজোর, ২) চাহ্না, ৩) সিংগবা, ৪) পিজোর এবং ৫) ওজোলেং। ঘরের সম্মুখভাগে একটি প্রশস্ত মাচান থাকে। তার নাম হচ্ছে ইজোর। ইজোর পেরিয়ে ছাদের নীচে যে অংশটি থাকে তার নাম 'চাহনা'। এখানে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। ঘরের ডান দিকের অংশে একটি কক্ষ থাকে তার নাম সিংগবা। এই সিংগবারই এক পাশে পৃথক একটি কক্ষে গৃহ কর্তার শয়ন কক্ষ। এই কক্ষের পেছন দিকে থাকে তার নাম ওজোলেং। এবং ঘরের বামপাশে লম্বা একটি কক্ষ থাকে সেটির নাম পিজোর। পিজোরের সম্মুখ ভাগে বন্ধনশালা থাকে, তার নাম চাকমা ভাষায় 'উলোনশাল'। এই উলোন শালের একপাশে অনেকট ঘরের পেছন দিক ঘেঁসে যে কক্ষ অর্থাৎ পিজোরের একাংশ মহিলাদের শয়ন কক্ষ।

ইদানিং কালে এধরনের আলগঘর সচরাচর দেখাই যায় না। তবে মিজোরামের চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় কিছু কিছু দেখা যায়। আসলে পার্বত্য এলাকায় বসবাসের জন্য আলগঘর জাতীয় ঘরগুলো খুবই সুবিধাজনক। এ ধরনেব ঘর পাহাড়ে ঢালুতে, পাহাড় চুড়োয়, খাদের পাশে সহজে নির্মাণ করা যায়। বন্য জন্তু ও বৃষ্টির জল থেকে বাঁচার পক্ষে এ জাতীয় ঘর উপযুক্ত। কিন্তু ইদানিং কালের চাকমারা অধিকাংশই সমতলবাসী হয়ে গেছে, তাই এখানকার চাকমাদের ঘরগুলো সমতলের অন্যান্য বাসিন্দাদের ঘরের মতোই হয়ে যাচ্ছে।

বাদ্যযন্ত্র

চাকমাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বাদ্যযন্ত্র সমূহ প্রচলিত দেখা যায়। যেমন—

ঢুল — বাংলা ভাষায় যাকে ঢোলক বলা হয়, চাকমা ভাষায় তা ঢুল। এটি নৃত্য-গীতেব সময়, দাহ কার্যে ও রথটানা উৎসবের সময় বাজানো হয়। এ ছাড়া এক ধরনের বড় আকারের 'রণঢুল' আছে যা কেবল যুদ্ধের সময় বাজানো হয়।

ধুধুক — ধুধুক হচ্ছে একটি মোটা বাঁশের খণ্ড, যার বুকেব একাংশ কেটে ফেলা হয়। এই কাটা অংশের উপর এক হাতে ধরা একটি বা দু'টি কাঠি দিয়ে আঘাত করে এটি বাজাতে হয়। নৃত্যের তাল রাখার ক্ষেত্রে এই বাদ্যটি খুবই উপযোগী।

শিঙা — শিঙা দু'প্রকারের হয়। একটি মহিষের শিং দিয়ে, অপরটি বাঁশ দিয়ে। মহিষের শিং দিয়ে তৈরি শিঙাতে অনেক সময় ছোট ধাতুর পাইপ লাগানো হয়। বাঁশের তৈরি শিঙাটি হচ্ছে ৭/৮ হাত লম্বা বাঁশের মধ্যের গাঁটগুলো ছিদ্র করে পুরোপুরি ফাঁকা করা হয় এবং সামনের দিকে

গাঁটে সঙ্গে অপর একটি ছোট্ট বাঁশের পাইপ লাগিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে এটি বাজাতে হয়। পুরনো দিনে যুবকরা জুমের টংঘরে বসে এটি বাজাতো। সাম্প্রতিক কালে এটি কোন কোন নৃত্যের শুরুতে বাজানো হয়।

হেংগরং — এটি বাঁশের ছোট একটি চেলি দিয়ে তৈরি চ্যাপ্টা ধরনের মুখে বাজানোর একটি যন্ত্র। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫-৬ ইঞ্চি। এটিকে ইংরাজীর Jews harp যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই যন্ত্রটি প্রধানত যুবতীরাই বাজান। ঝংকার সমৃদ্ধ এই যন্ত্রটি গানের তালে তালে বাজানো হয়।

হেংগরং বাদ্য বাদনরত চাকমা রমণী

বাহ্ঝি — অর্থাৎ বাঁশের বাঁশি। চাকমাদের মধ্যে দু'ধরনের বাঁশি প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে মুরলী বাঁশি। অপরটি বাঁশির মাঝখানে মোম লাগানো বাঁশি। এর নাম 'মুম বাহ্ঝি'। চাকমাদের 'উভোগীত' অর্থাৎ লোকগীতির সুরের সঙ্গে এই মোম লাগানো বাঁশিটির সুর খুবই মিলে যায়।

সারেন্দা — প্রচলিত সারিন্দাকেই চাকমা ভাষায় বলা হয় সারেন্দা। চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত এটি একমাত্র তার যন্ত্র।

মং — এটি ধাতুর তৈরি 'গং' (Gong)। দেখতে অনেকটা বড়ো আকারের করতালের মতো। এটি কোথাও টাঙ্গিয়ে বাজাতে হয়। বৌদ্ধ মন্দিরে পূজার্চনার সময় এবং যুদ্ধনত্যে এটি কোথাও টাঙ্গিয়ে বাজাতে হয়।

সুরঅ -ছ — এটি একপ্রকার ছোট আকৃতির লাউ-এর খোল। এর শুকনো বীচি গুলো এর মধ্যে থাকে এবং ঝাঁকানি দিলে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে। গানের তালে তালে এটি বাজানো হয়।

লোকক্রীড়া

চাকমা ভাষায় যে -কোন প্রকার ক্রীড়া বা খেলাধূলাকে 'খারা' বলা হয়। তাদের মধ্যে প্রচলিত ক্রীড়া সমূহের মধ্যে আছে — বালক -বালিকাদের জন্য পল্লাপল্লি খারা (লুকোচুরি খেলা), বুদ্ধিমান খারা, রাজা খারা, কবাজাং খারা, বাঘ খারা, চোকবান্যা খারা, ইজিবিজি খারা ইত্যাদি। কিশোর - কিশোরী ও যুবক -যুবতীদের মধ্যে প্রচলিত আছে — পত্তিখারা, পোর খারা, ঘিলা খার, নাদেংখারা, গুডু খারা (হা-ডু-ডু), বদাবডি (কুস্তি), বলি খারা (মল্লযুদ্ধ) ইত্যাদি। ঘরে বসে খেলার মধ্যে আছে— সেজক খারা, শামুক খারা, পেইখ খারা, বাঘদী খারা, পাশাখারা, এলাদুলা খারা প্রভৃতি। এছাড়াও জলক্রীড়ার মধ্যে আছে — পকপক খারা, ধানচোল খারা, হাড়ি

খারা, মাচ খারা ইত্যাদি।

অলঙ্কার

সাধারণত চাকমা রমণীদের আবশ্যকীয় আট প্রকার অলঙ্কার (চাকমা ভাষায় 'অষ্ট্যালংকার) - এর কথাই বলা হয়। যেমন— ১. ঠেঙৎ খারু (রূপোর তৈরি এক ধরণের পায়ের মল) ২. সনানচ (সোনার তৈরি নাকের নথ), ৩. বাঘু (রূপোর তৈরি বাজুবন্ধ), ৪. ঝুম্মুলি (প্রতিকানে জন্য রূপোর তৈরি বিশেষ প্রকার ঝুমকা), ৫. কজফুল (কচফুল আকৃতির সোনার তৈরি কানের ৪/৫টি করে পরিধানের অলঙ্কার), ৬. তাজ্জুর (কব্জিতে পরিধেয় রূপোর অলঙ্কার), ৭. হাঝুলি (রূপোর হাঁসুলি) এবং হালছরা (রূপোর চন্দ্রহার)। বিবাহের সময় কনেকে এই আট প্রকার অলঙ্কার 'দাভা' অর্থাৎ পণ স্বরূপ পাত্রের পক্ষ থেকে দেওয়ার বিধি একদা চাকমা সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে আছে — তেঙাছরা (টাকার মালা), কুজিখারু (হাতে পেঁচিয়ে পরার রূপোর অলঙ্কার), আঙ্খিক (আংটি), বাঙোরি (খারু), পিজি ছরা (পুঁতির মালা) , ঘিলাত্তাক (বর্ণালি পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি গলার হার), চরাং (রূপোর তৈরি বিশেষ ধরনের চুলের কাঁটা) ইত্যাদি। ইদানিং কালে উল্লিখিত অলঙ্কারের অনেকটি ব্যবহৃত হয় না। অপরদিকে আগেকার দিনেও পুরুষরা আংটি ছাড়া কোন অলঙ্কারই পরতো না। তবে, কেউ কেউ সখে বাম বা ডান হাতে লোহার রিং বা বালা পরতো। আর যুবকদের কেউ কেউ মাথায় 'ফুনি' অর্থাৎ চিরুণী গুঁজে রাখতো।

রূপোর হাঝুলি (চন্দ্রহার) ও খারু

বয়ন শিল্প ও পোষাক পরিচ্ছদ

অন্যান্য আদিবাসী রমণীদের মতো চাকমা রমণীরাও বয়ন শিল্পকর্মে খুবই পারঙ্গম। বহুকাল আগে থেকে চাকমা রমণীরা জুমের কার্পাস থেকে সুতো কেটে কোমর তাঁতে নিজেদের পরিধেয় ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবহার্য পোষাক - পরিচ্ছদ ও অন্যান্য পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করতো। চাকমা ভাষায় এই কোমর তাঁতকে বলা হয় 'বেইন'। বেইন কাজে ব্যবহার্য যাবতীয়

হাতিয়ার পত্র ও দ্রব্য - সামগ্রীকে বলা হয় 'সোচ -পদর'। আর বয়ন শিল্প কর্মকে বলা হয় 'বুনোকাদা'। প্রাচীন কালে চাকমাদের জীবন -জীবিকার তথা বেঁচে থাকার উপকরণ সমূহের প্রধান উৎস ছিল জুম ও অরণ্য নির্ভর। তখনকার দিনে জুমে বহুমুখী বিভিন্ন ফসল ছাড়াও পর্যাপ্তভাবে উৎপাদিত হতো 'কারমা' গাছ। এই কারমা গাছ (Indigo plant) -এর পাতা থেকে পাওয়া যেতো নীল রং। অন্যান্য রঙের জন্য ব্যবহৃত হতো 'রং গাছ', বহেড়া গাছ, জাম গাছ সহ হলুদ ও চুন এবং বনের বিভিন্ন গাছের কাণ্ড, মূল, পাতা, ফুল, ও ফলের নির্যাস। ফলে চাকমাদের মধ্যে অনেক আগে থেকেই কাপড় রং করার আদিম পদ্ধতি জানা ছিল।

কোমর তাঁতে তাদের বস্ত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে — পিনোন (মহিলাদের পাছড়া), খাদি (বক্ষ বন্ধনী), ফুল খাদি (নকশা সমৃদ্ধ বক্ষ বন্ধনী), খবং (মহিলা ও পুরুষদের মাথায় জড়ানোর কাপড়), কানি (গামছা জাতীয় কাপড়), হাত -কাবড় (চাদর), কাগোই (মহিলাদের ব্লাউজ), শিলুম (পুরুষদের জামা), বোর্গি (মোটা সুতোয় বোনা পুরু কাপড়), গান্‌ঝা কানি (গামছা), জহ্‌ল গান্‌ঝা (যুবকদের ব্যবহার্য বর্ণালী গামছা), কর্‌জাল (কাপড়ের থলে), বিছ্যনী (বিছানা চাদর), ফুল তাঙোন (বুদ্ধ মন্দিরের গর্ভগৃহে টাঙ্গানোর জন্য বর্ণময় লম্বা কাপড়) জুম্ম্য শিলুম (জুমের কাজে ব্যবহার্য পুরুষদের জামা), চীবর (বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পরিধেয় গেরুয়া বস্ত্র) এবং 'আলাম' (নকশা সংগ্রহের নমুনা বুনে রাখা কাপড়) ইত্যাদি। এখানে শেষোক্ত বস্ত্রটি সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। চাকমা ভাষায় নকশাগুলোর নাম হচ্ছে 'ফুল'। এই বর্ণময় বস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার ফুল বা নকসা বুনে রাখা হয়। নকসাগুলো সাধারণত বিভিন্ন গাছ, ফুল, পশু-পাখিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নমুনা, পশু-পাখিদের পায়ের ছাপ, মেঘমালা ও জলকুণ্ডলী নমুনা ইত্যাদির প্রতীক সমূহ নিয়ে তৈরী হয়। এই নমুনা বা প্রতীক সমূহ পর পর এই আলাম নামের বস্ত্রে বুনে রাখা হয়। তাই বয়ন শিল্পীদের নিকট এই আলামের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

খাদ্যাভ্যাস

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। তবে মাছ-মাংস নিয়মিত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার আগ্রহী। তারা সচরাচর শুকর, মুরগি ও ছাগলের মাংস গ্রহণ করে থাকে। বন্য পশুদের মধ্যে শম্বর, বন্য শুকর, হরিণ, বন্য ছাগল (ইয়া হরিং), বুনো মহিষ, গবয় ইত্যাদি মাংস খায়। পাখিদের মধ্যে শকুনি ও কাক ছাড়া অধিকাংশ পাখির মাংস খায়। নদী ও ছড়ার শামুক, কাঁকড়া ও চিংড়ি খেতে পছন্দ করে। কাঁকড়া ও চিংড়ির মাংস অন্য সব্জির সঙ্গে মিশিয়ে রান্না করে। তাতে সব্জি সুস্বাদু হয়। তারা শুঁটকি খেতে পছন্দ করে। মাছ-মাংস ব্যতীত তাদের অন্যতম প্রিয় খাদ্যের তালিকায় আছে 'বাঁশ করুল'(Bamboo shoot) , বেতের আগা (Cane top), শাম্মু উল (Mashroom)। তারা বাঁশ -কুরুলকে কেটে কুটে ২/৩ দিন হাঁড়িতে রেখে দিয়ে তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্না করে খায়।

চাকমারা পর্যাপ্ত পরিমাণে শাক-সব্জি গ্রহণ করে। শস্য, রাই ও জুমের 'আমিলা' নামের শাক ইত্যাদি তারা কম সিদ্ধই পছন্দ করে। এমন কি বনের কোন কোন শাক বা কচি আগা সিদ্ধ না করেই খায়। তারা ঝাল মরিচ খেতে পছন্দ করে। বিভিন্ন সব্জি রান্না করার সময় 'বেরমা' (পুঁটি মাছের শুঁটকি) ও সিঁদল (বার্মিজ নাপ্পি) উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে।

চাকমারা মাছ, মাংস বা কোন কোন সব্জি রান্না করার সময় এক ধরনের জুমের মশলা পাতা, যেমন 'ফুজি' (parseley) ও সাবারাং' মিশিয়ে দেয়। তাতে তরকারী সুস্বাদু ও সুঘ্রাণযুক্ত হয়। মশলা হিসেবে তারা ধনে, লাঙ্গ, এলাচ ও তেজপাতা ব্যবহার করে। তারা কোন কোন সময় বাঁশের চুঙ্গা দিয়ে মাছ, মাংস , চিংড়ি ও বিশেষ কোন সব্জি রান্না করে। এই প্রকার খাদ্যের নাম 'চুমো গরান'। এছাড়া গুড়ো মাছ, ডিম, শুঁটকি, মাশরুম ইত্যাদি কলাপাতায় মুড়ে নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর রেখে সিদ্ধ করে এক বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করে। এই প্রকার খাদ্যকে চাকমা ভাষায় বলে ' কেবাং'।

মদ্য পানীয়

চাকমারা নিজেরাই পাতন প্রক্রিয়ায় মদ্য তৈরী করে। চাকমা ভাষায় মদ্য পানীয় নাম 'মদ'। আগেকার দিনে মদকে 'আজুরো' বলা হতো। এই পাতন প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয়বার একই মদকে চোয়ানোর নাম চাকমা ভাষায় 'দ্ব-চুয়োনি'। তাতে এলকোহলের মাত্রা খুবই বেশী পরিমাণে থাকে। পাতন প্রক্রিয়া ছাড়াও চাকমারা ভাত পঁচিয়ে তাতে 'মলি' নামের ঔষধের গুটি মিশিয়ে কম নেশাযুক্ত মদ তৈরি হয়। তার নাম ' কাঞ্জি'। এই একই প্রক্রিয়ায় বিন্নি চাল দিয়ে তৈরি হয় 'জগরা'। তা খেতে বেশ সুস্বাদু।

চাকমা সমাজে মদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় মদ অপরিহার্য। তাছাড়া বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে মদের প্রয়োজন হয়। তবে অধিক মদ্যপান স্বাস্থ্য ও সম্মানের পক্ষে হানিকর।

লোক নৃত্য

নৃত্য বা লোকনৃত্যকে চাকমা ভাষায় বলা হয় 'নাচ'। সম্ভবত পালি 'নচ্চ' শব্দ থেকে তা উদ্ভুত হয়েছে। চাকমাদের লোকনৃত্য সমূহের উদ্ভব ঘটেছে প্রধানত লৌকিক উৎসব, প্রাচীন ঐতিহ্য ও কর্ম-সংস্কৃতিকে উপলক্ষ করে। যেমন— চাকমাদের অন্যতম 'বিঝু নাচ' -এর সৃষ্টি হয়েচে বিঝু উৎসবকে ভিত্তি করে। অনুরূপভাবে উৎসবকে ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে থানমানা নৃত্য, মালেয়্যা নৃত্য, কদলপুর নৃত্য ইত্যাদি। কর্ম-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে চাকমাদের 'জুম নৃত্য'। এই নৃত্যে জুমকৃষির অনুকৃতি দেখানো হয়েছে। অপরদিকে প্রাকৃতিক বিষয়কে উপলক্ষ করে সৃষ্টি হয়েছে 'পত্তাপত্তি নাচ' বা প্রজাপতি নৃত্য। এছাড়া রয়েছে প্রাচীন যুদ্ধ -প্রবৃত্তিকে ভিত্তি করে সৃষ্ট চাকমাদের 'ধাল-কাধং নাচ', যা একমাত্র যুদ্ধনৃত্য, প্রভৃতি।

চাকমা নৃত্যগুলো সবই দলগত নৃত্য। একক নৃত্য বলতে কিছুই নেই। প্রায় প্রতিটি নৃত্যেই যুবক-যুবতীরা এক সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। তবে একমাত্র 'ধাল-কাধং' নৃত্যটি কেবল যুবকদের দ্বারাই পরিবেশিত হয়। নৃত্যের পোষাক প্রায় একই হলেও, তার সাজ-সজ্জা ও উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যেমন, থানমানা ও মালেয়্যা নৃত্যে মেয়েরা চুলে, গলায় ও হাতে ফুল বা ফুলের মালা ব্যবহার করে। প্রায় সবই নৃত্যে পুরুষরা 'খবং' বা পাগড়ি ব্যবহার করে। চাকমাদের লোকনৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো প্রধানত চক্রাকারে ও চারকোনা ভঙ্গীতে সঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। নৃত্যে ব্যবহৃত মুদ্রাগুলো সহজ, সরল এবং তা প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপকরণের অনুকরণে সৃষ্ট।

নৃত্যে ব্যবহৃত মুখ্য বাদ্যযন্ত্র গুলো হচ্ছে — ধুল(ঢোলক), বাহ্‌ঝি (বাঁশি), ধুধুক, খেংগরং ও তাক। কেবল যুদ্ধ নৃত্য 'ধাল-কাধং নাচ' -এ ব্যবহৃত হয় বাঁশের তৈরি 'শিঙা' ধাতুনির্মিত মং (অর্থাৎ গং), ধুল ও ধুধুক প্রভৃতি। ইদানিং কোন কোন নৃত্যে আধুনিক হারমোনিয়াম ও গীটার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

নৃত্যেব পোষাকে সজ্জিত চাকমা যুবক-যুবতী

চিকিৎসা

প্রাচীন কাল থেকে চাকমাদের মধ্যে নিজস্ব এক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে— প্রাচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসা বিদ্যা। এই চিকিৎসা বিধি অনুযায়ী ঔষধ সংগ্রহের ক্ষেত্র হচ্ছে প্রধানত তিনটি। যেমন— বনজ ক্ষেত্র, প্রাণীজ ক্ষেত্র এবং জল বা সামুদ্রিক ক্ষেত্র। তবে, এই ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়াও চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে আদিম আদিবাসী সুলভ তান্ত্রিক পুজা-পদ্ধতি, তন্ত্র-মন্ত্র বা ঝাড়-ফুক, অপদেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা, যা সমাজে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ লোপ পেয়ে যাচ্ছে।

চাকমাদের মধ্যে প্রচলিত ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির নাম হল 'তালিক শাস্ত্র'। 'তালিক' শব্দের অর্থ সম্ভবত তালিকা বা সূচী। রোগ, রোগের লক্ষণ অনুযায়ী এই তালিক শাস্ত্রের পুঁথিতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধের নাম থাকে। সেই সঙ্গে থাকে ঔষধের প্রয়োগ বিধি, অনুপান ও পথ্য সম্পর্কিত তথ্য। যাঁরা এই চিকিৎসা বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা কার্য পরিচালনা করেন তাঁদের চাকমারা বলেন 'বৈদ্য'। গুরু - শিষ্য পরম্পরায় এই চিকিৎসাবিদ্যা অর্জিত ও সংরক্ষিত হয়। চাকমা

সমাজে এঁরা বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি।

চাকমাদের ভেষজ চিকিৎসা বিদ্যায় উল্লিখিত ঔষধ সংগ্রহের বনজ ক্ষেত্রটি হচ্ছে বনৌষধি। এই বনৌষধির সংখ্যা অত্যন্ত বিপুল। বনের বিভিন্ন প্রজাতির গাছ, লতা, গুল্ম; গাছের বিভিন্ন অংশ, যেমন— শিকড়, কাণ্ড, ফুল, ফল ও বীজ ইত্যাদি কিছুই বাদ যায় না। প্রাণীজ ক্ষেত্রটির মধ্যে আছে জীব-জন্তুব দাঁত, হাড়, চামড়া, কেশ, রক্ত, চর্বি, পিত্ত, মূত্র ইত্যাদি এবং বিভিন্ন ধরনের কীট-পতঙ্গ। আর জল বা সামুদ্রিক উৎসজাত ঔষধের ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে সৈন্ধব লবন, সামুদ্রিক ফেনা, ঝিনুক, শঙ্খ, শামুক, মাছ ও কচ্ছপ থেকে প্রাপ্ত উপাদান। এছাড়াও ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিবিধ প্রকার ধাতব চূর্ণ, যেমন— সোনা, রূপো, লোহা, তামা ইত্যাদি। এগুলো ত প্ত আগুনে 'জারণ' করে ঔষধের সঙ্গে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ানো হয়। এই ধাতব চূর্ণ ব্যবহারের বিধি সম্ভবত প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে চাকমা তালিক শাস্ত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।

তালিক শাস্ত্রের ঔষধের তালিকায় 'পাসারি' ঔষধ নামে আপাতদূর্লভ কিছু ঔষধের নাম দেখা যায়। যেমন— পারদ, মুসাব্বর, পিপুল, জাযফল, কাবাব, হিং, কস্তুরি, শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, দেবদারু, কর্পুর, গন্ধক, তুঁতে, তেঁতো লবন, তেজপাতা, যষ্ঠি মধু ইত্যাদি। এসবই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চাকমা বৈদ্যরা চর্যাপদ ও নাথ-সাহিত্যে উল্লেখিত 'নাড়ীতত্ত্ব' ও 'চন্দ্রভেদ' বিষয়ে চর্চা করেন, যা রোগীর রোগ নির্ণযের ক্ষেত্রে তাঁদের সাহায্য করে।

লোক-নিরুক্তি ঃ

নিম্নোক্ত লোক-নিরুক্তিগুলোর আদৌ সত্যতা নেই, তবু লোকে কথায় কথায় বলে।

যথা ঃ—

১ সাত সন্তানের জননীকে বাঘে খায না।

২. গর্ভবতী মহিলা দুপুর বেলা ঘুমোল তার গর্ভস্থ সন্তানের মাথা বড় হয।

৩. একটি কথা হাজার বার কথায় কথায বললে তা সত্যে পরিণত হয়।

৪. দুই বন্ধু অত্যধিক ধাঁ-ধাঁ চর্চা করলে তাদের বন্ধু-বিচ্ছেদ নাকি আসন্ন হয়।

৫. কোন বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে হঠাৎ বিষম খেলে তখন ছেলে বা মেয়ের মাথায় বয়স্ক লোকে হাত দিয়ে বলে" - জিও লক্ষ্মী, আলা-বলা শত্তুরর মাধাত পড়োক্কে।" অর্থাৎ "জীয়ে থাকো লক্ষ্মীটি, তোমার আপদ-বিপদ শত্রুর মাথায় গিয়ে পড়ুক।"

৬. নদী পোরেতে হলে ' ফোঃ -ফোঃ' শব্দ উচ্চারণ করে নদীতে পা রাখতে হয়। বাচ্চা ছেলে- মেয়েকে স্নান করানোর সময়ও একইভাবে ' ফোঃ ফোঃ' শব্দ উচ্চারণ করতে হয়।

৭. বিঝু - উৎসবের দিনে কেউ দুপুরে ঘুমোলে সে নাকি পরজন্মে শুকর হয়ে জন্মায়।

৮. কোন জিনিস একবার বন্ধুকে দিয়ে তা পুনরায় ফেরত নিলে ঐ ব্যক্তির গায়ে নাকি আঁচিল জন্মায়।

৯. মদের বোতলের শেষ তলানি অংশটি পাত্রে ঢালার পর বোতলের মুখে ফুঁ দিতে হয়, তাতে নাকি ভবিষ্যতে মদেব যোগান হবে।

১০. কারোর মাথায় একবার ঠোকর খেলে দ্বিতীয়বার আস্তে করে আপনিতেই ঠোকর খেতে হয়। না খেলে পরে নাকি অজান্তে বড় রকমের ঠোকর খেতে হয়।

১১. বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

১২. শারীরিক পঙ্গু ব্যক্তির বুদ্ধি বেশি থাকে।

১৩. ছোট লোকের (শারীরিক ভাবে) ছোট বুদ্ধি বেশি থাকে।

১৪. যে লোকের পেশা ওঝাবৃত্তি, সে কখনো ধনী হয় না।

১৫. কপাল উচুঁ ব্যক্তিরা ভাগ্যবান হয়।

ভারবো (বাস্তু-সংস্থানগত বিধি-নিষেধ)

১. পিতা ও বড় ছেলের গৃহের মাঝখানে অথবা বড় দুই ভাই-এর গৃহের মাঝখানে ছোট ছেলে বা ছোট ভাই অথবা অন্য কেউ গৃহ নির্মাণ করতে পারে না।

২. দুই দিকে খাদ (চাকমা ভাষায় 'কিজিং') -এর মাঝখানে ঘর বানানো যায় না।

৩. পিতা-পুত্রের গৃহ মুখোমুখি হয় না।

৪. দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঘর করা হয় না।

৫. নদীর বাঁকে ঘর নির্মাণ করা হয় না।

৬. উই-এর ঢিবির উপর ঘর নির্মাণ ঘর করা যায় না।

হুমো (সামাজিক বিধি-নিষেধ বা 'ট্যাবু')

১. ঘরপোড়া ব্যক্তি বা পরিবারের সদস্যরা 'বুরপারা' পরিশুদ্ধি অনুষ্ঠান সম্পন্ন না-করা পর্যন্ত অন্য কারোর গৃহে প্রবেশ করতে পারে না।

২. কেউ বাঘের দ্বারা নিহত বা আহত হলে ঐ গোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যকে যেখানে থাকুক না কেন, 'বুরপারা' পরিশুদ্ধি অনুষ্ঠান করতেই হবে। অন্যথায় তার বাঘের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

৩. প্রসূতি নিজগৃহে, পিতৃগৃহে কিংবা স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারের গৃহে ব্যতীত অন্য কারোর গৃহে সন্তান প্রসব করতে পাবে না।

৪. মৃত্যু জনিত অশৌচ গৃহে এক বৎসরের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান হতে পারে না।

৫. ছেলের বিয়ের মাধ্যমে পুত্রবধু ঘরে তোলার পর এক বৎসরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। তবে মেয়ের বিয়ে দাওয়ার পর ছেলের বিয়ে হতে পারে।

৬. আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের সময়ে বিবাহকার্য হয় না।

৭. স্বামী যে দিন প্রবাসে যায় সেদিন তার পত্নী চুল ভিজিয়ে স্নান করে না।

৮. সদ্য সন্তান -প্রসবা নারী 'ঘিলা-কাজই পানি' পরিশুদ্ধ অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত অন্যের গৃহে প্রবেশ করতে পারে না।

৯. বিপত্নীক ব্যক্তি 'সাবালা' (বর-কন্যার সহায়ক) হতে পারে না।

১০. যে দিন পরিবারের কোন এক সদস্য প্রবাসে যায়, সেদিন ঘরদোর ধোঁয়া মোছা করা যায় না।

১১. বুধবারে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না।

১২. বর ও কন্যার পিতা-মাতা বরযাত্রী দলের সহযাত্রী হতে পারে না।

১৩. স্ত্রী-লোকেরা বাঁশি বাজাতে পারে না।

১৪. গর্ভবতী নারীকে কারোর সর্প-দংশনের খবর বলা যায় না।

১৫. স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে নাম ধরে ডাকতে পারে না।

১৬. রাজা সাধারণ গৃহস্তের প্রবেশ করতে পারেন না। প্রবেশ করলে ঐ গৃহস্থ রাজভার সহ্য করতে পারে না। ব্যতিক্রম ঘটলে সংশ্লিষ্ট গৃহকর্তাকে দেওয়ান, খীসা, তালুকদার ইত্যাদি উপাধি রাজা কর্তৃক প্রদান করতে হয়।

১৭. কোন কিছু ভেট ব্যতীত রাজ-দরবারে গিয়ে রাজ সন্দর্শন করা যায় না।

সাধারণ বিধি-নিষেধ ও লোকাচার

১. বিবাহের দিনে বর ও বধুর মাঝখান দিয়ে যাওয়া যায় না।

২. পরস্পর কথা বলার সময় একজনের বাক্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরজনের কথা বলা ঠিক নয়। তখন প্রয়োজন 'তোমার কথায় ফুল পড়ুক' (তঅ কধাত ফুল পড়োক) বলে দ্বিতীয় জন কথা বলবে।

৩. সভাস্থল থেকে আলোচনার সময় রাগতভাবে বেড়িয়ে যাওয়া যায় না।

৪. অপরের গৃহের খোলা দরজায় চৌকাঠের দু'দিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

৫. পরিবারের কেউ ঘর থেকে চলে যাবার সময় গৃহস্থের নারীরা এলোচুলে থাকতে পাবে না।

৬. 'গল্লব্যা -কুদুম' (শ্বশুড় - জামাই, শ্বশুড় - পুত্রবধু, শ্বাশুরী- মেয়ের জামাই, স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভ্রাতৃবধু, স্ত্রীর জ্যেষ্ঠভগ্নী - কনিষ্ঠাভঙ্গির স্বামী ইত্যাদি) সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুবচনে অর্থাৎ সম্মানজ্ঞাপক ভাষায় পরস্পর কথাবার্তা বলতে হয়।

৭. স্ত্রী-লোকেরা ঘরের চালে উঠতে পারে না।

৮. স্ত্রী-লোকের 'পিনন' (নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র) -এর নীচে পুরুষদের যাওয়া নিষিদ্ধ।

৯. উত্তর দিকে মাথা রেখে শয্যাগ্রহণ বারণ।

১০. চালের ঝুড়ি খোলা রাখা যায় না। তাতে লক্ষ্মীর অপমান হয়।

১১. পুরুষরা কোমর তাঁতে কোমর তাঁতে কাপড় বোনা ও কুলো দিয়ে চাল-ঝাড়ার কাজ করেন না।

১২. মৃতের সৎকারে ব্যবহার্য 'ফঘরা' নামের সুতো ও বেত দিয়ে বোনা পট্টি 'আবিধি' অর্থাৎ অপাপবিদ্ধ কিশোরীরা ছাড়া অন্য কেউ বুনতে পারে না।

১৩. ভাত রাঁধার সময় কাঠ বা চামচ ভেঙ্গে গেলে এই ভাত পুরুষেরা খেতে পারে না।

১৪. কুকুর ঘরের চালে উঠে গেলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

১৫. শকুন ও চিল ঘরের চালে উড়ে এসে বসলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

১৬. কারোর ঘরে হঠাৎ করে ঢুকে পড়ে কোথাও না বসে চলে আসা যায় না।

১৭. গাছের দুই কাণ্ডের ফাঁকে চ্যাপ্টা হয়ে বেড়ে ওঠা কোন ফল স্ত্রী-লোকেরা খায় না। খেলে নাকি সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

১৮. বৌদ্ধভিক্ষুর সামনে উর্ধাসনে (বৌদ্ধ ভিক্ষুর আসনের চাইতেও উচুঁ) বসা যায় না।

১৯. শোওয়া অবস্থায় কোন 'বৈদ্য' তথা তান্ত্রিক ওঝাকে রোগীর অসুখের কথা বলা যায় না।

২০. আহার গ্রহণের সময় গান করা যায় না এবং খাবার সময় ভাতের থালা কেড়ে নেওয়া যায় না।

উপরে উল্লিখিত সামাজিক ও সাধারণ বিধি- নিষেধ সমূহ সাম্প্রতিক কালে অনেকেই মানেন না। কারণ, বাস্তবিক পক্ষে সে-সব বিধি-নিষেধের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে এর মধ্য দিয়ে সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধতা ও আচার নিষ্ঠতার স্বরূপ ও অন্য সমাজের সঙ্গে এঁদের সাদৃশ্যের বিষয় সম্পর্কে একটা ধারনা নেওয়া যায় মাত্র।

জাতীয় চরিত্র ঃ

চাকমাদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটিকমিশনার আর. এইচ. এস. হাচিনসন (চিটাগাং হিলট্রাক্টস ঃ ১৯০৯) লিখছেন " (চাকমারা) দেখতে ফর্সা, প্রফুল্ল ও সৎ। তাদের স্বাধীন চেতা মনোবৃত্তি তাদেরকে অন্যের কাছে শারীরিক পরিশ্রম থেকে বিরত রাখে। তথাপি নিজের স্বার্থের বেলায় সে কঠোরভাবে কাজ করে থাকে। সে তীক্ষ্ণ স্মৃতিধর। সহসা সব কিছু বুঝতে পারে এবং কোথাও পরিশ্রম করে লাভ বা সুবিধা পেলে তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে সাড়া দেয়। উচ্চ শ্রেণীর চাকমারা বুদ্ধিজীবি ও মিতব্যয়ী। উপজাতি হিসেবে তারা আবেগহীন, তর্কপ্রিয়, একগুঁয়ে, কিন্তু সত্যবাদী।"

চাকমাদের জাতীয় চরিত্র বিষয়ে হাচিনসনের কথাগুলো অনেকাংশে সত্য। তাঁদের স্বাধীন চেতা মনোবৃত্তির কথাটিও পুরোপুরি সত্য। কিন্তু উপজাতি হিসেবে তাঁরা আবেগহীন কথাটি আমাদের নিকট তেমন স্পষ্ট নয়। আসলে উপজাতি বা আদিবাসী ধারনাগুলো খুবই সাম্প্রতিক কালের সৃষ্টি। ব্রিটিশরা এদেশে এসে এই শব্দটি তাঁদের লেখালেখির মধ্যে এখানকার পার্বত্য ও বনবাসী আদিম জনগোষ্ঠীদের পরিচয় সম্পর্কে 'ট্রাইব' বা 'উপজাতি'শব্দটি প্রয়োগ করতে শুরু করে। কিন্তু তা একাংশ উচ্চ-শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে সুস্পষ্ট ও অর্থবহ হয়ে ওঠে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে। তা সত্ত্বেও এখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে সাংবিধানিক অর্থে ট্রাইব বা উপজাতির ধারনাটি জন্মায় তারও অনেক পরে। যেমন, ত্রিপুরীরা, যাঁদের রাজ্যশাসনের প্রাচীন ও সুদীর্ঘ প্রবহমান ধারা ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাঁরা এক সময় জানতে পারলেন তাঁরাও নাকি উপজাতি, খণ্ডজাতি বা জনজাতি। ত্রিপুরার অন্যতম আদিবাসী সংস্কৃতি গবেষক ও লেখক প্রয়াত মহেন্দ্র দেববর্মা সে কারণে মাঝে-মধ্যে আমাদের শুনিয়ে অনুযোগের সুরে বলতেন —"আমরা ত্রিপুরীরা এক সময় ছিলাম জাতি, এখন নাকি হয়েছি উপ-জাতি, খণ্ড-জাতি।" অনুরূপ ভাবে পূর্বে চাকমারাও কখনো ভাবেনি যে তারা উপজাতি। অথচ তাদের মধ্যেও বরাবর বিদ্যমান ছিল নিজ জাতিত্ব সম্পর্কে প্রগাঢ় আবেগ ও মমত্ববোধ। তাই উপজাতি হিসেবে চাকমারা আবেগহীন কথাটি বোধগম্য নয়।

উপসংহার

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার রাজার হাটের চকপাঁচুরিয়ায় প্রথম "বিশ্ব চাকমা সম্মেলন" অনুষ্ঠিত হয়। তাতে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন— ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশ থেকে। এই বিশ্বসম্মেলনের থিম ছিল - 'দ্য চাকমাস ঃ ইন নিউ পার্টনারশীপ'- অর্থাৎ 'চাকমা ঃ নতুন সহযোগিতার অংশীদারিত্বে।' কাদের নতুন সহযোগী? হয়তো এর উত্তর - আর্ন্তজাতিক বা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ এভাবে চিন্তা করলে থিমটি গালভরা মনে হয়। তবে, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থে ভাবলে বিষয়টি যথার্থ বলেই মনে হয়। কারণ, চাকমাদের মতো একটি বিপন্ন জনগোষ্ঠী, যাঁরা নিজ নিজ বাসভূমিতে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে টিকে রয়েছে, তাঁদের পক্ষে বিশ্ব-আত্মীয়তার ভাবনা থাকাই বাঞ্ছনীয়। বার্মায় এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা চিন-আরাকানিজ তথা বার্মিজদের দ্বারা আগ্রাসিত, অরুণাচলে পঞ্চাশ বছর ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরও সেখানকার চাকমারা ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরূপে পরিচিত, মিজোরামে চাকমাদের একাংশ সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার পেলেও অধিকাংশ চাকমা অধিবাসী জেলা পরিষদের এলাকা বর্হিভুত এবং বাংলাদেশে এখনো চাকমা আদিবাসীরা নিজ বাসভূমিতে থাকা সত্ত্বেও 'ভারত পন্থী' অপবাদে নিন্দিত ও অধিকার বঞ্চিত। কেবল ত্রিপুরায় তাঁরা তুলনামূলক ভালো অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে তাঁদের বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তার সন্ধানই তো কাম্য, যাতে তাঁরা বেঁচে থাকা ও অগ্রগতির ক্ষেতের নিজ নিজ অঞ্চলের, রাজ্যের এবং দেশের সমর্থন পেতে পারে।

নিরঞ্জন চাকমা

১৯৫১ সালে উত্তর জেলার লালজুরি গ্রামে জন্ম। পিতা স্বর্গীয় রমণী কুমার চাকমা ছিলেন একজন কৃষক। গ্রামের ইস্কুলে, কাঞ্চনপুর উঃ মাঃ বিদ্যালয় ও কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে পড়াশুনো। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক। বর্তমানে তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরে চাকমা ভাষায় প্রকাশিত 'ত্রিপুরা সদক' পত্রিকার সম্পাদক।

গারো

১) গারোদের নামের ব্যুৎপত্তি

গারোদের নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে অনেক গবেষক বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। বিভিন্ন গবেষকদের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় গারো জাতি ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছে যা বেদ, রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগেও পরিলক্ষিত হয়। লেখক মিলটন এস সাংমার লেখা "গারোদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে মহান ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে গাবোদের, "মান্দেহা" বলা হতো, যা পরবর্তী সময়ে "মান্দে,, বলে প্রচলিত হয় এবং বর্তমানেও ইহা প্রচলিত রয়েছে"। কারণ গারোগণ পরস্পরকে পরিচয় করার ক্ষেত্রে নিজেদের , "মান্দে,, বলে পরিচয় দিয়ে থাকে, যার সাথে যোগ হয়, "আঃচিক,, আঃচিক মানে পাহাড়, সুতরাং, "আঃচিক মান্দে,, মানে পাহাড়ের মানুষ। এবং তাদের বসবাস ছিল, "মন্দা শাইলা,, নামক স্থানে। মহাভারতে গারোদের, "গারোদাস,, বলে অভিহিত করা হয়েছে। গারোগণ মঙ্গোলিয় জাতির একটি শাখা। তাদের আদি পুরুষগণ তিব্বতের অধিবাসী ছিলেন এবং তারা তিব্বতের "টোরা" নামক স্থানে বসবাস করতেন, পরবর্তী সময়ে গারোগণ বাংলার রাঙ্গা মাটি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করেন, সেখান থেকে তারা আসাম, গোয়াহাটি, বর্তমান মেঘালয়ের গারো পাহাড় এবং আধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলায় বসতি স্থাপন করেন।

"গারো,, নামের ব্যাপারে প্রধানত দুইটি মতবাদ দেখা যায় প্রথমতঃ তারা নিজেদের গারা বা গেমচিং বলে পরিচয় দিত, পরবর্তী সময়ে ইহার ভাষান্তর রূপ নেয় গারো হিসাবে।

দ্বিতীয়ত ঃ— সে সময় গারোদের সর্দার ছিলেন বৈশ্য গারু তাই তার নামানুসারে গারো নামটা প্রচলিত হয় এবং বাসস্থানের নাম হয় গারো হিলস্।

২) গারোদের ত্রিপুরাতে আগমনের প্রেক্ষাপটে ঃ

অন্যান্য আদিবাসীদের মত গারোগণও মহাজন ও জমিদারদের দ্বারা শোষিত ও উৎপীড়নের শিকার হতো। মোগল শাসন কালের নথিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গারো গোষ্ঠীদের উল্লেখ আছে। সে সময় জমিদারগণ নামে মাত্র সম্রাটকে কর প্রদান করত কিন্তু প্রজাদের কাছ থেকে অনেক বেশী কর আদায় করতো। গারোগণ তার বিরুদ্ধাচরণ করায় তাদের উপর উৎপীড়নের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল তাই জমিদারদের অসহনীয় অত্যাচারের হাত থেকে গারোদের এবং গারো পাহাড়ে বসবাস কারী অন্যান্য উপজাতিদের রক্ষা করার নিমিত্তে গারো সর্দার ছত্রপতি গারো সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন গারো রাজ্য গঠন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ইংরেজের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গারোদের উপরেও রাজস্ব ধার্য্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপরন্তু ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করার অজুহাতে গারো পরগণায় নতুন কর ধার্য্য বৃদ্ধি করে প্রজাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। জমিদারদের করের চাপে টি পু গারোর নেতৃত্বে ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে টিপু গারোকে গ্রেপ্তার করে এবং ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বন্দি অবস্থায় টিপু গারোর মৃত্যু হয়। গারোদের প্রথম বিদ্রোহ ময়মনসিং ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

গারোদের দ্বিতীয় বিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গুখান ও উজির গারোর নেতৃত্বে। কিন্তু গোপনে সংবাদ পেয়ে ইংরেজ সরকার গুখান গারোকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু উজির গারোর নেতৃত্বে বিদ্রোহী গারোগণ নানাস্থানে জমিদারদের উপর আক্রমণ করে বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের বরকন্দাজ; সরকারী ব্যাক্তি ও পুলিশের উপর আক্রমণ করে। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দুইজন গারো সর্দার জানকু পাথর ও দেবরাজ পাথর বিদ্রোহীদেব নেতৃত্বে নেয় এবং তাদের নেতৃত্বে শেরপুর ও নলিতা বাড়ীর জমিদারদের কাছারি বাড়ী ও গৃহ লুট করে এবং পুলিশ থানা আক্রমণ করে আগুন ধবিয়ে দেয়। যার ফলে সেখানে কিছু কালের জন্য হলেও ইংরেজ শাসনের যবনিকা ঘটেছিল।

গারো মহিলা

ইংরেজ মেজিস্ট্রেট গেরেট সাহেব সদলবলে শেরপুর গিয়েছিলেন, বিদ্রোহীগণ তার বাংলোতে আক্রমণ কবে, গেরেট সাহেব কোন রকমে পালিয়ে রক্ষা পান। বিদ্রোহীগণ একজন পুলিশ, জমাদাব, একজন ববকন্দাজ, একজন পিয়ন, একজন মোহবার কে ধরে নিয়ে যায়। তারপর ক্যাপ্টেন শীলকে সৈন্য বাহিনী দিযে বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠায়, কিন্তু বিদ্রোহীরাও বল্লম, তলোয়ার, বিষাক্ত তীব ধনুক এবং কিছু বন্দুক নিয়ে ক্যাপ্টেন শীলের শিবিরে আক্রমণ করেন এবং বহু সৈন্যকে হতাহত কবে পালিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন শীল জানুক পাথর ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেয। ইংরেজদের আক্রমণে পাঁচজন গারো সর্দার ও বহু বিদ্রোহী আত্মসমর্পন করেন।

দ্বিতীয় গারো বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর জমিদার ও ইংরেজ সরকারের দ্বারা গারোদের উপব শোষণ ও উৎপীড়নের মাত্রা বেড়ে যায়। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গারো বিদ্রোহীগণ জমিদার ও মহাজনদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে এবং ইংরেজ সরকার সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। গারোগণ এই ভাবে বার- বার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, ১৮৬১, ১৮৬৬, ১৮৭১ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ করেছিলেন এবং ইংরেজ শাসকগণও বারে বারে সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। গারোদের এই মহা বিদ্রোহের কথা ময়মনসিংহের ইতিহাস "শেরপুর বিবরণ," মুক্তি যুদ্ধে আদিবাসী, "নাগ বংশের ইতিহাস" । "D.G. of Garo Hills"- ইত্যাদি পুস্তকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

ত্রিপুরাতে গারোগণ মূলত ময়মনসিং, শ্রীহট্ট থেকে আসাম ও মেঘালয় হয়ে বিদ্রোহ চলা

কালীন বা পরবর্তী সময়ে প্রবেশ করেছিলেন। গবেষকগণও এই মত পোষন করেন।

ত্রিপুরাতে এসে গারোগণ প্রথমত পশ্চিম ত্রিপুরার নন্দন নগর, মধুবন, ঝরঝরিয়া, বিশালগড়, কাঞ্চনমালা, ত্রীতিলতাও সিপাহীজলা প্রভৃতি স্থানে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে জীবিকার সন্ধানে দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পরে। দক্ষিণ ত্রিপুরাতে বিশেষ করে উদয়পুর মহকুমাতে গারোদের সংখ্যা বেশী পরিলক্ষিত হয়। সাবেক উত্তর ত্রিপুরা তথা বর্তমান ধলাই জেলার আমবাসা, লংথরাই ভেলী, কাঞ্চনপুর, কুলাই, কমলপুর মহকুমাতে গারোদের বসবাস রয়েছে তার মধ্যে আমবাসা লংতরায় ভেলী এবং কুলাই মহকুমাগুলিতে বেশী।

বর্তমানে উদয়পুর মহকুমায়, পেরাতিয়া, হোলাক্ষেত, হাতিপাঁচা, বটতলি, বসনখলা, শুকনা ছড়া, মরসুম পাথর, কালবন, পতাছড়া প্রভৃতি গ্রামে গারোদের বাস। শান্তির বাজার মহকুমার পতিছড়ি, রাজাপুর, ধুপতলী, প্রভৃতি গ্রামে গারোদের বাস। আমবাসা মহকুমাতেও কিছু সংখ্যক গারো রয়েছে। লংতরাই ভেলী মহকুমার মনু, ডেমছড়া, কছুছড়া, ধুমাছড়া প্রভৃতি স্থানে ভাল সংখ্যক গারোগণ রয়েছে। তাছাড়া কাঞ্চনপুর, কৈলাশহর, ধর্মনগর, অমরপুর, গন্ডাছড়া প্রভৃতি স্থানেও কিছু কিছু গারো পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

৩) আদমসুমারী অনুযায়ী গারোদের সংখ্যাগত পরিবর্তন

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ পর্যালোচনায় ইহাই পরিলক্ষিত হয় যে, প্রত্যেক জাতি গোষ্ঠীবে তাদের জীবিকা নির্বাহের তাগিদেই হউক, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই হউক বা পরস্পর বিদ্বেষ ও হানা-হানির কারণেও হউক এক স্থান থেকে আর এক স্থানে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে স্থানান্তরিত হয়ে বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। সেইরূপগারো জাতি গোষ্ঠীও চীনদেশ বা তিব্বত (বিভিন্ন গবেষকদের মতামত অনুসারে) থেকে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে, কোচবিহার, আসামের গোয়াল পাড়া প্রভৃতি স্থানে বস-বাস শুরু করেন, পরবর্তী সময়ে তৎকালীন ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণে এবং সুস্থ জীবন যাপনের লক্ষ্যে কিছু সংখ্যক গারো ময়মনসিং থেকে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে এবং আত্মজনের টানে বা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে আসামের গোয়াল পাড়া প্রভৃতি স্থান থেকে কিছু সংখ্যক গারো ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। কিন্তু আবার তার তিন দশক বছর পরে কিছু সংখ্যক গাবো জীবিকা নির্বাহের তাগিদে ত্রিপুরা থেকে আসাম ও মেঘালয়ের কিছু কিছু স্থানে চলে যায়, তা' প্রতিফলন আদম সুমারী অনুসারেই পরিলক্ষিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারী অনুসারে ত্রিপুরাতে গারোদের কোন হিসাব নেই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আদম সুমারীতে ২৭৩ জন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২৪৮ জন, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ২১৪৩ জন, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ৭৩৫২ জন, ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ৫৪৮৪ জন, ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ৫৫৫৯ জন, ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে ৭২৯৭ জন, ১৯৯১ খৃষ্টাব্দে ৯৩৬০ জন এবং ২০০১ খৃষ্টাব্দে ১১,১৪১জন, বলে জানা যায়। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পর কিছু গারো ত্রিপুরা থেকে অন্যত্র চলে যায়। তারা আসাম এবং মেঘালয়ের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।

৪) নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ঃ

গারোরা নিজেদের "আচিক মান্দে,, বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। মেজর প্লেফেয়ার মনে করেন তিব্বতীয় ভাষার সঙ্গে গারোদের ভাষার মিল রয়েছে, কিন্তু তিব্বতীয় ও গারোদের সম্পর্ক সূত্র কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনি। জাতিতত্ত্ব বিদ্‌গণ মনে করেন গারোদের ভাষা তিব্বতী - বার্মা ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখা। প্রখ্যাত ভাষাবিদ্ গ্রিয়ার্সন সাহেব গারো ভাষাকে পার্বত্য জাতিদের ভাষাগোষ্ঠী বোড়ো ভাষার অর্ন্তভুক্ত বলে মনে করেন।

ইম্পেরিয়াল পেজেটিয়ার মতে গারো জনগোষ্ঠী ভোত চীন গোষ্ঠীভুক্ত ভোটবর্মীর একটি শাখা। এদের আদি নিবাস হিসেবে উত্তব পশ্চিম চীনের ইয়াং সিকিয়াং এবং হোয়াংহো নদীব উজান প্রদেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোটবর্মীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মদেশেব দক্ষিণবাহিনী চিনউইন, ইরাবতী এবং মেকং নদীব অববাহিকায় এসে বসবাস কবেছিল। আবার বি. সি এথেনের মতে গারো জনগোষ্ঠী আসাম উপত্যকার অধিবাসী কাছাড়ী, রাভা, মেচ এবং অন্যান্য উপজাতির সমগোত্র।

গারোদের ব্যবহৃত তৈজশ-পত্র ও অলংকার

মেজর প্লেফেয়ার গাবোদেব সম্পর্কে বলতে গিযে বলেছেন এরা প্রায় চাবশ বছর আগে কোচবিহারে এসে বসবাস করতে থাকে। অতপর তারা ধুবড়ীর মুখে গিযে সেখানকাব রাজা দ্বারা আদৃত হয়, পরবর্তী সময়ে রাজা তাদের প্রতি অবিশ্বাস করে তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেয়নি। তাই সেখান থেকে তারা অগ্রসর হয়ে যোগীঘোনা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে আবার দক্ষিণ দিকে গোয়াহাটির দিকে অগ্রসর হয় এবং সেখানেও অহম রাজাব ব্যাবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে আসামের গোয়াল পাড়াব জেলার আব্রাঘাট পরগণা নামক জাযগায বসবাস শুরু করে। এই দীর্ঘ প্রচরনে গারোগণ বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় তার মধ্যে অবস্থা সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধশালী একটা ভাগ আব্রাঘাট পরগণায় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সাম্রাজ্যের প্রথম রাজার নাম আব্রাসেন বলে কথিত আছে এবং সম্বল হাদিং নামক স্থানে রাজ প্রাসাদ গড়ে উঠে। সম্বল হাদিং একটি বিচ্ছিন্ন পর্বত। সেখান থেকে নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে কিছু গারো গোষ্ঠী দলচ্যুত হয়ে গারো পাহাড় অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং আবিং নোগার নেতৃত্বে গারো পাহাড়ের চুড়াতে "নকরেক,, নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে।

৫) ভাষা

ভাষাবিদ্‌দের মতে গারো ভাষা তিব্বত বর্মী শাখার অন্যতম উপশাখা কাছাড়ী থেকে উৎপত্তি

হয়েছে, কক্‌বরক, বোড়ো, কুকী, চীন উপভাষাকে গারো ভাষার সহোদরা বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় ত্রিপুরার গারো গোষ্ঠীর, বাংলাদেশের গারো জনগোষ্ঠীর ভাষার সাথে আসাম ও মেঘালয়ের গারো জনগোষ্ঠীর ভাষার শব্দগত এবং উচ্চারণ গত কিছু পার্থক্য আছে। ত্রিপুরার এবং বাংলাদেশের গারোগণ ত্রিপুরী এবং বাঙালীদের সংস্পর্শে এসে ভাষাগত, ধর্মগত এবং সামাজিকগতভাবে কিছু প্রভাবিত হয়েছে। কক্‌বরক এবং বাংলা ভাষার অনেক শব্দ গারোরা গ্রহণ করেছে।

নিম্নে গারো ভাষার সহিত অন্যান্য বোড়ো ভাষা-ভুক্ত ভাষার সাদৃশ্য তোলে ধরা হলো—

গারো	ককবরক	কাছাবী	বোড়ো	দিমাছা	বাংলা
স্যা	ছা	সো	ছে	—	এক
দো	তক	তাও	গও	ভাউ	পাখি
না	আ	না	না	না	মাছ
তেলথক	থক	তাও	থাউ		তেল
হান্‌চি	থুই	থই	থোই	মি	রক্ত
দক	দক	দা/রা	এ্রক	—	ছয়
স্কু	চুকু	স্থু	গু	—	নয়
গ্নি	নুই	নি / গ্নে	—	—	দুই
আভা	আঙ	আঙ	আঙ	আঙ	আমি।
না	আ	না	না/গ-নী	না	মাছ।
চুপু	চিবুক	জিবু	জিবো	জিবু	সাপ।
চা	চা	—	জা	জা	খাওয়া।

৬) গারোদের নৃত্যকলা

প্রকৃতির সাথে তাল রেখে গারো জনগোষ্ঠীর নৃত্যকলা সঙ্গীত এবং সাংস্কৃতি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সঙ্গীত ও নৃত্যের চর্চা শুধু অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে পরিগণিত না হয়ে বেঁচে থাকার দাগিদেই এই কলা বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সঙ্গীত ও নৃত্যকলা জীবনের স্পন্দন এবং জীবিকা শক্তির উৎস। এই শক্তি অর্জন করে তারা বিভিন্ন বিপদ আপদ বা অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে থাকত। গারোগণ এই নৃত্য কলার মাধ্যমে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে। নৃত্য কলাকে জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যম হিসাবে তারা গণ্য করে। গারোদের মধ্যে নৃত্য কলাকে দুভাগে ভাগ করা যায়, একটি হল সামাজিক বা আনুষ্ঠানিক এবং অপরটি বিনোদন মূলক। গারো সমাজে প্রচলিত নৃত্যগুলির মধ্যে লোকনৃত্য। রণনৃত্য এবং আরও নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিবেশিত নৃত্যগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গারোবা নেতা নির্বাচনে, পশুবলির বেদীতে, বার্ষিক পূজা পার্বণে। মৃত ব্যক্তির সৎকারে। গৃহ প্রবেশ ও যুবক আবাস উদ্বোধনে বিভিন্ন প্রকার নৃত্য পরিবেশন করে থাকে।

৭) গারোদের সংগীত

সংগীত গারোদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-

উৎসবে, সর্বক্ষেত্রে সংগীত পরিবেশিত হয়। তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

রোমান্টিক গান (সেরেজিং) ঃ

(ক) দো- দো- গীতা বিদালীং আমাবা
রাউগীতা পীলারি দদঙ্গাবা
সক্‌মা - কীমা - রীংমীদীং আমাসংবা
জাপীং গাম্বারিং বকগীন দাঙ্গা - গীম্বা
কুচীল মগুল বিবালীম দাঙ্গা গীম্বা।
রীকীল ওয়াত্রি বিজাকীম রাজামীংবা।

বঙ্গানুবাদ ঃ— যুবতী পক্ষিনীর মত তুমি সুন্দর।
নিটোল আলাবু (লাউ) যেন তুমি তন্বী।
তোমার বক্ষযুগল কৃশ অতি মনোহর
তোমার উরু গাম্বাবি বৃক্ষের মত সাদা উজ্জ্বল।
তোমার ঠোঁট দুটি মগুল ফুলের মতই রমণীয়।
তোমার চোখের পাতা যেন বাঁশ পাতার মত নয়ন মনোহর।

(খ) বালওয়া বালসিরিয়ানা বাল্লা - রি- কেত -রি - কেত - জক্
আন্দালাচা দঙ্গিমৌং মাইনা ওযাল জাম জাগকজীব্‌জক
আইয়াও
বাললেং বালসি বালওয়ানা - খা- বং বাংশী সীগগানা
বুরাং জাসি ওয়ালজাত্‌চিও - রুনা সেরেং খেনজামা
আইয়াত্ত —

বঙ্গানুবাদ ঃ— সির - সিব বাতাস বইছে।
থোকা থোকা ফুল ফুটেছে।
অন্ধকারে ওয়ালজাম হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে।
আইয়াত্ত - বোল।
উথাল - পাতাল বাতাস বইছে।
খা - বং বাঁশী বাজাচ্ছে।
সেরেং তোমার কি ভয় নেই।
নিশি রাতে টং ঘরে একা থাকতে ?

(গ) রে - রে - প্রেম ও ভালবাসার গান ঃ—
রামা সাম্‌মু চাগীবা দিখাতিতি মীন্বীমা
হয়া মান্‌দে বিপাদে কাজি চা-না দংতীমা।
হাই চেংচাং হাই চাং - হানীংচানা বিদাংচেং।
না-আ সাকো সীম্নীংআ জাক্‌সি আদ্দি পীনীক্ চেং।

বঙ্গানুবাদ ঃ—

রাস্তার ধারের গাছটির ফলটা কোন স্বাদ নেই
এই ভদ্রলোকটা প্রসাদ পাবার জন্য বসে আছে।
ভাল যদি বাস তবে মাটির নিচে আগে যাও।
তুমি কাকে ভাল-বাস আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দাও।

(ঘ) **Graba :** দুঃখের গান (কোন বয়স্কা মহিলার মৃত্যু হলে) ঃ

সুক্কু ও বাড়া গন্দারি নাচিংনি আমা রেয়াংবনে।
জাগ্ - গু মাংগট্ রা - আরি নাচিংনি বায়ানা সগ্ - গাংবনে।
রাখা রাট্নি বীমাংকো রেয়াংব - নে।
আচিক - টেংজি বিমাকো দোয়াংব নে।
রামা রাট্নি বিমা-ও দংসোবনে।
আচ্কি টেংজি বিমাও সেংসোবনে।

বঙ্গানুবাদ ঃ— আমাদের মা তুমি মাথায় কাপড় রেখে চলে যেও
আমাদের মা তুমি হাতে লাঠি নিয়ে চলে যেও।
স্বর্গের মহা রাস্তা ধরে তুমি যেও।
স্বর্গের মহা পর্বত অতিক্রম করে তুমি যেও।
স্বর্গের দুয়ারে তুমি থাকবে।
মহা পর্বতের মাঝে তুমি অপেক্ষা করবে।

এরূপ আরও অসংখ্য সঙ্গীত গারোদের নিজস্ব রচিত রয়েছে তার মধ্যে কয়েকটি কিছু কিছু উল্লেখ করা গেল।

৮) গারো ভাষায় শিক্ষা

ত্রিপুরাতে গারো জন গোষ্ঠীর ভাষা সরকারি ভাবে প্রচলন হয় নাই। কিন্তু মেঘালয়ে স্কুল কলেজে গারো ভাষার প্রচলন রয়েছে এবং সেটা রোমান হরফে। ত্রিপুরাতে গারো ভাষার শিক্ষার প্রচলন নেই বলে শতকরা ৯৯ জন উক্ত জন গোষ্ঠীর মানুষ নিজ ভাষায় লিখতে বা পড়তে জানে না। উপরন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য ভাষা - ভাষীর সংস্পর্শে দিনের পর দিন চলতে থেকে গারো ভাষার সহিত অন্য পারিপার্শ্বিক ভাষার সংমিশ্রণ ঘটছে - যাহা অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরার গারোদের মাতৃভাষার অবলুপ্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

অন্যান্য জাতির মত গারোরাও শিক্ষা চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে চলছে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থনৈতিক সমস্যা। ত্রিপুরার গারোদের শতকরা ৭০ শতাংশ পরিবার আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল যারফলে উচ্চ শিক্ষার হার খুব কম কিন্তু স্বাক্ষরতার নিরিখে গারোদের মধ্যে শতকরা ৯৯.৫ শতাংশ সম্ভবপর হয়েছে।

৯) গারোদের শিক্ষা ও চাকরি ঃ

ত্রিপুরা গারো ইউনিয়নের তথ্য মুতাবেক বর্তমান স্বাক্ষরতা হিসাব করলে ৯৯.৫ শতাংশ কিন্তু তুলনামূলক উচ্চ-শিক্ষার হার কম দেখা যায়, ত্রিপুরার গারোদের মধ্যে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ৬০ শতাংশ +২ পর্যন্ত ৪০ শতাংশ বি. এ. , বি. কম এবং বি. এস. সি পর্যন্ত ৩০ শতাংশ এম.

এ, এম. কম ও এম. এস. সি ০.২ শতাংশ।

গারোদের জুমচাষে ব্যবহৃত বীজ-পাত্র ও তৈজশ-পত্র

বর্তমানে গারোদের প্রতি ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছেছে। তথাপি আশানুরূপ অগ্রগতি র অন্তরায় হিসাবে বলা যায় অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং যথোপযুক্ত পরিচালনাব অভাব। যারফলে দেখা যায় - অনেক পরিবাবে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকা সত্বেও শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রসব হতে পাবছেন না বা ড্রপ - আউট হযে যাচ্ছে।

গারো জনগোষ্ঠীব মধ্যে সরকাবী চাকুবী জীবীর সংখ্যা মোটামুটি সব ক্ষেত্রে দেখা যায, তবে উচ্চ পদে খুব কম সংখ্যক বর্তমান। পক্ষান্তরে বেকাব সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ত্রিপুরা গারো ইউনিযনের ২০০৭ ইং খৃষ্টাব্দেব গণনা মুতাবেক গাবোদেব মধ্যে এম এ, এম. এস সি মিলে ৩৫ জন । মাধ্যমিক থেকে +২ পাশ ১,১০০ (একহাজাব একশ) জন। স্নাতক ৭০ জন।

ত্রিপুরাতে গারোদের মধ্যে চাকুবি জীবী গারো সংখ্যাব ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ এব মধ্যে টি এস এস অফিসার একজন। টি পি এস অফিসার একজন। আই এফ এস একজন। ডাক্তাব চারজন। ইঞ্জিনিযার নয় জন এবং অন্যান্য গেজেটেট অফিসাব ত্রিশ জন।

১০) গারোদরে বাদ্যযন্ত্র

গারোদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য —

১) দামা ঃ— কাঠের তৈরী মৃদঙ্গের মত চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা।

২) ক্রাম ঃ— কাঠের তৈরী মৃদঙ্গের সব কিন্তু এক প্রান্ত সরু এবং অপব প্রান্ত তাব দ্বিগুণ বড় উভয় প্রান্ত চামড়া দিয়ে ঢাকা। ইহা একমাত্র -ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার হয।

৩) নাদিক ঃ— কাঠের নির্মিত ক্ষুদ্র আকারের ঢাক ব্যাস ১২ ইঞ্চি গভীব ৬ ইঞ্চি।

৪) না গ্রা ঃ— বৃহৎ আকারের মাটির তৈরী চামড়া দিয়ে ঢাকা।

৫) ইলংগমা ঃ— এক প্রকার ছোট বাঁশের তৈরী বাঁশি এতে মাত্র তিনটি মাত্রা বা ছিদ্র থাকে।

৬) ইমবেঙ্গি ঃ— একটুকরা বাঁশের তৈরী বাঁশি।

৭) রাং বা ঘন্টা ঃ— ইহা পিতলের তৈরী বড় চাকতি বিশেষ। নৃত্য ও উৎসবে ব্যবহৃত হয়।

রান্নার কাজে ব্যবহৃত ঘোটনকাঠি ও চালুনি এবং গারোদের নির্মিত পাদুকা

৮) ককা ঃ— ককা এক ধরনের, কর্তাল আকার একটু বড়।

৯) নেংগিলমি ঃ— ইহা ককাব চাইতে একটু ছোট। ইহা দেখতে পিতলের কাপের মত অনেকটা দেখতে। ইহা সঙ্গীতেব সময় অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রেব সহিত বাজায়।

এছাড়াও গাবোরা বণনৃত্য বা গুবি বোযাব সময় "কামাল" মানে দলপতি দুইটা জিনিষ ব্যবহাব করে সেগুলি হল— 'মীলাম,, এবং সাঁপ্নি মীলাম একধরনের তরবাড়ী ইহার সবদিকে খুব ধারালো থাকে। সাঁপ্নি হল একধবনের ঢাল ইহা এক ধবনের লতা দিয়ে তেরী করা হয় এবং এই ঢালে একবার কুপ দিলে সেটা আটকে যায়, সেটা সহজে তোলে নেয়া যায় না।

তবে বর্তমানে যে সাঁপ্নি গুলি তৈরী হয় সেগুলি বাঁশ বেত ইত্যাদি দিয়ে তৈবী করে থাকে।

১১) গারোদের জীবন - জীবিকা

গারোগণ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। অবসর সময়ে শিকাব ও মৎস শিকার করা সহজাত প্রবৃত্তি। আগে তারা জুম চাষ করে ধান, সব্জি, তুলা, বাজরা, ভুট্টা, লঙ্কা ও গালা কিটের চাষ করত। সমতলের গারোরা সমতল ভূমিতে ধান, পাট, মেস্টা, শাক-সব্জি ইত্যাদি চাষ করে। বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে তারা নানা প্রকার ফলের চাষ করে থাকে। তাদের উৎপাদিত ফসল বাজারে বিক্রি করে প্রয়োজনীয় জিনিষ ক্রয় করেন। গৃহ পালিত পশু পালনও করে থাকেন। বর্তমানে গারোগণ ত্রিপুরাতে স্থায়ী চাষী। কৃষি জীবির সাথে সাথে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে চাকুরি জীবিও পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই কৌলিন বৃত্তি ছেড়ে অন্য পেশায় জীবিকা নির্বাহ করেন। বর্তমানে ছোট খাটো ব্যবসা করেও কিছু গারো

জীবিকা নির্বাহ করছেন।

১২) গারোদের বিবাহ প্রথা

গারোদের ভাষায় গোষ্ঠীকে চাত্‌ছি বলা হয়। গারো সমাজ মূলত দুটি গোষ্ঠীভুক্ত সাংমা এবং মারাক। পরবর্তীতে মমিন নামে আর একটি গোষ্ঠীর সংযোজন হয়েছে। গারোগণ সামাজিক ভাবে মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃকুলকেই বংশ বা গোষ্ঠী হিসাবে পরিগণিত করে। সুতরাং বংশ বা গোষ্ঠীকে গারো ভাষায় বলে মা-চং। মা- চং মানে মাতৃকুল।গারো সমাজে পিতৃবংশের পারিবারিক পরিচিতির স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরাতে পারিপার্শ্বিক গত কারণে তার আমুল পরিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমানে ত্রিপুরাতে গারোদের পারিবারিক ব্যবস্থা পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক হয়ে গেছে যদিও বংশ বা গোষ্ঠী পরিচয় ক্ষেত্রে বা সামাজিক কোন ব্যাপারে মাতৃতান্ত্রিক রূপের বিবেচিত হয়। আসাম, মেঘালয় এবং বাংলাদেশে এখনও মাতৃতান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত আছে। গারোদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সমগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। সুতরাং স্বামী - স্ত্রী ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত হতে হবে। সাংমা গোষ্ঠীভুক্ত যুবক সাংমা যুবতী কে বিয়ে করতে পারবেনা বা মারাক গোষ্ঠীভুক্ত যুবক মারাক যুবতীকে বিয়ে করতে পারবে না। যুবক সাংমা হলে যুবতী মারাক হতে হবে বা যুবক মারাক হলে যুবতী সাংমা হতে হবে তাহলে সমাজে এই বিবাহ স্বীকৃতি পাবে।

পাত্র পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা মহিলারাই পালন করে থাকে। পাত্র নির্বাচন অনেকাংশে পাত্রীর উপর নির্ভর কবে। মাতা-পিতাব যদি একমাত্র কন্যা সন্তান থাকে তাহলে ঘর-জামাই প্রথা বর্তমানেও বিদ্যমান। তখন সেটাকে বলে ''নক্রম''। গারো সমাজে ''চাওয়াবী সিগ্না'' জামাই তুলে নেওয়ার প্রথা প্রচলন ছিল আগে। এই পদ্ধতিতে কোন মারাক যুবতী যদি বা তার মাতা-পিতার যদি কোন সাংমা যুবককে পছন্দ কবে থাকে বা কোন সাংমা যুবতী বা তার মাতা-পিতা যদি কোন মারাক যুবককে পছন্দ করে তাকে তাহলে লোকজন ডেকে এনে যুবককে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই যুবতীর সাথে বিয়ে দিত এবং যুবকটি যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তার জন্য অন্যান্য যুবকরা আট - দশ দিন পাহাবা দিত । তার পরেও ঐ যুবক পছন্দ না করলে পালিয়ে যেত। তখন সমাজে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ত না। তখন উভয় গোষ্ঠী মিলিত হয়ে গ্রামের প্রধানের তথা সং-নক্‌মা কে জরিমানা দিয়ে মীমাংসা হয়ে যেত। গারো সমাজে প্রচলন আছে যদি কোন সাংমা গোত্রের কেহ কোন অন্যায় করে থাকে তবে সামাজিক বিচার হবে এবং সামাজিক বিচারে যদি কোন জরিমানা ধার্য্য করা হয় তা হলে সেই ধার্য্যকৃত জরিমানা অর্থ সেই গোত্রের সকলে সমান অংশে বহন করে এবং পরবর্তী সময় অপরাধীকে স-গোত্রের মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়।

বর্তমানে গারোদের কঠিন সামাজিক প্রথা বা নিয়ম অনেকখানি শিথিল হয়েছে। অসবর্ণে বিবাহ এখন কোন বাঁধা নেই তাই বর্তমানে গারোদের সাথে অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর সাথে স্বাভাবিক ভাবেই এবং সামাজিক মতেই বিবাহাদি প্রচলিত হয়েছে।

মূলতঃ গারো পরিবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেন্দ্রীক, নারী পুরুষ উভয়ই নিজ-নিজ বংশধারার পৃষ্ঠপোষকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাক-বিবাহের অঙ্গীকার অনুসারে গারো পত্নী তার স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। অপরদিকে স্বামীর কর্তৃত্বও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় স্ত্রীর কাকা এবং

ভ্রাতার হস্তক্ষেপে। এ ব্যাপারে তাদের আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে থাকে। অপর দিকে স্ত্রীর অবাধ ক্ষমতাও স্বামীর পক্ষের আত্মীয় পরিজনদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কর্তৃত্বের এই ভারসাম্য থাকার ফলে গারোদের দাম্পত্য জীবন সফল হয়ে থাকে। ফলে দাম্পত্য জীবনে আসে সুখ ও স্থায়ীত্ব। গারোদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ অত্যন্ত বিরল।

পরিবারের ব্যাপারে স্বামীকেই সমস্ত দায়িত্ব বহন করতে হয়। সম্পত্তির মালিক স্ত্রী হলেও তাকে স্বামীর অধীনেই দাম্পত্য জীবন কাটাতে হয়। স্বামীর সেবা যত্নে স্ত্রীকেই মনযোগ দিতে হয়। গারোদের সামাজিক অনুশাসনে বলা আছে যে, কোনো স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করলে সে স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হতে পারে। তবে গারো সমাজে স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা অত্যন্ত বিরল।

১৩) জন্ম

গারো জনগোষ্ঠীরাও সন্তান জন্ম হওয়ার ব্যাপারে কিছু নিয়ম বা আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। গারোদের মধ্যে অন্তসত্বা মহিলাকে দিয়ে কোন প্রকার ভারী কাজ কর্ম করা নিষেধ, অন্তসত্বা মহিলাকে পরিবারে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেগুলির মধ্যে প্রথমতঃ সে যখন তখন বাড়ীর বাহিরে যেঁতে পারবে না সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পরে চুল ছেড়ে থাকতে পারবেনা ইত্যাদি।

সন্তান জন্ম হওয়ার সম্ভাব্য দিনের সাত দিন আগে একটি আলাদা ঘর তৈরী করা হয় যে ঘরে সন্তান জন্ম হবে। সেই ঘরটাকে গারো ভাষায় ''সূতি নক্' বলে (প্রসূতি ঘর)। সন্তান জন্ম দেওয়ার নিত চারদিন আগে থেকে ভাবী মা সেই সূতি নক্ বা প্রসূতিঘরে বাস করা শুরু করবেন। সেই ঘরে পুরুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে এবং অবিবাহিতা যুবতীদেরও প্রবেশে বাধা নিষেধ আছে। শুধু বিবাহিতা মহিলা এবং সন্তান প্রসব কাজে অভিজ্ঞ মহিলারাই সেই ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। সন্তান জন্ম হওয়ার পর দিন নব জাতক জাতিকাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তার মঙ্গল কামনার্থে একটি পূজা দেওয়া হয় সেই পূজাকে গারো ভাষায় বলে ''দারিছিক্' সেটা ''কামাল'', (পুরোহিত) দ্বারাই সম্পন্ন হয়। জন্মের সাতদিন পর আর একটি পূজা করে সেটা হলো '' সালজং মিদি সেই পূজার সময় সাধ্য মত ভোজনের আয়োজন করা হয় এবং সেদিনই সন্তানের নাম করণ হয় কামাল কর্তৃক। তার আরও ছয়দিন পর সূতি নক্ থেকে নবজাতক এবং মা কে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে ঘরে নেওয়া হয়।

১৪) মৃত্যু

গারো সমাজে জন্ম এবং বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের নিয়ম কানুনের চেয়েও অনেক বেশী গুরুত্ব এবং সতর্কতার সহিত মৃত্যুর নিয়ম কানুন প্রতিপালিত হয়। যখন কারোর মৃত্যু হয় তৎক্ষণাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সকলের নিকট খবব পৌছে দিতে হবে এবং আত্মীয় স্বজনকে যথাসম্ভব উপস্থিত থাকতে হয়। সকল আত্মীয় উপস্থিত হলে পরে মৃত ব্যক্তিকে স্নান করানো হয় (পুরুষ হলে পুরুষগণ স্নান করাবে এবং স্ত্রীলোক হলে স্ত্রীলোকগণ স্নান করাবে।) এমন সময় একদল বাঁশ দিয়ে একটি ভেলার মত তৈরী করে মৃত দেহের পাশে রাখে - যাতে করে শব দেহ বহন করে নিয়ে যায়, এবং ঘরের মাঝখানে একটি ছোট ঘরের মত বাঁশ বেত দিয়ে তৈরী করা হয় যার নাম গারো ভাষায় ''নান্‌সারী'' সেটা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত থাকবে এবং সেটাতে

প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালাবে এবং সকাল বিকাল ভোজন নিবেদন করবে। এছাড়াও ঘরের বাইরে উঠানের এক পাশে আর একটি ছোট ঘর নির্মাণ করবে উপরে ছাউনি দিয়ে যার মাঝখানে একটি বাঁশ পুঁতা থাকবে যার দৈর্ঘ্য হবে ছয় হাত। সেই বাঁশটিকে বলে "গাম্‌পং" এবং যে ঘরটা নির্মাণ করা হবে সেই ঘরটাকে বলে, "ডেলাং" এই ডেলাং এর ভিতর একটি ছোট মুরগী ছানা রেখে দেয় এবং সেটার জন্য প্রতিদিন খাবার এবং জল দেওয়া হয় যাতে মুরগী ছানাটা বেঁচে থাকে। সেটা ডেলাং শোয়া অনুষ্ঠান পর্যন্ত থাকবে। সেটা তিন মাসও হতে পারে এবং সর্বাধিক এক বছর। ডেলাং শোয়ার (ডেলাং দাহ) দিন সেই মুরগটাকে বলী দিয়ে মৃত ব্যক্তির আত্মার নামে উৎসর্গ করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ওয়ানগালা অনুষ্ঠানের সময় ডেলাং শোয়া অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করে থাকে।

উল্লেখ করা দরকার, এই ডেলাং রাখার পেছনে কারণ হল গারোদের বিশ্বাস ডেলাং এর ভিতরে যে মুরগী ছানাটা রাখা হয়েছে তার আত্মার মধ্যে সদ্য মৃত ব্যক্তির আত্মা এক হয়ে যায়। তাই যদি কোন আত্মীয় কোন কারণে মৃত্যুর দিন উপস্থিত থাকতে না পারে, তাহলে পরবর্তী সময়ে সে এসে ঐ ডেলাং - এ রাখা মুরগটিতেই তার আত্মীয় মৃত ব্যক্তির আত্মা নিহিত আছে মনে করে ডেলাং এর পাশে বসে বসে কান্না কাটি করে এবং শোক প্রকাশ করে ও মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে।

শব দেহ সৎকারের জন্য গারোদের "গাঞ্চি' (চিতা) তৈরী একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। গাঞ্চি তৈরীর জন্য প্রথমে স্থান নির্ধারণ করা হয়, তারপর সেখানে "গাঞ্চি' তৈরী করা হয়। গাঞ্চি সাত থেকে দশটা স্তর বিশেষ তৈরী হয়। প্রথম স্তর যেটা মাটির উপর থাকবে সেটা মোটা কলা গাছ দিয়ে তৈরী হয় যার দৈর্ঘ্য ছয়হাত। দ্বিতীয় স্তর হবে বট গাছ জাতীয় দিয়ে তৈরী তৃতীয় স্তর হবে আম জাতীয় কাঠ দিয়ে, চতুর্থ স্তরটি হবে বেল জাতীয় গাছ দিয়ে। তার পর থেকে যত স্তর হয় যেকোন কাঠ দিয়ে তৈরী করে।

গাঞ্জির উপরে বাঁশের বেত দিয়ে চার হাত লম্বা দুই হাত প্রস্থ একটি চাটাই বিছিয়ে তার উপরে শব দেহ শায়িত রেখে নিচে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সৎকারের কাজ সম্পন্ন হলে পর, গাঞ্চি সম্পূর্ণ ভাবে জ্বলে যাবার পর ভস্মে জল ঢেলে কপালের চাড়া সমেত কিছু হাড় সংগ্রহ করে পাশেই এক জায়গায় মাটি খুড়ে তা পুঁতে দিয়ে ভাল ভাবে প্রলেপ দিয়ে একটা কিছু দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। ইহা গারো ভাষায় বলে "গায়োন্দক' এবং পরদিন খুব ভোর বেলা শ্মশানে গিয়ে ঢাকনা খুলে দেখে কোন কিছুর পায়ের চিহ্ন আছে কিনা যদি থাকে তাহলে কিসের সেটা বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করা হয় যে মৃত ব্যক্তি পর জন্মে কিরূপে জন্ম গ্রহণ করবে।

তার মৃত্যুর পর থেকে ১৩ (তের) দিন শোক পালন করে আত্মীয় বর্গ, তার পর যথাসাধ্য শ্মশান বন্ধুদের কে ডেকে নিয়মানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকে পরবর্তী সময়ে আবার শুভ দিন দেখে ডেলাং শোয়ার দিন ধার্য্য করে সকল জ্ঞাতি ভোজন এবং আসল শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পান্না করা হয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন ভাল কাঠের খুঁটি দিয়ে (১১/২ থেকে ২ ফুট গোলাকার) প্রথা মত কারু কার্য্য করে মূল ঘরের বা পাশে উঠোনে পুঁতে দেয়া হয় মৃত ব্যক্তির স্মৃতি স্তম্ভ হিসাবে। এই স্মৃতি স্তম্ভকে গারো ভাষায় বলে "কীম্মা"।, উল্লেখ থাকে যে এই কীম্মা তৈরীর পদ্ধতি পুরুষ ও স্ত্রীর

ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নক্সার হয়, যা দেখলে পরে বুঝতে অসুবিধে হয় না কোনটা পুরুষ লোকের স্মৃতি স্তম্ভ এবং কোনটা স্ত্রী লোকের স্মৃতি স্তম্ভ।

১৫) গারো জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘর জামাই প্রথা ও পণ-প্রথার প্রবর্তন

আগেই বলা হয়েছে গারোগণ সামাজিকগত ভাবে মাতৃতান্ত্রিক । সেই অনুসারে ঘর জামাই প্রথা প্রর্বতন ছিল কিন্তু বর্তমানে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে গারোদের মধ্যে ঘর জামাই প্রথা নেই বললেই চলে। যদিও বা সামাজিক গত ভাবে মাতৃতান্ত্রিক প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত।

পণ প্রথা গারোদের মধ্যে পূর্বেও ছিল না এবং বর্তমানেও প্রচলিত হয় নাই এবং সামাজিক গতভাবে পণ প্রথা বর্জনীয়।

১৬) গারোদের ধর্ম

বিভিন্ন সূত্র থেকে বুঝা যায় বিগত ১৯৩১ ইং খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত গারোগণ জড়বাদী এবং হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রভাবে একটা অংশ গারো খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে গারোদের প্রচলিত ধারণা এবং বিশ্বাস বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত। তাদের মতে পৃথিবীর আগে পাহাড় পর্বতের পরিবর্তে শুধু জল আর জল ছিল। গারোদের বিশ্বাস ঈশ্বর "তাতারা বুরুংগা" জলময় পৃথিবীকে কঠিন মাটির স্তরে পরিণত করেছেন তাতারা বুরুংগা সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মার সমতুল্য। কথিত আছে তাতারা বুরুংগার নির্দেশে অধস্তন, "নেস্ত নোপতু" গুবরে পোকার সাহায্যে জলের তলদেশ থেকে কাদা এনে মাটির পৃথিবী তৈরী করেন। গারোবা মনে কবে বানর এবং ব্যাঙ হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম সৃষ্ট জীব। মানুষ পৃথিবীতে অনেক পরে এসেছে। গারোদেব আদি মানব-মানবী হল, "সানি ও মুণি" তাদের পুত্র কন্যারা হল গাংচুং ও দাজং। গাংচুং ও দাজং হল নর ও মান্ডের মাতা-পিতা। নর ও মাণ্ডে হল গারোদের আদি পিতা-মাতা।

গারোরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাদের ধারণা পাপ কাজ করলে পরজন্মে পোকা মাকড়, গাছ পালা হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তাতারা বুরুংগা ছাড়াও গারোদের অনেক দেব দেবী রয়েছে যেমন চোরা বুদী (শস্য দেবতা) সালজং (উর্বরতার দেবতা) গোয়েরা (শক্তির দেবতা) সুসুমি (ধানের দেবতা) কালকাম (মানুষের রক্ষা কর্তা) তংগ্রেংমা (রোগ শোকের দেবী) নাওয়াং (মানুষের অনিষ্টকারী দেবতা)।

তাছাড়া গারোরা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রের পূজা করে থাকে। তাদের বিশ্বাস যে কোন প্রকৃতিক র্দুযোগের জন্য এসব গ্রহ নক্ষত্র গুলিই কারণ। তাই তাদের পূজা অর্চনা করে খুশি রাখতে হয় । তাদের পূজার সময় পশু পাখি বলি দিতে হয়। কোন ব্যক্তির অসুখ-বিসুখ হলে পারিবারিক পূজা এবং সমগ্র সমাজের জন্য সর্বজনীন পূজা দিয়ে বিপদ-আপদও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাবার প্রচেষ্টা করে।

১৭) গারোদেব-দেবী ও সামাজিক উৎসব

গারোয়ারা ফসল লাগানো এবং ফসল তোলার সময নানারকম উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে। ফসল তোলার শেষে উল্লেখযোগ্য উৎসবকে বলা হয় ওয়ানগালা উৎসব। ওয়ানগালা উৎসব কয়েকদিন ধরে উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্গে চলে নাচ-গান এবং পান উৎসব। হিন্দুদের মত

গারোরাও পূর্ব পুরুষদের স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে। উল্লেখিত ছাড়াও গারোদের দেব দেবীর মধ্যে আরও আছে যেমন —

হাবা চুয়া রন্দা ঃ— (জুম দেবতা) গারোদের একান্ত বিশ্বাস এই দেবতাকে তুষ্ট না করলে ফসল ভাল হয় না। তাই সাতটি মোরগ বলি দিয়ে সন্ধ্যার সময় এই পূজা দেওয়া হয়। পূজার কাজ সম্পন্ন করেন কামাল (পুরোহিত)

গযরা পূজা ঃ— (স্বর্গের দেবতা) গারোগণ গয়রা দেবতাকে বজ্র এবং অস্ত্রের দেবতা হিসাবে গণ্য করে। তাই ভয়ংকর বজ্র ও অস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্তে গয়রা পূজা করে। শুকর, মোবগ বলি দিয়ে উক্ত পূজা করা হয়।

রংচু গাল্লা ঃ— (জুম দেবী) হাবা চুয়া রন্দা দেবতার মত রংচুগাল্লা পূজাও সু ফসলের দেবী। সু-ফসল পাবার উদ্দেশ্যে মুরগী। মদ এবং লেবু উৎসর্গ করে তার পূজা করা হয়।

রংদীক্ মীদি ঃ (ঘট পূজা) বা গৃহ দেবী বিশেষ করে মহিলাদের সমাবেশ উক্ত পূজা করা হয়। গারো ভাষায় রংদীক মানে বড় মাটির পাত্র সেখানে চাল রাখা হয়, তাই এই পূজা হিন্দুদের লক্ষ্মী পূজার সমতুল্য। এই পূজা সন্ধ্যার সময় হয়। কামাল (পুরোহিত) চালের হাঁড়ির গলায় এক গাদা কার্পাস জড়িয়ে তিনটি মুরগী বলি দিয়ে ঘরের মধ্যে এই পূজা করা হয় এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে আহ্বান করেন। বিশেষ করে গারো মহিলারা রংদীক্ মীদ্দিকে ধানের অধিষ্ঠাত্রী এবং আরাধ্য দেবী হিসেবে গণ্য করেন।

১৮) গারোদের খেলাধূলা

গারোরা খেলাধূলা ভালবাসে। তাদের খেলাধূলা সুপ্রাচীন এবং বেশীর ভাগই শরীর চর্চা এবং মল্লক্রীড়া ধরনের। সেগুলির মধ্যে চাম্বুল, হানাদিং, সাল্লা এবং ওয়াপাংল্লা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। চাম্বুল খেলায় বিশেষ ধরণের শারীরিক কসরৎ ও কলাকৌশলের পরিচয় মেলে। যারা এই খেলা দেখায় তারা একটুকরা কাপড়ের এক প্রান্ত কোমরে বেঁধে অপর প্রান্তে একটা ঢেলা মাটি শক্ত করে পুঁটলি বেঁধে দুহাতে প্রচন্ড শক্তিতে ঘোরাতে থাকে। এ- খেলায় শরীর চর্চা হয় এবং প্রচুর শক্তির দরকার হয়। ওয়াপাং সাল্লা খেলায় একটি আস্ত বাঁশের দুই প্রান্তে দুজন লোক টানাটানি করে। এতেও শরীর চর্চা হয়। হানদীং সাল্লা খেলাতেও দুজন লোক বাঁশের আড়াআড়ি ধরে টানাটানি করে। ওয়াপাং কাল্লা খেলায় দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাথরের চাঁই এর ওপর আস্ত বাঁশ রেখে দুপ্রান্তে বসে বল প্রয়োগ করতে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে ওপরে তুলতে পারবে তাকে জয়ী বলে ঘোষনা করা হয়। তাছাড়া রয়েছে সু-গোয়া বা ঘিলা খেলা, জাগল কাল্লা খেলা, দীর্ঘ লম্বা, উচ্চ লম্বা। পাথর ছোঁড়া, পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে এবং নিচে থেকে ওপরে দৌড় দেওয়া, দড়ি বেয়ে ওঠা। দড়ি টানাটানি প্রভৃতি খেলা গারোদের অতি প্রিয়। ইংরেজদের আগমনে গারো পাহাড় অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন হওয়ার সাথে সাথে ফুটবল, বাস্কেট বল, টেবিল টেনিস প্রভৃতি আধুনিক খেলাধূলার প্রবর্তনের ফলে গারো সমাজের নিজস্ব খেলাধূলা প্রায় বিলুপ্ত।

১৯) গারোদের জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ও বিপর্যয়

প্রত্যেকের জীবনেই চলার পথে বাঁচার পথে অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসে তাই ত্রিপুরার

গারোদের জীবনেও স্মরণীয় বিপর্যয় ঘটেছিল ১৯৮০ সনে ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা, সেই ঘটনায় বেশীর ভাগ গারো পরিবারকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরার গারোরা সেই বিপর্যয়ে পতিত হয়ে সর্বস্ব হারিয়েছিল যার ফলে তাদের অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে গেছে। সেই ঘটনায় দক্ষিণ ত্রিপুরাতে তিনজন এবং পশ্চিম ত্রিপুরাতে ৯ জন গারো সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণহানি হয়েছিল। এছাড়া ১৯৯৯ ইং সনেও একটি বিপর্যয় ঘটেছিল তখন বিশেষ করে পশ্চিম ত্রিপুরাতে কাঞ্চন মালা, ঝরঝরিয়া এবং মধুবন প্রভৃতি গ্রামের গারোদের উপর ভীষণ ভাবে আঘাত এসেছিল। তখন সেখানকার গারোগণ সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল। অনেকের জীবন হানি হয়েছিল। বহু অবস্থা সম্পন্ন গারো পরিবার ভিখারীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। বহু পরিবারকে বনের লাক্রি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে এবং অনেক পরিবার দিন মজুরে পরিণত হয়েছে। ১৯৮০ সনের এবং ১৯৯৯ সনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক গারো পরিবার আসাম এবং মেঘালয় চলে যায়। যার ফলে ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত গারোদের সংখ্যা ত্রিপুরাতে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি হয়নি। ২০০৮ গণনা অনুসারে (ইউনিয়ন গত) গারোদের সংখ্যা দাঁড়ায় বার হাজারের একটু বেশী।

সেই সব বিপর্যয় গারোদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে গারোবা সেই সব বিপর্যয় কে কাটিয়ে অনেকে অন্যত্র বাড়ী ঘর করে নিজস্ব পিতৃ সম্পদ ছেড়ে নূতন ভাবে সুস্থ জীবন যাপন করছে।

উল্লেখ থাকে যে গারো জনগোষ্ঠী ভেদা-ভেদ এর বিশ্বাসী নয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে গারোদের মধ্যে প্রধানত দুইটি সম্প্রদায় আছে সেগুলি হল মারাক এবং সাংমা তবে এই দুইয়ের মধ্যে কোন উচু-নিচু বা ভেদাবেদ নেয় তাই গারোগণ মানুষ মাত্রই এক — এই নীতিতে বিশ্বাসী।

২০) গারেদের রাজনীতি ঃ

ত্রিপুরাতে রাজনীতির ক্ষেত্রে গারোগণ অনেক পিছিয়ে যদিও এরা গ্রামীণ স্তর থেকে মহকুমা স্তর পর্যন্ত অনেক গারো ব্যক্তিত্ব রাজনীতিতে যুক্ত কিন্তু উল্লেখ করার মত হয় নাই। তার কারণ হিসাবে বলা যায় একদিকে সংখ্যালঘু এবং আর একদিকে অর্থনৈতিক কারণ এবং অহিংসা পরায়ণতা। তবে তার জন্য গারোদের মধ্যে রাজনীতি করার মত ক্ষমতা ও দক্ষতা নেই সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। তাই তো জাতীয় স্তরে মেঘালয়ের গারোগণ রাজনৈতিকভাবে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় ক্যাপ্টেন উইলিয়ামসন সাংমা, পি. এ. সাংমা এদের নাম। উল্লেখ থাকে যে, তাদের নিকট আত্মীয়রা অনেকেই ত্রিপুরাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং বহুকাল ধরে ত্রিপুরাতে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছে।

২১) গারো জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ঃ

গারোরা সহজে যে কোন লোকের সাথে মিশে যেতে পারে সেটা তাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলা যায়। তাই দেখা যায় যে কোন প্রতিবেশীর সাথে তারা এক হয়ে মিলে মিশে বস-বাস করছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠছে।

গারোদের ওয়ানগালা নৃত্য

২২) বিবর্তনের পথে গারো সমাজ

সামাজগত, শিক্ষাগত, অর্থনীতিগত বা সব দিক দিয়ে গারো জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। গাবোদেব সমাজে অনেক কু-সংস্কার ছিল সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে গ্রহণীয় নীতি বা পথ অনুসবণ করে এগিয়ে চলছে। ত্রিপুরা গারো ইউনিয় গঠিত হযেছে ১৯৮২ খৃষ্টাব্দে গারোদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টায় উদ্যোগী উক্ত ইউনিযন এবং ইহা অল ইন্ডিয়া গারো ইউনিয়নের সাথেও যুক্ত।

২৩) গারোদের বৈনারী পাতার ইতিহাস ঃ

বৈনারী সম্প্রদায় ও জাতি গোষ্ঠীর সাথে আত্মিক এবং অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনেব মানসিকতা গারো গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বিশেষ করে গারো মহিলারা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীব মহিলাদের সাথে বৈণারী (সই বা সখী) নামক এক নিবীড় আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করে তাদের সাথে আত্মীয়তা গড়ে তোলে। বৈনারী সম্পর্ক স্থাপনের পর একজন আর একজনের ছেলে মেয়ে ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজনকে নিজের ছেলে -মেয়ে ভাই বোন এবং আত্মীয় স্বজন বলেই মনে করে এবং সেই ভাবেই আচরণ করে। ছেলে মেয়ে ভাই - বোন এবং আত্মীয় স্বজনরাও সেই ভাবে সম্বোধন করে এবং আচরণ করে যাহা পরবর্তী বহু প্রজন্ম পর্যন্ত চলতে থাকে।

বৈনারী পাতার আগে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের মনের ভাবের আদান- প্রদান হয় এবং মনের মিল হলে পরস্পর প্রস্তাব করে বৈনারী পাতার জন্য তারা পরস্পর সম্মত হয়ে দিন তারিখ স্থির হয়। যেদিন দু-জনের মধ্যে বৈনারী বন্ধনে আবদ্ধ হবে সেদিন

সাধ্যানুসারে নূতন জামা-কাপড় আদান প্রদান করে এবং পাড়া-প্রতিবেশী কিছু লোকদের আমন্ত্রণ করে তাদেরকে স্বাক্ষী স্বরূপ রেখে ভোজের আয়োজন করা হয় এবং পরস্পর পরস্পরের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, একে অপরের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা-বোধ করবেনা এই অঙ্গিকার করে বৈনারী পাতার কার্য্য সম্পন্ন করে।

তখন থেকে গারো মহিলাগণ মনে করে বৈনারী হল— সব থেকে তার আপনজন। তাই তার বাড়ীতে কোন অনুষ্ঠান বা যে কোন উৎসব পার্বণে তার বৈনারীকে প্রথম সে আমন্ত্রণ করে এবং বাড়ীতে নুতন কোন ফসল বা ফল বা যে কোন কিছু উৎপাদন হলে প্রথমে বৈনারীর জন্য দেয়। নুতন কোন শাক-সব্জি উৎপাদন হলে প্রথমে বৈনারীর জন্য দেয়। যে কোন পূজা পার্বণে বা নববর্ষে নূতন পোষাকাদি দেয়া নেয়া হয়।

যে দিন বৈনারী বাড়ীতে যাবে বলে স্থির হয় সেদিন তারা গারো বৈনারী সকাল থেকে প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। মনের আনন্দে সকাল থেকে টাট্কা ফল, সব্জি ইত্যাদি সংগ্রহ শুরু হয়ে যায়। তারপর স্নান করে নূতন পোষাক পরে ফল, সব্জির ঝুড়ি ভর্তি করে নিয়ে বৈনারীর বাড়িতে রওনা হয়ে যায়, ঐ প্রান্তের বৈনারীও (অন্য) তারা বৈণারী আসবে বলে সকাল থেকে না খেয়ে বসে থাকতো, "বৈনারী আসলে পরে দুজনে একসাথে এক পাতে বসে খাবো।" বৈনারী ছেলে-মেয়েরাও, মায়েমা, এসেছে বলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। অন্য বৈনারীও মাঝে মাঝে গারো বৈনারীর বাড়ীতে বেড়াতে যেত সাথে নিয়ে যেত বৈনারীর জন্য কাপড় এবং ছেলে মেয়েদের জন্য পোষাকাদি, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি। অনেক সময় এক বৈনারী আর এক বৈনারীর বাড়ীতে দুই তিনদিন থেকে যেত। এই সময় বৈনারীর অন্য আত্মীয় স্বজনদের বাড়ীতে বৈনারীকে বেড়াতে নিয়ে যেত। আত্মীয় স্বজনরাও খুব আদর যত্ন করত।

গারোরা খুব অতিথি পরায়ণ, কারণ তারা মনে করে অতিথি সেবাই নারায়ণের সেবা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ১৯৭৩ ইং সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হবার পরিপ্রেক্ষিতে শরণার্থীর আগমন, তখন আমাদের গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে প্রচুর শরনার্থীর আগমন। তখন প্রথম অবস্থায় নিজস্ব বাড়ী ঘরে আপ্লায়ন করে নিয়ে স্থান দিয়েছিল এবং আমার বাবা স্বর্গীয় দ্বাজেন্দ্র সর্দার (চিরান) গ্রামের সর্দার ছিলেন, তিনি গ্রামের সকলকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন সকলের বাড়ীতে শরণার্থীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সেই ভাবেই থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। কিন্তু যখন শরণার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় তখন গ্রামের সকলে মিলিত হয়ে, ছন, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে অস্থায়ী ছাউনি, সূচাইল ইত্যাদি তৈরী করে দিয়েছিল এবং প্রত্যেকের বাড়ী থেকে যথা সম্ভব চাল, ডাল, সব্জি ইত্যাদি সংগ্রহ করে শরণার্থীদের খাবার ব্যবস্থা করেছিল, যতদিন পর্যন্ত সরকারী ভাবে শরণার্থীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা না করা হয়।

বর্তমানে কালের ক্রমবিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে গারোদের মনেও আত্মকেন্দ্রিকতার ছাপ পড়েছে। যার ফলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সেই বৈনারী প্রথা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। একদিকে সামাজিক বন্ধনের প্রসারতা ঘটছে, অপর দিকে সত্যিকারের আন্তরিকতার অবসান হয়ে যাচ্ছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে বৈনারী সম্পর্কটা শুধু ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপসংহার ঃ

গারোদের পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় জীবন চর্চা থেকে শুরু করে সব কিছুর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অমিলও পরিলক্ষিত হয়। তার কারণ হিসাবে মনে করি পারিপার্শ্বিক প্রভাব। ত্রি পুরায় গারোদের ভাষার মধ্যে যেমন ত্রিপুরী ভাষা এবং বাংলা ভাষাব অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেই ধর্ম- কৃষ্টি, প্রভৃতিতেও পারিপার্শ্বিক প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে ত্রিপুবার গারোদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাই তাদের কাছে প্রাচীন ধর্ম-কর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

পান্তিশ চিরাং
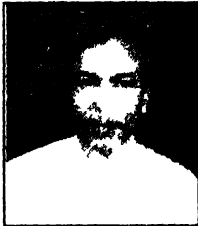
১৯৫৬ সালে ৮ই আগষ্ট উদয়পুর মহকুমার পেরাতিয়া গ্রামে জন্ম। পিতা সমাজপতি দ্বিজেন্দ্র চিরাং। প্রাথমিক পাঠ নাতিনটীলা প্রাথমিক স্কুলে। তাবপর চন্দ্রপুর কলোনী স্কুল, উদয়পুর রমেশ স্কুল। এম. বি. বি কলেজ থেকে স্নাতক। বর্তমানে রাজ্য সরকাবেব সমবায় দপ্তরে সমবায় অফিসার পদে কর্মরত।

মগ

১। মগ জনগোষ্ঠীর নামের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

ত্রিপুরায় এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বসবাসকারী আরাকান বাসীরা মগ বা মারমা নামে পরিচিত। তবে এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের মধ্যে কখনই মগ বলে পরিচিত নয়। অর্থাৎ 'মগ' শব্দ তাদের কাছে এখনো অজানা । বরং প্রচলিত নিজেদের ভাষায় অথবা একে অপরের পরিচয়ের ক্ষেত্রে ওরা নিজেদের যে 'লু' বা 'লু - ম্যো - জেসা' বলেই আখ্যায়িত করেন। মগ বা মারমা শব্দ কোষেও মগ শব্দের কোন অর্থ, প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। তাই ইদানীংকালে বাংলাদেশের এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা "মারমা" হিসাবে নিজেদেরকে পরিচয় দিচ্ছেন। তবে ঐতিহাসিক গণ এই জনগোষ্ঠীদের কে মগ নামে ভূষিত করার কারণ হিসাবে আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস 'রা-জোয়াং'-এ উল্লেখ আছে বলে দাবী করছেন। এদের মতে আরাকানে প্রাচীন রাজাগণ ছিলো মঘধ বংশোদ্ভুত এবং মঘধের ধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যের অনুসারী।

অন্যদিকে, মগ তথা আরাকানের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে মগ নামে আখ্যায়িত করার সম্পর্কে ইংরেজ পণ্ডিত; সেকাল ও একালের বাঙ্গালী পণ্ডিতদের কিছু ধারণা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা যায়—

প্রফেসব ডি জি হলের মতে "মগ শব্দটি মঙ্গোল শব্দের বিকৃত রূপ। কারণ মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর সাথে আরাকানী জনগোষ্ঠীর সাদৃশ্য রয়েছে"। আবার গ্রীয়ারসনের মতে — "মগ শব্দটি ইন্দোচীন জনগোষ্ঠীর একটি শাখা"। অনেকে আবার সংস্কৃত মদগু শব্দ থেকে (জলচর পক্ষি / জলদস্যু) মদগু ⟶ মগ⟶ মঘ নামে খ্যাত হয়েছে বলে অনুমান করেছেন।

আবার কেহ কেহ আলোচনা করেছেন যে, এক সময় বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলার সাথে সাথে আরাকান ও বার্মায় প্রচারিত হয়েছে। তবে বৌদ্ধই ধর্ম আরাকানে টিকে থাকে। তাই, হিন্দু মাত্রই যেমন আর্য ও আর্যবর্ত উদ্ভুত, মুসলিম মাত্রই যেমন মক্কা, মদিনা থেকে আগত, ঠিক তেমনি, বৌদ্ধ মাত্র মগধ থেকে আগত। সুতরাং, মগ বা মঘ মগধ শব্দ থেকে জাত বলেই দাবী করছেন।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে আবার আলোচনা করেছেন যে, ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ব্রহ্মদেশের রাজা কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে আরাকানের এক বিরাট জনগোষ্ঠী বাংলাদেশর কক্স বাজার, সীতাকুণ্ড হয়ে প্রথমে মং সার্কেলে বসতি স্থাপন করেছিল এবং এই মং সার্কেলের নাম থেকেই সেখানকার জনজাতিদের মং বা মগ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

সুতরাং উপরের আলোচিত বিষয় গুলি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাই যে 'মগ' শব্দটি আদৌ কোন আরাকানী শব্দ নয়। এই 'মগ' শব্দটি কোন না কোন জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা আখ্যায়িত শব্দ হতে পারে।

২। মগ জনগোষ্ঠীর ত্রিপুরা রাজ্যে আগমন এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বসতি স্থাপন

মগ জনজাতিদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগমন এবং বসতি স্থাপন নিয়ে কোন সঠিক তথ্যের

কোথাও উল্লেখ পাওয়া না গেলেও এই জনজাতিদের ত্রিপুরায় আগমন এবং বসতি স্থাপন নিয়ে অনেকে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ত্রিপুরার রাজমালায় বর্ণিত 'লিকা' নামক জনজাতিরাই বর্তমানে 'মগ' সম্প্রদায়ের লোকজন। এই অভিমতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অনেকে আবার আলোচনা করেছেন যে সমতল চাষ পদ্ধতি শেখার পূর্বে জুম চাষই ছিল মগ জনজাতিদের মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি। এই জুম চাষ প্রথা অবলম্বনে এবং বিশেষত জীবন-জীবিকার সন্ধানে আদি কালে আরাকান প্রদেশের এই ছোট জনগোষ্ঠী চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড় অতিক্রম করে ত্রিপুরায় তাদের বিস্তৃতি লাভ করে। অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক যে কোন কারণেই হোক মগ জনজাতি ত্রিপুরায় বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরায় প্রথমে ছড়িয়ে পড়ে । তাই, ত্রিপুরা ভারত ভুক্তির অনেক আগে অর্থাৎ 1931 সালের পরিসংখ্যান অনুসারেও দেখা যায় যে প্রায় 5748 জন মগজনজাতির লোক ত্রিপুরায় বসবাস করত।

অন্যদিকে, যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় যে, 1785 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা বোধপায়া আরাকান প্রদেশ আক্রমণ করে আরাকানের রাজা থামাদাকে বন্দী করে। রাজা থামাদা সহ তার কুড়ি হাজার সৈন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই ঘটনার পর আরাকানের গ্রাম স্তরের মানুষ চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই আশ্রয় গ্রহণ কারীদের স্রোত দীর্ঘ দিন চলতে থাকে। এরই মধ্যে ব্রহ্মদেশ থেকে অনুরোধ আসে সেইসব শরণার্থীদের দেশে ফিরে যেতে। কিন্তু ওরা ফিরে যেতে অস্বীকাব করে এবং ধীরে ধীরে সীতাকুণ্ড পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হয়ে ওরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড়েও ছড়িয়ে পড়েএবং স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তবে ত্রিপুরায় মগ বসতি স্থাপন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। সুতরাং এই বিষয়টি সঠিক গবেষণা ছাড়া বলা সম্ভব নয়।

৩। আদমসুমারি অনুযায়ী জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত পরিবর্তন

ত্রিপুরায় ১৯ টি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে মগ জনগোষ্ঠী খুব ছোট জনগোষ্ঠী। মগ সম্প্রদায়েব লোকেরা মোটামুটি ৫ টি মহকুমায় বিক্ষিপ্ত ভাবে রয়েছে। বিভিন্ন সময়ের আদমসুমারী অনুযাযী এই জনগোষ্ঠীর যে সংখ্যাগত পরিবর্তন দেখা যায় সেটা নিম্নে উপস্থাপন করা হল ঃ—

সাল	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
1961	10,510	5423	5087
1971	13,273	6841	6432
1981	18,182	9361	8821
1991	31,612	16,242	15,370
2001	30,385	15,393	14,992

এখানে 1991 এবং 2001 সালের জনসংখ্যার যে সংখ্যা গত পরিবর্তন দেখা যায় সেটা একটা ঋনাত্মক হার। অনুসন্ধানে দেখা যায় যে 1991 সালের পর থেকে ত্রিপুরায় বড়ুয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা উপজাতি স্বীকৃতি হারায়। এতদিন তারা মগ সম্প্রদায় হিসাবেই পরিচিত ছিল। যার জন্য 1991 সালের মগজাতির মোট জনসংখ্যার চাইতেও 2001 সালের মোট জনসংখ্যা কমে

গেছে।

৪। জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

ত্রিপুরায় মগ জনজাতিরা মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠি হিসাবেই পরিচিত। মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর মানুষদের চুল সাধারণত খাড়া এবং সোজা হয়, মাথার আকার হয় সাধারণত গোল। নাক মাঝারী হতে চেপ্টা। চোখের উপরের পল্লব ঝুলে থাকে সামনের দিকে। ওদের দাড়ি গোঁফ থাকে না বললেই হয়। চোখ ধূসর বা গায় ধূসর, দেহাবয়ব দীর্ঘ ও বিস্তৃত হলেও পা খাটো হওয়ায় এদের খর্বাকৃতি দেখায়। মগ জনজাতিদের এইসব বৈশিষ্ট্য গুলি লক্ষ্য করা যায়। তাই এই সব বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার জন্যই মগ জনজাতিদের মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠী হিসাবে বিভিন্ন লেখক বিশেষ করে মুস্তাফা মজিদ, আব্দুল মবুদ খান দাবী করেছেন ।

৫। ভাষা সম্পর্কিত তথ্য ঃ-

মগ জনজাতিদের নিজস্ব ভাষা এবং সংস্কৃতির ধারা এখনো অটুট বলা যায়। এই জনজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী থাকলেও একই ভাষায় তাদের মনের কথা আদান প্রদান হয়। তবে এলাকা ভেদে এসব গোষ্ঠীর লোকদের ভাষার উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য কার যায়। ত্রিপুরায় মোটামুটি ভাবে প্লেং সা, খ্যংমা, ক্যফ্যাসা, প্লেনেসা, লুনদুকসা, ফ্রাং রাসা, কক দেংসা, ইত্যাদি গোষ্ঠী লোকেদের ভাষার প্রচলন দেখা যায় এবং এই ভাষার বংশ তিব্বত - বর্মীয়। ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষে উন্নত কোন ভাষার সাথে এই ভাষার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মগ ভাষার বর্ণমালা, বর্মীয় বর্ণমালার সাথে কোন পার্থক্য নেই। অন্য দিকে সংস্কৃত বা বাংলার মতন মগ বা বর্মীয় ভাষার দুটি বর্ণে বিভক্ত। যেমন — স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ ১২ টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩ টি। এই স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ গুলি উচ্চারণের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষ্য করি তাহলে এদের আদি সংস্কৃত বা বাংলার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। নীচে এই বর্ণগুলির নমুনা দেওয়া গেল ঃ—

স্বরবর্ণ

১। মগ = ...

	Initial	Diacritic		Initial	Diacritic		Initial	Diacritic	
creaky	ဣ	အိ	[i]	အ	-	a [à]	ဥ	အု	u [u]
low	ဤ	အီ	ī [i]		အာ	ā [a]	ဦ	အူ	ū [u]
high		အီး	ı [i]		အား	a [à]	ဦး	အူး	u [u]
low	ဧ	အေ	e [e]					အို	ui [o]
high		အေး	e [è]					အိုး	ui [ò]
creaky		အေ့	e [é]					အို့	ui [ó]
low		အယ်	ay [ɛ]				ဪ	အော်	ö [ɔ]
high		အဲ	ai [ɛ]				ဩ	အော	o [ɔ]
creaky		အဲ့	ai [ɛ]					အော့	o [ɔ]

বাংলা ঃ— অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ....ইত্যাদি ।

ব্যঞ্জনবর্ণ

২। মগ = ...

က	k [k]	ခ	kh [kʰ]	ဂ	g [g]	ဃ	gh [g]	င	ṅ [ŋ]
စ	c [s]	ဆ	ch [sʰ]	ဇ	j [z]	ဈ	jh [z]	ည	ññ [ɲ]
ဋ	ṭ [t]	ဌ	ṭh [tʰ]	ဍ	ḍ [d]	ဎ	ḍh [d]	ဏ	ṇ [n]
တ	t [t]	ထ	th [tʰ]	ဒ	d [d]	ဓ	dh [d]	န	n [n]
ပ	p [p]	ဖ	ph [pʰ]	ဗ	b [b]	ဘ	bh [b]	မ	m [m]
ယ	y [j]	ရ	r [j]	လ	l [l]	ဝ	w [w]	သ	s [θ]
		ဟ	h [h]	ဠ	ḷ [l]	အ	ø [ʔ]		

বাংলা = ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ... ....ইত্যাদি ।

প্রচলিত ছড়া

	-ṅ	-ñ	-n	-m	-k	-c	-t	-p
a	အင် [ʔĩ]	အည်/ဉ် [ʔɪ̃]	အန် [ʔã]	အမ် [ʔã]	အက် [ʔɛʔ]	အစ် [ʔɪʔ]	အတ် [ʔaʔ]	အပ် [ʔaʔ]
i			အိန် [ʔeɪ̃]	အိမ် [ʔeɪ̃]			အိတ် [ʔeɪʔ]	အိပ် [ʔeɪʔ]
u			အုန် [ʔoʊ̃]	အုံ [ʔoʊ̃]			အုတ် [ʔoʊʔ]	အုပ် [ʔoʊʔ]
o	အောင် [ʔaʊ̃]				အောက် [ʔaʊʔ]			
ui	အိုင် [ʔaɪ̃]				အိုက် [ʔaɪʔ]			

সংখ্যা সম্বন্ধীয়

၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
တစ်	နှစ်	သုံး	လေး	ငါး	ခြောက်	ခုနှစ်	ရှစ်	ကိုး	တစ်ဆယ်
tiq	hniq	thòun	lè	ngà	c'auq	K'ú-hniq	shiq	kò	(tă)s'eh
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

মগ ভাষায় লেখার নমুনা

လူတိုင်းသည် တူညီလွတ်လပ်သော ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့်လည်းကောင်း၊
တူညီလွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးများဖြင့်လည်းကောင်း၊
မွေးဖွားလာသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၌ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်သော
ဉာဏ်နှင့် ကျင့်ဝတ်သိတတ်သော စိတ်တို့ရှိကြ၍ ထိုသူတို့သည်
အချင်းချင်း မေတ္တာထား ၍ ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏။

অনুবাদ

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

৬। জনগোষ্ঠীর ভাষার নমুনা, প্রবাদ বাক্য ও প্রাচীন লোক গীতি

ত্রিপুরার বসবাসকারী মগ জনগোষ্ঠীর ভাষা অন্যান্য উপজাতিদের ভাষা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে আলাদা। এই জনগোষ্ঠীর ভাষা বর্মীয় ভাষার শাখা বলা যায়। বর্তমান ম্যানমার আরাকান প্রদেশের রাখাইন জনজাতি লোকেদের ভাষার সাথে এবং তাদের লিপির সাথে নিরানব্বই শতাংশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বর্ণ মালার নমুনা উপরে দেওয়া হয়েছে।

তবে ভৌগোলিক কারণেই হোক আর ঐতিহাসিক কারণেই হোক ত্রিপুরার আদি জনজাতি তথা ত্রিপুরী উপজাতিদের কিছু কথ্য শব্দের উচ্চারণের সাথে মগ ভাষার কিছু শব্দের উচ্চারণে মিল পাওয়া গেছে। যেমন ঃ—

	বাংলা	ত্রিপুরী	মগ
১)	খাওয়া	চা/চানাই	চারে/চা
২)	বাঁশ	ওয়া	ওয়া
৩)	মধু	প্যা	প্যা
৪)	বাচ্চা	সা	সা
৫)	মুড়ি	ওরোং	ওয়ারোং
৬)	তিতা/ তেঁতো	কথা	কথা/খারে
৭)	শুকর	ওয়াক	ওঅ
৮)	মল	সি	সি
৯)	রাস্তা	লাসা	লেইন

মগ ভাষা অন্য জনজাতিদের ভাষার চাইতে তেমন কোন কঠিন ভাষা নয়। শব্দ ভাণ্ডার এবং কিছু ভাষাগত নিয়ম কানুন কেউ যদি রপ্ত করতে পারে তাহলে এই ভাষায় কথোপকথনের

কোন সমস্যা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোন একটি শব্দের সাথে 'ম' অক্ষর যদি প্রথমে যোগ করি তাহলে শব্দটির অর্থ নেগেটিভ হবে। আবার ঐ শব্দের পরে ' রে' তে' যোগ দেওয়া হয় তাহলে শব্দটির অর্থ পজেটিভ হবে। এক্ষেত্রে আমরা ইংরেজীর Non বা Dis বা Suffix বা Prefix- এর মতনই বলা যায়। নীচে উদাহরণ দেওয়া হল ঃ—

১। ক্রারে = শুনেছি ⟶ মক্রা = শোনেনি।

২। চারে = খাচ্ছি ⟶ মচা = খাব না।

৩। লারে = চলি / যাচ্ছি ⟶ মলা = যাব না।

৪। লেতে = আসছে ⟶ মলে = আসছে না।

এখানে স্পষ্টতই বলা যায় যে কারোর সদ্দিচ্ছা থাকলে মগ ভাষা শেখার কোন সমস্যা থাকার কথা নয়।

প্রবাদ বাক্য , প্রাচীন লোকগীতি, ছোট গল্প ধাঁ ধাঁ ইত্যাদি মগ জনজাতিদের মধ্যেও বহুল প্রচলন / চর্চার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, কাপ্যা, লাংগা, ই-এ, যেগ্রাং- ওয়েসেন্দ্রা, কামেন্দ্র ইত্যাদির চর্চার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এই বিষয় গুলি চর্চার প্রধান প্রাণ কেন্দ্র বলতে সমাজের মন্দিরই বলা যায়। তাই সঠিক প্রতিষ্ঠানের অভাব, সংরক্ষণ, উন্নত উপায়ে চর্চার অভাবেব জন্য বর্তমান প্রজন্মদের কাছে তেমন কোন উৎসাহ দেখা যায় না মূলতঃ নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক অভাবই এর জন্য দায়ী। জনজাতিদের কিছু উৎসাহী শিক্ষিত যুবক এই সমস্ত বিষয় গুলি সংরক্ষণ এবং পুনঃ প্রচলনে প্রচেষ্টা করছে।

প্রচলিত প্রবাদ বাক্য গুলি নীচে উল্লেখ করা হল ঃ—

১। ও মালে ক্রে।
খাওঅ মালে থে্।।
(আয় বুঝে, ব্যয় কর।)

২। সাদরাং লেত্ লা
লং থোকক্যাদলা।।
(যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়)

৩। লোং হ্লা গো ছংগে।
ওয়ং মৃছাং রে।।
(কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে।)

৪। ম্যো ম্যা গে।
প্যো মে প্রে।।
(অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট)

৫। পথং খ্রেং ত্খা নতে।
উচ খ্রেং তখা পরে ।।
(সব দিন সমান যায় না।)

এই রকম প্রচুর প্রবাদ বাক্য মগ জনজাতিদের প্রচলিত আছে। প্রতিটি প্রবাদ বাক্য ছন্দে এবং অর্থে ভরপুর।

লোকগীতি চর্চার ক্ষেত্রেও মগ জনজাতিদের প্রধান্য লক্ষ্য করার মতন। এক্ষেত্রে ই-এ , কাপ্যা, পাংখুং, যেখ্রাং ইত্যাদি মগ জনজাতিদের মধ্যে চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আধুনিক হিন্দি সিনেমার প্রভাব এবং পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাবে এই প্রাচীন ঐতিহ্য বাহী গীতি চর্চা এখন লুপ্ত প্রায়। তা- সত্বেও এর প্রচলন যে নেহাৎ কম তা বলা মুশকিল। লোকগীতির কিছু উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলঃ—

১। বপরা তিতি . . . . ই
রওয়া তংজংমা নওয়া তরুই . . . . ।।
. . ..
. .. .।।

২। পোসে এঙে কুক্যাকে।
ক্যোমে লুগে সেংখ্যোক সুংছে ছেংথারে
মেরো এঙে কুক্যাকে।
ক্যোমে লুগে মংগো ম্রা ছুংথারে ।।

৩। আসেং মকং ওয়া খ্রেং খং।
ওয়ালুং ব্রকু খেথায়্যংলে।।
....
....

এছাড়াও ই-এ, যে গীতি সাধারণত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ করে কল্পতরু উৎসর্গ অনুষ্ঠানে মগ ছেলে মেয়েরা সুশৃঙ্খলভাবে পরিবেশন করে থাকে।

"আসো দাদা, আসো কহ মোং।
সিংগা ব্রাংমা, কহমোং লোতে।।"
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -"

লক্ষণীয় বিষয় হল, গীতি হোক আর প্রবাদ হোক বা ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানের দলগীতি হোক না কেন, সমস্ত প্রাচীন মগ লোকগীতির সঙ্গেও ছন্দের একটা সুন্দর মিল থাকে। বাংলায় যেমন আমরা কবিতা, লোকগীতিতে দেখি।

৭। মাতৃভাষায় শিক্ষার অগ্রগতি ও সমস্যা এবং শতাংশ হিসাবে সাক্ষরতার হার ঃ

মাতৃ ভাষার শিক্ষার অগ্রগতি ত্রিপুরার মগ জন জাতিদের মধ্যে খুবই নগণ্য। সবরকম সদিচ্ছা সত্বেও এখন পর্যন্ত একটি স্কুলেও মগ ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যায়নি। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিরা মূলতঃ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা উল্লেখ করছেন। তবে, দক্ষিণ ত্রিপুরার মনু বনকুলের ধম্মদীপা স্কুলে প্রাথমিক স্তরে মগ

ভাষার শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চলছে। তাই শতাংশ হিসাবে মগ ভাষায় লেখাপড়া জানার লোকের সংখ্যা সমগ্র জনজাতির ২ (দুই) শতাংশের বেশী হবে না। দ্বিতীয়ত, মগ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তকের অভাবও অন্য একটি প্রধান কারণ হিসাবে সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীদের অভিমত। পাঠ্যপুস্তক স্থানীয় ভাবে ব্যবস্থা করা খুবই কঠিন। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মগ লিপিতে পাঠ্য পুস্তক হয় বাংলাদেশ নয়ত ম্যানমার থেকে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজের উৎসাহী কিছু শিক্ষিত লোকেদের আবার ভিন্ন মত পোষণ করছেন। উনাদের মতে, প্রাথমিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক হলেই সব কিছু হবে সেকথা মানা যায় না। বর্ণ বা বর্ণমালার শিক্ষাদানের মাধ্যমেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুরু করা যায বলেই দাবী করছেন। সে দিক থেকে নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য ভাল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৮। উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ-

মগ জনগোষ্ঠীদের উচ্চ শিক্ষার হার খুবই নগণ্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিত মহল প্রথাগত অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে দায়ী করছেন। অন্যদিকে পূর্বে মগ সমাজের সচ্ছল পরিবারের মধ্যে পরিবেশগত দুর্বলতা এবং দুরভিসন্ধিকেই দাযী কবছেন। আগের দিনে প্রচলিত ধারণা ছিল যে সমাজে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন নেই এবং তাদেব প্রধান কাজ হল পরিবারের রান্নার সহায়তা করা। বিভিন্ন সময়ের সেন্সাসের রিপোর্ট অনুযায়ী মগ জনজাতিদের শিক্ষার অগ্রগতি নমুনা নীচে দেওয়া হল ঃ—

সাল	মোট জনসংখ্যা	মোট শিক্ষিত	শতাংশ হার
1961	10,510	1100	10.47%
1971	13,273	1500	11 31%
1981	18,182	2096	11 53%
1991	31,612	7222	22 84%
2001	30,385	7224	23.77%

উপরে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই জনজাতিদের শিক্ষার হার যদিও খুবই কম তা সত্ত্বেও একটা বিষয় লক্ষণীয় সেটা হল1991 সালের পর তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অনেকের ধারণা সরকারের শিক্ষা নীতির জন্যই এই হার কিছুটা হলেও বেড়েছে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় এই জনজাতিদের থেকে 1961 সালে মেট্রিকুলেশন ও তার উপরে মাত্র ২ (দুই) জন 1971 সালে মেট্রিকুলেশন ৬ (ছয়) জন এবং গ্রেজুয়েট মাত্র ১ (এক) জন।

1981 সালের সেন্সাস অনুযায়ী মেট্রিকুলেশনের সংখ্যাটা কিছুটা বেড়ে ১৩ (তের)তে দাঁড়ায়। স্নাতক ৬ (ছয়) জন এবং স্নাতকোত্তর স্তরে ১ (এক) জন।

আবার 2001 সালের রিপোর্ট অনুযায়ী স্নাতক ডিগ্রী ধারী সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩ (তিপান্ন) এই তথ্য থেকে যদিও ধারণা করা যায় যে, মগ জনগোষ্ঠীদের শিক্ষার হার কিছুটা উন্নতি হয়েছে কিন্তু শতাংশ হিসাবে এই হারটা খুবই নগণ্য। বিভিন্ন মহকুমা স্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মগ সমাজে ডাক্তারের সংখ্য ৭ (সাত) জন, ইঞ্জিনীয়ার ১১ (এগার) জন অন্যান্য অফিসার ১২

(বার) জন। তবে এম.কম ও এম. এস . সির সংখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি।

৯। জীবন - জীবিকা

ত্রিপুরার বসবাসকারী মগ জনগোষ্ঠীদের কৃষিই হল প্রধান জীবিকা। বর্তমানে এই জনগোষ্ঠীদের সমতল চাষের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেও আদি কালে এদের জুমই ছিল প্রধান কৃষি ক্ষেত্র। সেদিক দিয়ে এই জনগোষ্ঠীদের অরণ্য শ্রেণীই বলা যায়। জুম চাষের ক্ষেত্রে এখনো মগ সমাজের একটা নিয়ম মানতে হয়। সেটা হল - যদি কোন পরিবার জুম চাষের ভূমি বাছাই করার পর প্রথমে কিছুটা জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করে সুস্থ মনে পূজা - অর্চনার পর ঐ দিন রাতে ঘুমের মধ্যে কোন অনভিপ্রেত স্বপ্ন দেখেন তাহলে ঐ জায়গা থেকে তাকে সরে গিয়ে অন্য কোন নতুন জায়গার সন্ধান করতে হয় এবং পুনর্বার একই নিয়ম মানতে হয়। আর যদি কোন খারাপ স্বপ্ন না দেখেন তাহলে ঐ পরিবারের ঐ বাছাই করা জায়গায় জুম চাষ করতে কোন বাঁধা নেই।

মগ ভেষজ ঔষধের প্রদর্শনী

অতীতে মগ জনজাতিরা জুম চাষের (Shifting cultivation) উপরই নির্ভর ছিল। এর প্রমাণ হিসাবে এই সমাজে কর্ম সংস্কৃতি, গীতি কথা ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু কালক্রমে এই জুম চাষ অ-লাভ জনক দেখা দেওয়ায় এই চাষ পদ্ধতি থেকে ওবা সমতল চাষের দিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। কারণ হিসাবে জুম চাষের জমির উপর অত্যধিক চাপের কথায় অনেক অর্থনৈতিকবিদ্ আলোকপাত করেছেন। সাধারণত একটি নির্দিষ্ট জায়গায় জুম চাষের পর আবার ঐ জায়গায় পুনর্বার চাষের উপযুক্ত হওয়ার জন্য অন্তত ১২ (বার) থেকে ১৫ (পনের) বৎসর সময় লাগে। সুতরাং ঐ নির্দিষ্ট জায়গার এই (time circle) বা সময় চক্রটি পাবার জন্য ঘুরে অন্য জায়গাগুলিতে জুম চাষ করে যেতে হয় যতক্ষণ না পূর্বের জুম চাষের জায়গাগুলিতে পুনর্বার জুম চাষের উপযুক্ততা আসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে, পরিবারে সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে ঐ সব জুম জমির উপর চাপ বাড়তে থাকে এবং সেই সব জুম চাষ থেকে কৃষকদের উৎপাদন তেমন পাওয়া যাচ্ছে না।

মগ জনজাতি অন্যান্য উপজাতিদের মতনই সহজ সরল জীবন যাপন করেন। তাই তারা চাষের পদ্ধতি ও সহজ সরল হিসাবে জুম চাষকেই বেছে নিয়েছিল। জুম চাষ হচ্ছে পৃথিবীর যে কোন চাষ পদ্ধতি থেকে খুবই সহজ পদ্ধতির চাষ। জুম চাষের জন্য মাটির কোন কর্ষণের দরকার পড়ে না। তেমনি কোন জৈব বা অজৈব সারেরও প্রয়োগের দরকার হয় না। জঙ্গল সাফাই করে, আগুন লাগিয়ে টিলা জমিন পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার বীজ গুলি টাক্কাল দিয়ে

সমান্য কোপ বসিয়ে বপন করলেই হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আগাছা পরিষ্কার এবং বন্য জন্তুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য পাহারার ব্যবস্থা যদি ঠিক সময়ে করা যায় তাহলেই বছরের খোরাক ঐ জুম চাষ থেকে একটি পরিবার পেয়ে যায়। শুধু ধান কেন, এই জুম থেকে একটি পরিবারের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত কিছুই উৎপাদিত হয়। যেমন তিল, কার্পাস, জুমের মুলা, শশা, কুমড়া, ধনীয়া, পাট বিভিন্ন প্রকারের ফল ইত্যাদি। এই জুম চাষের অভিজ্ঞতা থেকেই মগ সমাজে প্রচলিত একটি বাক্য প্রায়ই শোনা যায় যে, "জুম চাষীদের জুমের মরসুমে একমাত্র লবণ ছাড়া বাজার থেকে অন্য কোন কিছুই দরকার পড়ে না।"

অনেক পরিবার আবার জুম চাষের জন্য কেটে ফেলা শুকনো গাছ পালা ও সংগ্রহ করে রাখে যাতে করে বর্ষার সময়ে রান্নার জন্য সেগুলি কাজে লাগানো যায়।

এই জুম চাষের পদ্ধতি এবং এর নিয়মগুলি যদি লক্ষ্য করি তাহলে মগ সমাজে আদি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপরটা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, জুম কাটার সময়, ফসল লাগানোর সময় এবং ফসল তোলার সময়ে তাদের একে অপরের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার নিয়ম আছে। সেখানে কেউ যদি পিছিয়ে যায় তাকে সাহায্যের জন্য অন্যরাও হাত বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের গান যাকে মগ ভাষায় ব্যাসা, কাপ্যা, লাঙ্গা ইত্যাদি এই জুম চাষের সময়েই আদি কালে বেশী করে চর্চা হত বলে অনেক বয়স্ক লোকেদের বক্তব্য থেকে শোনা যায়।

পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জুম চাষে অধিক চাপ পড়ার ফলে সমতল কৃষির উপর মগ জনজাতি নির্ভর হতে বাধ্য হয়। কিন্তু সমতল ভূমির অপ্রতুলতা, এবং আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে অজ্ঞতার জন্য সমতল কৃষিতে জনগোষ্ঠীর লোকেরা তেমন এগোতে পারে নি। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া বা সাব্রুম মহকুমার অনেক বড় বড় ভূস্বামীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসাবে চাষ পদ্ধতির অনভিজ্ঞতারই প্রধান লক্ষণ। তাছাড়া মগ জনগোষ্ঠীর লোকেদের সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত উচুঁ জায়গায় বসবাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটা তাদের অভ্যাসগত কারণ ও হতে পারে। তাই তাদের চাষযোগ্য জমি গুলিও তুলনামূলক ভাবে উচুঁ জায়গায় হওয়ার জন্য ঐ সব জমিতে জল সেচের বড় সমস্যা দেখা যায়। কৃষি নির্ভর এই জনগোষ্ঠী স্বাভাবিক ভাবেই ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সফল হতে পারছে না, এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে সহজ সরল জীবন জীবিকার জন্য এই জনগোষ্ঠী লোকেদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং চাকরি বাকরির ক্ষেত্রেও তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এই সমস্যার জন্য মূলতঃ মগ জনজাতিদের আদি কাল থেকে তাদের সহজ সরল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দায়ী বলে অনেকে অনুমান করছেন। এছাড়া, পূর্বে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামন্ত প্রভুদের হাতে কুক্ষীগত ছিল। এর ফলে সমাজের সাধারণ লোকেদের মধ্যে তেমন গঠনমূলক প্রতিযোগিতা ছিল না। পরিনাম স্বরূপ কি শিক্ষার ক্ষেত্রে, কি ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠীদের মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। তবে বর্তমানে সরকারের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য নবপ্রজন্মদের মধ্যে এই করুণ আস্থা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত আনুমানিক এই জনগোষ্ঠীর প্রায় ২ (দুই) শতাংশ লোক সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত আছে। যদিও অনুপাতিক

হারে এই সংখ্যাটা খুবই নগণ্য বলা চলে।

অন্যান্য উপজাতিদের মতই মগ সমাজেও কুটির শিল্পের, বিশেষ করে বাঁশ বেতের তৈরীর উন্নয়ন এবং প্রয়োগ খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকালে এমনও নিয়ম প্রচলিত ছিল যে কোন ছেলে যদি বাঁশ বেতের কাজের পারদর্শী না হলে তার কপালে ভালো পাত্রী পাওয়া কঠিন ব্যপারর হত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে বাঁশ বেতের কাজের কদর কতখানি ছিল এবং এই যোগ্যতার কদর কতখানি ছিল এবং এই যোগ্যতার উপর একজন পুরুষ মানুষের কার্যক্ষমতা যাচাই হত। ম্যোজাং, খমক, পরইং, তং, কখ্যা, পোক্ ইত্যাদি বাড়ীর প্রয়োজনে তৈরী হয়।

মগ পরিবারে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

মগ সমাজে তাঁত শিল্পেব উপর মহিলাদের অগ্রাধিকাব বেশী। আদি কালে যখন মগ জন জাতিবা জুম চাষের উপর নির্ভর ছিল তখন জুমেব কার্পাস দিয়েই সমস্ত ধরনের পরিধেয় কাপড় চোপড় বুনা হত। সাধারণ মানুষের কাপড় শুধু নয় — ভান্তে বা বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য পবিধেয় কাপড়ও হস্ত তাঁত দিয়েই তৈরী হত। এই ধারা প্রায় আধুনিক মিল কাপড়ের প্রচলনেব আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল। সে দিক দিয়ে তাঁত শিল্প মগ জনগোষ্ঠীদেব মধ্যে একটি অভিন্ন ঐতিহ্য। গ্রামে গঞ্জে এখনো মগ বমণীদেব কাছে এই তাঁত বুনা একটি স্বাধীকারের অঙ্গ। কোন মহিলা কতটুকু নকসা দিযে কাপড় বুনবে তার খ্যাতি ততটুকু বেশী। এক্ষেত্রেও ছেলেদের বাঁশ বেতের কাজের মতনই, তাঁত বুনার দক্ষতার উপর কোন উপযুক্ত মেয়ের ভাল বর পাবার সম্ভাবনা তত বেশী। আধুনিক রেডিমেড কাপড় প্রচলনের আগে পরিবারের প্রায় সমস্ত প্রকারের বস্ত্র মগ রমণীদের তৈরী করতে হত। একই ধারাবাহিকতা হিসাবে এখনো গ্রাম পাহাড়ে নিজেদের কাপড়, বিশেষ করে বিছানার কাপড়, গাযের চাদর বুনানো হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত তাঁতের কাপড় গুণগত মানের দিক দিয়ে ভাল হলেও বাজারজাত করণের ব্যবস্থা এখনো হয় নি। তাঁত বিষয়ে পারদর্শী মহিলাদের সাথে আলোচনাকালে এর কারণ হিসাবে প্রাচীন পদ্ধতিতে সময় তথা মজুরী খুবই বেশী। এতে প্রতিটি কাজের উৎপাদনের খরচ খুব বেশী হয় এবং পাশাপাশি মিলের কাপড়ের দামেব সাথে বড় পার্থক্য দেখা দেয়। স্বাভাবিক ভাবে হস্ত চালিত কাপড়ের গুণগত মান থাকলেও দাম বেশী হওয়ায় ক্রেতাদের উৎসাহ থাকে না। তথ্য অনুযায়ী, সরকারের পক্ষ থেকে মগ জনজাতিদের তাঁত শিল্পের উন্নতি করণের জন্য প্রচেষ্টা নিচ্ছে। তা সত্ত্বেও তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরণ না করতে পারলে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এই শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয় বলে গ্রামীণ মগ তাঁত

শিল্পীদের অভিমত।

১০। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের আচারানুষ্ঠান

গ্রামীণ চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী সন্তান সম্ভবা মগ রমণীদের দেখভালের জন্য সাধারণত গ্রামেরই কোন পারদর্শী মহিলাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই পারদর্শী মহিলারা "ছারামা"(দায়) নামে পরিচিত। তিনিই খোঁজ খবর, ঔষধপত্র এবং পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই অনেক ছারামা ভেষজ ঔষধ প্রয়োগেও ওস্তাদ হন। আবার অনেক পরিবার মায়ের স্বাস্থ্য এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য তাবিজ ধারণ করতে দেখা যায়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নবজাতকের নাড়ী ছেদন, দেখা শোনা এবং মা যতক্ষণ পর্যন্ত না সুস্থ হয় ততক্ষণ ছারামারাই দেখভালের দায়িত্বে থাকেন।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল প্রসব যন্ত্রণা দেখা দিলেই মগ জনজাতিদের সন্তান সম্ভবা মায়ের জন্য একটি পৃথক অস্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করা হয় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার তিনদিন পর ঐ অস্থায়ী ঘরের উনুন পরিষ্কার করতে হয়। এর পরও মাও সন্তানকে সেই অস্থায়ী ঘরে একমাস ব্যাপী আলাদা ভাবে থাকতে হয়। সেই সময়ে মায়ের জন্য আলাদা চুলার ব্যবস্থা, আলাদা রান্নার ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত খাদ্য তালিকা ছাড়া অন্যান্য খাবারের বারণ থাকে। ছারামাদের বক্তব্য অনুযায়ী নব জাতকের শরীরের কথা মাথায় রেখে কিছু কিছু খাদ্যের উপর নিষেধ রাখা হয়। এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর, বিত্তবানদের ঘরে আচার অনুষ্ঠানের পর মা ও সন্তান কে মূল ঘরে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়। তবে বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার যুগে এই সমস্ত আচার বিচার অনেকাংশেই আর দেখা যায় না।

মগ জনজাতিদের মৃত দেহ সৎকার হিন্দুদের মতনই শ্মশানে নিয়ে পুড়ানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুদের থেকে বা অন্যান্য উপজাতিদের থেকে আলাদা। মৃত্যুর পর মরাদেহ ঘরেই রাখা হয় যতক্ষণ না আত্নীয় স্বজনেরা আসে। সাধারণত দুপুরের পরেই মৃতদেহ সৎকারের নিয়ম প্রচলিত আছে। মৃত দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুদৃশ্য বাক্স তৈরী করার রীতি আছে এবং গ্রামের লোকজন সহ আত্মীয় স্বজন সবাই মিলে সৎকারের জন্য যায়। শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে মৃতদেহ ভাল করে স্নান করানো হয় এবং নতুন জামা কাপড়, পাগড়ী পারানোর নিয়ম আছে। মৃত দেহের পাশে ভাত তরকারী সহ মাটির পাত্রে ভোগ দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে মগ সমাজে এক বিশ্বাস কাজ করে সেটা হল প্রাণ বা আত্মা দেহ থেকে ছেড়ে গেলেও যতক্ষণ না মৃত দেহ সৎকার হয়, ততক্ষণ সেই আত্মা ঘরেই থাকে। সুতরাং এই আত্মার উদ্দেশ্যে ভাত বা ভোগ উৎসর্গ করে দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে বিত্তবান পরিবারের লোকজন মারা গেলে রথ বানিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ও রীতি ছিল। এইসব ব্যপার ব্যয় বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। তাই আজকাল এই নিয়ম আর দেখা যায় না। অবশ্য রথ বানানোর নিয়ম ভান্তে বা ধর্মীয় ঠাকুরদের ক্ষেত্রে এখনো প্রচলিত আছে।

এই সমস্ত নিয়ম রীতি সম্পাদনের জন্য সময়ের দরকার এবং দূর দূরান্ত থেকে আত্নীয় স্বজনেরা যাতে উপস্থিত থাকতে পারে তারজন্য মৃত্যুর দিনেই সৎকার করা সম্ভব হয় না। তাই রাত্রে শবদেহ ঘরে রেখে ঢোল বাজানো হয়। এই ঢোল বাজানোর নিয়ম আদিকাল থেকেই প্রথা হিসাবে চলে আসছে। কথিত আছে যে আদি কালে মৃতদেহ ঘরে রাখা যেত না বিশালাকার উট

পাখীর উপদ্রবের কারণে। তাই গ্রামের লোকজনদের ঢোল বাজিয়ে পাহারা দিয়ে রাখতে হত এবং এই রীতি এখনো চলছে। এছাড়া ঢোল বাজানোর অন্য একটি কারণ হল এতে দূরের লোকজন জানতে পারে এবং মৃতদেহ সৎকারের জন্য সহজেই খবর পাওয়া যায়। এর সাথে 'সিসিজাকে' অর্থাৎ বই পড়ারও অন্য একটি নিয়ম আছে। বইটি গ্রামের মন্দিরেই রাখার নিয়ম আছে। সমাজের লোকজন এই বইটি সাধারণতঃ মানুষজন মরার সময়েই পড়া হয়। সকালে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার অগে এক দলকে লাকড়ী যোগাড়ের জন্য পাঠানো হয়। মরদেহ বাড়ী থেকে বের করার আগে আত্মীয়স্বজন প্রণাম করে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। তারপর দুপুরের পর লোকজন জড়ো হলে ভান্তে নিমন্ত্রণ করে সূত্র পাঠ শেষ হলে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। উল্লেখ্য, শ্মশানে নেওয়ার জন্য মগেদের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ রাখার একটি কফিনের মতন বাক্স বানানো হয় এবং এই বক্সটিকে সুন্দর রঙীন কাগজ দিয়ে মোড়ানো হয়। এখানে যদি কোন অবিবাহিত ব্যক্তি মারা যায় তাহলে মৃতদেহের সাথে একটি কলাগাছ বেঁধে দেওয়ার নিয়ম আছে। শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় পথে যদি নদী বা ছড়া পড়ে তাহলে এই নদীতে পয়সা ছুঁড়ে ফেলারও নিয়ম আছে। এখানে খ্যংস্যাং বা গঙ্গাকে পারা পারের ভাড়া হিসেবে দেওয়া হয়। সবাই মিলে যখন শ্মশানে রওনা হয় তখন একটা মিছিলের পতন দেখা যায়। সেখানে পৌঁছে আবার সবাই মিলে পঞ্চশীল গ্রহণ এবং যে যার সাধ্য মতন ভান্তেদেরকে দান করা হয়। মৃতদেহ পুড়ানোর জন্য পুরুষের জন্য তিন স্তর এবং স্ত্রীলোকের জন্য চার স্তর লাকড়ীর ব্যবস্থা করতে হয়। ঐ চিতার পাশে "স্রাং মোং দং" নামে একটি বাঁশের তৈরী তৃকোনাকৃতি স্তম্ভ পুতানো হয় এবং একটি 'তাংখোওয়েং' অর্থাৎ পতাকার মতন লম্বা কাপড় বাঁশে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

সৎকারের দিন মৃত ব্যক্তির মঙ্গল কামনায় ছেলে অথবা নিকট আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ 'শ্রমন' হওয়ার নিয়ম আছে, যে শ্রমন হবে তাকে সাতদিন পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রাদ্ধ দিন পর্যন্ত মন্দিরে থাকতে হয়।

কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে তাহলে তাকে চুল ছেড়ে দিয়ে মাথায় জল দিয়ে গাছের পাতার সাক্ষী রেখে সেই শ্মশানেই বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেয়। তারপর চিতায় আগুন লাগানোর প্রথম কর্তব্য হল জ্যাষ্ঠ পুত্র বা মৃতব্যক্তির নিকট আত্মীয়স্বজনের। চিতায় আগুন লাগিয়ে নদীতে বা পুকুরে স্নান শেষে যে যার বাড়ীতে চলে যায়। গ্রামের বাড়ীতে আবার অনেকে ঐ মরার বাড়ীতে পাহারাও দেয়।

পরদিন খুব ভোর বেলায় নিকট আত্মীয়স্বজনেরা চিতাভস্ম নীরিক্ষণের জন্য শ্মশানে যায়। এখানে মগ সমাজে আলাদা এক বিশ্বাসের লক্ষণ দেখা যায়। সেটা হল চিতাভস্ম বা ছালির দাগ দেখে বলা যায় যে মৃত ব্যক্তির আত্মা কি অবস্থায় আছে। চিতাভস্মের উপর যদি দেখা যায় লাঠির দাগ, তাহলে বলা হয় সেই ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে। যদি দেখা যায় মানুষের পায়ের ছাপ, তাহলে বলা হয় তার আত্মা এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে ফিরে আসবে এবং যদি কোন জীবজন্তুর পায়ের ছাপ থাকে তাহলে ধারণা করা হয় ঐ ব্যক্তির আত্মা জীবজন্তু হয়েই জন্ম নেবে। এই চিহ্ন বা ছাপের তাৎপর্য হিসাবে এই মৃত ব্যক্তির কর্মফল যাচাই করা হয় বলে বয়স্ক ব্যক্তিদের বক্তব্য।

যাই হোক, সাতদিন পর আবার মন্দিরের ঠাকুরদেরকে নিমন্ত্রণ করে শ্রাদ্ধখাওয়ানের পর

মৃত ব্যক্তির কাজ শেষ হয়। অনেকে আবার বার্ষিক শ্রাদ্ধও করে থাকেন। শ্রাদ্ধের দিন ঠাকুরদেরকে কিছু নির্দিষ্ট জিনিস দান করতে হয়। যেমন ছাতি, জুতা ইত্যাদি। মগ সমাজে এই নীতি সব ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যদি কোন শিশু মারা যায় সেক্ষেত্রে এই নিয়ম পালন হয় না। আবার কোন অপমৃত্যুর ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয় না। বরং এই সব ক্ষেত্রে মাটির গর্তে চাপা দিয়েই সৎকার শেষকরে দেওয়া হয়। কিন্তু আবার যদি কেউ অমাবস্যার দিন মারা যায় তাহলে সৎকার ঐ একই দিনে শেষ করে ফেলতে হয়। মগ সমাজে মৃত ব্যক্তি সৎকারের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উদাহরণগুলি ব্যতিক্রমী।

১১) মগ জনগোষ্ঠীর বিবাহ পদ্ধতি ঃ-

মগ জনজাতিদের কাছে বিয়ে মূলত একটি সামাজিক উৎসব এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। এই জনজাতিদের বিয়ের ব্যবস্থা তিন ধরনের হতে পারে।

প্রথমত ঃ দুই পক্ষের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে।

দ্বিতীয় ঃ পছন্দের মেয়েকে জোরপূর্বক নিয়ে।

তৃতীয় ঃ পছন্দের ছেলেকে ঘর জামাই করে রেখে দিয়ে।

দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি অধুনিক অইনের পরিপন্থী এবং সমাজের অস্থিরতা সৃষ্টি কারব ও হতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা থেকে এখন বিরত থাকছে।

প্রথম ব্যবস্থা অর্থাৎ সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থা যদি হয় তাহলে ছেলের পক্ষের দায়িত্ব খুব বেশী। সেখানে মেয়ের জন্য গয়না থেকে আরম্ভ করে যাবতীয় কাপড় প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি বর পক্ষকেই ব্যবস্থা করে দিতে হয়। এতে ছেলে পক্ষের মান সম্মানের আলাদা ব্যাপার জড়িত আছে। এমন কি ছেলে পক্ষ থেকে শাশুড়িকে সাম্মানিক হিসাবে টাকা পয়সাও দিতে হয়। এই ব্যবস্থাটি 'দুধের খরচ' নামে পরিচিত। অন্যদিকে কোন ছেলে যদি পছন্দের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায় তাহলে ছেলের পরিবারের অভিভাবকের দায়িত্ব হল মেয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের অভিভাবকদের কাছে এর দায় স্বীকার করা। অনেক সময় মেয়ের মা 'দাফা' ধার্য্য করে দেয় অর্থাৎ আর্থিক দাবী পেশ করা হয় অন্যায়ভাবে মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর সমাজের বয়স্কদের উপস্থিতিতে অনেক সময় দাবীর পরিমাণ কম বেশী টাকার একটা অংক ধার্য্য

বিয়ের আসরে মগ নব দম্পতি

করে দেওয়া হয়। এখানে ছেলের অভিভাবক অবশ্যই এই দাফার পরিমাণ মেয়ের অভিভাবকের বিশেষ করে, মেয়ের মার কাছে জমা দিতে হয়। আগের এই নিয়মের কারণে হয়ত মগ সমাজে পণপ্রথা এখনো প্রচ্ছন্নভাবে দেখা দেয়নি। যদিও সমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের দেখা দেখি এর প্রভাব যে পরছে না তা বাল কঠিন।

মগ দম্পতি

সাধারণত বর পক্ষই কন্যা পক্ষের ঘরে গিয়ে পাত্রী চয়ন করেন। এই পর্যায়ে কিছু লৌকিক আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। সমাজের বয়স্ক ব্যক্তিগণ ছেলেমেয়ের বিয়ের প্রস্তাব তাদের জন্মবার যাচাই করে পাকাপাকি করা হয়। তারপর বরপক্ষের মেয়ে যদি পছন্দ হয় তাহলে আংটি পরিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করে দেয়। মগদের মধ্যে কোন নিকট আত্মীয়-স্বজনের সাথে বিয়ে হয় না। অনেক সময় মামতো ভাইবোন, কাকাতো ভাই বোনের সাথেও বিয়ের প্রস্তাব রাখা হয় না। প্রাচীন কালে বিযের প্রস্তাব অনুষ্ঠানে মদ খাওয়ার রীতি প্রচলন ছিল। বৌদ্ধধর্ম মতে সুরাপান নিষিদ্ধ কিন্তু বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রারম্ভ থেকেই মদের বোতল উপঢৌকন হিসাবে দেওয়ার রীতি আছে। এই নিয়মটি প্রাকবৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠানের প্রতিফলন বলা যায়।

বিয়ের আসর মগ সমাজে ছেলের বাড়িতেই হয়। লগ্ন অনুযায়ী কনেকে ববের বাড়িতে আনার ব্যবস্থা হয়। কনেকে নিয়ে আসার সময় যুবক-যুবতীদের সঙ্গে খুব আনন্দ ফুর্তি হয় এবং বারে বারে ই-হো-হো, ই-হো-হো উচ্চারণে আনন্দের বহি:প্রকাশ করে থাকে। কনেকে নিয়ে আসার পথে বাজনা সহ বাজিপুড়ানো হয়। রাস্তায় আবার যুবক যুবতীরা রাস্তা বন্ধ করে রাখে ছেলে বা বর পক্ষ থেকে টাকা অদায় করার লক্ষে। একে মগ ভাষায় "লেং খাছি" নামে খ্যাত। বিয়ের দিন বিন্নি চাল রান্না করে খাওয়ানো খুব মঙ্গলের কাজ বলে মানা হয় এবং সবাই মিলে এই বিন্নি ভাত খাওয়াও হয়।

বর কনেকে সকালে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে বিয়ের আসরে বসানো হয়। ছেলেদেব ধুতি কামিজ এবং মেয়েদের পাছড়া ব্লাউজ পরানো হয়। পূর্বে নিমন্ত্রণ অনুযায়ী পুরোহিত এবং ভান্তে উপস্থিত হয়ে "লাথে পোওয়ে" বা বিয়ের কাজ শুরু হয়। পুরোহিত বর কনের কনিষ্ঠ অঙ্গুল স্পর্শ করিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। তারপর, থালায় ভাতসহ দুটি মুরগীর মাথা রাখা হয়। তারপর বর কনের হাতের উপর হাত রেখে অবার মন্ত্র উচ্চারণ করার পর মুরগীর মাথা দুটির জিহ্বা বের করে বর কনের ভবিষ্যৎ বিচার করা হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ একটি অবশ্য কর্তব্য।

তারপর পুরোহিত বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে দিলে আসরে উপস্থিত বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে হয়। তারপর বিয়ের আড়াই দিন পর নব দম্পতিকে শ্বশুর বাড়িতে অর্থাৎ মেয়ের মা-বাবার কাছে যেতে হয়। এই সময় সাথে সঙ্গী হিসাবে ছেলের অর্থাৎ বরের কোন ছোট ভাইকে (মামাতো, কাকাতো) সঙ্গে নিয়ে যায়। সাথে আত্মীয়-স্বজনের জন্য মিষ্টি, নারিকেল ইত্যাদি নিয়ে যেতে হয়। তারপর দুই তিন দিন থাকার পর আবার নিজের বাড়িতে ফিরে আসে।

অন্য জনজাতিদের সাথে বিবাহের বিষয়টি আগে নিষেধ ছিল। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ছোয়ায় এই বাধা থেকে অনেকটা সরে আসতে দেখা যায়। মূলত ত্রিপুরার মিশ্র জনজাতিদের সাথে পাশাপাশি বসবাসের কারণে এই প্রথা থেকে দূরে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। অন্য জনজাতিদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে রক্ষণশীল বা বয়স্কদের অপত্তি থাকলেও নব প্রজন্মের কাছে সেটা আর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। সেদিক দিয়ে মগ জনজাতিরা রক্ষণশীলতার উর্দ্ধে এবং অন্যান্য জনজাতিদের সাথে সমান তালে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

১২) জণগোষ্ঠীর মধ্যে ঘর জামায় প্রথা

ঘর জামাই প্রথা মগ সমাজে আদি কাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত প্রজন্মদের কাছে এই প্রথাকে তেমন গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করছে না। এখানে কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন এবং আত্ম মর্যাদাবোধ প্রাধান্য পাচ্ছে। তবে গ্রাম পাহাড়ে অর্থনৈতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া লোকেদের মধ্যে এই প্রথা এখনো প্রচলিত আছে। মগ সমাজে ঘর জামাই হলেও বিয়ের পর বরকনে তাদের ইচ্ছে মতন কনের বাড়িতে থাকতে পারে অথবা পৃথক ঘর বানিয়ে অলাদা সংসার শুরু করতে পারে। পরিবারে ছেলেদের মতন মেয়েরাও বাবা মায়ের সম্পত্তির অংশ পাওয়ার অধিকারী। সেদিক দিয়ে বৌ-এর সম্পত্তির অংশ জামাই ভোগ করতে পারে এবং সমাজ এই ব্যাপারে কোন প্রশ্নও তোলে না।

নিজেদের পোষাকে মগ যুবাদ্বয়

এই প্রথায় বিবাহের সম্মতি যদি কোন ছেলের থাকে তাহলে মেয়ে পক্ষের সাথে আলোচনা করে দিনক্ষণ স্থির করা হয়। এক্ষেত্রেও ছেলে-মেয়ের জন্মবারের মিল বা অমিল যাচাই হয়। যদি মিলে যায় তাহলে বিয়ের দিনক্ষণ স্থির করা হয়। এখানে ছেলেকে মেয়ের বাড়িতে আসতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে পোশাক পরিয়ে গ্রামের অন্যান্য লোকজনদের নিয়ে ছেলের মাথার উপর ছাতা ধারণ করিয়ে— ই-হো-হো, ই-হো-হো, ধ্বনি তুলে মেয়ের বাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। তারপর বৌদ্ধ

ভিক্ষু বা ঠাকুরের সম্মুখে স্তত্র পাঠ, পঞ্চশীল শুনার পর বিয়ের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ঘরের মালিক বা মেয়ের বাবা যদি সদিচ্ছা থাকে তাহলে ভোজের অয়োজন করে থাকেন। এই প্রথায় ছেলে পক্ষের কোন খরচা পড়েনা বললেই হয়।

১৩) প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ও বিবর্তনের দ্বারা

মগ জনজাতিদের প্রাচীন সামাজিক কাঠামো এলাকার মুরব্বি, চৌধুরী বা জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। এদের হাতেই ছিল এলাকার শাসন ক্ষমতার অধিকার। কৃষি জমির সিংহভাগ অংশই তাদের দখলে থাকত। বলা যায় গ্রাম্য অর্থনীতি এইসব শ্রেণী লোকেদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হত। ত্রিপুরায় রাজার শাসন কালে এলাকা ভিত্তিক চৌধুরী নিয়োগের প্রথা ছিল। মগজাতিদের চৌধুরীর সংখ্যা বিভিন্ন মহকুমার নেহাৎ কম ছিল না। সাব্রুম, বিলোনীয়া, তেলিয়ামুড়া মহকুমাগুলিতে এর অস্তিত্ব এখনো পাওয়া যায়। সমাজে কিছু সংখ্যক লোকের কাছেই সম্পত্তির বড় অংশ কুক্ষিগত থাকার কারণে অর্থাৎ অসামঞ্জস্য অর্থনীতির জন্যও মগ সমাজ পিছিয়ে পড়ার বড় কারণ।

ত্রিপুরা ভারতভুক্তির পর এই ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে সরে অসতে দেখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমেরে ফলে গ্রামে গ্রামে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা অধিকতর প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে। জানা গেছে, প্রথম দিকে এই ব্যাপারে মগ জনজাতিদের মধ্যে অপত্তি ছিল। কিন্তু পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন যাবৎ চলে অসা জমিদারী প্রথা থেকে সরে অসে।

১৪) জনজাতির ধর্ম ও ধর্মীয় বিভাজন

ঐতিহাসিকদের মতানুসারে মগজনজাতিদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মীয় প্রচারের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল। এর আগে এই জনজাতিদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রাকৃতিক পূজা। এর প্রমাণ হিসাবে সমাজে প্রচলিত বৌদ্ধ পূজা ছাড়াও অন্যান্য পূজার্চনাকে তুলে ধরেছেন। যেমন গঙ্গাপূজা করা, গ্রাম পূজা (পচু পূজা), পৃথ পূজা ইত্যাদি তান্ত্রিক প্রথায় পূজার্চনা বৌদ্ধ ধর্মে পরিপন্থী জানা সত্ত্বেও সমাজে এইসব পূজা পার্বন এখনো প্রচলিত আছে। এইসব লৌকিক আচার আচরণ থেকে অনেকে অনুমান করছেন যে মগ জনজাতিদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আনুগত্যতা বেশী দিনের নয়। অরাকানের ইতিহাস "রাজওয়াং" সূত্র থেকেও জানা যায় যে ১৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মগধে চন্দ্রসূর্য নামক জড়োপাসক আরাকান আক্রমণ করেন এবং তিনিই প্রথম বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন।

মগেরা খুব বেশী রক্ষণশীল জনজাতি নয়। অন্যান্য ধর্মের লোকেদের উৎসব অনন্দে এরা প্রায়সময় অংশ গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তকরণের প্রবণতা মগেদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়। এই কম প্রবণতার কারণ হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মের সহজ সরল নিয়ম-কানুনের সুফল হিসাবে অনেকে অনুমান করছে।

বৌদ্ধ ধর্মের যে মূল দুই ভাগ (১) হীনযান বা থেরাওয়াদা এবং (২) মহাজান থাকলেও মগ সমাজের লোকেরা সবাই থেরাওয়াদা বা হীনযানে বিশ্বাসী। বিভিন্ন মগ গোষ্ঠীর লোকেরাই থেরাওয়াদা ধ্যান ধারণায়-বিশ্বাসী।

১৫) লৌকিক দেবদেবী পূজাপদ্ধতি ও প্রভাব

উপরের আলোচনা অনুযায়ী মগজনজাতিগণ বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাসী হলেও অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস দেখা যায়। যেমন— ধনের দেবী লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি দেব দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। এই দেব দেবীদের মগ [illegible] মগেরা 'অবংমা' হিসাবে জানেন। ইন্দ্রকে 'স্‌গ্রা মাং' হিসাবে নামাকরণ করা হয়েছে। এছাড়া মগ সমাজে 'ক্রোজংনে্' নামে অন্য এক দেবতার পূজা হয় এবং এদের বিশ্বাস প্রত্যেক মানুষের শরীরকে রক্ষার জন্য এই দেবতার প্রধান কাজ। তাই অনেক মগ বাড়িতেই সকাল বিকাল এই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। আবার নতুন বছরের শুরুতেও "গ্রাম রক্ষাকারী দেবতার" উদ্দেশ্যেও গ্রামের সব অংশের মানুষ একসাথে বিশেষ করে সন্ধ্যার সময় পূজা দেওযা হয। মগেদের এই পূজা অনেকটা ত্রিপুরীদের কের পূজার সাথে মিল পাওয়া যায়।

তবে, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে এই সব দেবদেবীর পূজা অত্যন্ত আপত্তিজনক। এদের মতে এই লৌকিক পূজার্চনা বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী। এই লৌকিক পূজার্চনা বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজে বৌদ্ধ পূজার পাশাপাশি এইসব দেবদেবীর পূজা পার্বণ অনেকেই করছেন এবং এর ধারা এখনো চলছে।

আবার অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের পূজা পার্বণের রীতি আছে। আদি কালে "রিংনানে্" নামক অপদেবতার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য পূজা হত। 'চেছিনে' নামে অন্য এক অপ-দেবতা, যাকে সে ভর করবে সে ব্যক্তি প্রলাপ বক্‌তে থাকে। এছাড়াও, 'মাদ্‌রা', 'আফেংজা' চুং প্রভৃতি অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পূজা যেমন করা হয় তেমনি আবার হাতে বা কোমরে তাবিজ লাগানো হয়। এই সব কাজকর্মের পারদর্শী হিসাবে বৈদ্য বা ওঝা ডাকা হয়। এই বৈদ্যরাই পারিশ্রমিক বিনিময়ে পূজা বা তাবিজ বানিয়ে দেয়। অজকাল শিক্ষিত মগ সমাজ এই সব অন্ধবিশ্বাসের দিকে না ঝুঁকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়ার প্রবণতা বেশী।

১৬) মগদের পরম্পরাগত উৎসব ও নৃত্যগীতি

মগজনজাতি উৎসব, ধর্মীয় পালা পার্বনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরম্পরাগত উৎসব গুলির মধ্যে সাংগ্রেং, ওয়াছো, ওয়াগে, চীবরদান, থমংথং, বৌদ্ধ জয়ন্তি ইত্যাদি পালিত

হয়। এই সব উৎসব সমুহ মগ সমাজের ধারক ও বাহক বলা চলে উৎসবগুলি পালনের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেননা ওয়াছো পালন হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাস শুরুতে এবং ওয়াগে উৎসব পালন হয় ভিক্ষুদের বর্ষাবাস শেষ দিনটিতে। তেমনি সাংগ্রেং পালিত হয় বছরের শেষ দিনে। সাংগ্রেং আবার তিন দিন যাবৎ পালন করা হয়। সেগুলি হল প্রথমদিন- সাংগ্রেং, দ্বিতীয় দিন— আকে এবং তৃতীয়দিন- আতাদা/অচাদা। এই তিন দিন আবার এক এক দিন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দিন- অর্থাৎ সাংগ্রেং দিনে সকাল বেলা থেকেই বাড়িতে বাড়িতে পায়েস, মিষ্টি রান্না হয়। মন্দিরে ফুল উৎসর্গ, মোমবাতি বা তেলের বাতি জ্বালানো হয়। প্রায় সব বাড়ি থেকে মন্দিরের জন্য "ছোয়েং" বা ভোগ প্রদান করা হয়। দুপুরে অহারের পর মন্দিরে গিয়ে বৌদ্ধ মূর্তিকে চন্দনের জল, ভাল পারফিউম সহ স্নান করানো হয়। সাথে আবার বয়স্কদের এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও স্নানের ব্যবস্থাও করা হয়। সন্ধ্যায় সবাই মিলে পঞ্চশীল গ্রহণ এবং মোমবাতি প্রজ্জ্বলন হয়। কোথাও আবার সামর্থ অনুযায়ী আকাশ বাতি বা ফানুষ বাতি উড়ানু হয়। এই ধর্মীয় নিযমগুলি ওয়া উৎসবেও করা হয়।

মগ সমাজে বহু চক্রের বা ভব চক্রের চিত্র।

সাংগ্রেং-এব দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ আকে দিনটি মূলত তরিতবকারী সংগ্রহেব দিন হিসাবে পালন করা হয়। আবার অনেক জায়গায় খোয়াং খেলা বা গিলা খেলার আয়োজনেও হয় একই দিনটিতে। যদিও সংগ্রেং তিনদিনই খোয়াং খেলার উপযুক্ত সময়।

তৃতীয় দিন হল আতাদা বা আচাদা। এই দিন পাঁচন খাওয়া রীতি আছে। নিয়ম অনুযায়ী এই দিনে কম করে তেত্রিশটি বিভিন্ন তরকারী, শাক-সব্জি মিলিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করা। মগ সমাজে এই দিনটি আরো উল্লেখযোগ্য হল গ্রামের বা এলাকার সমস্ত পরিবার সাধ্যমত নিজেদের বাড়িতে রান্না করা তরকারী অন্যদের সাথে বদল করে নেওয়া (Exchange)। এতে যত পরিবারের সাথে বদল হবে তত বেশী তরকারীর সংখ্যা বাড়বে এবং কোন বাড়ির রান্না কেমন রান্না হল সে নিয়ে মহিলাদের মধ্যে আলোচনা পরবর্তী সময়ে শোনা যায়।

এই উৎসবগুলি ছাড়াও কঠিং বোওয়ে বা কঠিন চীবর দান, থমংথং, ছিমিংথং, পেং থং ইত্যাদি উৎসব মগদের পালন করা হয়।

নৃত্য গীতি মগজনজাতিদের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এর অনুশীলন প্রায় দেখা যায়। প্রচলিত নৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ওয়া নৃত্য, সাংগ্রেং নৃত্য, ছিমিং নৃত্য, সৈইং নৃত্য বেইং নৃত্য

ইত্যাদি। এইসব নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য।

অন্যদিকে গীতির প্রচলনও কম দেখা যায় না। উল্লেখযোগ্য গীতিগুলি নিম্নরূপ ঃ

ব্যাসা, ইএ; কাপ্যা, সাগ্রাং, তেগ্রাং ইত্যাদি। ব্যাসা গীতি প্রতিযোগিতামূলক প্রেমের গান। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে এই গান গাওয়া হয়। ইএ গীতি সাধারণত ধর্মীয় অনুষ্ঠান কল্পতরু উৎসর্গ বা দানের অনুষ্ঠানে এই গানের প্রচলন বেশী। কাপ্যা হল কোন কাব্য গ্রন্থের সুর দিয়ে শুনানোর ব্যবস্থা, সাগ্রাং গীতি হল পুরানো সংগীত বা কোন কাহিনীকে কেন্দ্র করে গাওয়া। তেগ্রাং হল আধুনিক গান যন্ত্রসহযোগে গাওয়া হয়।

অস্থায়ী মন্দিরের সামনে মগ যুবা

আবার পাংখোং, সামারোং নামেও যাত্রা গানের চর্চার কথা উল্লেখ করা যায়। এইগুলি কাহিনী নির্ভর সুরের যাত্রা গান। গ্রামে এখনো এগুলির চর্চা বহুলাংশেই দেখা যায়।

১৭) ঐতিহ্যগত খেলাধুলা ঃ-

ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগসমাজের খেলাধুলা হল— খোয়াং, কাংছি, গদো, অমংথো, এংখ্যং, আসো (কুস্তি) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খোয়াং খেলা দুটি দলে বিভিন্ন হয়ে খেলতে হয়। প্রতিটি দলে মোট পাঁচ থেকে পনের জন হতে পারে। তবে খেলার মাঠের আকার অনুযায়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি দলের দুই রাউণ্ড করে খেলার নিয়ম আছে। এই খেলার জন্য ঘাসহীন মসৃণ মাঠের প্রয়োজন। খেলাটি আদিকালে খোয়াং নামে গাছের বিচি দিয়ে খেলা হতে বলেই এই খেলাটির নাম খোয়াং নামাকরণ হয়েছে। চাকমাদের এই খেলাটি গিলা খেলা নামে পরিচিত। বর্তমানে এই গাছের বিচি সচরাচর না পাওয়ার কারণে সাইজ করা কাঠের টুকরা দিয়ে এই খেলাটি হয়। কাঠের টুকরাটি অন্তত কুড়ি ফুট দূরত্বে সাজিয়ে রাখা হয়। প্রতিটি খোয়াং বা কাঠের টুকরা ছয় ইঞ্চি দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়। একজন খেলা পরিচালক নিযুক্ত থাকেন। তার নির্দেশে যে দল প্রথম খেলবে তাদের একটি মসৃণ ধাতুর তৈরী ছোট গোলকৃতি বস্তু বা শিল দিয়ে সেই সারিবদ্ধভাবে রাখা বামদিক থেকে এক নম্বর কাঠের টুকরা বা খোয়াংকে ফেলে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে খোয়াংটি অন্ততছয় ইঞ্চি দূরত্বে সরাতে হবে। অন্যথায় হবে না। এইভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় যতজন খেলোয়াড় ততজন খেলবে। তারপর যে খেলোয়াড় তার নিজের খোয়াং ফেলতে পেরেছে তাকে বোনাস হিসাবে তার পাশের বাম বা ডান দিকের খেলোয়াড়ের খোয়াং ফেলে দেওয়ার সুযোগ পাবে। এইভাবে চলবে খেলোয়াড়দের দক্ষতা অনুযায়ী। প্রথম দলটি যদি প্রথম রাউণ্ড খেলা শেষ করতে পারে তাহলে সাথে সাথে তাদের দ্বিতীয় রাউণ্ড খেলার সুযোগ পাবে।

মগ নৃত্যের শিল্পীগণ

আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় দল প্রথম রাউণ্ড খেলার জন্য ডাক পাবে।

দ্বিতীয় রাউণ্ড খেলাও ঐ একই পদ্ধতিতে চলবে। তবে, এখানে সুবিধা হল খোয়াং যদি সামান্য

শিলের আঘাতে পরে গেলেই কোয়ালিফাই হবে। এই দ্বিতীয় রাউণ্ড যে শেষ করতে পারবে সেই দলই বিজয়ী হবে। এই খেলা যুবক ও যুবতীদের মধ্যে, এক পাড়ার যুবক ও অন্য পাড়ার যুবকদের মধ্যে, বিবাহিত দল ও অবিবাহিতদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। সাধারণত সাং গ্রেং মাসেই এই খেলাটির প্রচলন আছে। সে সময় দিনের বেলা ছাড়াও রাতে খাবারের পর আলো জ্বালিয়ে এই খেলা চলতে থাকে। প্রাচীন কালে যখন বিদ্যুৎ বা হেজাক লাইটের চালু হয়নি তখনও বাঁশের চোঙায় কেরোসিন ঢেলে আলোর ব্যবস্থা হত। সমাজের বয়স্ক লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন।

ক্যাংছি খেলাটি মগ ভাষায় কবাডি খেলার নাম। আবার খাদাক খেলাটি মগ ভাষায় রঙপা খেলার নাম। এই দুটি খেলায় মগ যুবকদের জনপ্রিয় খেলা এছাড়াও মুরগীর লড়াই খেলা যাকে মগ ভাষায় 'ক্রাকফা খোওয়ে' খেলা নামে পরিচিত। যুবকদের এটিও জনপ্রিয়। এংখ্যং খেলাটি ছোট ছোট বাঁশের টুকরো দিয়ে খোলা হয়। এই খেলাটি মূলত মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

১৮) স্মরণীয় ঘটনা ও বিপর্যয় ঃ

ত্রিপুরায় বসবাসরত বয়স্ক মগ জনজাতিদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কলেরার প্রাদুর্ভাব ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ঘটনা তাদের জানা নেই। বয়স্ক মগদের বক্তব্য অনুযায়ী ১৯৫০/৫১ সালের সাইক্লোন খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। ঐ সময়ে সাব্রুম, বিলোনীয়া সহ দক্ষিণের অনেক গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। এইগুলি আবার পুনর্নির্মাণে মগ সমাজে লোকেদের যথেষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। এছাড়া আদিকালে কলেরা প্রায় সময় লেগে থাকতে। এতে সমাজের সব অংশের মানুষ পুরো গ্রাম খালি করে অন্য গ্রামে চলে যেতে হত। যদিও এই সম্পর্কে কেউ আবার নির্দিষ্ট দিন বা বছরের উল্লেখ করতে পারছেন না।

১৯) রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের উল্লেখ ও পরিচয় ঃ-

অপেক্ষাকৃত ছোট জনগোষ্ঠীর লোকজন হলেও মগ জনজাতিদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সংযোগ স্থাপনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর থেকে মগ সমাজের লোকেদের রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের মনের স্পৃহা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই জনজাতিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

(ক) মংসাবাই মগ (১৯১১-১৯৯৬) উনি প্রথম জীবনে কলসী (বিলোনীয়া) অঞ্চলে বসবাস

করতেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে কুলাই (আমবাসা) অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৭৩ সালে কংগ্রেস পার্টি থেকে প্রার্থী হয়ে বিধানসভার সদস্য লাভ করেন। একবারই তিনি বিধানসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে উনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না এবং ১৯৯৬ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

(খ) হুরাঅং মগ-ত্রিপুরার মগ সমাজে হুরা মগ নামে অধিক পরিচিত। উনার স্থায়ী ঠিকানা বর্তমান শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা গ্রামে। ছাত্র জীবন থেকে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজনের পর তিনি সি পি আই দলে একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে থেকে যান। তিনি ত্রিপুরা টেরিটোরিয়েল কাউনন্সিলের ১৯৫৭-৬২ সালে সদস্য ছিলেন। আজীবন তিনি সি পি আই দলে কর্মী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

(গ) শ্রী অংগজু মগ ঃ- শ্রীঅংগজু মগ সাব্রুম মহকুমায় মনুবনকুলের নিবাসী। কংগ্রেস পার্টির নেতা এবং এলাকায় তিনি বাবু নামে পরিচিত। তিনি ১৯৬৭, ১৯৮৩ এবং ১৯৮৮ সালে কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে মনু কেন্দ্র থেকে বিজয়ী হয়ে বিধানসভার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এলাকায় জোতদার হিসাবেও উনার খ্যাতি আছে। পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ার সুবাদে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকও বটে। বর্তমানে বয়সের কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নিজেকে আর বেশী জড়াতে চাইছে না।

(ঘ) শ্রী মুইবাই চৌধুরী (১৯২০ খ্রীঃ) ঃ- প্রথম জীবনে অর্থাৎ ছাত্রবস্থায় বাংলাদেশের চন্দ্রগুনাতে নারাণগিরি প্রাইমারী স্কুল থেকে পড়াশুনা শুরু। তারপর রাঙ্গামাটি গভারমেন্ট হাইস্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে দিল্লীর গান্ধী আশ্রম থেকে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু আততায়ীর হাতে গান্ধীর মৃত্যুর পর সাব্রুমের রূপাইছড়িতে বৈবাহিক জীবন শুরু করেন। গান্ধীর সংস্পর্শ এবং ঐ সময়ের কংগ্রেস পার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতার প্রভাবে তিনি প্রথম জীবনে কংগ্রেস কর্মী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস দলের কোন্দলের ফলে ১৯৭৮ সালে সি এফ ডি পার্টির প্রার্থী হয়ে মনু কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বার্দ্ধক্যর কারণে এখন নিজেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে তিনিও দূরে সরে রেখেছেন।

(ঙ) শ্রী ব্রজ মগ চৌধুরী ঃ-

শ্রীব্রজ মগ চৌধুরী জোলাইবাড়ী ঠাকুরছড়াতে স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি একজন তরুণ রাজনৈতিক নেতা। জোলাইবাড়ী থেকে বিদ্যালয় পড়াশুনা শেষ করে বি. এইচ. ইউ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তারপর তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনে এসে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে জোলাইবাড়ী কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হয়ে বিধানসভার সদস্য হন। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে আর সাফল্য লাভ করতে পারেননি। এখনো তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে আছেন।

(চ) শ্রী মংসাজাই মগ ঃ

শ্রীমংসাজাই মগ ১৯৪৩ সালে জোলাইবাড়ীর দেবদারুতে জন্মগ্রহণ করেন। বিলোনীয়া বি কে আই স্কুল থেকে বিদ্যালয় পড়াশুনা শেষ করে এম বি বি কলেজে পড়াশুনার সময় থেকে রাজনৈতিক সংস্পর্শে আসেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তিনি শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ত্রিপুরা

স্বশাসিত জেলা পরিষদের (সপ্তম ও অষ্টম তপশীল) প্রথম নির্বাচনে শিলাছড়ি-মনুবনকুল কেন্দ্র থেকে এম ডি সি (১৯৮২-৮৫) নির্বাচিত হন। তারপর, সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল অনুযায়ী এডিসি নির্বাচনে (১৯৮৫-৯০) পুনরায় নির্বাচিত হন এবং কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৯৫ সালে নির্বাচনেও তিনি নির্বাচিত হন এবং স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বর্তমানেও তিনি শিলাছড়ি মনুবনকুল কেন্দ্র থেকে এডিসি'র নির্বাচিত সদস্য এবং রূপাইছড়ির আর ডি ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান।

মগ সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশনের গ্রাম্য সভা

(ছ) শ্রী মংর্ছ্রি মগ চৌধুরী

শ্রীমগ টি ইউ জে এস পার্টির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই এই পার্টির সক্রিয় সদস্য। পরবর্তী সময়ে আই এন পি টি নাম পরিবর্তন হলেও উনি এই পার্টিরই একজন সক্রিয় সমর্থক। টি ইউ জে এস পার্টির প্রতীক জোড়া পাতার সক্রিয় কর্মী হিসাবে বনকুল এলাকার লোকজন উনাকে 'পাতা বুড়া' নামেই অভিহিত করতেন। তিনি ১৯৮২ সালে এবং ১৯৮৫ সালের স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি বিজয়ী হতে পারেননি। বর্তমানে উনি আই এন পি টি পার্টির কর্মী হিসাবে এলাকায় পরিচিত।

২০) প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ও সহাবস্থান

মগ জনজাতিদের সাথে অন্যান্য উপজাতি এবং অ-উপজাতিদের সহাবস্থান খুবই নিবিড়। ত্রিপুরায় বিভিন্ন মহকুমায় মগ সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের সাথে বসবাস করছে দীর্ঘদিন ধরে। অথচ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার কথা তেমন শোনা যায় না। এক্ষেত্রে দক্ষিণ ত্রিপুরায় জোলাইবাড়ী, বাইখোড়া, শান্তিরবাজার, ধলাইতে কুলাই, গণ্ডাছড়া ইত্যাদি মিশ্র জনজাতিদের সাথে বিশেষ করে বাঙালী সম্প্রদায়ের লোকেদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছেন। এই সহাবস্থান কারণ হিসাবে সমাজে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবকে অনেকে উল্লেখ করছেন। কারণ ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তথা বাঙালীরা বৌদ্ধ ধর্ম বা বৌদ্ধদেবকে হিন্দু ধর্মের এক অবতার হিসাবে মানেন। তাই এই ধর্মের উপর আস্থা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের এবং মগ জনজাতিদের মধ্যে তেমন কোন সংঘাত এখনো দেখা যায়নি।

অন্যদিকে অন্যান্য উপজাতিদের উপজাতি সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড় সম্পর্কে দেখা যায়। আজকাল নিবিড় সহাবস্থানের জন্য অন্যান্য উপজাতিদের সাথে মগ জনজাতিদের বিবাহ সম্পর্কও গড়ে উঠছে। এখানে ধর্মের বন্ধন না হলেও চেহারার দিক দিয়ে, খাওয়া দাওয়া, আচার আচরণে অনেক মিল থাকার জন্য কোন সমস্যা দেখা যায় না।

২১) বিবর্তনের পথে জনগোষ্ঠী

কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি জনগোষ্ঠীদের জীবনে বিবর্তন এক অনিবার্য ধারা। মগ জনজাতিদেরও এই ধারার বাইরে নয়। প্রাচীনকাল থেকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় বসবাসকারী মগ সমাজ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়। জনসংখ্যার দিক দিয়ে ক্ষুদ্র, শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল, এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা এখনও উন্নতির প্রথম দাগও এগোতে সক্ষম হয়নি। মগ সমাজ তেমন কোন রক্ষণশীল সমাজও নয়। সেদিন দিয়ে তাদের অন্যান্য উন্নত সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষণগুলি সহজে গ্রহণ করার সুবিধা আছে। তবুও দেখা যাচ্ছে সেই আদি কালের ধ্যান ধারণা, সামাজিক নিয়ম, ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব থেকে এখনও কেটে উঠা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাই যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না।

শিক্ষা বা শিক্ষার মানের উন্নতি মগ সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন। এখানে শিক্ষা মানে পুস্তক শিক্ষার সঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকলে চলেব না। এর সাথে নৈতিক শিক্ষার যেমন প্রয়োজন, অপরের সংস্কৃতি থেকে কিছু শিক্ষা নিয়ে নিজের সমাজের উন্নতির প্রচেষ্টাও থাকতে হবে। তবেই সমাজের বিবর্তনকে সঠিকভাবে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

তা সত্ত্বেও কালের পরিবর্তনের সাথে মগ জনগোষ্ঠীদের পরিবর্তন যে আসেনি সে কথা বলা কঠিন। পূর্বে আলোচনা অনুযায়ী গত শতাব্দীতে যেখানে সমাজের মূল নিয়ন্ত্রকরা ছিলেন রাজা, জমিদার বা সামন্ত প্রভুরা। এদের দ্বারাই সমাজ পরিচালিত হত। সমাজের প্রধান ক্ষমতা তাদের হাতে কুক্ষীগত ছিল। এদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছিল প্রধান আইন। অর্থনৈতিক মূল চাবিকাঠি ছিল তাদের হাতে। অর্থাৎ সমাজে খুব কমসংখ্যক লোকেদের হাতে ছিল সমস্ত ধরনের ক্ষমতা। বৃহত্তর অংশের মানুষ তাই বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। আজ যদি মগ সমাজের অনগ্রসরতার কারণগুলি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এই কারণগুলি হবে প্রধান কারণ।

সমাজ পরিবর্তনের সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তন মগ সমাজে এক নয়া মোড়। গত শতাব্দীর শেষদিক এবং এই শতাব্দীর প্রথম দিক হচ্ছে মগ সমাজের "টেক অফ" যুগ। হয়ত এর সময় আরো প্রয়োজন। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে এই চিত্রটি পরিষ্কার ফুটে উঠছে। অন্যান্য অনগ্রসর উপজাতি সমাজের মতনই মগ সমাজও কুম্ভকর্ণ ঘুমে আচ্ছন্ন। তাকে জাগাতে আপামর মগ সমাজের জনগণের সাহায্য অবশ্যই দরকার।

উসাজেন মগ

দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমার রূপাইছড়ি গ্রামে ১৬ জুন ১৯৬৮ সালে জন্ম। পিতা ত্রিপুরার প্রথম সারির বামপন্থী নেতা শ্রী মংসাজাই মগ। ১৯৮৯ সালে এম বি বি কলেজ থেকে স্নাতক, পরে ১৯৯৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ। ১৯৯৮ সালে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ত্রিপুরার প্রশাসনিক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে জম্পুইজলা ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক (বি ডি ও)।

লুসাই

ত্রিপুরায় বসবাসকারী সরকার-স্বীকৃত ১৯টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে লুসাই একটি। বর্তমানে লুসাইরা নিজেদেরকে মিজোরূপে চিহ্নিত করতে পছন্দ করে। ত্রিপুরা ছাড়া লুসাই বা মিজোরা মিজোরাম, আসাম, মেঘালয়, মণিপুরে বসবাস করে থাকে। ভারতের বাইরে মায়নামার ও বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামেও এই জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের দেখা যায়। ত্রিপুরার মিজোরাম সংলগ্ন জম্পুই পাহাড়েই লুসাইদের বসবাস। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উচুঁতে অবস্থিত ত্রিপুরার উচ্চতম পাহাড় জম্পুই। লুসাই অধ্যুষিত গ্রামগুলো হলো— ফুলদঙছেই, সাবুল, ত্লাঙসাউ, বাংলা, বেলিয়ানচিপ, ভাঙমুন, থালক্ছি, মুনপুই, মঙচুয়ান ও ভাইসাম। ত্রিপুরায় বসবাসকারী লুসাই বা মিজোদের সংখ্যা হলো আনুমানিক ছয় হাজার।

এটা বলা খুবই কঠিন কেন লুসাইরা নিজেদেরকে মিজো বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। কিছু লেখক - গবেষকদের মতে 'লুসাই' অভিধাটির মূলে রয়েছে 'লু' যার অর্থ মাথা এবং 'সেই' অর্থ 'লম্বা'। এর অর্থ হলো লম্বা মাথার মানুষ। এছাড়া 'লুসাই' এর অন্য অর্থ - 'লু' হচ্ছে 'মাথা' এবং 'সাই' হচ্ছে 'কাটা' বা ' কোপ' দেয়া। এবং এর অর্থ হলো যে মানুষেরা মাথা কাটে বা শিকার করে, এক কথায় মস্তক শিকারী। অন্যদিকে 'মিজো' এই নতুন অভিধার ব্যুৎপত্তি হলো এই রকম— 'মি' অর্থ মানুষ ও 'ছো' অর্থ পাহাড় অথবা উচ্চ ভূমি। এর আক্ষরিক অর্থ যে মানুষেরা উচুঁ পাহাড়ে বসবাস করে। 'মিজো' অভিধা ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করলে মনে হয় যে 'লুসাই' নাম থেকে মিজো নাম অধিকতর উপযুক্ত। কিছু কিছু লেখায় লুসাই বা মিজোকে লুহ্সাই (Lhoosi) রূপে অভিহিত করা হয়। লুসাই বা মিজো জনগোষ্ঠী রক্তের দিক থেকে মোঙ্গলীয় এবং তাদের ভাষা তিব্বত-বর্মীয় ভাষা - বংশের অর্ন্তগত।

লিখিতভাবে না থাকায় লুসাইদের প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। তাদের প্রাচীন ইতিহাস যা কিছু জানা যায় লোক-পরম্পরায় প্রচলিত ইতিহাস, রূপকথা, লোকসান-এইসব উৎস থেকে। আর, ত্রিপুরার লুসাই বা মিজোদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য কমই পাওয়া যায়। জম্পুই পাহাড়েই বা কখন থেকে বসবাস করতে শুরু করেছে — এই তথ্য পাওয়াও বেশ কঠিন। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে বিভিন্ন সময়ে বর্তমান মিজোরামে তারা বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। সে যা হোক, সমস্ত লুসাই বা মিজো মনে করে যে তাদের পূর্বপুরুষ 'ছিনলুঙ' বা 'চিনলুঙ' (আবদ্ধ পাথর বা গুহা) এর এক জায়গায় অবস্থান করেছিলেন। বিভিন্ন গবেষক এই 'ছিনলুঙ' বা 'চিনলুঙ' সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যাখ্যা করেছেন। লুসাই বা মিজো সম্প্রদায় অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মতোই প্রথম দিকে জীবিকা নির্বাহের জন্যে শিকার ও খাদ্যমূল সংগ্রহের ওপর নির্ভর করতো। পরবর্তীকালে তারা জুম কৃষিতে উত্তরণ ঘটায় এবং যাযাবরের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতো জুম চাষের উপযুক্ত জমির খোঁজে। এইভাবেই তারা এক সময় পৌছে যায় জম্পুই পাহাড়ের উর্বর ভূমিতে। তবে তাদের ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কিছু লেখক

নির্দিষ্ট বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। শ্রীযুত এস্ সাইলো লুসাই বা মিজোদের ত্রিপুরায় আগমনের একাধিক ঐতিহাসিক সময়কালের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে ত্রিপুরায় মিজো বা লুসাইদের প্রথম দলটি আসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক জাদেঙ দলপতির নেতৃত্বে। তারপর ১৮৫০ সালে রিভুং দলপতি ভানুয়াই থাঙ্গার নেতৃত্বে এবং ১৯০৫ সালে দখুমা সাইলোর নেতৃত্বে লুসাই বা মিজোরা খেপে খেপে ত্রিপুরায় আগমন করে। ১৯১২ সালে সর্বশেষ দলটি এসেছিল রাংভুংগা (Hrangunga) সাইলো (দখুমা সাইলোর ভ্রাতুষ্পুত্র)' র নেতৃত্বে এবং বসতি স্থাপন করেছিলো ফুলদুংছাই - এ এবং সেখানে দুইশতর মতো পরিবার ছিলো। পুরোপুরিভাবে জম্পুই পাহাড়ে বসতি স্থপনের পূর্বে লুসাই বা মিজোরা আঠারোমুড়া রেন্জের চাউপুইক্লাং ও হাওয়াইবাড়ি এবং শাখান রেন্জে অবস্থান করেছিলো। প্রয়াত রেভাবেণ্ড এইচ নেলিয়ানার তথ্য অনুসারে জানা যায় যে ১৯০৫ সালে তাদের দলপতি দখুমা সাইলোর নেতৃত্বে লুসাই পাহাড় থেকে উত্তর ত্রি পুরার কৈলাসহরের কাছে মুনথা (Hmuntha)'য় চলে আসে। পাঁচ বছর পরে সেখানকাব সমস্ত লোক জম্পুই পাহাড়ে ফিরে যায় এবং ফুলদঙছেই গ্রামে পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন করে। তাদের মধ্যে সত্তর পরিবারের মতো খ্রীষ্টান ছিলো। কিন্তু ইংরেজরা লুসাই পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তারের পরে লুসাই বা মিজোরা সেখান থেকে আবার বিভিন্ন জায়াগয় সরতে শুরু করে। রেভারেণ্ড লেনিয়ানা লুসাই বা মিজোদেব এই স্থানন্তরের তিনটি কারণ দর্শিয়েছেন। প্রথম কাবণ, লুসাইদের বন্দুক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ, দ্বিতীয় কারণ লুসাই বা মিজোদের ওপর উচ্চহারে রাজস্ব ধার্যকরণ এবং তাদেরকে বেগার শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা। লুসাই বা মিজোদের মাইগ্রেশানের তৃতীয় যে কারণটি তা হলো লুসাই পাহাড়ে ব্যাপকভাবে বাঁশ গাছে ফুল হওযা বাঁশঝাড়ে মড়ক লাগা। এই ঘটনাকে লুসাই বা মিজো ভাষায় বলে মৌতম (Mautam)। এবং যার ফলে লুসাই পাহাড়ে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয় ও লুসাই বা মিজোদের জীবনে নিয়ে আসে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট। তবে একথা অনস্বীকার্য যে লুসাই বা মিজোরাই ছিলে জম্পুই পাহাড়ে প্রথম বসতিস্থাপনকারী জনগোষ্ঠী। তবে তারা পরে ইংরেজ শাসিত মিজো পাহাড়ে প্রত্যাবর্তন করে।

লুসাই বা মিজো সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ত্রিপুরায় এমন সাতাশটি গোষ্ঠী (hnams) বিদ্যমান এবং তা হলো — বুয়ালতে (Bualte), চাউংথু (Chaungthu), চাউতে (Chawhte), চেনকুল (Chenkul), ছাকচুয়াক (Chhakchhuak), ছাঙতে (Chhangte), চুরাথ্লা (Chhurathlah), চুআউহাং (Chea Chuauhang), চয়ানুগো (Chuanugo), হাউনার (Hauhnar), নামতে (Hnamte), রাহেল (Hrahael), খিয়াংতে (Khiangte), খৌলরিং (Khawlhring), পাচুয়াঙ (Pachuau), পই (Pawih), পাউতু (Pautu), রালতে (Ralte), রাইতে (Rawihte), রিভুং (Rivung), রোখুম (Rokhum), সাইলো (Sailo), থাংলুয়া (Thangluah), তোছাং (Tochhawng), ভাঙচিয়া (Vangchhia), জাদেং (Zadeng) এবং জংতে (Zawngte)।

ইংরেজ শাসনের সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম লুসাই পাহাড়ে লুসাইদের জীবনে নিয়ে আসে এক আমূল পরিবর্তন। লুসাই বা মিজোদের সামাজিক — সাংস্কৃতিক জীবন ধারা বুঝতে হলে লুসাই বা মিজোদের জীবনে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব বোঝা দরকার। এইভাবে আমরা তাদের জীবনধারাকে প্রাক্-

খ্রীষ্ট ও পশ্চাৎ-খ্রীষ্ট পর্বে ভাগ করতে পারি। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করার পরে লুসাই বা মিজোরা তাদের পূর্ববর্তী ধর্ম-বিশ্বাস ও নানা রকম লৌকিক আচার-আচরণ বর্জন করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লুসাই পাহাড়ে লুসাই বা মিজোদের মধ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ১৮৯৪ সাল থেকেই তাঁদের কাজকর্ম শুরু করে দেন। আর, তার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় পঞ্চাশ বছর সময়ের কাল-পর্বে সমগ্র লুসাই সমাজ খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। তবে লুসাই বা মিজোদের সমাজকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে তাদের প্রাচীন রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস ও তাদের সদ্য বর্জিত প্রাচীন লৌকিক আচার-আচরণের দিকে ফিরে থাকাতে হবে।

লুসাই বা মিজো সমাজ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক এবং পিতাই হচ্ছে পরিবারের কর্তা। তবে পরিবারে মাতৃভূমিকাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘর-গৃহস্থালি সামলানো সন্তান-সন্ততিদের রক্ষণাবেক্ষণ করা মায়ের একক দায়িত্বেই পড়ে। আগে ছিলো একান্নবর্তী যুথবদ্ধ পরিবার। বর্তমানে যৌথ পরিবার ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবার গড়ার দিকে ঝোঁক বাড়ছে। পরিবারে পুরুষ সন্তান ও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে লুসাই সমাজে পক্ষপাতিত্বের দৃষ্টিতে দেখা হয় না – উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখা হয়।

পূর্বে প্রতিটি লুসাই বা মিজো গ্রাম 'লাল' (Lal) অভিহিত গ্রামীণ দলপতি দ্বারা শাসিত হতো। এইসব গ্রামীণ দলপতি ছিলেন বেশীরভাগ সাইলো গোষ্ঠীর। এই দলপতি নির্বাচিত হতো নির্বাচনের মাধ্যমে। কখনও কখনও আমন্ত্রণের মাধ্যমেও গ্রামীণ দলপতি বেছে নেওয়া হতো। একসময় তা হয়ে দাঁড়ায় উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রাম-সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ। সাধারণতঃ কনিষ্ঠ পুত্রই পিতার জায়গায় হতো গ্রামীণ দলপতি।

দলপতি ছিলেন একাধারে গ্রামের নেতা, রক্ষক ও অভিভাবক, সর্বোপরী খাদ্যসংকটের সময় অন্নদাতা। গ্রামীণ রাজনীতি, সামাজিক আশয়-বিষয় ও বিচার-আচারের ব্যাপারে গ্রামীণ দলপতি ছিলো সর্বেসর্বা। তাকে গ্রামীণ প্রশাসনিক কাজে তাকে সাহায্য করার জন্যে একটা পরামর্শদাতা পরিষদ ছিলো, যাকে লুসাই ভাষায় বলে 'উপাস' (UPAS)

বিবাহ ঃ ছেলে-মেয়েদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন বিষয়ে পিতা-মাতা খুবই সতর্কভাবে ঠাণ্ডা মাথায় এগোন। বিয়ের কনে বাছার ব্যাপারে পিতা-মাতার পছন্দই প্রায় শেষ কথা। বিবাহসংক্রান্ত বিষয়ে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ যেদিক গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তা হলো - বংশলতিকা, পিতা-মাতার ভাবমূর্তি, পূর্বপুরুষের পরিচয়, বংশে উন্মাদ থাকার সম্ভাবনা, প্রগলভতা, চৌর্যবৃত্তি, মদ্যাশক্তি ও অলসতা। বিবাহযোগ্য বয়স হলে পর ছেলে ও মেয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। বিয়ের ব্যাপার পাকাপাকি হবার আগে ছেলের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে একজন ঘটক পাঠানো হয় বিয়ের আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করতে। কন্যাপক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাবার পর ঘটক কন্যা-পণ নির্ধারণ ও বিয়ের তারিখ ঠিক করেন। যদি লুসাই বা মিজো ছেলে মেয়ে পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসে তাহলে ছেলের পক্ষকেই কন্যাপক্ষের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতে হয়। যদি কন্যা-পণ কন্যাপক্ষের কাছে গ্রাহণযোগ্য হয়, তাহলেই ছেলে-মেয়ে বিয়ে করতে পারে। বরপক্ষ থেকে কন্যা-পণ দেয়ার সম্মতিই হলো লুসাই বা মিজো বিয়ের পূর্ব-শর্ত। কন্যা-পণ

লুসাই বা মিজো সমাজের বিয়ের একটি নিযামক দিক। বিয়ের আগে আংশিকভাবে কন্যা-পণ কন্যার মা-বাবাব কাছে অবশ্যই পাঠিয়ে দিতে হয়। প্রাচীনকালে লুসাই বা মিজো সমাজে কন্যা-পণ হিসেবে দিতো হতো তবে তা এখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। এবং পরিবর্তে এখন নগদ অর্থ দিতে হয়।

শিশু-বিবাহ লুসাই বা মিজো সমাজে একেবারেই হয়না। অন্তর্বিবাহই লুসাই সমাজে আদর্শ বিবাহ তবে বহির্বিবাহ অন্য গোষ্ঠীতে হতে পারে। বিয়ের আগেই যদি কোনো মেয়ে অন্তঃসত্বা হযে পড়ে, আর ছেলেটি যদি মেয়েটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে চল্লিশ টাকা জরিমানা দিতে হয়, আর তখন ওই অবৈধ সন্তানটির ওপর তার দাবি বর্ত্তায়। এবং মেয়েটিকে বিয়ে করার কোনো বাধ্যবাধকা চাপানো হয়না ছেলেটির ওপর।

সমাজে লুসাই মেয়েদের ভূমিকা ঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে লুসাই বা মিজো সমাজে পুত্রসন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ-কথাও বলা হয়েছে যে বিয়ের সময কন্যাপণ দেয়া বাধ্যতামূলক। পরিবারের মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারীব পদমর্যাদা একই। পরিবারে লুসাই নারী যে গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করে তার প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশিষ্ট সমাজবিদ জে. শেকসপীয়ার (J. Shakespeare) তাঁর 'The Lushi Kuki Clans বইযে লিখেছেন, "একজন লুসাই মেয়েকে খুব ভোরে উঠতে হয়। ভোরের আলো ফোটার আগেই তাকে শূন্য 'লাঙ্গা' (বাঁশ-বেতের তৈরি পিঠে ঝোলানো বাস্কেট) য় বাঁশের চোঙা ভর্তি কে পাহাড়ের নীচে বেশ দূরে গিয়ে ওই শূন্য চোঙাগুলোয় জল ভর্তি করে লাঙ্গার ভেতর ঢুকিয়ে পিঠে লাঙ্গা ঝুলিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে পাহাড়ের ওপর ফিরে আসতে হয়। পিঠের লাঙ্গা ঘরের মধ্যে রেখেই তাকে বসতে হয় ধান ঝাড়তে। আগের দিনেই উনুনের ওপর পরিমাণমতো ধান শুকানো হয় ও বারান্দায় তা উদুখলে ভেনে ঝকঝকে চাল করতে হয়। আর, স্বামী ঘুম থেকে ওঠার আগেই ওই চাউল দিয়ে ভাত রান্নার কাজ শেষ করে ফেলতে হয়।"

লুসাই বা মিজো মেয়েদের সম্পত্তির ওপর উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো অধকার বর্তায় না। জুমচাষের বেশীরভাগ কাজ করতে হয় মেয়েদের। প্রচলিত জনপ্রিয় লোককথা ও প্রবাদ-প্রবচনে লুসাই বা মিজোদের সম্পর্কে বলা হয়েছে —

এক ঃ মেয়ে ও পুরোনো বেড়া পাল্টানো যেতে পারে।

দুই ঃ নারী-বাক্য কোনো বাক্যই নয় যেমন কাঁকড়ার মাংস কোনো মাংসই নয়।

তিন ঃ মেয়েদের কথা গ্রামের জলের উৎসের বাইরে গিয়ে পৌঁছায় না।

চার ঃ ধমক নাখাওয়া বৌ ও মাঠের অযত্নলালিত ঘাস অসহনীয়।

পাঁচ ঃ মেয়েলোক ও কুকুরদের চিৎকার করতে দাও, এটি তাদের খুশিই করে।

এই সব প্রবাদ-প্রবচন থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে লুসাই বা মিজো মেয়েদের সামাজিক

মান-মর্যাদা পুরুষদের থেকে কম ছিলো। এখন কিন্তু সমাজে মেয়েদের মান-সম্মান অনেকটা বেড়েছে ও মেয়েদের সামাজিক ভূমিকায় পরিবর্তনও এসেছে।

'জলবুক' (Zawlbuk) অথবা অবিবাহিত যুবকদের রাত্রীকালীন

শয়নকক্ষ বা 'ঘটুল' ঃ অবিবাহিত লুসাই বা মিজো যুবকদের এই ঘটুল লুসাই বা মিজো সমাজে অপরিহার্য এক শিক্ষা-আবাস। প্রত্যেক লুসাই বা মিজো গ্রামে এই ঘটুল থাকবেই। বৃহদাকার গ্রামে একাধিক ঘটুল থাকতে পারে। গ্রামীণ দলপতির বাড়ির কাছে গ্রামের মাঝখানে সাধারণতঃ এই ঘটুল তৈরি করতে হয়। গ্রামের সমস্ত লোক বিনা পারিশ্রমিকে অবিবাহিত যুবকদের ঘটুল তৈরি করে দেয়। খ্রীষ্টান মিশনারীদের আসার আগে সামাজিক শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে এই ঘটুলের বিশেষ ভূমিকা ছিলো। এই ঘটুলেই থেকে অবিবাহিত যুবকেরা নীতি শিক্ষা নিতো যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথ মসৃণ করে দিতো। নীতি শিক্ষার বাইরে কিছু প্রযুক্তি-বিদ্যাও তারা গ্রহণ করতো ভবিষ্যৎ সাংসারিক কাজের জন্য। বিয়ের আগে পনেরো বছরের মতো বয়েসের যুবকদের ঘটুলে আবশ্যিকভাবে থাকতে হতো। সন্ধ্যার সময় এই ঘটুলে যেন যৌবনের ঢল নামতো এবং যুবকরা আমোদ-ফুর্তিতে মাতোয়ারা হয়ে সকলের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতো। শৌর্য-বীর্যের গান গাইতো তারা আর পূর্বপুরুষদের বীরত্বের জয়গান করতো মসগুল হযে। পূর্বে মিজো বা লুসাই গ্রামগুলো অহরহ পারস্পরিক যুদ্ধে পড়তো জড়িয়ে। আর তাদেরকে শুতে হতো ঘটুলে যাতে করে প্রয়োজন হলে বিপদকালে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অভযানে যেতে পারতো। এই ঘটুলগুলো পর্যটক ও অতিথিদেরও বিশ্রামাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ঘটুল পর্যবেক্ষনের সর্বময় কর্তা হতেন গ্রামীণ দলপতি। ঘটুলে যুবকদের পালন করতে হতো কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং তাদেরকে মূল্যবোধের শিক্ষা দেয়া হতো। আত্মবিসর্জন (T lawmngaina) - এর ব্রত গ্রহণ করতে হতো অবিবাহিত লুসাই বা মিজো যুবকদের এই ঘটুলেই। এই আত্মোৎসর্গ বা আত্মবিসর্জনের নীতি শিক্ষা তাদেরকে করে দিতো দৃঢ়চেতা।

লুসাই বা মিজো মেয়েদের জন্যে অবশ্য এমন কোনো রোমাঞ্চকর ঘটুলের ব্যবস্থা নেই। আর মেয়েরা ছেলেদের ঘটুলে ঢুকতেই পারেনা। আদিকালের এই 'Zawlbuk' বা ঘটুল তার অপরিহার্যতা হারিয়ে ফেলে যখন লুসাই পাহাড়ে ইংরেজ শাসন চালু হয় আর খ্রীষ্টান মিশনারীরা লুসাই বা মিজো যুবকদের প্রাচীনপ্রথা বহির্ভূত আনুষ্ঠানিক আধুনিক শিক্ষা দিতে শুরু করে।

লুসাই বা মিজোদের সামাজিক উৎসব ঃ লুসাই বা মিজোদের ঐতিহ্যগতভাবে তিনটি প্রধান উৎসব আছে। আর সেগুলো হলো —

এক ঃ মিম কুট (Mim Kut)

দুই ঃ পল কুট (Pawl Kut) এবং

তিন ঃ চপচর কুট (Chapchar Kut)।

প্রচলিত গ্রামীণ ধারণা অনুসারে 'কুই' অর্থ হলো উৎসব। লুসাই বা মিজোদের এই তিনটি

উৎসবই হলো কৃষিকাজ সম্পর্কিত। উৎসবগুলো পালিত হয় ভোজ ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে।

চপচর কুট ঃ বসন্ত কালের আগমনে এই উৎসব পালিত হয়। এই সময়ে কৃষকেরা বাঁশবন কেটে ফেলে জুমচাষ (tlangle)-এর জন্যে। বাঁশবন কেটে ফেলে স্তুপীকৃত বাঁশ আগুনে পুড়িয়ে দেয়ার আগে রৌদ্রে ফেলে রাখা হয়। আর এই প্রক্রিয়ার কালকেই বলা হয় 'চপর'। উৎসবটিকে বসন্ত উৎসব হিসেবে অভিহিত কার যেতে পারে। এই উৎসবে খুব ঐতিহ্যসম্পন্ন যে নৃত্য পরিবেশন করা হয় তাকে বলে 'চেরও' (Cheraw) অর্থাৎ বংশনৃত্য। এই বংশ নৃত্যে শুধুমাত্র মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে থাকে এবং ছেলেরা মাটিতে বসে মেয়েদের নৃত্যের তালে তালে বংশ বাচদন করে থাকে ঠকঠক শব্দ করে। 'চপর কুট' উৎসব পালিত হয় সমস্ত লুসাই বা মিজো গ্রামে। এবং এটি হলো খুবই ঐতিহ্যশালী প্রাচীন সাংস্কৃতিক উৎসব লুসাই বা মিজো সমাজে। এই উৎসবের সময় পুরুষ ও মেয়ে লোকেরা তাদের ঐতিহ্যগত পোষাক করে এবং মাথায় পরে ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি টুপি।

মিম কুট বা ভুট্টা (Mize) উৎসব উদ্‌যাপিত হয় শরৎ কালে ভুট্টা পাকার পর তা সংগ্রহ করে। এই 'মিম কুট' উৎসবে পান করা হয় চাউলের তৈরি মদ, নাচ, গান আর ভোজের প্রাচুর্য সকলকে মাতোয়ারা করে তোলে। আর, সংগৃহীত ভুট্টার কিছু অংশ আলাদা করে রাখা হয় পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে।

'পল কুট' বা শস্য-উৎসব পালন করা হয় ডিসেম্বর মাসে শীতকালে সমস্ত প্রকারের শস্য ঘরে ওঠার পর। এই উৎসবের সময়কাল নির্ধারিত হয় কতটা মদ (Zu) সংগ্রহ করা হয়েছে তাব ওপর।

লুসাই বা মিজোদের নৃত্য ঃ 'চেরও' (Cheraw) হচ্ছে লুসাই বা মিজোদের সব থেকে জমকালো নাচ। এই নাচে লম্বা বাঁশের কাঠি বা টুকরো ব্যবহার করা হয়। আর যার জন্যে এই নাচকে বলে বংশ নৃত্য (Bamboo Dance)। এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে সন্তান জন্ম দেয়ার সময় যে মা মারা গেছেন তাঁর প্রেত লোকে যাবার রাস্তা মসৃণ করতে এবং সেখানে যাতে তিনি বিজয়িনীর বেশে অনুপ্রবেশ করতে পারেন তার জন্যে। এই নাচে অংশগ্রহণকারীকে খুবই পারদর্শী হতে হয় ও সবসময় থাকতে হয় অতি সতর্ক।

'খুয়াল্লম' (Khuallam) হচ্ছে এক ধরনের নাচ যা বাঁশি ও ঢোলের তালে তালে ... অতিথি ও আগন্তুকেরা নেচে থাকে। প্রথম দিকে তাই ছিলো নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নাচ। তাঁরা নাচতে নাচতে সামাজিক ভোজের আসরে ঢুকে পড়তেন। লুসাই বা মিজোদের জীবন অতিবাহিত হয় বলা যেতে পারে লাগাতর সামাজিক উৎসবের মধ্য দিয়ে যেখানে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বন্ধুবান্ধব সমবেত হয়ে সম্মিলিত ভোজে অংশগ্রহণ করে। তাই 'খুয়াল্লাম' কে বলা যেতে পারে আগন্তু ও অতিথিদের নাচ।

'চেইলাম' (Chheilam) ঃ সন্ধ্যার শান্ত-সমাহিত সময়ে মদের আসরে এই নাচ নাচা হয়। এই আসরে অংশগ্রহণকারীরা মুখে মুখে তিন তিন লাইনের গান রচনা করে তাদের শৌর্য-বীর্যের

ভাব প্রকাশ করে থাকেন। গৃহকর্তাও আমন্ত্রিত অতিথিদের প্রশংসা করে থাকেন মুখে মুখে গান রচনার মধ্য দিয়ে।

লুসাইদের অর্থনৈতিক জীবন ঃ অতীতে জুম চাষই ছিলো এই জনগোষ্ঠীর প্রধান উপজীবিকা। জুম কৃষি যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, অথচ ফল চাষের পক্ষে উপযোগী, তাই কমলা লেবুর চাষ শুরু করে দিলেন লুসাইরা। ত্লাংছাং (Tlang Sang) হলো জম্পুই পাহাড়ের প্রথম গ্রাম যেখানে লেবুর বাগান সৃষ্টি করা হলো। ত্রিপুরায় মোট তিন হাজার হেক্টর পরিমাণ জমিতে কমলা লেবুর চাষ হয়ে থাকে।

আর এই তিন হাজার হেক্টর জমির মধ্যে শুধুমাত্র জম্পুই পাহাড়েই দু'হাজার সাতশ' হেক্টর জমিতে কমলা লেবুর চাষ হয়ে থাকে। কাজেই খুব সঙ্গত কারণে জম্পুই পাহাড়কে কমলা চাষের স্বর্গোদ্যান বলা যেতে পারে। জম্পুই পাহাড়ের কমলা লেবু তার মিষ্টি স্বাদের জন্যে অতি বিখ্যাত। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে জম্পুই পাহাড়ে কমলা-উৎসব করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক অজানা রোগের আক্রমণে সেখানে কমলা লেবুর ফলন কমে গেলেও জম্পুই পাহাড়ের কমলা লেবুর চাহিদার অন্ত নেইং

লুসাইদের মধ্যে শিক্ষা ঃ ১৯২৩ সালেই ত্লাংছাঙ গ্রামে জম্পুই মিশন মিডিল স্কুলের অস্তিত্ব ছিলো। যাঁরা এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁরা হলেন — ছাউখুমা সাইলো, হাউদালা, রিতোওমা, রুয়ালা, জেড লিয়ানথাঙ্গা এবং জাখুমা। ১৯২৪ সালে মুনপুই (Hmunpuii) গ্রাম থেকে যারা মিডিল ইংলিংশ স্কুল পাশ করেন তাঁরা হলেন সেলচুঙ্গা, খতিনখুমা, লালচুঙ্গা, খুয়াল্লুনা, দেঙ্গেরা, জম্পুইয়া এবং আর এল লুনা। জম্পুই পাহাড়ের লুসাই বা মিজোরা শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় অনেক এগিয়ে আছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আই এ এস্ (IAS), অই এফ এস (IFS), টি সি এস (TCS), ডাক্তার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদে আসীন আছেন।

লুসাইদের ধর্ম ঃ খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করবার পূর্বে লুসাই বা মিজোরা ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ধর্ম অনুসরণ করতেন। লুসাই বা মিজো ভাষায় ধর্মের প্রতিশব্দ হলো 'সাকুয়া' (Sakhua) — 'সা' (Sa) অর্থ মাংস এবং 'খুয়া' (Khua) অর্থ গ্রাম। সনাতন ধর্ম অনুসারে পাহাড়-পর্বত, নদী, বৃক্ষ ও গুহার উদ্দেশ্যে পশু-পক্ষী বলি দেয়া হতো। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত দেবতাদের ভয় করা হতো এবং তাদেরকে পূজাও করাও হতো ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে। পরলোক, স্বর্গলোক ও প্রেতলোক সম্পর্কে তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিলো। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর লুসাই ও মিজোরা তাদের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করেছে।

রূপ কথা ঃ লুসাই বা মিজোদের মধ্যে বীরত্বব্যঞ্জক অনেক রূপকথা আছে। 'ছুরবুরা' (Chhurbura) বা 'ছুরা' (Chhura) নামে রূপ কথায় একটি জনপ্রিয় চরিত্র আছে যা লুসাই রূপকথার চরিত্রদের মধ্যে সর্বপ্রধান। এইসব রূপকথা এতই জনপ্রিয় যে শিশুরা তা গোগ্রাসে গেলে এবং ছুরবুর বীরের বীরত্বগাথা শুনে একেবারে মোহিত হয়ে যায়।

একথা বলা যেতে পারে যে ত্রিপুরা ও মিজোরামের লুসাই বা মিজোদের মধ্যে কোনো পার্থক নেই। এবং তারা একই পূর্বপুরুষদের বংশধর।

ভান লাল থ্‌ললুয়াঙ্গি চংতে
জন্ম ঃ ১৯৬৪ সালের ১৮ই জানুয়ারী আসামের জোরহাটে। জোরহাট এবং শিলং-এ পড়াশুনা। আগরতলা অরুন্ধতীনগর সেন্টপলস্‌ স্কুলের শিক্ষিকা পদে বৃত।

ডার্লং

ডার্লং জনগোষ্ঠী ইন্দো-চীন ভাষা-বংশের কুকি-চীন শাখার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর অন্যতম। বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা ভিন্ন অন্য কোথাও এই জনগোষ্ঠীর মানুষের স্থায়ী বসবাসের তথ্য নেই। উত্তর ত্রিপুরার অন্ততঃ ২২টি গ্রামে এই জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করছেন। ১৯৯৪ সনে বেসরকারীভাবে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ডার্লংদের জনসংখ্যা ৫৮৯০জন যেটা রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার ০.২ শতাংশ এবং উপজাতি জনসংখ্যার ০.৬৯ শতাংশ। ঐতিহ্যগত, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত দিক দিয়ে এই জনগোষ্ঠী মিজো, হ্মার ও হালাম-কুকি জনগোষ্ঠী-সমূহের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

ডার্লংদের অদিম বাস-ভূমি ও ইতিহাস ঃ

ডার্লং জনগোষ্ঠী সম্পর্কে লিখিত কোন প্রামান্য ইতিহাস না থাকার ফলে বংশপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত লোক-কথা, সামাজিক সংস্কার, আদিম-ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই জনগোষ্ঠীর উপর আলোকপাত কবা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তবে এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সামাজিক সংস্কার ও অনুশাসন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ভাষাগত নৈকট্যের নিরিখে এই জনগোষ্ঠী কুকি-চীন শাখার অন্তর্গত। অতীতে ডার্লং জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য কুকি জনগোষ্ঠী থেকে পৃথকীকরণ কঠিন ছিল। কিন্তু ১৮শ শতকের প্রথম পাদে ডার্লং জনগোষ্ঠীতেও সামাজিক অনুশাসন এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পাদনের জন্যে সমাজ-পতি (Chief) নির্বাচনের সূচনা হয় এবং রাজন্য ত্রিপুরার ইতিহাসে ডার্লং সমাজপতিগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

কুকি-চীন শাখার অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীব মতই ডার্লংরাও বিশ্বাস করতেন যে "সিনলুং" নামক গুহা থেকে মানুয আবির্ভূত হয়। ডার্লং ভাষায় "সিনলুং' শব্দের অর্থ হলো আবদ্ধ পাথর। ডার্লংরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা একজন একজন করে সে গুহা থেকে বহির্গত হয়। কিন্তু 'ফতলেই" নামক উপজাতি গোষ্ঠী যখন সেই গুহা থেকে বাইরে অসে তখন তারা অত্যাধিক কথা বলা শুরু করে এবং তাদের উচ্চস্বরের কারণে গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়। এতে সেই গুহার আভিভাবক-ঈশ্বর ভীত হন এবং মনে করেন পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে। অতএব সেই গুহা থেকে আর একটি মানুষও যাতে বাইরে আসতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি একটি পাথর দিয়ে গুহাটিকে বন্ধ করে দেন।

একই মতে অনেক উপজাতি গোষ্ঠীই মনে করে তাদের পূর্বপুরুষেরা একটি বিশেষ গুহা থেকে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, কোম উপজাতি সমাজে একটি রূপকথা চালু আছে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীর মাটির নীচে (অর্থাৎ নরকে) বাস করত এবং সেখান থেকেএকটি ছিদ্রপথে তারা একে একে বের হয়ে আসে। সেই ছিদ্রপথের মুখে একটি বাঘ অপেক্ষা করে বসে থাকে। একজন একজন করে মানুষ বের হতে থাকে, বাঘটি তাদের হত্যা করতে থাকে। কিন্তু কারাংপা নামে একজন মানুষ বাঘের চামড়ার মত রং-এর পোশাক পড়ে বাইরে আসে। বাঘ তাকে মারেনি, বরং বন্ধুত্ব করে। এর পরেই সাইচেপা নামে আর একজন মানুষ গুহা থেকে বাইরে আসে এবং

বাঘটিকে গুলি করে হত্যা করে। তখন প্রত্যেকে মদ্যপান-সহ সেই বাঘেরই মাংস খেয়ে সেই বাঘের মৃত্যুতে আনন্দ-উল্লাস করে। ডার্লংরা বিশ্বাস করেন বর্তমান দক্ষিণ চীনের কোন এক স্থানে গুহাটির অস্তিত্ব এখনও আছে, কিন্তু কেউ সেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করে না। সেই গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে কান পাতলে গুহার ভিতরে কাঁসর-ঘন্টার ক্ষীণ শব্দ এবং মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সাম্প্রতিক কালে পণ্ডিতেরা এই রূপকথা সম্পর্কে যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। একটি যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা হলো "সিনলুং" বা "ছিনলুং"-এর অর্থ গুহা নয়, এটা একজন চৈনিক রাজপুত্রের নাম,— চিন লুং। তিনি হলেন চৈনিক রাজবংশের সেত হুয়াং টি-র পুত্র, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব ২১৪ সালে চীনের মহা প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। এই রাজপুত্র পিতার বিরাগভাজন হয়ে দেশ ত্যাগ করেন এবং ব্রহ্মদেশে গিয়ে বসবাস করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, শত-সহস্র বছর ধরে এই ঘটনাটি মুখে মখে প্রচলিত হওয়ার পর এর ঐতিহাসিকতা হারিয়ে যায় এবং বর্তমানে এটা একটি রূপকথা হিসাবে গণ্য হয়।

হ্মার ঐতিহাসিক মি. দারলিয়েন সুং এবং মি. রাংলিয়েন সংগ্যাত বিশ্বাস করেন যে ২২১-২০৭ খৃষ্টপূর্বে চৈনিক রাজাদের রাজত্ব-কালে হ্মার জনগোষ্ঠী চীন ত্যাগ করে চলে আসে। পরবর্তীকালে এই জনগোষ্ঠী বর্তমান মায়ানমার এবং ভারতের সীমানা ববাবব দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রগমন শুরু করে। মি. দারলিয়েন সুং তাঁর "The Hmars" বইটিতে "Readers Digest World Atlas"-এর ৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্যের উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, 100.30 ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং 30.30 ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে "সিনলুং" স্থানটি অবস্থিত। স্থানটি য়ালুং নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। অন্যান্য পণ্ডিতদের মত তিনিও বিশ্বাস কবেন দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের য়ালুং নদীর তীরে অবস্থিত সিনলুং-ই হ্মারদের আদি বাসস্থান। মি. দারলিয়েন সুং-এর বর্ণিত যুক্তির সঙ্গে মুখে মুখে প্রচলিত ডার্লংদেব সম্ভাব্য আদিম নিবাস এবং তাদের অগ্রগমন সম্পর্কে ইতিহাস অভিন্ন। অনুমান করা হয় যে, অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর মত ডার্লংরাও খৃষ্টপূর্ব ২২০ থেকে ২০০-এর মধ্যে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। ডার্লং সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরা দাবী করেন যে, সেই অতীতে তারা নিজেদের "রিয়াম" অথবা "মানমাসি" বলে পরিচয় দিতেন— এই দুইটি শব্দের অর্থ হলো "মানুষ"।

ডার্লংদের মতে "ডার্লং" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা অন্ততঃ আধ ডজন আছে। একটি ব্যাখ্যা হলো ডার্লংরা যখন এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাসের জন্য প্রবেশ করে তখন তারা শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করে এবং শত্রুদের গলা কেটে হত্যা করে। "ডার" শব্দের অর্থ গলা এবং 'লেং" শব্দের অর্থ কাটা। সুতরাং এই দুইটি শব্দ মিলে "ডার্লেং" হিসাবে তারা পরিচিত হয়। পরবর্তী সময়ে "ডার্লেং" শব্দটি 'ডার্লং" শব্দে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনাটি ঘটে তাদের দেশান্তর কালে। অতএব এটাকে "ডার্লং" নামকরণের বুৎপত্তি হিসাবে ধরে নেওয়া যায়না।

আর একটি ব্যাখ্যা হলো এই জনগোষ্ঠী অগ্রগমন পথে "ডার্লং তলাং" নামক পাহাড়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিল। সে পাহাড়ের নাম অনুসারে এই জনগোষ্ঠীর নামাকরণ "ডার্লং" হয়েছিল। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক দিক বিবেচনায় এই ব্যাখ্যাটিকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য

মনে হয়, কারণ বর্তমান মিজোরামে এই ডার্লং ত্‌লাং (পাহাড়) এখনও জীবন্ত সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া ঐতিহাসিকদের অভিমত হলো ডার্লং জনগোষ্ঠী তাদের দেশান্তরের সময়ে এই পাহাড়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিল।

যাই হোক, "Mizo History" লেখক ভি. এল. সিয়ামা ও "Mizo Chan chin" লেখক পাস্তুর লিয়াংখাইয়া-র মত প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ এবং অন্যান্যদের অভিমত অনুসারে বর্তমান মিজোরামে আসার বহু আগেই এই উপজাতি গোষ্ঠী ডার্লং নামে পরিচিত ছিল এবং হ্‌মার, রাঙ্খল, চাউরেইস, লালগ্রঙ, মিরাউঙ ও ডার্লং জনগোষ্ঠীগুলিই প্রথম বর্তমান মিজোরামে প্রবেশ করে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। ঐতিহাসিকদের আরও অভিমত হলো মিজোরামে বর্তমান নদীগুলি, যেমন তুইরিয়াল (সোনাই), ত্‌লাউং (ধলেশ্বরী) ও তুত (ত্‌লাউং-এর শাখা) এইগুলির নামাকরণ ডার্লংরা করেছিল। এই তথ্য প্রমাণ করে যে ডার্লং ত্‌লাং (পাহাড়)-এর নামাকরণ হয়েছিল এই পাহাড়ের আদি বাসীন্দাদের নামানুসারেই। অতএব ডার্লং ত্‌লাং (পাহাড়)-এর নামানুসারে এই জনগোষ্ঠীর নামাকরণ হয়েছিল চিরাচরিত এই বিশ্বাস ও ব্যাখ্যা ঠিক নয়, কারণ উপরোক্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলির আগে অন্য কোন উপজাতি গোষ্ঠী এই অঞ্চলে স্থায়ী বসবাস করেছিল এমন কোন তথ্য নেই, যারা টিবেটো-বর্মন ভাষা-বংশের শব্দ-রূপে পাহাড়টির নামাকরণ করতে পারে। যদি পাহাড়গুলি ও নদীগুলি পূর্বেই বিভিন্ন নামে পরিচিত থাকত, তাহলে ডার্লংদের দ্বারা এগুলি নতুন করে নামাকরণের প্রয়োজন ছিল না। এই তথ্য পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, যেসমস্ত উপজাতি গোষ্ঠী এই নদীগুলির সংস্পর্শে এসেছিল তারাই এগুলির নামাকরণ করেছিল, যেমন "ডার্লং ত্‌লাং" এই নামাকরণটি এই পাহাড়ের আদি বাসীন্দারাই করেছিল।

চিরাচরিত পোষাকে ডার্লং যুবতী

তথাপি আর একটি ব্যাখ্যা আছে যে, এই উপজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিরা নিজেদের "ডারল" বলে পরিচয় দিত। পরবর্তীকালে সমগ্র উপজাতি গোষ্ঠীই "ডারল" এবং পরে "ডার্লং" নামে পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত: প্রাচীনকালে সমাজপতি প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে এই উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত গ্রাম্য-প্রধানের নেতৃত্বে নিজেদের সামাজিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতো। গ্রামের প্রতিটি মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করতো এবং তাঁর অদেশ-উপদেশ পালন করে চলতো। ডার্লং সমাজের এরূপ সামাজিক বাধ্যবাধকতা ছিল যে, একজন শিকারিকে তার শিকারে পাওয়া পশুর সামনের পা-টি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের চিহ্নস্বরূপ ও কর্তৃত্ব স্বীকৃতি-স্বরূপ

গ্রাম্য-প্রধানকে ভেট দিতে হতো। এই কারণেই গ্রাম্য প্রধানকে বলা হতো "ডার্ল", যার অর্থ "ল(hlaw)"-গ্রহণ করা এবং "ডার" (dar)- হত্যা করা পশুর সামনের পা। পরবর্তীকালে সেই গ্রাম্য-প্রধানগণ "ডার্ল", এবং পরে "ডার্লং" নামে পরিচয় লাভ করে।

"ডার্লং" নামাকরণের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা রয়েছে বলে মনে হয়। কারণ অতীত ইতিহাসে ডার্লং এবং অন্যান্য কুকি-চীন-ভুক্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলিতে গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক অনুশাসন প্রচলিত ছিল। আর শিকারে পাওয়া জন্তুর সামনের পা গ্রাম্য-প্রধানকে ভেট দেওয়ার রীতি এখনও ডার্লং গ্রামগুলিতে প্রচলিত আছে।

ত্রিপুরীরা নিজেদের "বরক", মিকির-রা "আর্লেং", গারোরা "আচিকমানদি"- এই সমস্ত শব্দগুলির অর্থ হলো "মানুষ", ডার্লংরাও নিজেদের 'রিয়াম (Hriam)" বলে, মানে "মানুষ"। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, অনেক উপজাতি গোষ্ঠী এরূপ বিভিন্ন অভিধায় নিজেদের পরিচয় দেয়, যার অর্থ "মানুষ"। নিজেদের "মানুষ" বলে অভিব্যক্তি সারা পৃথিবীর অনেক জাতি-গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটা সেই সমস্ত জাতি-গোষ্ঠীর নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি সচেতনতা ও গর্ববোধজনিত সমাজ-মাসিকতার প্রতীক, যার ফলে তারা নিজেদের "মানুষ" গণ্য করে এবং অন্যান্যদের মনুষ্য-ইতর অন্য কিছু বিবেচনা করে। ডার্লংরাও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর মতোই উচ্চ-জাত্যাভিমানী এবং নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি গর্ববোধ অকৃত্রিম, যার কারণে তারা নিজেদের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর তুলনায় অধিকতর জ্ঞান-সমৃদ্ধ ও অগ্রসর মনে করে, এবং অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে "মিলুক মিলাই" বলে অভিহিত করে থাকে। শব্দ দুটির অর্থ হিনতাব্যঞ্জক।

রিয়াম বা ডার্লং উপজাতি গোষ্ঠীর দুইটি শাখা— আত্তমরই এবং ফাতলেই। এই দুইটি শাখার প্রধান পার্থক্য হলো তাদের কথিত উপ-ভাষার উচ্চারণে ভিন্নতা। কিন্তু এই দুইটি শাখার নিবিড় মেলামেশার ফলে এখন ভাষার উচ্চারণে এই ভিন্নতা দূরীভূত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে এই দুইটি শাখার অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে।

হ্মার, মিজো ও কুকিরা মনে করে ডার্লংরা তাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ডার্লংরাও সেটা বিশ্বাস করে। কারণ, এই উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে ডার্লংদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। ডার্লংদের পরিচয় ও সামাজিক অবস্থান জানতে হলে নিম্ন-বর্ণিত তথ্যসমূহ যাচাই করতে হবে।

১) ডার্লংদের সমাজপতি প্রথা, উপভাষা, শারীরিক গঠন এবং সমাজ-সংস্কৃতির কার্যকলাপ হ্মারদের (Hmars) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, যার কারণে ডার্লংরা নিজেদেরকে হ্মারদের (Hmars) অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে মনে করে।

২) হ্মার (Hmars), মিজো ও কুকিদের মতোই ডার্লংরাও বিশ্বাস করে যে মানুষ সিনলুং (Sinlung) বা ছিনলুং (Chhinlung) নামক গুহা থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

৩) ডার্লংরা মিজোদের মতো একইরকম সমাজপতি-প্রথা অনুসরণ করে, যেহেতু ডার্লংদের প্রধান সমাজপতিগণ হলেন থাংগুর সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা মিজোদের প্রথম সমাজপতি থাংগুরা সম্প্রদায়ের বংশধর। এছাড়া ডার্লংরা মিজোদের সঙ্গে অভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতির কার্যকলাপ

অনুসরণ করে এবং এই দুইটি গোষ্ঠীর আদি কথ্য উপভাষার ভিতর বিশেষ কোন বৈসাদৃশ্য ছিল না। বস্তুত: ডার্লং গোষ্ঠীকে, মিজোদের একটি উপ-গোষ্ঠী বলা চলে।

৪) তথাপি অনেকের অভিমত হলো ডার্লং গোষ্ঠী কুকি গোষ্ঠীর একটি উপ-গোষ্ঠী। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে কালের পূর্ব বাংলার লোকেরা পাহাড়ে বসবাসকারী অসভ্য, দেশান্তরী ও মস্তক-শিকারী উপজাতি মানুষদের চিহ্নিত করতে "কুকি" নামে অভিহিত করতো। অতএব "কুকি" বলতে পাহাড়ে বসবাসকারী হ্মার (Hmars), কুকি, ডার্লং ও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীগুলিকে বুঝাতো। এমন কি নাগা গোষ্ঠীগুলির একটা অংশ এখনও নিজেদের নাগা-কুকি গোষ্ঠী হিসাবে পরিচয় দেয়। কাজেই, পাহাড়ে বসবাসকারী তথাকথিত প্রায় সমস্ত অসভ্য উপজাতি গোষ্ঠী বুঝাতে "কুকি" নামাকরণ ব্যবহার করা হতো। সেকালের পূর্ব বাংলার লোকেদের আরোপিত এই "কুকি" নামাকরণটি অনেক উপজাতি গোষ্ঠীর কাছেই অজ্ঞাত ছিল। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট অভিন্ন হলেও প্রত্যেকটি গোষ্ঠী নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থাশীল ছিল। "লুসাই" বা "মিজোদের" এই কুকি নামে বিশেষ অভিহিত করা যায়নি। একইভাবে হ্মার-রা (Hmars) নিজেদের "কুকি" হিসাবে পরিচয় দিতে অসম্মান বোধ করতো। এই সম্পর্কে S: Barkataki তাঁর "Tribes of Assam" বই-এ বলেছেন— "The Hmar tribe never calls itself by this name which has a derogative sense."

ডার্লং গোষ্ঠী সম্পর্কে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তারা যখন পাহাড়ে বসবাস করতো তখন ডার্লংরা নিজেদের রিয়াম এবং মানমাসি বলে পরিচয় দিতো। কিন্তু যখন তারা সমতলবাসী লোকেদের সংস্পর্শে এলো, তখন সহজভাবেই "কুকি" নামটি গ্রহণ করে। সমস্ত প্রয়োজনীয় দলিল-পত্রে তারা "কুকি" পদবী ব্যবহার করতে শুরু করে। ত্রিপুরায় এসে বসবাস শুরু করার পর থেকে খৃষ্টান মিশনারীরা তাদের আলাদা পরিচিতি "ডার্লং" স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা নিজেদের "কুকি" হিসাবেই পরিচয় দিয়ে এসেছিল। ডার্লংদের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, বাহ্যতঃ সামান্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও হ্মার (Hmar), মিজো ও কুকি এক এবং অভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী এবং ডার্লং এই তিনটি গোষ্ঠীরই অনুভুক্ত একটি উপজাতি গোষ্ঠী। রূপকথা, ইতিহাস, সমাজপতি প্রথা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ, জ্ঞাতিত্ব, উপভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য যথেষ্ট প্রমাণ করে যে, অতীতে কোন এক সময়ে উপরোক্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলি অভিন্ন ছিল।

দেশান্তরে অগ্রগমনের সম্ভাব্য পথ

এখানে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, "The Hmars" বইটির লেখক Darliensung-এর যুক্তি অনুসারে ডার্লংদের আদি নিবাস ছিলো চীনের সিনলুং। কারণ ডার্লংরাও বিশ্বাস করে যে তাদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান চীনের কোথাও অবস্থিত সিনলুং-এ বসবাস করতেন। সিনলুং ও এর সভ্যতা সম্পর্কে অনেক রূপকথা প্রচলিত আছে। সিনলুং সম্পর্কে তারা গর্ব করে বলে থাকে যে, সেই স্থানটি ছিলো সুখ-শান্তি ও আনন্দে ভরপুর। সেখানে জনগণ নির্বাচিত নেতাদের দ্বারা পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত জনগোষ্ঠীর লোকেরা এক পরিবারের মতো বসবাস করতো।

কালক্রমে সেখানকার বাসীন্দারা তাদের আদি নিবাস ত্যাগ করে এবং দক্ষিণ দিকে অগ্রগমন শুরু করে। ২০০ খৃষ্ট-পূর্ব কাছাকাছি সময়ে মধ্য চীন থেকে উপজাতিদের সেই গণ-অগ্রগমন বিষয়ে অনেক ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। সেগুলির মধ্যে একটি সম্ভাব্য কারণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক তথ্যটি সবারই জানা যে, খৃঃপূঃ ২১৪ সনে চৈনিক রাজা সেত-হুয়াঙ-টি বিশাল দুর্গ, যেটা চীনের মহা প্রাচীর হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিত, নির্মাণ করেছিলেন। তিনি একজন ভয়ঙ্কর অত্যাচারী রাজা হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। সেই বিশাল কর্মযজ্ঞের জন্য হাজার হাজার শ্রমিকের প্রয়োজন পড়েছিল এবং দেশের তিন ভাগের দু-ভাগ পুরুষ মানুষদের সেই প্রাচীর নির্মাণে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু খৃঃপূঃ ২১২ সনে সেত-হুয়াঙ-টি-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রমিকেরা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। এটা হতে পারে যে, সিনলুং-এ বাসীন্দা ডার্লংদেরও সেই বিশাল দুর্গ নির্মাণে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, কারণ সিনলুং চীনের মহা প্রাচীরের কাছাকাছি অবস্থিত। Dr. Edward Thomas তাঁর "China Yesterday and Today" বইটিতে এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন "The expansion of Chaw dynasty came to Chin dynasty creating pressure on the latter."

চীন রাজবংশ যুদ্ধকালীন সমস্ত নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করেছিল এবং আদিম অধিবাসী অনেক উপজাতি গোষ্ঠীকে পদানত করে রেখেছিল। যারা পদানত হতে অস্বীকার কবেছিল তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া পর্যায়ক্রমে আসা চৈনিক অভিবাসীরাও আদি-বাসীন্দাদের দক্ষিণ দিকে বিতারিত করেছিল। অতএব, এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে, চৈনিক অভিবাসীদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিক-রাজনৈতিক চাপের ফলে সিলুং-এর আদি বাসীন্দা অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর মতো ডার্লংরাও তাদের প্রিয় বাসস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

অতীতের সেই শতকে মানুষের সাধারণ অগ্রগমণ ছিল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর। ঐতিহাসিকদের ধারণা সেই গণ-অগ্রগমন হিমালয় পর্বতের সীমান্ত দিয়ে অনেক উপজাতি মানুষ সান ইয়ানান প্রদেশে উপনীত হয়েছিল। তাদের আরও ধারণা সেই সান প্রদেশই ব্রহ্মদেশের বর্তমান সান রাজ্য। সান হলো চীন থেকে আসা এবং ব্রহ্মদেশে অভিবাসী হওয়া সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠী মানুষদের সাধারণ পরিচিতি। যে-সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ যারা দক্ষিণ-পশ্চিম চীন থেকে এসে ব্রহ্মদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল বার্মিজরা তাদেরকেই "সান" নামকরণ করেছিল। সম্ভবতঃ সেই গণ-অগ্রগমন হিমালয় পর্বতের পাদদেশ বরাবর সংঘটিত হয়েছিল। ডার্লংরা এখনও হিমালয়ের অপার সৌন্দর্যের কথা স্মরণ করে থাকে এবং তারা বিশ্বাস করতো যে মৃত ব্যক্তিকে যমালয়ে পৌছার আগে তার আত্মাকে অবশ্যই হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে হয়। ডার্লং সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিরা দাবী করে থাকেন "হিমালয়" শব্দটি ডার্লং ভাষার "মাহি লাউই এইতি" শব্দগুলি থেকে উৎপত্তি যার অর্থ "আমাদের এইটা অতিক্রম করতে দাও"। তাঁরা বলেন— এটা হলো দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর অগ্রগমনের সময় হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ। "হিমালয়" শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে ডার্লংদের এই দাবী পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য না হলেও এটা ঐতিহাসিকভাবে সমর্থন করা যায় যে, সুদূর অতীতের কোন এক সময় ডার্লংরা হিমালয় পর্বতের পাদদেশ অঞ্চলে বসবাস

করেছিল।

সেই জনগোষ্ঠী আরও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং ভারত-ব্রহ্মদেশ অঞ্চলে জনমানবহীন এলাকায় অনেক গ্রাম পত্তন করে বসবাস শুরু করে। আশ্রয়, খাদ্য ও নিরাপত্তার সন্ধানেই তারা দেশ-দেশান্তরে ক্রমাগত অগ্রগমন করতে থাকে। তারা সর্বদাই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতো এবং অশীরী ভূত-প্রেত থেকে শুরু করে অনাহুত শত্রুর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। তাদের জীবন ছিল সমস্যা-সঙ্কুল এবং বেঁচে থাকার জন্য কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। যার ফলে রোগ-শোক থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভূত-প্রেত-এর পূজা সমাজে চালু হয়। শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে করতে পরবর্তী সময়ে গোটা সমাজই মস্তক-শিকারী হিসাবে আখ্যাত হয় এবং মস্তক-শিকার একটি সামাজিক জীবন-চর্চা ও পৌরুষ প্রমাণের প্রধান ক্রীড়া হিসাবে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু এতে করে তাদের জীবনে নিরাপত্তা আসেনি, বরং গোষ্ঠীগতভাবে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমতে থাকে।

হ্মার (Hmar) ও লুসাই এই দুইটি জনগোষ্ঠী একই সময়ে পাশাপাশি থেকে আরও দক্ষিণ-মুখো অগ্রসর হচ্ছিল। সেই সময় হ্মার (Hmar)-দের বলা হতো "খাউথ্লাঙ", যার অর্থ পশ্চিমগামী। কারণ তারা লুসাইদের আগে আগে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে তাদের সেই অগ্রগমন ঘটেছিল ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে। "খামপাত" হ্মার (Hmar), লুসাই ও ডার্লংদের বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান ছিল। একটি গল্প চালু আছে যে, "খামপাত" নামক স্থানে তাদের পূর্ব-পুরুষেরা একটি বটগাছের চারা রোপণ করেছিল এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল সেই বটগাছের ডালগুলি যখন মাটি স্পর্শ করবে তখন তারা আবার সেই "খামপাতে" ফিরে যাবে। "TRIPURA" গ্রন্থের লেখক উমেশ সাইগল বলেছেন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যখন সেই বটগাছের ডালগুলি মাটি স্পর্শ করে তখন অনেক লুসাই যাদের মধ্যে লাখিপুরের মি. হানের, আইজলের ক্যাপটেন লাইখুমা, ক্যাপটেন সি. খুমা, ক্যাপটেন ভানপুইলাল এবং ক্যাপটেন লালমুয়ানা, তারা সবাই ব্রহ্মদেশে ফিরে যান।

"Mizo Pi Pute Leh an Thlahte Chan Chin" গ্রন্থের লেখক কে. জাউলা-র মতে সেই জনগোষ্ঠীগুলি ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে খামপাতে বসতি স্থাপন করে। বার্মিজ ভাষার খামপাত-এর অর্থ হলো "সোনালি গোলাপ-বাগ"। একটি জনপ্রিয় লোক-কথা প্রচলিত আছে যে, বার্মিজদের পূর্বপুরুষের একটি সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই কন্যাটি পরে প্রদেশের সর্বময়ী কর্ত্রী হন। তারা তাঁকে একটি সোনার গোলাপ বাগান বা খামপাত উপহার দেয়। কালক্রমে সেই কন্যাটির নাম-ই "খামপাত"- হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। রুন (Run) নামে একটি সুন্দর নদী খামপাত-এর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই নদীকে কেন্দ্র করে কুকি-চীনভুক্ত উপাতি গোষ্ঠীর মানুষদের অনেক লোক-গীতি ও লোক-কথা চালু আছে।

খামপাত থেকে উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলি আরও অগ্রসর হয় এবং তাদের মধ্যে ডার্লং-সহ অনেক জনগোষ্ঠী রিলির (Rili) কাছে বসতি স্থাপন করে। রিলি বর্তমান ব্রহ্মদেশে অবস্থিত একটি প্রাকৃতিক হ্রদ, যেটা বর্তমান মিজোরাম থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। ডার্লংদের মধ্যে এখনও অনেক লোক-কথা প্রচলিত আছে এবং সেই হ্রদকে নিয়ে ভীতিপ্রদ গান

তারা গেয়ে থাকে, কারণ তাদের বিশ্বাস সেই হ্রদে অনেক ভূত-প্রেত বাস করতো। এটাই প্রমাণ করে যে, গণ-অগ্রগমনের সময় ডার্লংরা সেই হ্রদের চারদিকে বসবাস করেছিল। কালক্রমে তারা সেই স্থান ত্যাগ করে উত্তর দিকে ধাবমান হয় এবং মিজোরামের বর্তমান চামফাই-এ বসতি স্থাপন করে। ঐতিহাসিকদের মতে ডার্লংরা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের সমর্থনে অনেক চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

চামফাই থেকে তারা উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসহ হয় এবং ডার্লউং (ডার্লং)-এ বসবাস শুরু করে। আইজল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ২০ কিমি দূরে NH-54-এর পার্শ্বে স্থানটি অপরিবর্তিত নামে এখনও আছে। সেখান থেকে তুইরিয়াল (সোনাই নদী) নদী অতিক্রম করে বর্তমান আইজলে বসতি স্থাপন করার জন্য চলে আছে। ঐতিহাসিকদের দাবী নদীটির নাম ডার্লংদের দেওয়া। ডার্লংরা দাবী করে যে "আইজল" নামটাও তাদেরই দেওয়া। "আইজল" নামকরণটি হয়েছিল এই কারণে যে এখানে আইরিয়া (airhria) নামক মশলা জাতীয় গাছ প্রচুর পরিমানে ছিল। এখানে "আই" অর্থে উপরোক্ত গাছের নাম এবং "জল" মানে স্থান।

আইজল থেকে বিশেষ করে শত্রু ভয়ে ডার্লংরা আরও উত্তর দিকে অগ্রসব হয় এবং আইজল থেকে প্রায় ৩০ কিঃমিঃ দূরে একটি পাহাড়ে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে সেই পাহাড়টি 'ডার্লং' পাহাড় নামে পবিচিতি লাভ করে। সম্ভবতঃ এই পাহাড় থেকেই ডার্লংরা দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। একটি শাখা থাংগুর এবং পালিয়ান গোষ্ঠীপতিদের নেতৃত্বে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। অপর শাখাটি লোকসংখ্যায় কিছুটা কম, রিভাং গোষ্ঠীপতিদের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম থেকে ডার্লংরা বর্তমান ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ রিভাং গোষ্ঠীপতিরা থাংগুর ও পালিয়ান গোষ্ঠীপতিদের আগেই ত্রিপুরা প্রবেশ করেছিল।

"This beautiful India : TRIPURA" গ্রন্থের লেখক Sukhdev Chib -এর কথায় ত্রিপুরায় বর্তমানে বসবাসকারী ডার্লংরা রুংগাভুংগা (রাংভুংগা) নামে গোষ্ঠীপতি বা "লাল" দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল এবং তিনি উনকোটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তাঁর দলকে নিয়ে এসেছিলেন। অপর দিকে, অন্যদলটি গোষ্ঠপতি লিয়ানলুরা-র নেতৃত্বে লংতরাই পাহাড় অতিক্রম করে আসে। এইভাবে ডার্লংরা উনকোটি ও তেলিয়ামুড়া মধ্যস্থ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে।

উপরোক্ত তথ্যসমূহ সমর্থন করে Lt. Col. J. Shakespear বলেছেন— "It seems most probable that the country into which the various Thangur Chiefs noved, under pressure from the Chins, was almost entirely occupied by small communities having no power of cohesion. The greater part of the small communities of the country into which the Thangurs moved were absorbed and formed a majority of the subjects of Thangur Chiefs; but some fled north and west into Manipur, Silchar, Sylhet and Tipperah where they are known as Kuki where their appearence caused much trouble."

ডার্লং জনগোষ্ঠীর প্রবীণ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের যে অংশ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছিল তারা বর্তমান মণিপুরের দক্ষিণাংশে প্রবেশ করেছিল এবং আসামের বর্তমান উত্তর কাছার পার্বত্য এলাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। মিজো ও ডার্লং এই দুইটি জনগোষ্ঠী উত্তর

কাছাড় পর্বতমালাকে সুনিশ্চিতভাবে "Ngaibang Tlang" বলে যার অর্থ, যে পর্বতমালা কারও স্থায়ী বাড়ী পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে।

এই স্থান থেকে তারা দক্ষিণ দিকে ফিরে অগ্রসর হতে থাকে এবং বর্তমান শ্রীহট্ট জেলায় এসে বসতি স্থাপন করে। এখানে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, উপজাতি জনগোষ্ঠীর সমস্ত শাখাই এক সঙ্গে অগ্রগমন করেনি। কারণ এরূপ প্রমাণ আছে যে, ডার্লংরা উত্তর দিক থেকেও ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল। সেই সময় তারা ইংরেজদের করায়ত্ত এলাকায় এবং সন্নিকট গ্রামগুলিতে আক্রমণ করে ব্যাপক লুটপাট করেছিল। তাদের আক্রমণে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নাজেহাল ও কিংকর্তব্যভিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং ত্রিপুরার মহারাজার মাধ্যমে তাদেরকে দমন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু যেহেতু ডার্লংদের সঙ্গে মহারাজার সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে তিনি অস্বীকৃত হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে একটি গোপন কার্য্যবিবরণীতে আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি উল্লেখ করেছিলেন — "One of the Tipperah Rajahs married a daugher of Manipuri stock. This fact seemed to indicate that a means by communication did exist between these two Kingdoms and Government caused efforts to discover the line of route. It was found that a road did exist but imtead of passing into the interior right accross the Tipperah hills it ran along the outer margine of the hills on the north-west through parts of Sylhet into Hylakandy in Cachar, hence throuh a Kuki village called Thanghum into Manipur. There ware disputes between the Cachar and Tipperah Rajahs as to the parts of Hylakandy and the Tipparah Rajah set forth claims to the allegiance of the Kukis lying south of Cachar (Secret Procedings, 30th July, 1824, Nos. 697).

আগেই বলা হয়েছে, ডার্লংদের আর একটি শাখা যারা রিভাং গোষ্ঠীপতিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে পূর্বদিক দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল তারা লংতরাই পাহাড় এলাকাসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। Lt. Col. J, Shakespear- এর মতানুসারে লংতরাই পাহাড়ের চেংরি ও কাসালং নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি বড় গ্রাম রিভাং গোষ্ঠীপতি ভাননুয়াই থাংগির দখলে ছিল।

উপরোক্ত দুইটি স্থান থেকে ডার্লংরা বর্তমান এলাকাগুলিতে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। ডার্লং প্রবীণেরা পরিস্কারভাবে স্মরণ করেন ৬০/৭০ বছর আগেও উত্তরে বসবাসকারী ডার্লংদের সঙ্গে দক্ষিণে বসবাসকারী ডার্লংদের কথ্য ভাষায় সামান্য পার্থক্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে ডার্লংদের মধ্যে সেই কথ্য ভাষার পার্থক্য আর নেই।

গোষ্ঠীপতি এবং তাদের ভূমিকা ঃ

এখানে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে ডার্লংদের, বিশেষ করে তাদের গোষ্ঠীপতিদের সম্পর্কে লিখিত তথ্য বিশেষ নেই। যার কারণে, এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে লিখতে গেলে প্রবীণদের কথিত মৌখিক ইতিহাসের উপরই সর্বাধিক নির্ভর করতে হয়। তবু কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরানো তথ্য যতটুকু পাওয়া গিয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের সময়ে ডার্লং গোষ্ঠীপতিদের সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মিজো এবং কুকি-চীন-ভুক্ত অন্যান্য উপজাতিদের মতো ডার্লংরাও দাবী করে যে তাদের গোষ্ঠীপতিরা থাংগুরার বংশধর। থাংগুরার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক অনেক

গল্প চালু আছে। মজার ব্যাপার হলো যৌক্তিক গল্পের চেয়ে অযৌক্তিক গল্পগুলি সমাজে অধিকতর জনপ্রিয়। যাই হোক, ইতিহাস বলে থাংগুরা-র পিতা হলেন ঝামুয়াকা। Lt. Col. J. Shakespeat -এর মতানুসারে থাংগুরা থেকে তাঁর বংশধরের সবাই গোষ্ঠীপতি হিসাবে সুপ্রতিস্থিত ছিলেন। ঝামুয়াকার ছয় পুত্র ছিল, তারা হলো - ঝাদেংগা, পালিয়ানা, থাংগুরা, থাংলুয়া, রিভুংগা ও রুখুমা। এই ছয় ভাই বিভিন্ন ছয়টি গ্রাম শাসন করতো। উত্তরাঞ্চলের গ্রামগুলি ছিলো সুকতে, পাইতে ও থাদু উপজাতি গোষ্ঠীদের দখলে। Lt. Col. J. Shakespear-এর মতে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামগুলি নিয়মিত এবং প্রথা মফিক অধিস্থিতি গোষ্ঠীপতিদের শাসন সুশৃঙ্খল ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পশ্চিম পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী ছোট ছোট উপজাতিগুলি একে অপরে শত্রুভাবাপন্ন ছিল। পরবর্তীকালে থাংগুর গোষ্ঠীপতিরা এই পশ্চিম পার্বত্য এলাকাও করায়ত্ত করে। চারটি উপজাতি গোষ্ঠীপতি— যথা পালিয়ান, থাংগুর, রিভাং ও পাচুয়াল গোষ্ঠীপতিরা ডার্লংদের শাসন করতো। রিভাং গোষ্ঠীপতিরা কিছুদিনের জন্য লংতরাই পাহাড়ে বসবাসকারী ডার্লংদের শাসন করেছিল। এই রিভাং গোষ্ঠীপতি বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তাই ডার্লংদের কাছে তারা এখন আর বিশেষ স্মরণীয় নয়।

ডার্লংদের বর্তমান বাসস্থান

এটা এখন সবারই জানা যে, বর্তমানে ডার্লংরা শুধু ত্রিপুরাতেই বসবাস করছে এবং সেটাও উত্তর ত্রিপুরার ২২টি গ্রামেই সীমাবদ্ধ। ডার্লংরা পাহাড়ের সামান্য ঢালু প্রদেশে গাছ বা বাঁশের খুটির উপর ছনের ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরী করে। এখন তাদের অনেকেই সমতল জমিতে উন্নত ধরনের ঘর-বাড়ি তৈরী করে বাস করছে।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে ডার্লংরা এক সময় দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের কোন এক অঞ্চলে বসবাস করতো। বর্তমান বাসভূমিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার আগে তারা তাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করে দীর্ঘদিন দেশ থেকে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেছে। দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণের সময় কোন এক স্থানে ছয়-সাত বছর বসবাস করার পরেই অধিকতর উপযুক্ত জুম-চাষের জমির খোঁজে অথবা শত্রুদের ভয়ে আবার অগ্রগমন শুরু করতো। সামাজিক কাজ-কর্ম সম্পাদনের জন্যে গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে গ্রামের প্রবীণদের দ্বারা পরিচালিত তাদের নিজস্ব গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল।

বর্তমান ত্রিপুরায় আসার পর তারা রাজ্যের উত্তর জেলার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। উমেশ সাইগল তাঁর ' TRIPURA" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, দুইজন গোষ্ঠীপতির অধীনে ডার্লংরা তেলিয়ামুড়া থেকে উনকোটি পর্যন্ত এলাকা করায়ত্ত করেছিল। কৈলাশহর পূর্বে কুলাসর নামে পরিচিত ছিল এবং এই নামকরণটি হয়েছিল একজন ডার্লং গোষ্ঠীপতির (লাল) পুত্রের নাম "কুলা" অনুসারে। সুখদেব ছিব-এর মতানুসারে ত্রিপুরার মহারাজা সমগ্র ফটিকরায় ও তৎসংলগ্ন এলাকা ডার্লংদের জন্য নির্দিষ্ট করে ঘোষণা করেন, তাই অধিকাংশ ডার্লংরাই কৈলাশহর মহকুমায় বসবাস করে। ডঃ থাংলুরা, খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারক, ১৯৩১ সনের ১৯শে মার্চ তারিখে মহারাজার দেওয়ান-এর ফটিকরায় পরিদর্শন উপলক্ষে স্বাগত ভাষণে বলেছিলেন, — "all these places around Kailashahar where we the Kukis (Darlongs) used to live before, they all

became now the graves of our fore-fathers. But neither do we desire nor want to leave this cemetery of our forefathers....... we are enjoying full liberty and freedom under the protection of His kindness the Maharaja, and it is now becoming our second nature to live loyally to the state authorities till we are called from this world to the happier shore."

ডার্লংরা দুইটি বিভাগে (bials) বসবাস করে, যথা— Hmar bial এবং Sim bial যার অর্থ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে ১১টি করে ডার্লং গ্রাম আছে। কিন্তু দক্ষিণ বিভাগের গ্রামগুলি বৃহত্তর, কারণ উত্তর বিভাগের তুলনায় এই বিভাগে বসবাসকারী ডার্লং লোকসংখ্যা বেশী। সুখদেব ছিব তাঁর "This beautiful India : TRIPURA" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — "১৯২০ সনে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বাঙালী পরিবার ব্যতিরেকে কৈলাশহরের বাসিন্দা সবাই ছিল ডার্লং। এখনও পর্যন্ত ডার্লং প্রবীণেরা কৈলাশহরকে কুলাসর এবং বাজারকে কুলাসর বাজার বলে ডাকেন। তাঁরা এখনও বীরত্বের জন্য খ্যাত কুলা সম্পর্কে অনেক কাহিনী বলে থাকেন।

বর্তমানে ডার্লংরা উত্তর ত্রিপুরা জেলার চারটি মহকুমায় বসবাস করে। ডার্লং অধ্যুষিত মহকুমা ও গ্রামগুলি নিম্নরূপ ঃ-

১। ধর্মনগর ঃ দুইটি গ্রাম — পিজলা ও বইতাং।

২। কৈলাশহর ঃ ১৫টি গ্রাম — খালাইগিরি, সেরতলাং, ভেপা, মুরুয়াই, ডেওরা, তুইংগই, দারসের, খাওহেরেং, জামথলা, তালান, দারচই, মুনথা, সেরমুন, নাজারেথ, বেতছড়া।

৩। লংতরাইভ্যালী ঃ চারটি গ্রাম — কাঞ্চন, নালকাটা, ওলড্ কাতাল, নিউ কাতাল।

৪। কমলপুর ঃ একটি গ্রাম - সাইকার।

প্রত্যেকটি গ্রামই একে অপরের কাছাকাছি অবস্থিত এবং ঘনবসতিপূর্ণ। এমন ঘনবসতিপূর্ণ যে, কোথাও কোথাও বাড়ীগুলি একটি না একাধিক পরিবারের বুঝা কঠিন। নিবিড় সান্নিধ্যে বসবাসের ফলে ভ্রাতৃত্ববোধ, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সাহায্য-সহানুভূতির মনোভাব সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। যার ফলে, যেকোন সামাজিক ও ধর্মীয় কার্যকলাপেই ডার্লংরা ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। কোন ডার্লং গ্রাম-ই বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ, Hnam Committee (ডার্লং সমাজের উচ্চতম সামাজিক সংগঠন) এবং অন্যান্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলি সমাজের উন্নয়ন কার্যকলাপে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অতএব, ডার্লংরা যেখানেই বসবাস করুক, তারা তাদের স্বজাতিকে ও জন্মস্থানকে ভুলতে পারে না।

ডার্লং লোকসংখ্যা ঃ

১৯৯৪ সনের হিসাব অনুসারে ডার্লংদের সংখ্যা ৫৮৯০জন। এর আগে দশকগুলিতে তাদের সংখ্যা কত বলা কঠিন, কারণ সরকারী আদমসুমারিতে কখনও ডার্লংদের সংখ্যা আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। ১৯২১ সন পর্যন্ত ত্রিপুরার লুসাইদেরকেও কুকিদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩১ সনের লোকগণনায় ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা লুসাই এবং ডার্লং-কুকিদের আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

১৯৯৪ সনের এপ্রিল মাসে সংগৃহীত তথ্য অনুসারে গ্রামভিত্তিক ডার্লংদের জনসংখ্যা

নিম্নরূপ ঃ

ক) Hmar Bial অথবা উত্তর বিভাগ।

গ্রাম	পরিবারের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
পিপলা	৬	৩১	২৫	৫৬
বইতাং	৮০	১৯৯	১৮৬	৩৪৫
খালাইগিরি	২৮	৮৭	৭৪	১৬১
শেরত্লাং	৩১	৮৯	৬৪	১৫৩
ডেপা	১৮	৪৮	৪৫	৯৩
মুরুয়াই	৪৯	১৬৬	১৫৬	৩১২
ডেওড়া	১০৪	৩৫৬	২৮০	৬৩৬
তুইংগই	৫৩	১৪৯	১৫৮	৩০৭
দারসের	২৮	৭৮	৮০	১৫৮
খাওহেরেং	৩৩	৮১	৭৯	১৬০
জমেথলা	১১	৪২	৪৩	৮৫
	৪৪১	১৩০৮	১১৭৭	২৪৮৫

খ) Sim Bial অথবা দক্ষিণ বিভাগ।

গ্রাম	পরিবারের সংখ্যা	লোকসংখ্যা		
		পুরুষ	মহিলা	মোট
তালান	২৭	৬৮	৫৮	১২৬
দারচুই	১৫৩	৪৮৫	৪৭০	৯৫৭
সেরমুন	২৪	৭৯	৭৩	১৫২
মুনথা	১৬	৩৪	৪২	৭৬
নাজারেথ	৪	১১	১২	২৩
বেতছড়া	৯৮	৩০৯	২৯৩	৬০২
কাঞ্চন	৪৭	১৫১	১৫৩	৩০৪
নালকাটা	৪৮	১২৪	১২৮	২৫২
ওল্ড কাতাল	৫৩	১৮৪	১৭৮	৩৬২
নিউ কাতাল	৫১	১৬২	১৩৩	২৯৫
সাইকার	৪১	১৩৯	১১৭	২৫৬
	৫৬২	১৭৪৭	১৬৫৭	৩৪০৫

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৩১ সনে ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা কৃত সেন্সাস

বিবরণী থেকে ২০০১ সনের জনগণনা পর্যন্ত কোন সময় ডার্লংদের আলাদা জনসংখ্যা দেখানো হয়নি। বলা হয়ে থাকে কুকি জনসংখ্যার সঙ্গে ডার্লংদের সংখ্যা অঙ্গীভূত, অর্থাৎ ডার্লং-কুকিদের একত্রে জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে। ১৯৯১ সনের জনগণনায় কুকির (ডার্লং-কুকি একত্রে) জনসংখ্যা ১০৬২৮। ১৯৯৪ সনের বেসরকারীভাবে সংগৃহীত ডার্লংদের সংখ্যা (৫৮৯০জন) যদি বাস্তবভিত্তিক হয়, তাহলে ডার্লং ও কুকি জনসংখ্যার অনুপাত ৫৫:৪৫। ২০০১ সালের জনগণনায় ডার্লং-কুকির জনসংখ্যা ১১৬৭৪জন, তাহলে উপরোক্ত অনুপাতে ডার্লংদের বর্তমান জনসংখ্যা কম-বেশী ৬,৫০০জন।

গোষ্ঠী প্রথা

স্মরণাতীত কাল থেকেই ডার্লংদের নিজস্ব গোষ্ঠী প্রথা ছিল। সমাজে গোষ্ঠীপতির পদ উদ্ভব হওয়ার পূর্বে সাতটি গোষ্ঠী-শাখা গ্রামীণ অনুশাসনের দায়িত্ব পালন করতো। সেই শাখাগুলি হলো — ১) চাওংকাল, ২) চাওননেল, ৩) ইনভাং, ৪) রানতে, ৫) ত্লুকুতে, ৬) তুয়াল্নগেন ও ৭) ফেনকাউই। পরবর্তী কালেও এই শাখাগুলির গোষ্ঠীপতিরা ডার্লং সমাজের যে-কোন সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে সহযোগিতা করতে থাকে।

থাংগুর ছিলেন ডার্লংদের প্রথম গোষ্ঠীপতি। প্রথম গোষ্ঠীপতি থাংগুর-এর জন্ম সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীগুলির মধ্যে কোনও কোনওটা যৌক্তিক, কোনও কোনওটা নয়। কোনও কোনওটা যৌক্তিক বা অযৌক্তিক সেগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করতে না গিয়ে বর্তমানে প্রচলিত গোষ্ঠী প্রথার উপর আলোকপাত করা উচিত। বর্তমান ডার্লং উপজাতি সমাজে কুকি-চীন, বিশেষ করে হ্মার (Hmars) ও মিজো উপজাতি গোষ্ঠীর অন্ততঃ ২৪টি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত আছে। গোষ্ঠীপতি প্রথা উদ্ভবের পূর্বে কতটি গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী ছিল বলা কঠিন, কিন্তু এ'টা পরিষ্কার যে, উপরোক্ত সাতটি প্রভুত্বকারী গোষ্ঠী এবং অন্যান্য প্রভুত্বকারী নয় এমন গোষ্ঠী — এই দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো। গোষ্ঠীপতি উদ্ভবের পর ডার্লং সমাজ তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা ১) গোষ্ঠীপতি শ্রেণী, ২) নুসুম পারুয়াল শ্রেণী এবং ৩) লালচি লই শ্রেণী।

ডার্লং ভাষা

ডার্লংদের কথ্য ভাষাকে বলা হয় "ডার্লং তাউং" (Darlong Tawng) বা "রিয়াম তাউং" (Hriam tawang)। Tawng শব্দের মানে হলো উপ-ভাষা। এই ভাষা হ্মার (Hmars), মিজো এবং কুকি-চীন গোষ্ঠীর অন্যান্য উপজাতিদের উপ-ভাষাগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এই উপ-ভাষাগুলি Tibeto-Buman ভাষা-বংশের বার্মিজ শাখার অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে ডার্লং ভাষায় অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমান ডার্লং ভাষাটি অন্যান্য উপজাতিদের ভাষার চেয়ে হ্মার (Hmars) ও মিজোর ভাষার সঙ্গে অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ। ডার্লং লোকগীতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ডার্লং ভাষাটি হ্মার (Hmars) ও লুসাই — এই দুইটি ভাষারই অংশ বিশেষ। সম্ভবতঃ এই কারণেই ডার্লংরা হ্মার (Hmars) ও লুসাই — এই দুইটি ভাষাই বুঝতে এবং বলতে পারে। কিন্তু হ্মার (Hmars) ও লুসাইরা ডার্লং ভাষা খুব বেশী বুঝতে পারে না। যেমন, নিম্নে উল্লেখিত গানটি লুসাই ভাষার, কিন্তু ডার্লংরা গানটিকে

নিজেদের বলে দাবী করে এবং গানটির উৎপত্তি সম্পর্কে কাহিনী বলে থাকে।

Thlepui a leh ni chun tlangah
Siahthing a her tliah e;
Vala e ka thah ni chun ngaevvar
Siathing Ka her tliah

উপরোক্ত লোক-গীতির মানে হলো ঃ–

যেদিন ঝড়ো বাতাস পাহাড়কে আন্দোলতি করে,
শক্ত গাছগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করে,
যেদিন আমি বন্য শুয়োর হত্যা করি,
আমি শক্ত গাছগুলিকেও ভেঙ্গে চুরমার করি...

কোন এক পর্যায়ে ডার্লংদের একটা অংশ "চুংত্লাং তাউং" (Chungtlang tawng), যার মানে পাহাড়ীদের উপভাষায়ও কথা বলতো। এই উপভাষাটি বর্তমান লুসাই ও ডার্লং উপভাষার মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। এই উপভাষাটি বিশেষতঃ দক্ষিণ বিভাগে বসবাসকারী ডার্লংদের মধ্যে চল্লিশ দশক পর্যন্ত চালু ছিলো। বর্তমানে মুষ্টিমেয় ডার্লং প্রবীণ ব্যক্তিরা ছাড়া সেই উপ-ভাষা কেউ জানে না।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনারীরা আসার পূর্ব পর্যন্ত ডার্লং ভাষার কোন লিখিতরূপ ছিল না। মিজো খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা ডার্লং গ্রামগুলিতে মিজো মাধ্যম স্কুল স্থাপন করে, এবং সেই স্কুলগুলিতে মিজো ভাষার জন্য Hunterian system বলে খ্যাত রোমান লিপিতে ধ্বনিমূলক বানান পদ্ধতি চালু করা হয়। মুরুয়াই নিবাসী পাস্তর তুয়াংকুংগা স্মরণ করেন যে, ডার্লং ছাত্ররা শুধুমাত্র লুসাই ভাষাতেই চিঠিপত্র লিখতো।

উদাহরণস্বরূপ ঃ-

"Ka pa duh tak,
I dam chuan ka lawn e: keipawh
Ka dam e, -etc.
    I fapa duh ka
    ....kuki."

বাংলা অর্থ ঃ-

"প্রিয় পিতা, আপনি যদি
ভাল থাকেন, আমি সুখী হবো
আমিও ভাল ....
আপনার আদরের পুত্র
.... কুকি।"

খৃষ্টান মিশনারীরা অবশ্য জোর দিতেন যে "কুকি"-র পরিবর্তে তারা "ডার্লং" লেখা উচিত। কারণ, ইতিহাস প্রমাণ করে যে, তারা ডার্লং, কুকি নয়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ডার্লং গ্রামগুলিতে প্রথম স্কুল স্থাপিত হয়। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে চারজন ছেলে এবং তিনজন মেয়েকে পড়াশুনার জন্যে রাজ্যের বাইরে পাঠানো হয়। লুসাই ভাষার জন্য গৃহীত

রোমান লিপির মাধ্যমেই ডার্লংরা ধীরে ধীরে পড়াশুনা করতে থাকে। এই লিপির মাধ্যমেই ডার্লং ভাষাও উন্নতি লাভ করেছে।

ডার্লংদের জীবিকা

রাজ্যের অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর মতো ডার্লংদেরও প্রধান জীবিকা জুম চাষ। জুম চাষ তাদের জীবনচর্চা, জুম চাষ তাদের গর্বের বিষয়। জুমকে কেন্দ্র করেই তাদের আনন্দ-উৎসব, গান, হাসি-কান্না। জুম চাষ শুধুমাত্র তাদের জীবিকার উৎস নয়, প্রেম-ভালবাসারও উৎস।

জুম-চাষ পদ্ধতি অভিন্ন ও সার্বজনীন। ডার্লংরাও সাধারণতঃ জুম-চাষে একই পদ্ধতি গ্রহণ করে। জুম চাষে বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত, যেমন ঃ ১) জুমক্ষেত্র নির্বাচন, ২) জুম কাটা ও জুমক্ষেত্র পোড়ানো, ৩) বীজ বপন, ৪) আগাছা বাছাই, ৫) জুমক্ষেত্র রক্ষন, ৬) জুম-ফসল সংগ্রহ, এবং ৭) শস্য-মাড়াই।

এখন জুম-চাষের বিশেষ কয়েকটি পর্যায়ে ডার্লংদের অনুসৃত পন্থা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হচ্ছে।

ক) জুম-ক্ষেত্র নির্বাচন

বাঁশ এবং ঘন গাছ-গাছালি ও লতা-পাতা পরিপূর্ণ জঙ্গলই জুম-চাষের উপযুক্ত বিবেচনা করা হয়। কোনদিন আবার হয়নি এমন কুমারী বনকে ডার্লংরা "রিহাল" বলে। "রিহাল" পছন্দ করার পর সেটা জুম-চাষের জন্য শুভ-অশুভ নির্ণয় করতে হয়। একটা বাঁশের টুকরোকে সমানভাবে চিরে চেলা করা হয়। জুমক্ষেত্রের নির্বাচক বাঁশের দুটোকে এক সঙ্গে হাতে ধরে উপরে উৎক্ষেপণ করে মাটিতে ফেলে দেয়। যদি দেখা যায় দুটো চেলার মধ্যে একটি উপুর, অন্যটি চিৎ, তাহলে জুম-চাষের জন্য জঙ্গলটি শুভ। আর দুটো চেলা-ই যদি উপুর অথবা চিৎ হয়, তাহলে অশুভ ধরা হয়। যদি জঙ্গলটি জুম-চাষের জন্য শুভ-চিহ্ন পাওয়া যায়, সেই জঙ্গলটির পাদদেশে কিছু স্থান পরিস্কার করে দুইটি বাঁশ আড়া-আড়িভাবে পুঁতে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিকে ডার্লংরা "থালাউর (Thalawr)" বলে। এটা দেখে সবাই বুঝতে পারবে জায়গাটি জুম-চাষের জন্য নির্বাচিত হয়ে গেছে, এবং কেউ জায়গাটি দখল করার চেষ্টা করে না।

খ) জুমক্ষেত্র কাটা ও পোড়ানো

ডার্লং যুবক যুবতীদের কাছে জুম-কাটা আনন্দ-উৎসবের একটা মাধ্যম। জানুয়ারী মাসে জুম কাটা হয়। জুম কাটার জন্য যুবকদের এবং যুবতীদের আলাদা আলাদা দল তৈরী করা হয়। যুবকদের দল জুম কাটার মাধ্যমে নিজেদের শক্তি ও কসরত প্রদর্শন করে, আর যুবতীদের দল তাদের কাজে দক্ষতা দেখে বাহবা জানাতে থাকে। জুম কাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুবক যুবতীরা নাচ, গান, হৈহুল্লোড়-এর মাধ্যমে বহু অপেক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত "চাপচার কুত (Chapchar Kut)" অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন ধন-দৌলতের দেবী "ফাপিতে"কে (Fapite) মুরগী নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে "Kut inlum" বলা হয়। কিন্তু বর্তমান খ্রীষ্টান ধর্মের রীতি অনুসারে "Kut inlum"-এর পরিবর্তে প্রার্থনা করা হয়।

"Chapchar Kut অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর এবং কাটা বাঁশ, গাছ-গাছালি ইত্যাদি সম্পূর্ণ শুকনো হওয়ার পর জুম-পোড়ানো হয়। জুম পোড়ানো হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টিকারী ও উত্তেজনা

সৃষ্টিকারী একটি কার্য্যক্রম। জুমের আগুন ঠাণ্ডা হওয়ার পর জুমিয়া পরিবারের সবাই দল বেধে জুম পরিষ্কার করে।

গ) জুমে বীজ-বপন

জুমে সমস্ত ধরনের ফসলই উৎপাদন হয়। ধান প্রধান শস্য হলেও অন্যান্য শস্য ও ফলমূল যথা— কার্পাস, ভুট্টা, তিল, শশা, তরমুজ ইত্যাদি বপন করা হয়। ধান, ভুট্টা ও কার্পাস এক সঙ্গে মিশিয়ে বপন করা হয়। তিল, বেগুন ইত্যাদির বীজ জুম ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে কচু ও হলুদ আলাদাভাবে রোপন করা হয়। এভাবে একটা জুমে অন্ততঃ চল্লিশ রকমের ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। জুমে বীজ বপন শুরু করার আগেই ডার্লংরা জুমের একটি বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে একটা ছোট ঘর তৈরী করে নেয়। এই ঘরটিকে ডার্লংরা "তু (Tu)" বলে। এই ঘর বিশ্রাম, খাওয়া-দাওয়া, জুম পাহাড়ার সময় রাত্রিযাপন ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়।

ঘ) জুম পাহাড়া ও ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

জুম ফসলের রক্ষণাবেক্ষণ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জুম ফসল পাহাড়া ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডার্লং জুমিয়ারা নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে —

প্রহরী মঞ্চ ঃ জুমের কেন্দ্রস্থলে লম্বা শক্ত বাঁশ পুতে কিংবা কোন উঁচু গাছের ডালে মাচা তৈরী করা হয়। এই মাচায় বসে জুমিয়া জুমের চারদিকে নজর রাখে।

থ্লাকবাউক (Thlawkbawk) ঃ এটা পশুপাখী তাড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম। একটি বড় লম্বা বাঁশকে তিন ভাগে দুই ভাগ সমানভাবে চিরা হয়। এরপর চিরা অংশটি উপর দিকে রেখে বাঁশটিকে একটু হেলানোভাবে মাটিতে পুঁতা হয়, এবং বাঁশের উপর অংশটি অনুভুমিক পুঁতা শক্ত বাঁশের সঙ্গে বাধা হয়। বাঁশের একটি চেরা অংশের উপরিভাগ লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে জুম-ঘর অথবা প্রহরী মঞ্চ থেকে দড়িটি টান দিলে হাততালির মত অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি হয়। এই ভীতিজনক শব্দে জুমক্ষেত থেকে পশুপাখী পালিয়ে যায়।

ফাঁদ ঃ জুমক্ষেত থেকে পশু-পাখী তাড়ানোর জন্য বিভিন্ন রকম ফাঁদ পাতা হয়। শুধু জুমক্ষেত থেকে পশু-পাখী তাড়ানোর উদ্দেশ্যে নয়, ফাঁদ পাতা হয় পশুপাখী শিকারের জন্যেও।

মানুষের প্রতিকৃতি ঃ কুৎসিত ও ভীতিজনকভাবে তৈরী মানুষের প্রতিকৃতি জুমক্ষেত-এর মাঝখানে পুঁতা বাঁশের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যাতে বাতাসে প্রতিকৃতিটি ঝুলতে থাকে। মাঝে মধ্যে পাখীর পালকও প্রতিকৃতির সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হয়। এতে ছোট ছোট পাখীদের কাছে প্রতিকৃতিটি বড় শিকারি পাখী মনে হতে পারে।

তীর-ধনুক ও চিৎকার ঃ তীর-ধনুকের সাহায্যেও পশু-পাখী তাড়ানো হয়। এছাড়া, বিকট চিৎকার করে পশু-পাখী তাড়ানো যায়। সাধারণতঃ পাহাড়-অরণ্য এলাকায় বসবাসকারী উপজাতি মানুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত। তাই তারা জানে কিভাবে চিৎকার করলে কোন পশু ভয় পায়। পশু-পাখী তাড়ানোর জন্য তারা হাততালি-সহ সেভাবে চিৎকার করে।

ঙ) শস্য সংগ্রহ

জুম ক্ষেতে একই সঙ্গে বিভিন্ন শস্য ও ফলমূল-এর বীজ বপন করা হয়। কিন্তু সেগুলির পরিপক্কতা হয় বিভিন্ন সময়ে। কাজেই জুমের ফসল সংগ্রহ করতে হয় বিভিন্ন পর্যায়ে। প্রথম

পর্যায়ের ফসলগুলি হলো — শশা, তরমুজ, ভূট্টা, চালকুমোড় ইত্যাদি। ধান-ই জুমের প্রধান শস্য। জুমিয়া পরিবারের সমস্ত সদস্য এই শস্য সংগ্রহে অংশগ্রহণ করে। শস্য সংগ্রহের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে জুমিয়া পরিবার প্রয়োজনে গ্রামের অন্যান্য পরিবারের সাহায্য নিয়ে থাকে। সংগৃহীত ধানের ছড়া জুম-ঘরে জড়ো করা হয়। ধান সংগ্রহ শেষ হওয়ার পর তৃতীয় পর্যায়ের ফসল সংগ্রহ করা হয়। এই পর্যায়ের ফসলগুলি হলো — হলুদ, মরিচ, তিল, কার্পাস ইত্যাদি।

শস্য সংগ্রহের প্রথম পর্য্যায় থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত জুমিয়া পরিবারের সমস্ত সদস্যই জুম-ঘরে বসবাস করে। শস্য সংগ্রহের এই সময়টা জুমিয়াদের কাছে খুবই আনন্দের। খোলা আকাশের নীচে বসে লোক-কথার গল্প বলে, এবং গান গায়। এই সময়ে ডার্লং যুবক যুবতীরা "লালখাওলুর (Lalkhawlur)" গান গায়, এবং আনন্দে হৈহুল্লোড় করে। প্রেম, ভালবাসা, আনন্দের এই সময়টা কোন জুমিয়া হারাতে চায় না।

ডার্লংদের খাদ্যাভাস

মাংস ডার্লংদের প্রিয় খাদ্য। মাংস ছাড়াও, ডার্লংরা তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সহজলভ্য সমস্ত খাদ্যইগ্রহণ করে। কিন্তু অতীতে সর্বপ্রাণবাদ যুগে ডার্লংদের খাদ্যাভাসে ভীষণ বাধানিষেধ ছিল। তারা গরুর মাংস এবং অন্য পশু দ্বারা নিহত কোন পশুর মাংস খেত না। এমন কি অন্য উপজাতি গোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার পূর্বে তারা চা পর্যন্ত খেত না। সমাজে পূজকদের ভেতর খাদ্যাভাসে বাধা নিষেধ আরও বেশী ছিল। অবশ্য খাদ্যাভাসের এরূপ বাধানিষেধ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীদের মধ্যেও সমানভাবে বিদ্যমান। যেমন হিন্দুরা গো-মাংস খেত না, কারণ গরুকে তারা পবিত্র মনে করে। আবার মুসলমানরা শুয়োরের মাংস খায় না, কারণ তারা শুয়োরকে অপবিত্র মনে করে। সাম্প্রতিক কালে ডার্লংরা ধর্মের এসব বাধানিষেধ জয় করতে সক্ষম হয়েছে, বিশেষ করে খৃষ্ট ধর্মের সংস্পর্শে আসার পরে। এমন নয় যে, খৃষ্ট ধর্ম তাদের এই বিষয়ে উৎসাহ যুগিয়েছে, কারণটা হলো খৃষ্ট ধর্ম স্পষ্ট কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করে না।

চাউল ডার্লংদের প্রধান প্রিয় খাদ্য। চাউল ছাড়া অন্য কোন পরিবর্ত খাদ্যশস্য সাধারণ ডার্লংরা এখনও রপ্ত করতে পারেনি। জংলী শাক-সব্জী-সহ ডার্লংদের খাদ্যবস্তুর তালিকা অনেক দীর্ঘ। রাজ্যের অন্যান্য উপজাতিদের মত ডার্লংরাও রাজ্যের অরণ্যে সহজাত বাঁশের করুল, বন-আলু, বন-কচু সহ ২০/২২ রকমের শাক-সব্জী, লতা-পাতা ও গাছের মূল দৈনন্দিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। সেই সঙ্গে জুম ও আধুনিক কৃষি জমিতে উৎপাদিত শাক-সব্জীতেও তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু কয়েক দশক আগেও ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, এবং তখন তাদের খাদ্যভাস ছিল সম্পূর্ণ জুম-নির্ভর। জুম-নির্ভর জীবন-যাত্রায় তারা দৈনিক তিনবার খাদ্য গ্রহণ করতো — যেমন খুব ভোরে জুমক্ষেতে যাওয়ার পূর্বে, দুপুরে জুমক্ষেতে এবং সন্ধ্যায় বাড়ীতে জুমক্ষেত থেকে ফিরে আসার পর।

বর্তমান সময়ে সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছার পর এবং অন্যান্য জাতি-উপজাতি মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ডার্লংদের খাদ্যাভাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। তারা তাদের সহজাত খাদ্যবস্তু ছাড়াও আধুনিক খাদ্যবস্তুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ডার্লং সমাজ এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। রাজ্যের সমগ্র

উপজাতি জনসংখ্যার ১ (এক) শতাংশেরও কম হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে ডার্লং সমাজের অগ্রগতি এবং সরকারী চাকরির বিভিন্ন পদে তাদের অংশগ্রহণ সর্ববিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে ডার্লং সমাজের একটা অভিজাত স্তর সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্য জাতি-উপজাতি মানুষের সঙ্গে মেল-বন্ধনের ফলে তাদের চিরাচরিত খাদ্যাভাসে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি খাদ্য গ্রহণের সময়ও পরিবর্তন হয়েছে। এখন ডার্লং সমাজের অধিকাংশ মানুষ দৈনিক তিনবারের জায়গায় দুইবার খাদ্যগ্রহণ করে।

গ্রামীণ প্রশাসন

ডার্লং সমাজ, এমন কি সমাজে গোষ্ঠীপতি প্রথা চালু হওয়ার আগে থেকেই, সুস্থ নিয়মনীতির মাধ্যমে গ্রামীণ প্রশাসন পরিচালনা করে এসেছে। গোষ্ঠীপতি প্রথা চালু থাকার সময়ে গোষ্ঠীপতি তার সমস্ত প্রজার প্রতি ন্যায় বিচার করতেন, প্রজাদের সবরকম প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট থাকতেন। তবে সমস্ত কার্য্যকলাপ সুস্থভাবে সম্পাদনে গোষ্ঠীপতিকে সাহায্য করার জন্য একদল গ্রামীণ পদাধিকারীর প্রয়োজন ছিল। ডার্লং সমাজে গোষ্ঠীপতির যুগে গ্রামীণ প্রশাসনের শাসকগণ নিম্নরূপ ছিল ঃ

লাল (Chief)

খাউনবাউল / মুকতিয়ার (Advisor of the chief)

খাওপা (Village Secretary),

তারত্লাং (Village Elders)

ক) লাল (Lal) ডার্লং সমাজে গ্রামীণ প্রশাসনে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তিনি এক বা একাধিক গ্রাম শাসন করতে পারতেন। তার সমস্ত প্রজাই তাকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী স্বীকাব করে এবং তার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। কেউ যদি কোন অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত হয়, কিংবা মানুষ হত্যার মত মারাত্মক অপরাধ করে গোষ্ঠীপতির গৃহে প্রবেশ করে এবং ঘরের মধ্যস্থ খুঁটি দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে, তাহলে গোষ্ঠীপতি তাকে তার অপরাধের ক্ষমা করেন এবং তাকে ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করেন। গোষ্ঠীপতির ক্রীতদাস হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর সেই মানুষ তার অপরাধের জন্য বাইরের যে-কোন আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। গ্রামে গোষ্ঠীপতির কথাই শেষ কথা, এবং গ্রামবাসীদের কাছে আইন হিসাবে গণ্য করা হয়। গোষ্ঠীপতির এক বা একাধিক গ্রামপ্রধান থাকেন, তাদের বলা হয় খাউনবাউল কিংবা মুকতিয়ার। তারা গ্রাম কিংবা গ্রামের বাইরের সমস্ত আইনী বিষয়ে গোষ্ঠীপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। গোষ্ঠীপতির প্রসাশনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীকে চাঁদা দিতে হতো।

যারা অপরাধ করে গোষ্ঠীপতির গৃহে প্রবেশ করতে চায়, তাদের কাছে গোষ্ঠীপতির গৃহটি আশ্রয়স্থল। কেউ গোষ্ঠীপতির গৃহে প্রবেশ করলে সে বা তার পরিবার গোষ্ঠীপতির ক্রীতদাসে পরিণত হয় এবং পরিবর্তে গোষ্ঠীপতি তার বা তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। কেউ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত না করা পর্যন্ত সেই ব্যক্তি বা তার পরিবারের ক্রীতদাসত্ব চলতে থাকে। তবে গোষ্ঠীপতিরা সাধারণতঃ ক্রীতদাসের উপর দুঃসহ আচরণ করতেন না। যদি

কোন গোষ্ঠীপতি তার ক্রীতদাসের উপর অত্যাচার করেন, তাহলে সেই ক্রীতদাসরা পালিয়ে গিয়ে অন্য কোন গোষ্ঠীপতির গৃহে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতো।

খ) খাউনবাউল / মুকতিয়ার

খাউনবাউল এবং মুকতিয়ার সমার্থক হলেও তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের কিছুটা পার্থক্য আছে। খাউনবাউল হলেন, গ্রামের ভিতরকার বিষয়ের জন্য গোষ্ঠীপতির উপদেষ্টা। আর মুকতিয়ারের দায়িত্ব হলো ডার্লং গোষ্ঠীপতির সঙ্গে অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীপতিদের সুস্থ যোগাযোগ স্থাপন এবং সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এই দুই পদাধিকারীকেই গোষ্ঠীপতি স্বয়ং নির্বাচন করে থাকেন, এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ মনে করলে তিনি তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন। গ্রামের প্রত্যেকটি বৈঠক খাউনবাউলের ঘরে অনুষ্ঠিত হয়।

গোষ্ঠীপতি প্রথা অবলুপ্তির পর গ্রাম সভাপতির উপর প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। গ্রামের সমস্ত রকম বিরোধের বিচার তিনি করে থাকেন। গ্রাম পরিষদের সম্পাদক ও সদস্যগণ গ্রাম সভাপতির কাজে সহায়তা করেন। কোন শিকারী বন্য পশু হত্যা করলে পশুটির সামনের পাটি গ্রাম সভাপতিকে উপহার দিতে হয়। যদিও এই রীতিটি বাধ্যতামূলক নয়, গ্রামের কেউ ভোজের আয়োজন করলে সভাপতিকে নেমতন্ন করা হয়ে থাকে।

খাউপা (Khawpa) ঃ খাউপা হলেন গ্রাম সম্পাদক। তিনি গ্রামে সংঘটিত সমস্ত ঘটনার তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখেন। গাও-বুড়ারা তাকে নির্বাচন করেন। গ্রাম সভাপতির অনুমোদনক্রমে তিনি সমস্ত বৈঠক আহ্বান করেন। গোষ্ঠীপতি প্রথার যুগে প্রত্যেকটি গাও-বুড়াদের সভা খাউপার বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হতো।

তারত্লাং (Tartlang) ঃ তারত্লাং একটি যুগ্ম শব্দ যার অর্থ "গ্রাম বৃদ্ধরা"। তারা গ্রামবাসীদের সমস্ত রকম ভাল-মন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং গ্রামের প্রত্যেক মানুষের প্রতি ন্যায়-বিচার যাতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। গ্রাম প্রশাসনে তারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

লেইকাম (Leikam) ঃ লেইকাম মানে মধ্যস্থতাকারী। দুই ধরনের মধ্যস্থতাকারী গাও-বুড়াদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তারা গাও-বুড়া ও অভিযুক্তদের মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করেন। তারা গাও-বুড়াদের খাদ্য রান্নার কাজও করেন। গাও-বুড়ারা তাদের কাজের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন, এবং কোন অনাকাঙ্খিত কার্যকলাপের জন্য তারা বরখাস্ত হতে পারেন। গ্রাম প্রশাসনে তারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সর্দার রেংগা এবং পু ভাংঘাকা ডার্লং সমাজের গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিলুপ্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তারা ডার্লং উপজাতি সমাজের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্বীকার না করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং প্রথমবারের মত গ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। গ্রাম পরিষদের সভাপতির হাতে গ্রাম প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, এবং নাম (Hnam) কমিটির সভাপতি সমগ্র ডার্লং উপজাতি সমাজের সমস্ত বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী হন।

প্রকৃত পক্ষে ১৯৩৬ সাল থেকে গ্রাম পরিষদ গোষ্ঠীপতির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাস করে গ্রাম

প্রশাসনের কার্যকলাপ শুরু করে। লাল্লিয়ানথুয়ামা (পালিয়ান গোষ্ঠীপতি) উত্তর বিভাগের এবং লালছয়ালভেলা (থাংগুর গোষ্ঠীপতি) দক্ষিণ বিভাগের শেষ গোষ্ঠীপতি হিসাবে চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে গ্রাম শাসন করেন। এইভাবে চল্লিশ দশকের শেষার্ধে ডার্লং সমাজে গোষ্ঠীপতি প্রথার অবসান ঘটে।

ডার্লং সমাজের চিরাচরিত সামাজিক প্রথা সমূহ

স্মরণাতীত কাল থেকেই গোষ্ঠীপতিদের কর্তৃত্বে ডার্লংদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছিল। গোষ্ঠীপতিদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়ার পরও তাদের এই শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। ডার্লংদের গ্রাম শাসনের অন্যতম কাজ হলো তাদের চিরাচরিত সামাজিক প্রথাসমূহ কার্যকরী করা। বর্তমান সময়ে সামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত প্রথাসমূহ লিখিতরূপ দেওয়া হয়েছে এবং যে-কোন সামাজিক সমস্যা চিরাচরিত প্রথা অনুসরণে সমাধান করা হয়ে থাকে। এরকম কোন সমস্যা নেই যা এই প্রথা দ্বারা সমাধান করা হয় না। সমস্ত ডার্লং গ্রামেই চিরাচরিত প্রথাসমূহ কার্যকরী হয়ে থাকে, এবং কোন বিষয় যদি গ্রাম পরিষদ সমাধানে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেটা কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানো হয়। যে –কোন বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক।

গ্রামের যে-কোন সমস্যা গ্রাম পরিষদ সমাধান করে থাকে। দুইটি গ্রামের মধ্যে যদি কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়, সেটা সংশ্লিষ্ট দুইটি গ্রাম পরিষদ যৌথ বৈঠকে বসে সমাধানের চেষ্টা করে থাকে। কোন ক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা পক্ষকে পুলিশ বা রাজ্য সরকারের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না। কারণ, ডার্লং সমাজে দুই বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে কলহ-বিবাদের মত সাধারণ বিষয় থেকে হত্যার মত বিষয় সমস্তই চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিচার করা হয়ে থাকে। এখানে চিরাচরিত সামাজিক প্রথা-সমূহের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো ঃ

১) সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন ঃ

ক) সাক্ষীদের উপস্থিতিতে পিতা নিজের ইচ্ছানুসারে সন্তানদের সম্পত্তি ভাগ করে দেন।

খ) পিতার মৃত্যু হলে, মা সাক্ষীদের সামনে রেখে তার সন্তানদের সম্পত্তি বিতরণ করেন।

গ) পুত্র-সন্তানহীন পিতা কন্যা-সন্তানদের সমানভাবে সম্পত্তি ভাগ করে দেন। পিতা-মাতাহীন সন্তানরা আত্মীয়স্বজনদের অভিমত অনুসারে নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়।

ঘ) পিতা-মাতাহীন কোন নাবালক সন্তানকে সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়া হয় না। কিন্তু সেই সন্তানের অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির অংশীদারীত্ব দেওয়া হয়।

২) দুর্ঘটনা-জনিত আইন ঃ

ক) যদি কোন ব্যক্তি কাউকে দুর্ঘটনাজনিত কারণে কষ্টকর জখম করে থাকে, তাহলে তাকে ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানা করা হয়। যদি জখম ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহলে জখম ব্যক্তির সমস্ত চিকিৎসা খরচ, এবং মৃত ব্যক্তির পারলৌকিক সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয়, মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিকে বহন করতে হয়।

খ) দুর্ঘটনাবশতঃ যদি কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং সেই অগ্নিকাণ্ড প্রতিবেশীদের ঘরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে যে বাড়ী থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে সেই বাড়ীর মালিককে গ্রাম পরিষদের

কাছে জরিমানা দিতে হয়, এটা ডার্লং ভাষায় বলা হয় — "Khawheng lak lei."।

৩। বিবাহ আইন

ক) পালাই (negotiator)-এর মাধ্যমে বিবাহ প্রস্তাব শুরু করা হয়।

খ) বিবাহ প্রস্তাব করার সময়, ঘটকেরা পাথুরে মাটির কোদাল কিংবা কুড়ালি বাগদানের প্রতীক হিসাবে যুবতী মেয়ের পিতা-মাতার কাছে নিয়ে যায়। এটা ডার্লং ভাষায় "থিলখাং (Thilkhang)" বলা হয়। বিবাহ-প্রস্তাবে রাজী হলে যুবতী মেয়ের পিতা-মাতা থিলখাংটি গ্রহণ করেন এবং রেখে দেন। যুবতী মেয়ের পিতা-মাতা থিলখাংটি প্রস্তাবক যুবককে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ যুবতীর জন্য প্রস্তাব পাঠাতে পারে না। প্রথাটি অদ্যাবধি প্রচলন আছে।

গ) কন্যা-পণ বিবাহ অনুষ্ঠানের রাত্রে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই সম্পূর্ণ দিতে হয়।

ঘ) বিবাহ-প্রস্তাব চূড়ান্ত হওয়ার পর, যুবক যদি যুবতীকে বিবাহ করতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে তাকে ত্রিশ টাকা জরিমানা দিতে হয় এবং যুবতী অগ্রিম পাওয়া কন্যা-পণ সম্পূর্ণ যুবককে ফেরত দিয়ে দেয়। অপরদিকে, যুবতী যদি যুবককে বিয়ে করতে অস্বীকার করে, তাহলে যুবতী অগ্রিম পাওয়া কন্যা-পণের একটা অংশ মাত্র ফেরত দিতে হয়।

ঙ) কোন যুবকের বাগদানে ব্যাঘাট সৃষ্টির ফলে যদি বিবাহ বাতিল হয়, তাহলে সেই যুবককে ত্রিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে এবং অগ্রিম দেওয়া পণের টাকা সম্যক পরিশোধ করতে হবে।

চ) আইন-মাফিক বিবাহ চার্চের নিয়ম অনুযায়ী পাস্তুরের ধারা চার্চে সম্পন্ন হবে।

ছ) মধ্যস্থকারী দ্বারা অবৈধ কোন বিবাহ চার্চে অনুষ্ঠিত হয় না।

জ) যদি কোন যুবক কোন যুবতীকে গোপনে ঘরে নিয়ে তুলে, সেই বিবাহ চার্চে অনুষ্ঠিত হবে না। যুবক যুবতীকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসার আগে এবং বিষয়টি গ্রাম পরিষদের গোচরে আসার আগে যুবতীর পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজন যুবতীকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার অধিকার আছে। কিন্তু "আরমিত এন (Armit en)" অনুষ্ঠানের পর যুবতীর পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের সেই অধিকার থাকবে না।" আরমিত এন (Armit en)" অনুষ্ঠান হলো, গ্রাম পরিষদের সদস্য উপস্থিতিতে একটি লাল মোরগ কাঁটা হয়, যাতে যুবতীকে আর কেউ দাবী করতে না পারে।

৪। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন

ডার্লং সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদকে অতিশয় ঘৃনার চোখে দেখা হয়। কিন্তু শক্ত বাধা-নিষেধ সত্বেও সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে থাকে, এবং সেগুলি নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সমাধান করা হয়।

ক) যদি স্বামী বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়, তাহলে তাকে ত্রিশ টাকা জরিমানা দিতে হয়। এই প্রথাকে বলা হয় "মাকথা (Maktha)"। আর যদি স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়, তাহলে তাকে "মানপুই (Hmanpui)", অর্থাৎ মূল কন্যা-পণ সম্যক স্বামীর পরিবারের কাছে ফেরত দিতে হয়।

খ) স্ত্রীর গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে ত্যাগ করে, সন্তানটি স্ত্রীর অধিকারভুক্ত হয়।

গ) যদি স্বামী সন্তান-সন্ততি-সহ স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তাহলে স্বামীকে সত্তর টাকা জরিমানা দিতে হয়ে। এই প্রথার নাম "ফারুয়াং (Faruang)" এবং এই "ফারুয়াং (Faruang)" না দিলে স্বামী সন্তান-সন্ততির অধিকার দাবী করতে পারে না।

ঘ) স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ-এর পর যদি তারা আবার বিবাহ করতে চায়, তাহলে স্বামী স্ত্রীর পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবককে সত্তর টাকা "মানপুই (Hmanpui)" প্রদান করে তারা সেটা করতে পারে।

ঙ) স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেউ যদি বিবাহ করতে চায়, সে গ্রাম পরিষদের যথাযথ গোচরে এনে তার শ্বশুর পরিবারের জন্য চা-চক্রের অনুষ্ঠান করে। এই প্রথাকে বলা হয় "ইনডেলথা (Indulta)" অথবা "তারপু লাকা রেং লা (Tarpu laka Rneng la)" যদি সে রীতি পালন করতে ব্যর্থ হয়, এবং এই মর্মে তার শ্বশুর অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হয়।

চ) স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ও তার ছেলে-মেয়েদের যদি মৃত স্বামীর পরিবারের সঙ্গে, বিশেষতঃ পারিবারিক অশান্তির কারণে, বসবাস করা সম্ভব না হয়, তাহলে ত্রিশ টাকা "মাকথা (Maktha)" দিয়ে মৃত স্বামীর পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। স্ত্রী মৃত স্বামী প্রদত্ত সম্পত্তির ভোগ দখল করতে পারবে এবং নিজের পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে। এই বিচ্ছেদকে বলা হয় "থিহ্নুং ইনমা (thihnung inma)" অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর বিচ্ছেদ।

ছ) যদি কোন যুবতী মেয়ে বিবাহের আগে গর্ভবতী হয়, তাহলে যুবতী মেয়ের ভাষ্য অনুসারেই শিশুটির পিতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হয়, এবং অন্য কোন তদন্ত ছাড়াই গ্রাম্য বিচারসভা সেটা অনুমোদন করে। যদি যুবক যুবতী মেয়েটিকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে পঞ্চাশ টাকা "রাল ইনমা (Ral inma)" জরিমানা দিতে হয়। "রাল ইনমা (Ral inma)" মানে "বিবাহের আগে বিচ্ছেদ"। কিন্তু এই বিচ্ছেদটা যদি কোন মহিলা দ্বারা সংঘটিত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন জরিমানা ধার্য্য করা হয় না।

৫। ব্যভিচার-ঘটিত আইন

ক) যদি কোন বিবাহিত মহিলা ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত হয়, সেটার বিচার চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তার পিতার বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। যদি স্বামী তাকে পুনরায় গ্রহণ করতে আপত্তি না করে, এবং সে তার স্বামীর সঙ্গে মিমাংসা করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে গ্রাম বিচারসভাকে যথাযথ জানিয়ে স্বামীর গৃহে ফিরে যেতে পারে।

খ) যদি বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার কার্যে লিপ্ত হয়, স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত মহিলার কাছে পঞ্চাশ টাকা দাবী করবে। এই প্রথাকে বলা হয় "ভাউকসু (Vawksun)", এই জরিমানার টাকাটি গ্রামের মহিলাদের দ্বারা ব্যয় করা হয়।

গ) কোন পুরুষ কোন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলে এবং মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে গেলে, স্বামী নিজের ব্যভিচারিণী স্ত্রীর বিরুদ্ধে চল্লিশ টাকা জরিমানা (রেতলেই) ধার্য্য করবে।

ঘ) স্বামী যদি স্ত্রীর ব্যবিচারিনী কার্যকলাপ হাতে-নাতে ধরে ফেলে, সে তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রীর উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার অধিকারী, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষের উপরে নয়।

সমাজে সংঘটিত সমস্ত সমস্যার বিচার ও নিষ্পত্তি হয়তো চিরাচরিত সামাজিক প্রথা-সমূহ দ্বারা করা কঠিন। কিন্তু গ্রাম বিচারসভার আধিকারিকগণ নিজেদের সাধারণ বিচার-বুদ্ধি ও Veto ক্ষমতাবলে অসীম ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন।

বিচার কার্য্যে তারা সাধারণতঃ সহজাত সততার (Natural justice) উপর নির্ভর করে থাকেন।

বাইরে থেকে তাদের এই বিচার ব্যবস্থা কঠোর ও অবৈজ্ঞানিক মনে হতে পারে, কিন্তু এই বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমেই ডার্লংরা নিজেদের সমাজে শান্তি ও ঐক্য রক্ষা করে এসেছে।

ডার্লংদের সর্বোচ্চ সামাজিক সংগঠন DKWO-র কার্যকলাপ ও ক্ষমতা

ডার্লংদের গ্রাম পরিষদের কাজকর্ম ও ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। গোষ্ঠীপতি প্রথার যুগে গোষ্ঠীপতির অধীনে বিচারসভা সমাজে সংঘটিত প্রত্যেকটি বিষয় সুষ্ঠুভাবে মিমাংসা করতো, এবং সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ বিচারসভার রায় সহজেই মেনে নিতো। গোষ্ঠীপতি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর সামাজিক প্রশাসনের নিয়মনীতি সংশোধন করা হয় এবং সমাজের প্রতিটি মানুষের সমানভাবে ন্যায়-বিচার পাওয়ার অধিকার ঘোষণা করা হয়। গ্রাম পর্যায়ে অনুশাসনের কর্তৃপক্ষ গ্রাম পরিষদ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। ডার্লং সমাজে সর্বোচ্চ সামাজিক সংস্থা হলো — Darlong-Kuki Welfare Organisation (DKWO). Hnam (Community) President হচ্ছেন সংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তাকে সাহায্য করার জন্য আছেন — দুইজন Vice-President, একজন করে General Secretary, Asstt. general Secretary, Finance Secretary ও Treasurer এবং সাতজন Executive Member. ডার্লংদের স্থানীয় প্রশাসনের ২৪ নম্বর ধারা অনুসারে DKWO এবং এর আধিকারিকদের কাজকর্ম ও ক্ষমতা নিম্নরূপ ঃ—

ক) DKWO ডার্লং সমাজেব সমস্ত বকম উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

খ) DKWO চার্চ, রাজনীতি ও সমাজে বিদ্যমান সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের অভিভাবক এবং রক্ষক।

গ) DKWO ন্যায়-বিচার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

ঘ) কোন বিচারের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে যদি কোন আধিকারিক আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকেন, দায়ী আধিকারিক সমাজের কাছে জরিমানা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আইনটি কার্য্যকরী করবেন।

ঙ) যদি গ্রাম পরিষদ কোন বিষয়ে ফয়সালা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সর্বোচ্চ সংস্থা বিষয়টি মিমাংসার জন্য গ্রহণ করেন এবং এই সর্বোচ্চ সংস্থার প্রেসিডেন্ট দ্বারা ঘোষিত রায় কেউ কোনভাবে আপত্তি জানাতে পারে না। কারণ, ডার্লংদের Customary Law-এর ৩ (৪) ধারায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সমাজ থেকে উদ্ভূত কোন বিষয় রাজ্য বিচারালয়ে কিংবা পুলিশের কাছে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

চ) বিচারের রায় প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাম পরিষদের সভাপতি এবং তার আধিকারিকরা যদি আইনের কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা করেন, সর্বোচ্চ সংস্থা গ্রাম পরিষদের সভাপতি ও তার অধীনস্থ আধিকারিকদের উপর জরিমানা ধার্য্য করতে পারেন।

ছ) সমস্ত গ্রাম পরিষদের সভাপতি ও আধিকারিকদের দ্বারা একটি সাধারণ সভায় সর্বোচ্চ সংস্থার প্রেসিডেন্ট ও আধিকারিকগণ তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

জ) গ্রাম পরিষদের সভাপতি সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, কিন্তু তিনি ও তার আধিকারিকগণ সর্বোচ্চ সংস্থার কাছে দায়বদ্ধ।

ঝ) যদি সর্বোচ্চ সংস্থার প্রেসিডেন্ট তাঁর অধীনস্থ আধিকারিকদের মনে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি

করে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ ভাইস-প্রেসিডেন্টের কাছে তাদের অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট আধিকারিকদের সভা আহ্বান করতে পারেন এবং সেই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তিনি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, এবং পরবর্তী সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হবে।

ঞ) কোন কারণে যদি গ্রাম পরিষদের সভাপতির পদটি খালি পড়ে থাকে, সর্বোচ্চ সংস্থার অনুমোদনক্রম শূন্য পদটি পূরণ করা যাবে।

ডার্লংদের ধর্ম-বিশ্বাস ঃ

ডার্লং ভাষায় ধর্মকে বলা হয় "সাখুয়া"। "সা" মানে মাংস এবং "খুয়া" মানে গ্রাম। এখানে "খুয়া" বলতে "প্রকৃতি (nature)" বুঝানো হচ্ছে। ডার্লং সমাজের আদি ধর্ম-বিশ্বাসে প্রকৃতির বিবিধ প্রতিমূর্তির কাছে পশু উৎসর্গ করা হতো, এবং পশুর মাংস নৈবেদ্য দেওয়া হতো। সেই কারণেই ডার্লং ভাষায় ধর্ম বুঝাতে "সাখুয়া" শব্দ সৃষ্টি হয়েছে।

আদিম কালে ডার্লংরা বিশ্বাস করতো যে, প্রকৃতিতে অতিপ্রাকৃত শক্তি বিরাজমান। কোন কোন ক্ষেত্রে, যে-সমস্ত দেবতাদের তারা শ্রদ্ধা করত, ভয় করতো সেই সমস্ত দেবতাদের নামও তারা জানত না। সেই ভয় ও শ্রদ্ধা থেকেই আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ ও নৈবেদ্য দেওয়ার প্রথা শুরু হয়েছিল। তারা বিশ্বাস করতো, যে-সমস্ত দেবতাদের তারা পূজা করতো সেই সমস্ত দেবতা পৃথিবী ও স্বর্গ উভয় স্থানেই বিরাজমান থাকেন। দেবতারা মানুষকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ উভয় কাজই করেন বলে তাদের বিশ্বাস। এই কারণেই, অভিশাপের ভয়ে, এবং আশীর্বাদের আশায় তারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ও নৈবেদ্য দিতো। তারা বিশ্বাস করতো সংসারে সুখ-শান্তি ও সৌভাগ্য আনার মানসে এবং বন্ধনমুক্ত মানুষ হিসাবে পরলোকে প্রবেশ করার জন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট রাখা তাদের আনুষ্ঠানিক কর্তব্য। তারা বিশ্বাস করতো মৃত্যুর পরেও জীবন আছে, যদিও মত্যুর পরে ঠিক কিভাবে জীবনের অস্তিত্ব বিরাজ করে তারা জানতো না। চিরাচরিত সামাজিক প্রথা চালু হওয়ার সূচনা কালে, যখনই কোন গোষ্ঠীপতির মৃত্যু হতো, তাঁর পূর্ব পছন্দ মত একজন যুবা ছেলেকে খাদ্য, পানীয়, বাদ্য-যন্ত্র ইত্যাদি বস্তু-সম্ভার সমেত গোষ্ঠীপতির মৃতদেহের সঙ্গে কবর দেওয়া হতো। এরূপ প্রথা পালন করা হতো এই বিশ্বাসে যে, গোষ্ঠীপতি পরলোকেও তাঁর কর্তৃত্ব ও গৌরব বজায় রাখবেন।

ডার্লংদের ধর্মবিশ্বাসকে দুটো প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়, — পুরানো বিশ্বাস সর্বপ্রাণবাদ এবং নূতনটা হলো খ্রীষ্টীয় ধর্ম। সর্বপ্রাণবাদ ধর্মবিশ্বাসের কালে ডার্লংদের বহুসংখ্যক দেব-দেবী ছিলেন। এতসংখ্যক দেব-দেবী ছিলেন যে, পূজকরা নিজেরাও সমস্ত দেব-দেবীর নাম জানতো না, যদিও শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভয়ের সঙ্গে তারা সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করতো। যে-কোন অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ঘটনাকেই ভুত-প্রেত-এর কাণ্ড-কারখানা মনে করা হতো।

এই সমস্ত কারণেই, স্থান থেকে স্থানান্তরে অগ্রগমনের কালে তারা অনেক দেবতাকে পরিত্যাগ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন দেবতাকে গ্রহণ করেছিল। এর ফলে সর্বপ্রাণবাদ ধর্মবিশ্বাসকেও দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, — অপেক্ষাকৃতভাবে পুরানো, এবং অপেক্ষাকৃতভাবে নূতন

সর্বপ্রাণবাদ ধর্ম। ডার্লংদের খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ শুরু হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, এবং ডার্লংদের মধ্যে যারা এতদিন সর্বপ্রাণবাদী ছিলো তারাও ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমানে ডার্লংরা পাঁচটি প্রধান খ্রীষ্টীয় ধর্ম সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত, যথা — বাপটিস্ট, রোমান ক্যাথলিক, ইউনাইটেড পেনটেকসত্যাল চার্চ (UPC), ইভেনজেলিক্যাল ফ্রি চার্চ অব ইন্ডিয়া (EFCI) এবং প্রেসবিটারিয়ান চার্চ।

ডার্লংদের সাংস্কৃতিকজীবন

১) মস্তক-শিকার ঃ মস্তক-শিকার সম্পূর্ণরূপে পুরুষদের ক্রিড়া বিশেষ যেটা শুধুমাত্র ডার্লং সমাজে নয়, গারু, নাগা, খাসি, মিজো এবং হ্মার (Hmars) সমাজেও সমানভাবে প্রচলিত ছিলো। উপরোক্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলিতে কারও সামাজিক মর্যাদা এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের উপর নির্ভর করে। সমাজে নিজেদের বীরত্ব, সামাজিক পরিপক্কতা ও পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রয়োজন ছিল। সফল মস্তক-শিকারীরা উচ্চাভিলাষিনী অবিবাহিতা যুবতীদের হৃদয় জয় করতে পারতো এবং সমাজে উচ্চ সম্মান লাভ করত। জনপ্রিয়তা সত্বেও, এই খেলাটির গোড়াপত্তন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। যাই হোক, মস্তক শিকারের কয়েকটি কারণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ঃ—

ক) দুইটি গ্রামের মধ্যে কিংবা দুই গোষ্ঠীপতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা সময় সময় মস্তক শিকারের দিকে চালিত করতো, যেখানে একটা গ্রামের সাহসী মানুষেরা যতটা সম্ভব অন্য গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন মস্তক আনতে চেষ্টা করতো।

খ) সফল মস্তক শিকারের মাধ্যমে নিজেদের পৌরুষ প্রমাণ করা এবং মান-সম্ভ্রম লাভ করার যুবকদের ইচ্ছা থেকেও মস্তক শিকারের পত্তন হয়েছিলো।

গ) ধর্মীয় দিক থেকে মানুষ মনে করতো পরিবার এবং গ্রামের মঙ্গল কামনায় ঈশ্বরের কাছে সবচেয়ে বড় উপহার হলো মানুষের মস্তক।

ঘ) গ্রামের গোষ্ঠীপতি মৃত্যু হলে মৃত নেতাকে বিদায় জানানোর জন্য গ্রামবাসীরা মস্তক শিকারে যাত্রা করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, পরাজিত শত্রুরা পরলোকে মৃত গোষ্ঠীপতির অনুগামী হবে এবং সেখানে গোলাম হিসাবে তাকে সেবা করবে।

সমাজে মস্তক শিকারকে নিষ্ঠুর কার্য হিসাবে গণ্য করা হতো না। আগেই বলা হয়েছে কাজটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত এবং উচ্চ প্রশংসিত ছিল। সফল মস্তক শিকারীরা সমাজে উচ্চ সম্মান লাভ করতো এবং তাদের "রালথা (Raltha)" বলে ডাকা হতো, যার অর্থ "মহান যুদ্ধা বা শিকারী"। তাদের কাছে সেটা শুধুমাত্র সম্মানের চেয়েও বড় কিছু ছিল, কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে, একমাত্র সফল শিকারীরাই মৃত্যুর পরে পিয়ালরাল (Pialral), অর্থাৎ স্বর্গে বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন করে, কারণ সেখানে পরাজিত শত্রুরা গোলাম হিসাবে তাদের সেবা-শুশ্রুষা করে থাকে।

ডার্লংদের উৎসব-সমূহ

প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক জীবিকা জুম চাষে মানুষের জীবন যখন আবর্তিত হতো, তখন অবসর সময় বলে মানুষের জানা ছিল না। সুতরাং, বিরামহীন দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রম থেকে নিজেদের

উপশম করতে মানুষ বছরের নির্দিষ্ট সময় ও ঋতুতে সামাজিক উৎস পালন করতো। কৃষি-কার্য প্রক্রিয়ার চারটি পর্যায় অনুসারে ডার্লংদের চারটি বার্ষিক সামাজিক উৎসব বা কুত (Kut) ছিল, সেগুলি হলো ঃ—

চিরাচরিত রউসেম বাদনরত ডার্লং শিল্পী

ক) রামজু ইন (Ramzu In) কিংবা চাপচার কুত (Chapchar Kut) ঃ এটাকে বসন্ত ঋতুর উৎসব বলা যেতে পারে। জুম কাটার মত কঠোর পরিশ্রম এবং জুম পোড়া দেওয়ার পূর্বে, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে, এবং ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে এই উৎসব পালন করা হয়। তিন চারদিন ধরে এই উৎসব চলে। উৎসব অনুষ্ঠানের দিন-তারিখের অনেক আগে থেকেই গ্রামবাসীরা প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। পুরুষেরা পশু শিকার ও ফাঁদ পাতার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে চলে যায়। মহিলারা চাউলের মদ তৈরী এবং উৎসবের দিনগুলিতে কাঁটার জন্য পালিত শুয়োর ও মোরগ-মুরগীগুলিকে পরিপুষ্ট করে তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে। উৎসবের দিন যুবক-যুবতী ও বয়স্করা নিজেদের সবচেয়ে ভালো পোষাকে সজ্জিত হয়। উৎসবের প্রথম রাতে, যুবকেরা সারা রাত্ঁ ধরে নাচে। দ্বিতীয় রাতে তারা বিশেষ নাচ নাচে এবং যুবতীরাও সেই নাচে অংশগ্রহণ করে। এই উৎসবের জন্য সবাই সারা বছর ধরে অপেক্ষা কবে থাকে।

খ) কাংদাই কুত (Kangdai Kut) ঃ এই উৎসব এপ্রিল মাসে জুম পোড়া দেওয়ার দিন বিকাল থেকে পরদিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের মাধ্যমে তারা তাদের ফলপ্রসু জুম এবং শুভ স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ কামনায় দেবতাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

গ) থ্লানতাউই কুত (Thlantawi Kut)

একদিনের জন্য এই উৎসব পালিত হয়। স্বর্গতঃ প্রিয়জনদের স্মরণ করে এই উৎসব পালন করা হয়। পরলোকগত প্রিয়জনদের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা জানাতে এবং নিজেদের মানসিক তৃপ্তি লাভের জন্য তারা প্রতিটি কবরে সবচেয়ে ভালো খাদ্য-সামগ্রী উৎসর্গ করে। এই বিশেষ দিনটিকে বলা হয় "বাইনাচার (Baihnachar)", এবং অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত কঠোর ও নির্ভুলভাবে পালিত হয়। অনুষ্ঠানের দিন কাউকে কাজ করার জন্য মাঠে বা জুমে যেতে দেওয়া হয় না। যারা এই নিয়ম ভঙ্গ করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়।

ঘ) থারলাক বা মিম কুত (Thalrak or Mim Kut) ঃ এটাকে শরৎ ঋতুর উৎসব বলা যেতে পারে, যেটা জুলাই মাসে ভুট্টা ফসল সংগ্রহের পর এবং ধান ক্ষেত বাছাই-এর কাজ শেষ হওয়ার পর পালন করা হয়। এই উৎসবটি বিশেষ করে পরলোকগত আত্মীয়-পরিজনদের স্মরণ

করে, এবং দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পালন করা হয়। লৌকিক কাহিনীর পাংগামা ও থুইতিলংগি নামক প্রেমিক-প্রেমিকাকে ভিত্তি করে এই উৎসব বলে সবারই বিশ্বাস। পাংগামাকে রেখে থুইত্তিলংগি-র মৃত্যু হয়। পাংগামা ভীষণ একা অনুভব করে এবং পরলোকে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সেখানে সে দেখতে পায় যে, থুইত্তিলংগি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে, জুমের প্রথম ফসল, বিশেষ করে ভুট্টা যেটা ধানের আগে সংগ্রহ করা হয়, তাকে খাওয়াবে। এর থেকেই এই উৎসব মিম (মানে ভুট্টা) উৎসব হিসাবে পরিচিত হয়। সেই হিসাবে, উৎসবটি আনন্দের নয়, বরং পরলোকগত আত্মীয়পরিজনদের স্মরণ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই উৎসবটি পালিত হয়ে থাকে।

এই সমস্ত উৎসবগুলির প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ের ডার্লংদের কাছে উৎসবগুলি অতীতের বিষয় মাত্র। বহু দশক ধরে পালিত না হওয়ার ফলে উৎসবগুলি তাদের বিস্মৃতির অতলগর্ভে চলে যাচ্ছে। সমাজের নূতন প্রজন্ম উৎসবগুলি পুনরোদ্ধারে সচেষ্ট না হলে সেগুলি হারিয়ে যাবে।

ডার্লং সমাজের নূতন প্রজন্মের কাছে উৎসব মানে নাচ-গান। তাদের নৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়। বর্তমান সময়ে ডার্লংদের কয়েকটি বিখ্যাত নাচ হলো, -- চেম লাম (dao dance), কারেল ইনকান (bamboo dance), রিকি ফাচাউই (hungry parrots' dance) পুয়াল ভাচাং (hornbill dance), সাতে তুয়াল ইনফাই (wild quadruped animal dance), আরতে তুয়াল ফিত (fowls dance) ভাথু ইনদি (doves in love dance), সালু লাম (dancing with head or skull of an animal), সিলাই লাম (gun dance) ইত্যাদি।

ডার্লং মহিলাদের গয়নাগাঁটি

ডার্লং মহিলাদের পুরানো দিনের গয়নাগাঁটিও এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। ডার্লং মহিলারা যে- সমস্ত গয়নাগাঁটি পড়তো, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো — রিথেই (necklace), থি তাক (necklace red beads) থিভাল (necklnce of silver coines), খুয়াইনুর (necklace of valuable stones) ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ের ডার্লং মহিলা বা মেয়েরা কেউ উপরোক্ত গয়নাগুলি পড়ে না। কেউ কেউ অতীতের গৌরবের বস্তু এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হিসাবে এগুলি অতীব যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করে চলেছে।

ডার্লংদের বাদ্যযন্ত্র-সমূহ

ডার্লংদের উন্নত ধরনের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ নেই। কিন্তু তাদের কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র দুর্লভ এবং অতি মূল্যবান। তাদের কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ-

১) রউসেম (লাউ-এর খোল দিয়ে তৈরী);

২) ডারখুয়াং (বড় ধরনের কাঁসর-ঘন্টা);

উপরোক্ত দুইটি বাদ্যযন্ত্র এত মূল্যবান যে, Darlong Hnam (Community) Committee এগুলিকে ডার্লং সমাজের প্রতীক হিসাবে ঘোষণা করেছে।

৩) ডাররিবু (তিনটি বিভিন্ন আকারের কাঁসর-ঘন্টা ভিন্ন ভিন্ন সুর সৃষ্টির জন্য এক সঙ্গে বাজানো হয়)।

৪) খুয়াং (ঢোল বিশেষ);

৫) ডারতেং (ছোট কাঁসর-ঘন্টা),

৬) বেলেম (বাঁশের বাঁশী),

৭) তুইথেই (বাঁশের নল দিয়ে তৈরী); ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ের ডার্লং যুবক-যুবতীরা আধুনিক বাদ্যযন্ত্র বাজানো রপ্ত করেছে, এবং সেগুলির সঙ্গে তারা আধুনিকতম সুরে গান গাইছে।

ডার্লং সমাজ পরিবর্তনের বর্তমান রূপরেখা ঃ

খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করার পর ডার্লংদের সামগ্রিক জীবনযাত্রায়, যথা সামাজিক কাজকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের পর তাদের সমাজ জীবনে যে-সমস্ত বিষয়ে পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলির কয়েকটি বিষয়ের উপর এখানে আলোকপাত করা হলো ঃ-

১) খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের আগের দিনগুলিতে বুকপুই (male dormitory) ছিলো একমাত্র কেন্দ্র যেখানে পুরুষেরা একত্রে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষ বিষয়ে আলোচনা করতে পারতো। এই কেন্দ্রটি আমোদ-প্রমোদ, খাওয়া-দাওয়া, নাচ ও গানের স্থান হিসাবেও ব্যবহৃত হতো।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের পর চার্চ সাধারণ মিলন-স্থলে পরিণত হয়, যেখানে প্রত্যেকেই, যুবা ও বৃদ্ধ, ঈশ্বরের প্রশস্তি করে, ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করে এবং একে অপরে সঙ্গদান করে। খ্রীষ্টীয় ধর্মানুষ্ঠানগুলি, যথা খ্রীষ্টমাস, নিউ ইয়ার, গুড ফ্রাইডে, ইস্টার সাটারডে — এইগুলিতে তারা স্তোত্র আবৃত্তি করে, এবং বাইবেল পাঠ করে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের পূর্ব ও পরের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো, — খ্রীষ্টীয় উৎসব ও ভোজসভায় মদ্যপান করা হয় না। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের পূর্বের দিনগুলিতে উৎসব-অনুষ্ঠানে মদ্যপান প্রধান বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে উৎসব-অনুষ্ঠানে চাউলের মদের পরিবর্তে চা পরিবেশন করা হয়।

২) ডার্লং সমাজ খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে গ্রামগুলির মধ্যে কোন সহযোগিতা ছিল না। গ্রামগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। একের সঙ্গে অপরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে যুবকদেব অনাহূত দ্বন্দ্বের জন্য প্রশিক্ষিত করে তোলা হতো। গ্রামগুলির মধ্যে শত্রুতা এতটা প্রবল ছিল যে মস্তক শিকারে গ্রামকে জয়যুক্ত করা তাদের সামাজিক প্রথা হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল, এবং যুবকেরা নিজেদের পৌরুষ প্রমাণ করার জন্য মস্তক শিকারে অনুপ্রাণিত হতো। সম্ভবতঃ ভালবাসার অস্তিত্ব এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানসিক সুসম্পর্ক ও সঙ্গদান তাদের জানা ছিল না।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণের পরে ডার্লং সমাজ যিশুর অনুশাসন পালন করতে শিখেছে, — "A new commandment I give unto you, that you love one another, even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples. If you have love for one another."

এর ফলশ্রুতি হিসাবে যে বিবাদগুলি তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তারা সেগুলি

বিলুপ্ত করতে শিখেছে। বর্তমান সময়ে বিশেষতঃ যুবক-যুবতীরা সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য, এক সঙ্গে গান গাইতে এবং বাইবেলের বাণী সম্পর্কে আলোচনা করতে ভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করতে ভীষণ আনন্দবোধ করে। এখন কাছে ও দূরের গ্রামগুলির মধ্যে এবং সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্ব বিরাজ করছে।

ডার্লং সমাজে বিবাহ প্রথা

খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে, ডার্লং সমাজে এমন দেওয়ানী চুক্তি প্রচলিত ছিল যেখানে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে কন্যা-পণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। মেয়ের পিতা-মাতাকে দাবীমত কন্যা-পণ দিতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে অনেক যুবক নিজের ভালবাসার পাত্রীকে বিয়ে করতে পারত না। অনেক সময় লোভনীয় কন্যা-পণ লাভ করে লোভী পিতা-মাতা নিজেদের কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিত।

খৃষ্ট ধর্মের মতে বিবাহ একটি পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পবিত্র বিবাহে প্রয়োজন হয় পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে পারস্পরিক আনুগত্য ও অঙ্গীকার। কন্যা-পণ এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু সামাজিক-আর্থিক মর্যাদা নির্বিশেষে পণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যার ফলে বৈষয়িক লাভ করে এখন আর কোন পিতমাতা নিজেদের কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দিতে পারে না। বিবাহ-কার্য এখনও একটি সামাজিক অনুষ্ঠান যেখানে গ্রামের সবাই অংশগ্রহণ করে। খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণের পূর্বের মত বিবাহ অনুষ্ঠানে এখন চাউলের মদ্য পান এবং "রামার" (চুক্তিমত মুরগী) কাটা হয় না। এর পরিবর্তে চা ও বাড়ীতে তৈরী কেক খেয়ে সারা দিন-রাত সঙ্ঘবদ্ধ নাচ-গান হয়।

খৃষ্টধর্ম বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচলিত কুপ্রথাগুলি বিলুপ্ত করেছে, যেমন — কন্যাপক্ষকে জল, কাদা, পঁচা ডিম, ময়লা রঙ ইত্যাদি ছোড়া।

খৃষ্টধর্ম গ্রহণ পূর্বে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথাযথ সহযোগীতা ছিল না। স্বামীর ছিল অবাধ কর্তৃত্ব এবং সংসারে স্ত্রীর বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। বিবাহ-বিচ্ছেদ সহজ ও সাধারণ বিষয়। সমাজে একটি প্রবাদ চালু ছিল — "খারাপ দরজার সিঁড়ি এবং খারাপ মহিলা পরিবর্তন করা উচিত।" গ্রামীণ গোষ্ঠীপতিদের জন্য বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল।

খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পরবর্তী সমাজে, স্বামীদের কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু স্ত্রীদের প্রতি তারা অধিকতর দায়িত্বশীল। বিবাহ-বিচ্ছেদ এখন নাই বললেই চলে, এবং বহুবিবাহ ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। খৃষ্টান পরিবারগুলিতে এখন অধিকতর ভালবাসা, দয়া ও বোঝাপড়া বিরাজমান।

ডার্লং সমাজে শিক্ষার অগ্রগতি

মিশনারীরা ত্রিপুরায় আসার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা ডার্লংদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। যীশুর বাণী প্রচারক মিজোরা ডার্লংদের মধ্যে পড়া ও লেখার কলাকৌশল প্রবর্তন করেন। শিক্ষার মাধ্যম ছিল মিজো ভাষা এবং ডার্লংদের মধ্যে এই ভাষার প্রভাব এত ছিল যে, তারা মিজো ভাষায় লিখিত বাইবেল ও স্তবগানের বই পড়া ছাড়াও এই ভাষায় প্রার্থনা ও প্রচার-কার্য করতো। শুরুতে কোন প্রথাগত বিদ্যালয় ছিল না। মিশনারীরা চার্চ গৃহেই লেখাপড়া শেখাতেন।

মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ ও ১৯৪৩ সালের মধ্যে তিনজন ডার্লং বালককে চুরাচান্দপুর স্কুলে পড়াশোনার জন্য পাঠানো হয়, এবং দুইজন ডার্লং যুবতীকে মিজোরামের ডার্তলাং-এ নার্স

প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। ১৯৪৩ সালে নিউজিল্যান্ড বাপটিষ্ট মিশনারীরা (NZBMS) আগরতলায় সেন্ট পলস্ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে যথেষ্ট সংখ্যা ডার্লং বালক শিক্ষা লাভ করে। উক্ত NZBMS ডার্লং গ্রামগুলিতেও কিছুসংখ্যক স্কুল শুরু করে, সেখানে ডার্লং ছেলেমেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করতে পারতো। সেই স্কুলগুলিতে দ্বিতীয় শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছেলেমেয়েদের আগরতলা সেন্ট পলস্ স্কুলে পাঠানো হতো।

রোমান ক্যাথলিক মিশনারীরা ত্রিপুরায় কিছুসংখ্যক ডার্লং ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষাদান করেন, এবং কিছুসংখ্যক ছাত্রীদের শিলং-এর ডনবস্কো স্কুলেও ভর্ত্তি করেন। ১৯৭৫ সালে ডারচুইয়ে একটি নূতন ইংলিশ মিডয়াম স্কুল খোলা হয়।

বর্তমানে ডার্লংদের ভাষায় লিখিত বাইবেল স্তবগানের বই আছে এবং অন্য ভাষার উপর তাদের নির্ভরতা অনেকাংশে কমেছে। ১৯৯০ সালে Children Association Jubilee ডার্লং ভাষায় লিখিত গানে একটি বই প্রকাশ করেছে।

বর্তমান সময়ে ডার্লংদের শিক্ষিত সমাজ বলা যেতে পারে। সমাজের প্রতিটি শিশু এখন স্কুলে যায়। অনেক পরিবার এখন সরকারী চাকরির উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে এখন তারা কর্মরত আছেন। ডার্লং সরকারী চাকুরের সংখ্যা গড়পড়তা হিসাবে রাজ্যের সমসাময়িক অন্যান্য উপজাতি সমাজের অনেক উপরে। কৃষি ক্ষেত্রেও তারা নূতন নূতন কৃষি-প্রথা রপ্ত করেছে। ডার্লং সমাজ এখন দ্রুতগতিতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা অধিকতর উন্নত প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে, এবং আর্থিক স্থায়িত্ব নিশ্চিত হচ্ছে। তাদের বর্তমান উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যদি সততা ও কর্মনিষ্ঠা বজায় থাকে তাহলে ডার্লং সমাজ অবশ্যই নিকট ভবিষ্যতে আরও নূতন সাফল্যের নজির স্থাপন করবে।

এল. ডার্লং

কৈলাশহর মহকুমার দেওড়াছড়া গ্রামে ১৯৫৯ সনে জন্ম। গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা। শিলং নেহু থেকে ভূগোলে এম. এ। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ডেপুটি কন্ট্রোলার অব্ একজামিনেশনস্ পদে ব্রতী রয়েছেন।

মলছম

জনগোষ্ঠীর উদ্ভব

মলছম জনগোষ্ঠী তিব্বত-বর্মীয় গোষ্ঠীর অর্ন্তগত। মলছম জনগোষ্ঠীর উদ্ভবের পেছনে একটি প্রাচীন লোককাহিনী প্রচলিত আছে। বংশ পরম্পরায় দিদিমা ঠাকুরমার মুখ থেকে এই কাহিনী সমাজে প্রচলিত হয়ে এসেছে। বংশ পরিবারের উদ্ভবের এই কাহিনীটিকে এরা জাতির কাছে এই ভাবেই জাগ্রত রেখেছে; ভুলতে দেয়নি। বিস্তারিত লেখ্য ইতিহাস নেই বলে মুখে মুখে প্রচলিত এই লোককাহিনীই কার্যতঃ এখনো পর্যন্ত জাতির উদ্ভব ইতিহাস। এই কাহিনী তথা উপকথার মধ্যেই রয়েছে মলছম জাতির আদি বাসস্থান, তাদের বাস্তুচ্যুতি, ত্রিপুরায় আগমণ এবং বসতি বিস্তারের কাহিনী। ছোট্ট জাতি, জনসংখ্যার স্বল্পতা, এখনো প্রায় আদিম জীবন যাত্রা, অনুন্নত ও দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, এই জনগোষ্ঠীকে এখনো জুম নির্ভর করে রেখেছে। মলছম জাতির সনাক্তকরনের জন্যে উপকথাটির কাহিনী মূল্য অনেক। কাহিনীটি হল ঃ—

প্রাচীন কালে বড় পুং তাং-এ একটি মস্ত বড় গ্রাম ছিল। গ্রামটির নাম ছিল আর-সি- এন-খা-সা। গ্রামে অসংখ্য মানুষ। সংখ্যাতীত মানুষের অনুমান সংখ্যা ছিল আকাশের তারার সংখ্যার সমান। গ্রামটির বিশালত্ব বুঝানো হত একটি মস্ত বড় মোটা ভেজা কাপড়ের উদাহরণ দিয়ে। মোটা ভেজা কাপড়টি দিয়ে গ্রামের চারধার একবার ঘেরাও করে আনতেই ভেজা মোটা কাপড়টি শুকিয়ে যেত। গ্রামের বিশালত্ব ছিলো এতটাই।

গ্রামের সব লোকই ছিলো আত্মনির্ভর, স্বচ্ছল ও সুখী। স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি তাদের অলস করে তুলেছিল। বছরের বেশীর ভাগ সময়েই পুরুষেরা মদ্যপানে জীবন অতিবাহিত করত। শুধু মাত্র টিয়া পাখী যখন ধানের শীষ নিয়ে আকশে উড়ত ঐ দৃশ্য দেখার পরে ই পুরুষেরা তৎপর হত কাজের জন্য। ওরা মাঠে যেত, ধান কাটত, মাড়াই দিত। অসংখ্য কাজ। বপনের কাজটা মহিলারাই করতেন। পাকা ধান ঘরে তোলার কাজ পুরুষের। ধান পাকলেই পুরুষের কাজের সময়।

"আর-সি-এন-খা-সা" গ্রামের এক রাজা ছিল। তাঁর নাম ছিল কাঞ্চিকাও। রাজার একমাত্র কন্যা। অন্য কোন সন্তান ছিল না।

গ্রামের মাঝখানে ছিল এক বড় গুহা। ঐ গুহাটি ছিল এক বৃহৎ সাপের দখলে। ঐ গুহার পাশ দিয়ে কেউ গেলে সাপটি তাকে আস্ত গিলে ফেলত। সাধারণতঃ পারত পক্ষে কেউ ঐ গুহার পাশ দিয়ে যেতনা, যদিও সাপটিকে মানুষ ধরে খায় তা গ্রামবাসীদের জানাই ছিলো না। কিন্তু দেখা যেত প্রতিদিনই একটি একটি করে লোক গ্রাম থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কেউ জানে না। এই হারিয়ে যাওয়াকে গ্রামের মানুষ ভবিতব্য বহে মনে করত। একদিন হল কি রাজার ঐ একমাত্র মেয়ে গ্রাম পরিভ্রমনে বেড়িয়েছে। সঙ্গে কেউ নেই; একা। ভুল করে রাজকন্যা ঐ গুহার পাশে চলে যায়। অমনি সাপটি তাকে গিলে ফেলে। কন্যা হারিয়ে শোকাহত রাজা রাজকন্যাকে খোঁজে বের করার জন্যে গ্রামের লোকদের আদেশ করলেন। লোকজন বেড়িয়ে পড়ল রাজকন্যার খোঁজে। সহজে কি আর খোঁজ মেলে! অবশেষে দিনের শেষে কিছু লোক ঐ সর্প-গুহার সন্ধান পায়। কিন্তু তারা জানে না যে, ঐ সাপই রাজ কন্যাকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু

সাপটি চোখে পড়তেই মহাভোজের সন্ধান পেয়ে গ্রামের লোকেরা সাপটিকে মেরে ফেলে। সাপটি এতবড়, ভয়ঙ্কর আর শক্তিশালী ছিল যে, রাজা গ্রামের শক্ত সমর্থ যুবকদেরই সাপটিকে মারার জন্যে আদেশ দিয়ে দিলেন। যুবকরা তো সাপটিকে মেরে ফেলল। এখন কি হবে? ঠিক হল সাপের মাংস গ্রামের লোকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। গ্রামে মহা ভোজ হবে। সাপের মাংস গ্রামের সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। অবশিষ্ট ছিল মাথাটি। মাথাটি কাকে দেওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত এক বিধবা মহিলাকে পাওয়া গেল যিনি মাংসের ভাগ পাননি। সাপের মাথাটি তাকেই দেওয়া হল।

বিপর্যয় ও অজ্ঞাত যাত্রা

কি করে সাপের মাথা রান্না করতে হয় তা সেই বিধবা মহিলা জানত না। তিনি মাথাটি না রেঁধে তাকে মোরগের খাঁচায় রেখেছিলেন। সেদিন গেল। পরদিন বেলা প্রায় বারটা, তখন সাপের মাথাটি মোরগের মতন ডেকে উঠল। বিধবা মহিলা এতে অবাক হলেন। খাঁচার কাছে এগিয়ে যেতেই মাথাটি তিনবার মোরগের মতন ডেকে উঠল ও বিধবাকে বলল, শীঘ্র তোমার আত্মীয় পরিজন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। এক্ষুনি গ্রামটি ধ্বংসা হবে। সাপের মুখ থেকে ঐ কথা শেষ হতেই ঐ গুহা মুখ থেকে গরম জল বুদ্‌বুদ্ আকারে বেরুতে লাগল। বিধবা মহিলা ঐ কথা শুনে এবং ধ্বংসের রূপ দেখে গ্রামের সকলকেই ডেকে বললেন, ধ্বংস নিকষর্তী , শুরুই হয়ে গেছে। সকলে গ্রাম ছেড়ে চলে যাও। মহিলার এই সতর্ক বার্তায় এবং প্রলয়ের রূপ দেখে গ্রামের সকলেই গ্রাম ছেড়ে অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করল। গ্রামটির সম্পূর্ণ ধ্বংস দেখার জন্যে কেউ আর অপেক্ষা করল না। গ্রামবাসী সকলেই "তুই ভম নু বা কাল নদী পার হয়ে আর-সি-এন-খা-সা গ্রাম ছেড়ে পালাতে চাইল, কিন্তু পারল না। সাপটির কথা মতন গ্রামটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। আর-সি-এন- খা-সা টিই হল মলছমদের আদি বাসস্থান মলছমদের ধারনায় আর-সি-এন- খা-সা গ্রামটি মিজোরামের কোথাও ছিল। উপকথাটি থেকে এই ধারনাই হয় ঐ গ্রামে ছোটখাট আগ্নেয়গিরি ছিল। অগ্নি উৎপাতের ফলে গ্রামটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং মলছমদের আদি পুরুষেরা ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তাদের আদি বাসস্থান ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। আর-সি-এন-খা-সা ছেড়ে মলছমদের অভিমুখ ছিল ত্রিপুরার দিকে। ১৫৭০ সাল বা তার আসপাশ সময়ে ত্রিপুরায় এসে এরা থিতু হলেন বর্তমান অমরপুর মহকুমায়। এইভাবেই মলছম জনগোষ্ঠী গ্রাম ত্রিপুরায় আসে। কাহিনীর মধ্যে যতই রূপক থাকুক, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিপর্যয় জনিত কারণেই যে তাদের পিতৃভূমি ছাড়তে হয়েছিল এই ঘটনাকে মলছম জনগোষ্ঠী বাস্তব বলেই মনে করে। ঐ বিধবার অধঃস্তন পুরুষেরাই বর্তমানের মলছম জনগোষ্ঠী।

মলছম জাতি গোষ্ঠীর নামাকরণ

মলছম নামের উৎপত্তির উৎস সন্ধানে আমাদের আবার যেতে হবে সেই মিজোরামের সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রাম আর-সি-এন-খা-সা গ্রামে। সেই গ্রামেই তো তাদের আদি বাসস্থান। স্থানচ্যুত হয়েই তো তাদের ত্রিপুরায় আগমন, অমরপুরে বসতি স্থাপন। তাদের অর্থাৎ নূতন এই জনগোষ্ঠীর আগমণ সংবাদ ও বসতি স্থাপনের কথা ত্রিপুরার মহারাজার কর্ণ গোচর হয়। মহারাজা মলছম গোষ্ঠীর সর্দারকে রাজ প্রাসাদে ডেকে পাঠান। তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কোথা থেকে

এসেছ? সর্দার নিজের ভাষায় জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন "মলছম কা কৌনতঃ"। মল অর্থ ভূমি, অঞ্চল; ছম-এর অর্থ দশটি। অর্থ দাঁড়ায় দশটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত কোন একটি স্থান। অঞ্চল বলতে গ্রামকেই বলা হচ্ছে। দশটি গ্রাম জুড়ে এদের আদি বাস ছিল, সেখান থেকেই তারা এসেছেন। রাজা ঐ দশটি গ্রাম অর্থাৎ মল-ছম হিসেবেই জাতির নামাকরণ করলেন, সেই থেকে ত্রিপুরায় নবাগত এই জনগোষ্ঠী মলছম হিসেবে পরিচিত হলেন। এই জনগোষ্ঠী আর সি-এন-খ- সা গ্রাম সেই সুদূর অতীতে ফিরে এলেও তাদের আদি বাসস্থান দশটি জনপদের বা গ্রামের নাম কিন্তু বিস্মৃত হয় নি। ঐ দশটি গ্রামের নাম হল ঃ ১) ভরপুই তং; ২) লালময় তং ; ৩) কর্নাকুল তং; ৪) শায়সম তং ; ৫) সাজাই তং; ৬) পেংকুই তাং; ৭) লংতড়ই; ৮) সাদিং তং ; ৯) সাকল তং ; ১০) রিসির তং।

নাচের ভঙ্গিতে মলছম যুবক-যুবতী

মলছম শব্দের প্রাচীনত্ব

মলছম শব্দটি খুবই প্রাচীন শব্দ। রাজার পুঁথিপত্রে এবং রাজ প্রতীকের বিভিন্ন নক্সায় এর উল্লেখ রয়েছে। ঐ প্রাচীন শব্দটিই বর্তমান কালেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংরেজী বানান হল "MOLSOM", এই উচ্চারণের সঙ্গে ধ্বনী সাজুয্যে বাংলায়ও এখন লেখা হচ্ছে "মলছম"।

মলছম জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা ঃ—

শিকারভিত্তিক জীবন যাত্রা প্রায় বিস্মৃত। দশটি গ্রামে স্থায়ী বসতি থেকেও এই অনুমান। বিবর্তনের মধ্য দিয়েই কৃষিভিত্তিক জীবনে চলে আসা। জুম চাষই এখনো আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের জীবিকা। এখন জীবন জীবিকায় কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। স্থায়ী চাষ, চাকুরী ইত্যাদি। কিন্তু বাণিজ্য এখনো অধরা। কেমনভাবে জুম চাষ করা হত? আসলে তা ছিল সার্বিক সামাজিক অংশ গ্রহণ। গ্রামের মানুষ, সকল যুবক-যুবতী, বয়স্ক একে অপরের সঙ্গে কাজ বিনিময় করতেন। অর্থাৎ এক জনের জুম সকলে মিলে চাষের উপযোগী করে দিত। অর্থাৎ একজনের কাজ সকলের কাজ। বা দশে মিলি করি কাজ। দশে মিলেই একেক জনের কাজ করে দিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যুবক- যুবতীরা "রশম" বা কাজের বিনিময়

করতেন। ১০/১২ জনের এক একটি দল। আসলে "রশম" হত ঐ দলের মধ্যে। কাজের সময় গান গাইতেন "হই, হই" এই গানটিই বেশী গাওয়া হত।

জুম চাষের বিভিন্ন পর্যায় ছিল, যেমন ঃ জুম চাষের টীলা বা স্থান নির্বাচন করা (লৌও এন) ,; জুম কাটা, (লৌওয়াট) জুম পেড়োনো (লৌ ও হালে); জুমের ছাই পরিস্কার করা (লৌ ও মাদর রখম); বীজ ধান লাগানো (লৌ ও ছাংটু); জুমের আগাছা পরিস্কার করা (লৌংচন) ও জুম ধান কাটা (লৌং শারে আট) ইত্যাদি। প্রত্যেক পরিবার তাদের জুমে পৃথক পৃথক টং-ঘর তৈরী করতেন। আবার সবাই মিলে কঞ্চিকাওরন ও অচাইরন করতেন। অর্থাৎ বাৎসরিক একবার সমাজকর্তা কাঞ্চিকাও ও পূজারী বা বলি দাতা অচাইকে সবাই মিলে তাদের কাজে সহযোগিতা করতো। এইভাবে কাজের সহযোগিতা পেলে কাঞ্চিকাও এবং অচাই উভয়েই আলাদা আলাদাভাবে বড় ধরনের ৩/৪ কলসী মদ নামিয়ে ডেকে নিজেদের ঘরে আনন্দ-আহ্লাদ করতেন। বিভিন্ন ধরনের নাচ-গান, প্রদর্শন করতেন। ধানের গর্ভে দুধ জমতে শুরু করলে প্রতিটি পরিবাব একটি শুকর কেটে ধানের পূজো করতেন। প্রার্থনা ধান যেন পুষ্ট হয়; ফলন যেন ভাল হয়। ধান পাকলে যেদিন গ্রাম ধান কাটা হবে সেদিন " বুথার হীরনা" করা হতো। জুমের মধ্যে মরিচ, পাট, তুলা, ধনে পাতা, তরমুজ বিভিন্ন ধরনের ফল ও শষ্য ফলানো হত। সব বীজই একসঙ্গে জুমে পুঁতে দেওয়া হত। আমাদের মধ্যে এই ধারনা রয়েছে জুমের ফসলের বাজার কৈলাশহর, কুমিল্লা (অধুনা বাংলাদেশ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মলছম পুরুষেরা মাথায় করে ঐ সব বাজারে জুমের শষ্য পাট, তুলা, সরিষা আরো নানা ধরনের দানা জাতীয় শষ্য ঐ সব দূরবর্তী বাজারে নিয়ে যেতেন। নিজেদের উৎপন্ন বেঁচে যে নগদ অর্থ পাওয়া যেত তা দিয়ে বা বিনিময়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতেন। বছরে এক বার বা দুইবার এই ধরনের বাণিজ্য প্রক্রিয়া চলত। সাধারণতঃ একবছর বা ছয়মাসের জন্য বের্মান (সিঁদল শুটকী) লবন, রাব, জাপানী আয়না, দা এবং মেয়েদের সুজা উপকরণ কিনে আনা হত।

জাতীয় বীর থেকে জাতির দেবতা

প্রাচীন কালে আমাদের জাতীয় বীর ছিলেন সেংক্রাক। অসাধারণ রণকৌশলের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর ছিল অমিত শক্তি, খুব বুদ্ধি, ক্ষীপ্র গতি, স্থলেও অন্তরীক্ষে উভয় যুদ্ধেই তিনি ছিলেন পারঙ্গম। জাতিকে বিপদমুক্ত রাখতেন। তার প্রকৃত নাম ছিল "ভম জৈও যাং"। ভম শব্দের অর্থ এলাকা; জৈও শব্দের অর্থ শেষ। লোক বিশ্বাস করত তিনি দৈবশক্তির অধিকারী। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য হতে পারতেন। যুদ্ধ করতে করতে কোন একদিন আহত্ত হয়ে তিনি এক বিধবা মহিলার গৃহে দৃশ্য অবস্থায় আশ্রয় নেন। তিনি ঐ মহিলাকে মিস্ত্রি ডাকিয়ে তার দৃশ্য অবস্থার মূর্ত্তি নির্মাণের আদেশ দেন। মহিলা কাঠ মিস্ত্রি নিয়ে আসেন; তাঁর কাঠেব মূর্ত্তি নির্মাণ করান। মূর্ত্তি তৈরী হয়ে গেলে তিনি পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যান। রাজা তখন থেকেই তাঁর নাম রাখলেন সেংক্রাক। ককবরক ভাষায় "সেংভ " হল তরবারী, "ক্রাক" শব্দের অর্থ শক্ত অর্থাৎ শক্ত তরবারী। তিনি অসীম শক্তির অধিকারী বলে মলছম জাতি তাঁকে কূল দেবতা হিসেবে মান্যতা দেয়। সেই থেকে আজো অব্দি তিনি মলছম জাতির কূল দেবতা। মলছমরা সেংক্রাকের মূর্ত্তিকেই পূজা করে, তাঁর আরাধনা করে, তার উদ্দেশ্যেই বলি উৎসর্গ করা হয়।

মলছম জনগোষ্ঠীর লৌকিক দেবদেবী ও তাঁদের পূজাপদ্ধতি

মলছম জনগোষ্ঠীকে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলা যায় না। তারা মূলত প্রকৃতির পূজক। প্রাচীন কালের অধিবাসীদের মতন মলছমদের প্রাকৃতিক দেবদেবীর উপরই বিশ্বাস। মলছম সমাজের অন্যতম প্রধান কাজই হল পূজা-পার্বন। বছরে তিনবার কেন্দ্রীয়ভাবে মলছমরা সামাজিক উৎসব করে। তাছাড়া, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগতভাবেও নানা দেবদেবীর পূজা করা হয়। এই সব পূজা করার জন্য বিশেষ করে পূজারী হিসেবে অচাই, অচায়োবে বড়োয়া, তারাই একাজে অংশ গ্রহণ করেন। পূজাগুলি হলো ঃ— ১) রামশের (বনমালী পূজা); ২) শেরতে (ছোটদের পূজা) এবং শের পুই (বড়দের পূজা)।

রামশের ঃ এই পূজা সাধারণত বনের মধ্যে করা হয়। চাষবাস, বিবাহপর্ব এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজ করার পূর্বে এই পূজা করা হয়ে থাকে। বনের মধ্যে রক্ত যাতে ঝড়ে না পড়ে, চাষের সময় যাতে কোন দৈব দুর্বিপাক সৃষ্টি না হয়, এর জন্যেই রামশের পূজা। এই পূজা সর্বব্যাপক। প্রতিটি পাড়ায় গ্রামে এই পূজা। বিবাহ এবং জুম চাষ প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তির সঙ্গে সংস্পৃক্ত। প্রত্যেকের চৌধুরী কেন্দ্রীয় সমাজকর্তা হালামদেব ঘরে গিয়ে সামাজিক কূল দেবতা সেংক্রাককে একটি মোরগ কেঁটে পূজা করে সন্তুষ্ট করেন। পূজার কাজ সম্পন্ন হলে সবাই মিলে মিশে বিকেলে "চৌধুরীর" ঘরে মদ খেয়ে আনন্দস্ফূর্ত্তি করে। নাচ-গান করে। এই পূজা সাধারণত অগ্রায়ণ মাসেব প্রথম সপ্তাহে করা হয়।

আগরতলা বইমেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মলছম শিল্পী

শেরতে ঃ এই কের পূজা ১৩৩৭ খ্রিঃ ১৫ই মাঘ থেকে মলছম দাগ মেলা নামে খ্যাত। ১৫ই মাঘের এই পূজায় ও কেরে, ত্রিপুরার সমস্ত মলছম একত্র হয়ে একটি নির্দিষ্ট জায়গাতে পূজা

অনুষ্ঠান করেন। পূজাস্থলে কূলদেবতা সেংক্রাককেও রাখা হয়। পূজা হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে সমাজ অধিকারীক হালামস, কাঞ্চিকাও ও তাদের দলগুলি এবং পাড়ার চৌধুরী, গ্রামের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই পূজা করতে হয়। সাধারণতঃ এই কের পূজাতে ২০/২৫ টি ছাগল কাটা হয়। বিভিন্ন নাচ-গান প্রদর্শন করে আনন্দস্ফূর্তি করা হয়।

শেরপুই ঃ— অর্থাৎ বড়দের পূজা। এই কের পূজায় বিশেষ করে চৌদ্দ দেবতার নাম করে তাদের এবং সঙ্গে কূলদেবতা সেংক্রাককেও পূজা দেওয়া হয়। বিশেষত্ব হল এই পূজায় মোষ বলি হয়। গোমতীর পাড়ে দুটি মহিষ কেটে এই পূজার প্রারম্ভ। এই কের পূজায় প্রত্যেক পাড়ার চৌধুরী একটি করে মোরগ, ছাগল, নেশা জাতীয় এক কলসী মদ নিয়ে মলছমের ঘরে ঘরে যান। এই পূজাই মলছম সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা। এই তিনটি সামাজিক পূজা চলাকালীন গ্রামের লোক বাইরে যাওয়া এবং বাইরের লোক গ্রামে প্রবেশ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পূজা ঃ উপরোক্ত পূজাগুলি সামাজিক সমষ্টিগত পূজা। এছাড়াও পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ভাবেও পূজাবিধি প্রচলন আছে। রয়েছে বলি ও আরাধনার প্রথা। যেমন ঃ—

ইনথার থাতবেং ঃ— নূতন ঘরে গৃহ প্রবেশেব সময় এই পূজা করা হয়। যাতে পারিবার দেবদেবীর রোষ থেকে বাঁচতে পারেন। অর্থাৎ গৃহ দেবতার তুষ্টি বিধান উদ্দেশ্যে এই পূজার আয়োজন।

তুলথ ঃ— নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য তথা মনোমত দেবদেবীদের তুষ্ট করার জন্য এই পূজার আয়োজন। এক বছরে একবার এই পূজা করা হয়,যাতে সারা বছর দেবদেবীরা তুষ্ট থাককেন।

কেলতান ঃ ভবিষ্যৎ পথের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য এই পূজা।

সাকপেলীং রভল ঃ গর্ভবতী মাকে আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য এই পূজা।

মকত কোং ঃ নবজাতক শিশুকে রক্ষা করার জন্য এই পূজা।

পরশেন পাই ঃ নবজাতক শিশু যেন অতিরিক্ত চালাক, বা শয়তান না হয় তার জন্য দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্যে এই পূজা।

জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত তাঁত শিক্ষা

প্রাচীনকাল থেকেই মলছম জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই বুনে আসছে। চরকা দিয়ে সুতো কাটা সেই সুতোর ছোট্ট তাঁতে কাপড় বুনা হয়। ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতিদের মতনই কাপড় তৈরীর জন্য বাঁশ দিয়ে কাপড় বুনার কাঠামো তৈরী করা হয়। মলছম ভাষায় ঐ কাঠামোকে বলা হয় "থম্", মেগরা "থম্" দিয়ে কাপড়, পাছড়া, রিয়া তৈরী করা হয়। কাপড়ে নকসা থাকে। এই নকসা গুলিরও বিভিন্ন নাম। যেমন, খাম্ চাঙ, খাম কই, জীচুঙ, কান্দু, রিবিভ জী, আরডাপ জী, খাম রকং, রেখের তে; থাম কীং মিট নাই, কান থই, বাঙচাই, কানথা বার। মলছম ভাষায় কাপড়ের নকসাকে জী বলা হয়। পাছড়া, রিয়া ও মাথঅ বাঁধবার গামছার মধ্যে ঐ নকসাগুলি তৈরী হয়। জনগোষ্ঠীর পুরুষেরা নীচের দিকে পয়দারি (ধুতি) পড়েন এবং মেয়েরা রিয়া পাছড়া পড়েন। আজকের দিনেও গ্রাম পাহাড়ে মলছম জনগোষ্ঠীর মেয়েরা ঐতিহ্যগত তাঁত

শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের বুনা কাপড়ের বাজার রয়েছে বলে কখনো কখনো তা আর্থিক নির্ভরশীলতার উপায়ও। সাধারণত লাল এবং সাদা এই দুই ধরনের রং ই ব্যবহার করা হয় বেশী। অতীতে কেবল তাই হত, তবে এখন অন্যান্য রং-এর সুতোও ব্যবহার করা হয়।

খেলাধুলা ঃ মলছম জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়ে এবং যুবক-যুবতীরা খেলাধুলা প্রিয়। প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রাকৃতিক উপাদানই তাদের খেলার উপকরণ। সমাজের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে যাঁকজমকপূর্ণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রায়শঃই আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে তিনভাগে খেলাধূলাকে ভাগ করাছিল, যেমন (১) নপাংরদয় (শিশু ও বাচ্চাদের খেলা), (২) টাংভাল নলং জরতরেএন (যুবক-যুবতীদের খেলা) ও (৩) ররত্তন ভের প্রদর্শক ইত্যাদি। বাচ্চাদের কতিপয় উল্লেখযোগ্য খেলা হল— (ক) পইরকপ (চক্রঘর্ষণ), (খ) করবাই (লাটিম ঘুরানো), (গ) দংরদয়, (ঘ) হারিরদয়, (ঙ) রিবিরারাবা, (চ) সাকর ফাইকাল, (ছ) সারুরিসিক এবং (জ) তুই কম জং।

জনগোষ্ঠীর বিবাহপদ্ধতি ও জামাই প্রথা ঃ

প্রাচীন কাল থেকেই মলছম সমাজের বিবাহপদ্ধতি অনুসারে পিতা মাতার অনিচ্ছায় কোন যুবক-যুবতী ভালবাসার কবলে পড়লে অথবা যুবতী-যুবকটিকে ভালবাসলে এক বছরের জন্য যুবটিকে যুবতীর বাড়ীতে এসে থাকতে হত। এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুবতীর সঙ্গে নিজের স্ত্রী হিসেবে কোন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। একই বাড়ীতে পৃথক পৃথক থাকতে হয়। শ্বশুড় - শ্বাশুড়ীর ঘরে ভাবী জামাইকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জীবনের সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এক বছর পূর্ণ করতে পারলে তখনই যুবতীর পক্ষে জামাইকে নিজের জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন। এই এক বছরের মধ্যে জামাইকে যুবতীটিকে পাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট কাজ করতে হত। শ্বশুড় ও শ্বাশুড়ীকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হত। শ্বশুড় - শ্বাশুড়ী তাদের অপছন্দের জামাইকে নোংরা এবং কষ্টসাধ্য কাজ করতে বাধ্য করত। এমন কী কোন সময় তাকে কম খাবার দিত বা খাবার দিতই না। জামাই শ্বশুড়ীর কাছে খাবার জল চাইলে তাকে শুকরের খাবারের ভাত দেওয়া হত। মাটিতে বিছানো ছাড়া ঘুমাতে হত। শ্বশুড় শ্বাশুড়ীর স্নানের জন্য নদী থেকে পরিস্কার জল এনে দিতে হত। এমন কি তাকে বাইরের কাজের সঙ্গে ঘরের কাজও করতে হত। আসলে তাকে ঘরের কাজের লোক বা চাকর হিসাবেই ব্যবহার করা হত। জামাইকে জঙ্গল থেকে লাকড়ী সংগ্রহ করতে হত। জুমে টং-ঘর বানানো, জুম চাষের জন্য জঙ্গল পরিস্কার করা, বীজ লাগানো, সময় হলে ধান কাটা, ধান মাড়ানো সব কাজ করে শ্বশুড় শ্বাশুড়ীকে খুশী করতে পারলেই যুবকের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিতে এরা সম্মত হতেন। অসন্তুষ্ট থাকলে জামাই খাটার কাজ আরো এক বছরের জন্য বেড়ে যেত। এ হল জামাই -এর ধৈর্য্য পরীক্ষা।

কিন্তু কালক্রমে সমাজে বির্বতনের ফলে জামাইখাটা প্রথা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে এই প্রথা বিশেষ দেখা যায় না।

বিবাহ পদ্ধতি ঃ— মলছম সমাজে আদিকালে তিনধরনের বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

১) বাংপুই চেমজেপ ঃ

পিতা-মাতার অনিচ্ছায় যুবক-যুবতী ভালবাসা করলে অথবা যুবতীর অনিচ্ছায় যুবকটি

ভালবাসা করলে এক বছরের জন্য যুবক স্বেচ্ছায় যুবতীর ঘরে জামাই উঠতেন। এক বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হত না। এক বছর পূর্ণ হলেই যুবতী-যুবকটিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারতেন।

২) মীংনাং সেং

কোন যুবক-যুবতী ভালবেসে বিবাহের আগে যৌন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে উভয়ই 'অপবিত্র' বলে অচাই একটি মোরগ কেটে পুনঃ বিবাহ না করিয়ে যুবতীটির ঘরে যুবকটিকে জামাই উঠাতেন। অপবিত্র অবস্থায় বিবাহ করার ফলে সমাজকর্তাদের "রুভলোট কোনোকার চই" অর্থাৎ জরিমানা দিতেন। সমাজ কর্তা তথা কাঞ্চিকাও ও হালামস্‌দ্বয়কে সোওয়াশ আধুলি ভুলের জরিমানা হিসেবে দিতে হত।

৩) রীলই পুই

যে বিবাহ পদ্ধতি পিতা - মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন ঃ

রীলই চংরীথাং ঃ — ছেলেদের পক্ষে পিতা-মাতা পুত্র-বধূর জন্য মনের মত মেয়ে খোঁজে পেলে মেয়ের মা বাবার সম্মতি নিয়ে এই বিবাহ হত।

সমীওউ ঃ — ছেলে-মেয়ের অভিভাবকরা উভয়ে সম্মত হয়ে মেয়ের ঘরে মদ খেয়ে বসে চুক্তি করে উভয় পক্ষের বিয়ের খরচ ও জামাইয়ের দাবী নিয়ে কথা হত।

মেয়ে পক্ষের দাবী ঃ— ছেলে কত বছর জামাই খাটতে পারবে, কত বড় কলসীর মদ বসাতে পারবে, শুকর কটি কাটতে পারবে, বাঁশ বেতের কাজ ছেলে করতে পারে কিনা ইত্যাদি।

ছেলের পক্ষে দাবী ঃ— মেয়েটি তাঁত বুনতে পারে কিনা, ধানের ঝাড়াই মাড়াই করতে পারে কিনা, জল তুলতে, রান্না করতে পারে কিনা, ধান বুনতে ও কাটতে পারে কিনা ইত্যাদি।

রলভমনি ঃ— বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য করা।

তুই বকনি ঃ— মেয়ের ঘরেই বিয়ের অনুষ্ঠান করা প্রচলিত ছিল। উভয় পক্ষ নিজ নিজ আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ করতেন। রলভমনির পরের দিন সকালে পাত্রকে স্নান করিয়ে মেয়ের বাড়ীর উঠানে উচই দ্বারা পূজা করে নমস্কার বিনিময় করতেন। সেই সময়েই দেব-দেবীর সামনে শুকরগুলিকে কাটা হত। বিকেলে মেয়ের ঘরে উভয়কে সাক্ষাৎ করিয়ে এক সঙ্গে বসিয়ে দুই জনের মাথায় কাপড়ের ছাউনি দিয়ে বাঁশের চোঙা দিয়ে তাদের মাথার উপর, সমস্ত আমন্ত্রিত, উপস্থিত আত্মীয় স্বজন ও পিতা- মাতারা সবাই মিলে জল ঢেলে দিতেন। একে তুই বকনি অর্থাৎ জল ঢালার দিন বলে। রাত্রে সবাই মিলে বড় কলসীর মদ খেয়ে আনন্দ-স্ফূর্ত্তি করে নাচ-গান করতেন। নূতন জামাই শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সামনে এক পায়ে দাঁড়িয়ে যেকোন একটি বিয়ের গান গেয়ে নূতন শ্বশুড়কে মদ খাইয়ে দিতেন।

দলানি ঃ — এটি বিয়ের তৃতীয় দিন। এই দিনে বিবাহে আমন্ত্রিত আত্মীয় স্বজন, ভাই বোন, বন্ধু-বান্ধবীদেরকে স্নান করিয়ে ভাত খেতে দিয়ে এক চোঙা মদ খাইয়ে নমস্কার করে প্রতি জনকে মাংসের ভাগ পাঠিয়ে বিদায় করতেন। পরের দিন সমাজকর্তা কাঞ্চিকাও ও হালামস্‌দের বিশেষ মাংসের ভাগ পাঠাতেন।

টারপি তারপুথাক ঃ— বিয়ের পঞ্চম দিনে ছেলের বাবা -মাকে বিয়ের প্যান্ডেল থেকে

ঘরে পৌঁছে দেওয়া হত। সেখানে তাদের এক অথবা তিন রাত থাকতে হত। তার পর আবার মেয়ের ঘরে ফিরে যেতে হত। তখন থেকেই শ্বশুড় - শ্বাশুড়ীর ঘরে ছেলেকে জামাই খাটতে হত।

পণ প্রথা ঃ— মলছম সমাজে পণপ্রথা আগেও ছিল না এখনো নেই। তবে বিয়ের যাবতীয় খরচ ছেলের পক্ষকেই বহন করতে হত। মলছম সমাজে ছেলের চাইতে মেয়ের মূল্য অনেক বেশী।

একটি অভিনিত নাইছের দৃশ্য

খ্রীষ্টান ধর্ম এবং মলছম সমাজে এর প্রভাব

মলছম সমাজের মানুষ পাহাড়,পর্বত আর জঙ্গলে বাস করতেন। তারা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত। মলছমরা সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এই জন্যে এই জনগোষ্ঠীর উপর খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাব বেশী। মলছম জনগোষ্ঠী প্রকৃতির পূজারী হলেও ত্রিপুরায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের আগমণের ফলে ধীরে ধীবে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মিশনারীদের প্রবর্তিত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করারও সুযোগ পায়। এই জন্যে সরকারী বিদ্যালয়ের চাইতে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রবর্তিত স্কুলেই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী। কিছু কিছু অঞ্চলে মলছমরা এখনো হিন্দু ধর্মেই নিষ্ঠ। মলছম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যারা শিক্ষিত তারা সবাই খ্রীষ্টান ধর্মীবলম্বী।

খ্রীষ্টান ধর্ম মলছম সমাজের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। খ্রীষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী হওয়ার পর থেকেই তাদের সামাজিক জীবনেরও উন্নতি ঘটে। খ্রীষ্টান ধর্মই তাদের আধুনিক জীবন সন্ধান দেয়। সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিতেও মিশনারীরা মলছমদের সাহায্য করছে। শিক্ষিত করে যেমন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি করেছে তেমনি মিশনারীদের প্রতিষ্ঠানেও চাকুরীর সুযোগ পাচ্ছে। সমাজের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষই খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। তবে এখনো মলছমরা প্রায় শিক্ষা বঞ্চিত, অর্থনৈতিক দিক থেকেও পিছনে পড়ে রয়েছে। আর্থিক দুর্বলতার কারণে উচ্চ শিক্ষাও

তাদের অধরা। উচ্চ শিক্ষা অসমাপ্ত রেখেই মলছম যুবক-যুবতীরা মিশনারী পরিচালিত এন. জি. ও- তে যোগ দিচ্ছেন। কারণ সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ খুবই কম। অর্থনৈতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হল আদিম চাষপদ্ধতি জুম থেকে এখনো সমাজের অধিকাংশ লোক ভিন্ন জীবিকার সন্ধান পাননি। আর্থিক পশ্চাৎগামীতা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হয়ে রেখেছে।

জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য ঃ—

১। ইঞ্জিনীয়ার — ৩ জন।

২। বি. এ ৪০ জন।

৩। বি. এস. সি ৫ জন।

৪। এম. এ ১০ জন।

এম. কম, এম. এস. সি. কেউ নেই।

সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিতের সংখ্যা ঃ—

১। গেজেটেট অফিসার — ৩ জন।

২। তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ৩ জন।
(গ্রুপ . সি”)

৩। সেনাবাহিনী ও অন্যান্য – ৭০ জন

সমাজে মোট জনসংখ্যা ঃ

ত্রিপুরার মলছম জনগোষ্ঠী হালাম সম্প্রদায় ভুক্ত। ১৯৯১-এর আদম সুমারী অনুসারে মলছম জনগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা বিশ হাজার। তবে বর্তমানে এই সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজারেব উপর।

জনগোষ্ঠীর ৩৫,০০০ - এর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুবই কম; এক শতাংশেরও কম। সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা ৭৬ জন। শতাংশের হিসেবে দশমিক দুই শতাংশের মতন। ২১ শতকে পদার্পণ করেও সভ্য সমাজের আধুনিক উপকরণবর্জিত এই জনগোষ্ঠী দুই হাজার বছরের আগেকার আদিম অবস্থাতেই রয়েছে।

রামজাও মলছম

অমরপুর মহকুমার পূর্ব তৈছলং, তৈদুর ভক্তমোহন পাড়ায় ১৯৮৫ সালে জন্ম। বিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন আগরতলা সেন্টপলস্ স্কুল থেকে। বর্তমানে ত্রিপুরা নীট (N.I.T)-এ ইঞ্জিনীয়ারিং-এ চতুর্থবর্ষের ছাত্র।

কাইপেং

নৃতাত্ত্বিক বিচারে কাইপেং জনগোষ্ঠী টিবেটো-বর্মণ মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কাইপেং জনগোষ্ঠী একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেও ত্রিপুরার অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের তুলনায় খুবই প্রাথমিক (আদিম) স্তরে রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ১৮৭০ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী কাইপেং জনগোষ্ঠী পার্বত্য ত্রিপুরায় হালাম গোষ্ঠীর একটি উপশাখা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। ত্রিপুরায় কাইপেং জনগোষ্ঠীকে কুকীদের একটি ধারার সঙ্গে যুক্ত মনে করা হয় ফলে ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি তালিকায় কাইপেংদের কুকী সম্প্রদায়ের একটি উপ-বিভাগ হিসেবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও এটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে কাইপেং জনগোষ্ঠী কুকী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নয় হালাম গোষ্ঠীর সঙ্গেই সংযুক্ত।

কাইপেং জনগোষ্ঠীর মানুষেরা দক্ষিণ-পূর্ব চীনের ভূখন্ড ছেড়ে দীর্ঘ পরিক্রমার পর ত্রিপুরায় স্থায়ী বাসস্থানের সন্ধান পান। বা ত্রিপুরাতে বসবাসের জন্যে মনস্থির করে। দীর্ঘ পথে ব্রহ্মদেশ বা বর্তমান মায়ানমার। সেখানে স্বল্পকালের স্থিতি তারপর আবার প্রব্রজণ। ব্রহ্মদেশ থেকে মিজোরাম হয়ে চলে যায় কুমিল্লা (বর্তমান বাংলাদেশে। ত্রিপুরার ভূমি অতিক্রম করেই ছিল এ সন্ধানী যাত্রা। পরে তারা সমতল ছেড়ে পাহাড়েই ফিরে আসেনা, ফিরে আসেন ত্রিপুরায়। কুমিল্লার সমভূমি ছেড়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় ফিরে আসার মূল কারণ ছিল তাদের জীবন জীবিকা। কাইপেংরা সমতল চাষে অভ্যস্থ ছিলেন না, অভ্যস্থ হওয়ার চেষ্টাও করেন নি। তাদের আয়ত্বে ছিল জঙ্গল পুড়িয়ে টিলা ভূমিতে জুম চাষ। সেই থেকে হালাম সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের সঙ্গে স্মরণাতীত কাল থেকেই কাইপেংরা ত্রি পুরায় বসবাস করে আসছেন। হালাম শব্দের উৎপত্তি খুঁজতে হয় ডিমাসা কাছাড়ী ভাষায় যার অর্থ জমির উপর অস্থায়ী মালিকানা। কাইপেংরা বিচ্ছিন্নভাবে থাকা পছন্দ করে না। তাদের যুথবদ্ধ জীবন। অমরপুর মহকুমার অম্পি তৈদু অঞ্চলেই এরা বসতি গেড়ে আছে। তবে তেলিয়ামুড়া এবং সদর মহকুমাতেও কিছু কাইপেং পরিবার বাস করছেন। ইদানীং কিছু কাইপেং পরিবার উত্তর জেলার দামছড়া অঞ্চলে চলে গেছে। শতাধিক পরিবার ত্রিপুরা সীমান্ত মিজোরামেও রয়েছে।

জনসংখ্যা

হালাম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরূপণের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য আদম সুমারী হয়নি। তবে জনগোষ্ঠীর তরফে নিজেরাই একটি সুমারীর আয়োজন করে। সেই সুমারীর তথ্য অনুযায়ী হালামভুক্ত কাইপেং জনগোষ্ঠীর লোক সংখ্যা ছয় হাজার পাঁচশত। নিজেদের আয়োজিত ঐ সুমারী হয়েছিল অতি সম্প্রীতি, ২০০৪ সালে। কাইপেংদের সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ হল এই জনগোষ্ঠীকে আধুনিক সুবিধা-বর্জিত কেবলমাত্র প্রকৃতি নির্ভর করে রাখা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরা বাস করেন বলে আধুনিক জীবনধারা এমন কী ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবাও ওদের কাছে পৌঁছায় নি। শুদ্ধ পানীয় জলেরও অভাব। ফলে অসুখ-বিসুখ ও মৃত্যুর হার তাদের মধ্যে বেশী। কেবল তাই নয় কাইপেং অধ্যুষিত এলাকায় প্রাথমিক স্তরে পড়াশুনার জন্যে কোন বিদ্যালয়ও নেই। ফলে এখনো এরা আদিম জীবন যাত্রায় অবহেলিত।

শারীরিক গঠন ঃ

নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে কাইপেং জনগোষ্ঠী তিব্বত - বার্মা মঙ্গোলয়েড গোত্র-ভুক্ত আগেই বলা হয়েছে। ফলতঃ উত্তরাধিকার সূত্রেই এরা শক্ত সমর্থ দেহ, চেপ্টা নাক, উঁচু চিবুক এবং গাত্র বর্ণ কালো থেকে বাদামী রং-এর অধিকারী। এদের মধ্যে আবার রয়েছে সাতটি উপবিভাগ, যথা ঃ— ১) সান জাঙ; ২) কুয়ার সেট্, ৩) সেঙ্গার, ৪) লাংথাঙ, ৫) সেনঘুর, ৬) সেনথেই এবং ৭) ডুরাই।

ভাষা

কাইপেংরা হ্রালাম গোষ্ঠীর পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে, বলতে পারে। কাইপেংরা লুসাই এমনকি বার্মা ভূখন্ডের কুকীদের শব্দাবলীতেও কম বেশী স্বাচ্ছন্দ্য। লুসাই ভাষার সঙ্গে নৈকট্যই সমধিক। নীচের উদারহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে ঃ—

কাইপেংদের কথ্য ভাষার সঙ্গে ইংরাজী ও লুসাই ভাষার কিছু উদাহরণ যার থেকে কাইপেং এবং লুসাই ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রাঞ্জল হবে।

Sl. No.	English	Kaipeng	Lushai
1.	Hair.	Sam	Sam
2.	Head	Lu	Lu
3.	Ear.	Kuar	Beng
4.	Nose	Nar	H nar.
5.	Face.	Mai.	H mai.
6.	Teeth	Ha.	Ha
7	Fore-head	Chal	Chal
8.	Tongue	Lei	Lei
9.	Hand	Kut	Kut
10.	Eye	Mit	Mit
11	Leg	Ke	Ke
12.	Nail	Tin.	Tin.
13	Blood.	Shisen.	Shisen.
14.	Water.	Tui	Tui
15.	Vegitable	Ansel	Anhel
16.	Fish	Nga	Sangha
17.	Onion	Purunsensen	Purunsen
18.	Belly	Phung.	Pum
19.	Skin	Vun.	Vun.

কিছু প্রচলিত প্রবাদ ঃ

1. "Nupa choryrongai lo tha mawk lini a zing"

Ep :– "Disobedient children are overtaken by lunar eclipse"

2. Khawpni th:xa ruirunal tyngka bo.

Ep:– "There is only one string for whole city people to die.

মাতৃভাষা কাইপেং কিন্তু এই ভাষার সঙ্গে লুসাই বা মিজো ভাষারও যথেষ্ট সাজুয্য রয়েছে। ভাষা থাকলেও তার লেখ্যরূপ নেই, বর্ণমালা নেই, ফলে লিখিত কোন সাহিত্য কর্ম নেই। এর নেতি-বাচক ফল পড়েছে গোটা সমাজের উপর। এখন যারা লেখা পড়া শিখতে চায় তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ নেই। ফলে পড়ুয়া ছাত্রদের ভাষা বিভ্রাটের শিকার হতে হয়। তাদের হয় বাংলা অথবা মিজো ভাষায় লেখা পড়া শিখতে হয়। মিজো ভাষা বিভ্রাটের কারণেই কাইপেং ছাত্র -ছাত্রীদের মধ্যে বাদ পড়া (ড্রপ আউট) ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বেশী। ষাট শতাংশের বেশী। এ পর্যন্ত আমার জানা একজন মাত্র কাইপেং ছাত্রী এম. এ. ডিগ্রী পেয়েছে। তাও বিশ্ব বিদ্যালয়ে নিয়মিত পড়ে নয়, ইগ্নো-র আগরতলা কেন্দ্র থেকে। অপর একজন এম. এ. পাশ করেছে ত্রিপুরা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে। এম. কম., এম. এস. সি. বি এ., বি. এস. সি. ছাড়া কাইপেং সমাজে পাশ তারা আর কেউ নেই। জনসংখ্যার প্রান্তীয় স্তরে অবস্থান এবং পশ্চাৎপদ অঞ্চল অবস্থানকেই এর জন্যে দায়ী করা হয়। এই দুই কারণে অন্যবিধ উন্নয়ন ও উপকরণও কাইপেং সমাজের অধরা। কাইপেং গ্রামগুলোতে এখনো সড়ক সংযোগ নেই, জল বিদ্যুৎও পৌঁছায়নি, পৌঁছায়নি আধুনিক জীবন -যাত্রার উপকরণ। কাইপেংদের মধ্যে সরকারী কর্মীর সংখ্যাও নগণ্য দু'চার জন মাত্র।

কাইপেং বর-বধূ

কাইপেংদের জীবিকা

উপযুক্ত জীবিকার সন্ধান না পেয়ে কাইপেংরা চরমতম দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই দিন আনি দিন খাই অবস্থা। তাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য জীবিকা হল জুম চাষ। ১৯৩০—১৯৪০ দশক সময় পর্যন্ত তাদের একমাত্র জীবিকা ছিল জুম চাষ এবং জুমের সন্ধানে স্থানান্তর গমন। বড়মুড়া পাহাড়ের পূর্ব ও পশ্চিম পাদদেশেই ছিল তাদের জুম ক্ষেত। ১৯৪০ সালে অমরপুর মহকুমার তৈদু'র এক বিস্তীর্ণ জলাভূমির আবদ্ধ জল খাল কেটে বের করে দিয়ে এরা চাষযোগ্য ভূমি উদ্ধার করে। সমাজে প্রবাদ ছিল, যে বা যারা এই জলাভূমির জল নিকাষ করবে তাঁর মৃত্যু হবে। এই প্রবাদ পথম পর্বে বাস্তবতা পায়। জল নিকাশের পর যে কটি পরিবার উদ্ধারকৃত জমিতে বসতি স্থাপন করে তাদের মধ্যে ছয় জনের মৃত্যু হয়। ফলে প্রবাদ সত্য হচ্ছে এই ধারণা থেকে পরিবারগুলি পালিয়ে যায়। সকলেই আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ১৯৫০ -এর দশকের শেষ ভাগে ধীরে ধীরে তৈদু'র উদ্ধার করা শুকনো জমিতে ফের কাইপেং বসতী গড়ে উঠে এবং কাইপেংরা উদ্ধারকৃত জায়গার দখল নেয়।

কাইপেংরা ব্যাবসা বাণিজ্যও শেখেনি। এই জন্যে যে দক্ষতার প্রয়োজন তা তাদের কাছে এখনো অধরা। ধৈর্য্য ধরে তা শিখবে এতটা ধৈর্য্যশীলও তারা নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে আঙ্গুলে গোনা কতিপয় এই সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারী চাকুরীতে রয়েছে। সেনা বাহিনীতেও তাদের স্থান নেই। বড় জোড় ২০ জন কাইপেং সরকারী চাকুরীজীবি। তাও উচ্চ পদে এই সংখ্যা শূন্য। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কাইপেংরা দরিদ্র থেকেও দরিদ্রতর।

মেয়েরা তাদের পরিধেয় নিজস্ব তাঁতে নিজেরাই বুনে নেয়। নিজেরাই সুতো কাটেন। কিন্তু তাদের ঐতিহ্যগত বাঁশ বেতের কাজ, উপযুক্ত বাজারের অভাবে প্রায় বিলুপ্তির মুখে। অধিকাংশ কাইপেং পরিবারই ছনের ছাউনী দেওয়া মাটির দেওয়ালের ঘরে বাস করে।

বিবাহ বিবাহ বিচ্ছেদ ও পণ প্রথা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অপরাপর উপজাতিদের মতনই কাইপেংরা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে সীমাবদ্ধ রেখে আসছিল। ব্যতিক্রম হিসেবে নিজেদের ৭ টি শাখার মধ্যেও ছেলে-মেয়ের বিয়ে চলতে পারত। এই কট্টর প্রথা নিকট অতীত পর্যন্ত চলছিল। সময় বদলাচ্ছে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশ্রন ঘটছে এখন উপজাতিদের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিয়ে হতে দেখা যাচ্ছে।

১৮ থেকে ২২ বছর বয়স হল মেয়েদের বিয়ের বয়স। ছেলেদের ২৩ থেকে ২৭ বছর বয়স। এখন, ভিন্ন সম্প্রদায়ে তো বটেই সমতলবাসীদের সঙ্গেও বিয়ে হচ্ছে, অন্ততঃ হতে বাধা নেই। প্রেমের বিয়েও স্বীকৃত। তবে পরিবারের উদ্যোগে সম্বন্ধ করে বিয়েকেই কাইপেংরা অধিক পছন্দ করেন।

সমাজে দুই ধরনের বিয়ে প্রচলিত রয়েছে — (১) পাত্র-পাত্রীর বাড়ীতে তাঁর পরিবারে যাবেন এই প্রথা হল "Law lo" এবং (২) বিয়ের অব্যবহিত পরেই কনে বরের বাড়ী চলে যাবেন। এই প্রথার নাম "Samak", তবে বর্তমানে উভয় প্রথাই প্রায় অপ্রচলিত। এখন নবদম্পতিরা নিজেরা ঘর বাঁধতেই অধিক পছন্দ করেন। পিতা-মাতার সঙ্গ ত্যাগ করে, যাকে বলে স্বাধীন। কাইপেংদের মধ্যে পণ প্রথা ছিল না। তবে পাত্র পক্ষকে পাত্রী পক্ষ কিছু অর্থ দিতে হত কিন্তু তা পণ হিসেবে কিছুতেই নয়। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। তবে একান্তই যদি তা হয় তবে জরিমানার পরিমাণ খুব একটা বেশী নয়।

বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রচুর মদ্যপান হত। এই প্রথাকে বলা হত জুপুই (Zu pui) এবং যখন কন্যার পিতা-মাতা ঐ পরিমাণ মদ যোগানে অপারগ হতেন ঐ মদ্যবিহীন বিবাহ অনুষ্ঠানটিকে বলে জুটি (Zute)। যার বাংলা প্রাতশব্দ "অধিক চাউল থেকে তৈরি মদ" এবং " কম চাউলে তৈরি মদ" । দারিদ্রতার কারণে এই বিপুল পরিমাণ মদের যোগান প্রথা এখন প্রায় উঠেই গেছে। এছাড়া খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচলনও এই প্রথাকে বন্ধ করতে উৎসাহ যুগিয়েছে। মদ্যপানের অনুষ্ঠান তিনদিন ব্যাপী চলত। যুবক-যুবতীদের ব্যাভিচারের শাস্তিও কঠোর।

ধর্ম ও কিছু আচার

সুদূঢ় অতীতে কাইপেং সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না। অন্ততঃ ষোড়শ শতকের আগ পর্যন্ত। তারা কোন মূর্ত্তি পূজা করত না। কিন্তু ভূত প্রেত এবং খারাপ বা দুষ্ট আত্মার তুষ্টির জন্য পূজো করত। তবে ধর্ম- বিশ্বাসী বা মূর্ত্তি পূজক না হলেও ভগবৎ বিশ্বাসী ছিল। স্বর্গ নরক বিষয়ে

ধারণা ছিল না তাদের। কিন্তু জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন। ১৮০০ সালের পর থেকে কাইপেং সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব পড়তে শুরু করে। দীর্ঘ ২০০ বছর হিন্দু ধর্মের প্রভাব সমাজে বহাল ছিল। ১৯৬০ সাল থেকে নূতন ধর্ম বিশ্বাসে তারা ব্রতী হন। কাইপেংদের মধ্যে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্মান্তরের কাজ করতে শুরু করে। অমরপুর মহকুমার তৈদুতে প্রথম খ্রীষ্টান মিশনারীদের পদার্পন। ১৯৬২ সালে প্রথম তিনটি কাইপেং পরিবার বিনন্দ সর্দার পাড়ায় ধর্মান্তরিত হন। ধর্মান্তর ঘটে ১৮ই নভেম্বর তারিখে। ৪৬ বছরে মিশনারী প্রচেষ্টায় ৬০ শতাংশেরও বেশী কাইপেং সম্প্রদায়ের মানুষ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। ধর্মীয় বিবর্তনের বর্তমান পর্যায় এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে কাইপেং সম্প্রদায় আধুনিক সংস্কৃতিকে দ্রুত গ্রহণ করছে।

কাইপেং সমাজে শিশু যদি পুত্র সন্তান হয় জন্মের পরেই তার শরীর ধুইয়ে দেওয়া হয় বা স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। ছয় মাস বয়স হলে প্রথম তার চুল কেটে দেওয়া হয়। কন্যা সন্তান জন্মানোর পর বিশেষভাবে তৈরী বস্ত্রে তার বুক আবৃত করা হয়। এই কাজটি কয়েকজন ছেলে মিলে করেন। কিন্তু অধুনা এই প্রথা মানা হয় না। হতে পারে, এই প্রথা মানা হত এই কারণে যে কাইপেংরা শরীরের উর্দ্ধাংশ খুব কম সময়ই আচ্ছাদিত রাখত সেই অভ্যাস এখন লুপ্ত। এক দেড় বয়স পর্যন্ত শিশু মারা গেলে তার মৃত দেহ কবর দেওয়া হয়। এক বছরের উর্দ্ধে হলেই মৃতদেহ আগুনে পোড়ানো হত। এখন যেসব পরিবার খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদের সকলের দেহই কবর দেওয়া হয়।

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব

কাইপেং সমাজে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব দ্রুত বিস্তার ঘটে এবং সমাজের গভীরে স্থান করে নিচ্ছে। তাদের অর্থনীতি সংস্কৃতি সামাজিক নিয়ম-কানুন সর্বত্র খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব এখন পরিলক্ষিত হয়। আদিম সমাজের দুঃখময় খরা থেকে তারা উন্নততর সমাজের প্রবেশ করছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি, আধুনিক সমাজব্যবস্থার ধারণা, ডিজিটাল যুগের হাওয়া এখন দুর্বল ও পশ্চাৎপদ সমাজেও বইতে শুরু করেছে। কাইপেংরা এখন আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার সান্ধ্যলগ্নে মুক্তি ও উন্নয়নের প্রত্যাশী। এর মধ্যেও বৈচিত্র্য হল কেউ কেউ পুরনো প্রথাগত জীবিকা ও জীবন-যাত্রাতেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান নিজেদের, অবশিষ্টরা অবশ্যই উন্নয়নের উল্লম্ফন মাত্রায় নিজেদের ভাসিয়ে রাখতে চান। তবে পশ্চাদগামীরা সংখ্যায় স্বল্প। অধিকাংশই নয়া ধর্মকে বাহন করে আত্মবিশ্বাস যে জীবনের সব পথের আস্বাদন পেতেই উৎসাহী। তবে যারা ধর্মান্তরিত হননি তাদের আস্থা হিন্দুধর্মেই। তারা ধর্মের আচারপদ্ধতি, মূর্ত্তি পূজা ও অন্যান্য আচারবিধি মেনে চলেন। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান যে ধর্মাবলম্বীই হোক্ আচারবিধি মেনে চলেন। তবে হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টান যে ধর্মাবলম্বীই হোক আসলে প্রত্যেকের প্রভাব প্রত্যেকের উপর পড়ছে। আসলে মূল ধর্ম বিশ্বাসে অটল থেকেও এ যেন উপজাতিদের এক মিশ্র সংস্কৃতি। আসলে, অন্য উপজাতিদের মতই কাইপেংরাও ধর্মের বিবর্তন পথে চলেও প্রকৃতির নির্ভরতাকে বাদ দিতে পারে নি, নিজস্ব কিছু প্রথা ও আচরণ থেকেও নিজেদের পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি। আগে কাইপেংরা কের পূজা অনুষ্ঠান করত। কাইপেং ভাষার কেরের প্রতি শব্দ হল Khawser। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন দিন পূজা হত। পূজার দিনে গ্রামে বহিরাগতদের ঢুকতে দেওয়া হত না বা ভিতরের

লোকদেরও বাইরে যেতে দেওয়া হত না। এই বিধিনিষেধ ছিল একটা নির্দিষ্ট অর্থাৎ পূজাকালীন সময় পর্যন্ত।

কাইপেংরা, লুসাই বা মিজোদের মতনই অতীতে কোন নির্দিষ্ট প্রথা বা সংস্কৃতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল না। এর পশ্চাতে অনেক কারণ ছিল, যথা ঃ ১) জনসংখ্যার স্বল্পতা; ২) নিজস্ব সংস্কৃতির উপর নিষ্ঠার অভাব; ৩) নিজস্ব সামাজিক আইন এবং প্রথার প্রতি অহঙ্কারের অভাব; ৪) নিজস্ব সংস্কৃতির চাইতেও বহিরাগত সংস্কৃতির বর্ধিত প্রভাব ইত্যাদি। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবে এখন সমাজ নূতনভাবে নিজেকে গ্রন্থিবদ্ধ করতে শুরু করেছে।

খেলাধূলা

সমাজে প্রথাগত খেলাধূলার সংখ্যা কম। তবে ছেলে-মেয়েরা যে সব খেলাধূলা করে তা হল ঃ ১) কুস্তি; ২) বাচ্চাদের লুকুচুরি খেলা; ৩) দড়ি টানাটনি; ৪) বাঁশে চড়া; ইত্যাদি।

সংস্কার ঃ

তৈদু ঢেপার বাঁধ কেটে দেওয়ার বিষয়ে একটি সংস্কার ছিল, ঐ বাঁধ কাটলে যে কাটবে তার মৃত্যু হবে। বাঁধ কেটে মার্সি ল্যান্ড উদ্ধার হল, কিছু কাইপেং পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করল। এর অব্যবহিত পরেই কাইপেং পরিবারের ছয় ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ফলে সংস্কার বাস্তবায়ি ত হচ্ছে, এই জায়গায় বসবাস করা অমঙ্গলজনক, মৃত্যুই ভবিতব্য এই বিশ্বাসে অবশিষ্ট পবিবার গুলি ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়। পবে অবশ্য অনেকেই এবং বেশী সংখ্যায় ঐ জায়গাতেই ফিরে আসে এবং বসবাস শুরু করে। অর্থাৎ সংস্কার মুক্ত হয়। প্রাচীন লোকেরা বলেন ঐ বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন সামসের গাজী।

রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

কাইপেং সমাজে উল্লেখ করার মতন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেই; এখনো পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েতেও এই সম্প্রদায়ের কেউ নির্বাচিত হন নি। সংখ্যাল্পতাই হয়তো এর কারণ হবে।

কাইপেংরা অতিশয় শান্তিপ্রিয়। কখনই তারা অপরের সঙ্গে বিবাদে জড়ায় না; অন্যকে আক্রমণ করে না বা ঘৃণাও করে না। অন্য উপজাতিদের সঙ্গে শতাব্দীর পর শতাব্দী এরা সহাবস্থান করছে। মলছম, কলই, রাঙ্খল, রূপিনী, দেববর্মা সকলের সঙ্গেই তাদের সখ্যতা ও সহঅবস্থান করেছে ধনলেখা, তৈদু, সস্টাঙ, লুপাংরুমুয়া, পালকুয়া, ভাটাম্‌ক কুণ্ড ইত্যাদি গ্রামে।

রজনী কাইপেং

অম্পির নিকটবর্তী ধনলেখা গ্রামে ১৯৫৫ সালের ৪ঠা মার্চ জন্ম। ধনলেখা গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা। উচ্চ শিক্ষা কাছাড় নেহেরু কলেজে। ১৯৯১ সনে ব্রিটেনের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ। ত্রিপুরা ব্যাপ্টিষ্ট খ্রীষ্টান ইউনিয়ন-এর সাধারণ সম্পাদক। ২০০২ সনে ব্যাঙ্গালোর থেকে এম. টি এইচ ডিগ্রীও লাভ করেন।

রাঙ্খল

গবেষক ও লেখকদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে হালাম জনজাতি কুড়িটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত এবং সেগুলি হলো — মলছম, কাইপেঙ, রাঙ্খল, কলয়, রূপিনী, বঙচের, কারবঙ, লাঙক্যাই, চোরাই, মুরছুমফাঙ, রাঙলঙ, থাঙকচেপ, বঙ, খকনু, হালাম, নাতিয়াঙলঙ, নাসবাঙ, সাইমার, দাব এবং কাঙকচেপ।

কিন্তু কলয় এবং রূপিনী সম্প্রদায় আসলে বৃহত্তর হালাম জনজাতির সমাজের মধ্যে পড়ে না। সত্যিকথা বলতে কি, তারা ককবরক ভাষাভাষী ত্রিপুরী সমাজের অর্ন্তভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জনগোষ্ঠী। ১৯০১ সালের আদমসুমারির সময় এই দুটি জনগোষ্ঠীকে সম্ভবতঃ ভুল করে হালাম জনগোষ্ঠীভুক্ত করে দেওয়া হয়। আর ঠিক সেই সময় থেকে খুবই অসঙ্গতভাবে সমাজবিজ্ঞানী ও ঐহাসিকরা তাদেরকে হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু সমাজগত, ভাষাগত এবং সংস্কৃতিগতভাবে তারা হালাম সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত হতে পারে না।

হালাম সম্প্রদায়ের উৎস

ঐতিহাসিক ও নৃতত্ববিদ্‌রা যেভাবে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনো জনগোষ্ঠীকে উপজাতি হিসেবে বিবেচিত করেন মনুষ্য সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে, আর ঠিক তেমনিভাবে ত্রিপুরার রাঙ্খল জনগোষ্ঠী উপজাতি বা জনজাতি হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তবে রাঙ্খলদের উৎস- সংক্রান্ত তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়। রাঙ্খলদের মূল উৎস বের করা খুবই কঠিন, কারণ এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা কোথা থেকে এসে ত্রিপুরায় বসতি বিস্তার করেছিলো তার কোনো লিখিত তথ্য নেই। পরম্পরাগতভাবে এতটুকু জানা যায় যে রাঙ্খলারা হলো 'রুমমি' (Hrwm mi)-অর্থ হিমালেয়ের পাদদেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী তড়িৎ গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমন করতে পারে। এবং যারা চরিত্রগতভাবে সাহসী ('Mi' Hoisen')

মাইগ্রেশন ও বসতি বিস্তার

রাঙ্খল জনগোষ্ঠীর মাইগ্রেশন ও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ার যে তথ্য পাওয়া যায় তার থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে রাঙ্খলরা বার্মার পূর্ব সীমান্ত থেকে এসেছিলো এবং এই অংশ স্মরণাতীত কালে চীন (Sinlung) দেশের অর্ন্তভুক্ত ছিলো। বিশেজ্ঞদের মত অনুসারে এই জনজাতির মানুষ ইন্দো-মোঙ্গল প্রজাতির হালাম-কুকী গোষ্ঠীভুক্ত। ভাষাগতভাবে তারা চীন-তিব্বতীয় ভাষা-বংশের কুকী উপভাষা-বংশের অর্ন্তগত। রাঙ্খলরা ত্রিপুরার ককবরক ভাষা বুঝতে পারে। এবং তাদের মনে হয় ককবরক ভাষার সঙ্গে তিব্বত-বর্মীয় কুকী জনগোষ্ঠীর ভাষার সমন্বয় সাধন হয়েছে।

জনবিন্যাস পরিবর্তন

রাঙ্খল জনগোষ্ঠীর জনবিন্যাসে ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই ক্ষয়িষ্ণুতার জন্যে দায়ী

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিম্নমুখিতা, তার গতিতে ক্ষয়ীমান প্রভাব। রাখাল জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনে এ-সবেরই প্রভাব পড়েছে।

ধর্ম ভাষা ও সমাজগত কিছু কথা ঃ

হিন্দু ধর্মের সঙ্গে রাখালদের পরম্পরাগত ধর্মের মিল রয়েছে। তারা আত্মা এবং একাধিক দেবতা ও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে। তারা অপূর্ব একশান্ত সমাহিত জীবন যাত্রায় বিশ্বাসী। রাখালরা তাদের প্রাচীনতম জাতিসত্তা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পছন্দ করে। সমাজের মধ্যে আত্মসম্মান ও গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এই জনগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য।

ঐতিহাসিকভাবে এ-কথা সত্য যে ভৌগোলিক পরিসরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যে উপভাষাগত বিভাজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। তার ফলশ্রুতি হিসাবে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসার ফলে রাখাল ভাষায় প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। বিশেষভাবে সুর (tone) ও স্বরভঙ্গি (accent) -এর ক্ষেত্রে। রাখালদের দুর্ধর্ষতা এখনও মানুষ মনে করে এবং তারা একসময় নরমাংসভোজী ছিলো বলে জানা যায়। দেবতা, রাজা ও সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাভক্তি ছিলো প্রবাদের মতো। এবং তারা ছিলো ভালোর ভালো খারাপের খারাপ। রাজ আমলে তারা রাজার সৈন্যবাহিনীতে বহুল সংখ্যায় নিয়োজিত হতো। শিকারী হিসেবে তারা ছিলো প্রসিদ্ধ। বিজয়াদশমীর দিন রাখালরা রাজ দরবারে অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর তুলনায় বিশেষ পদ ও সম্মান পেতো। এর কারণ হতে পারে এই যে রাজার

সেনাবাহিনীতে তারা বড় বড় উচ্চপদে আসীন ছিলো। এবং রাজারা এই জনসমাজের মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে বিজয়া দশমীর রাজভোজে রাঙ্খলদের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করতেন।

রাঙ্খলদের জনবসতি ও জুম কৃষি

এই কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাঙ্খলরা ত্রিপুরার ভূমিপুত্র। উত্তর ত্রিপুরার ধলাই জেলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় এদের বসবাস দেখা যায়। ভারতের মধ্যে ত্রিপুরাই তাদের আবাস ভূমি বলা যেতে পারে। হালামরা হলো কুকী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরায় ত্রিপুরীরা আসার পূর্বে এই জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা ত্রিপুরায় বসবাস করতো। অতীতে রাঙ্খলদের মূল জীবিকা ছিলো জুম চাষ। জুম কৃষি যাতে বিপদের মুখে না পড়ে তার জন্যে তারা নানা ধরনের পশু-পক্ষী বলি দিতো ও দেবার্চনা করতো। জুমের ফসল ঘরে এলে তারা দেব-দেবীকে খুশি করার জন্যে সংঘবদ্ধ নৃত্যগীত করতো।

ভাষা সম্পর্কে বিশেষ কিছু কথা

ভাষা হলো একটা জনগোষ্ঠীর বহিঃ প্রকাশেব মাধ্যম। এবং এই ভাষা ব্যাকরণ ও শব্দসম্ভারের নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। রাঙ্খলদেরও একটি সুসংহত ব্যাকরণনির্ভর ভাষা আছে যা কুকীচীন ভাষাবংশের অর্ন্তভুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানে রাঙ্খলদের ব্যক্তিবিশেষের ভাষা বলার ভঙ্গি পাল্টে যায় এবং এটি নির্ভর করে বক্তার সামাজিক ভূমিকা ও মর্যদার ওপর।

রাঙ্খলদের প্রাচীন বাসস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য

জনশ্রুতি অনুসারে রাঙ্খলরা সারা বিশ্বের আরণ্যক পরিবেশে পাহাড়ের ওপর বসবাস করতো, যেখানে ছিলো প্রকৃতির মনোরম হাতছানি ও অনাবিল শান্তি। জীবজগতের এই বিশেষ অবস্থাকে রাঙ্খল ভাষায় বলে ARSHI - EM KHOWPUIআর সেখানে এক অতিপ্রাকৃত শক্তির অধীনে তারা বসবাস করতো। তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির ফলে তারা অভিশপ্ত হলো মৃত্যুজনিত অভিশাপে। পাপ মুক্তির পরে দেখা গেলো একজন গর্ভবতী মহিলা ও একটি গরু বেঁচে আছে। ক্রমান্বয়ে দু'জন সুন্দর মানুষের জন্ম হলো — Khowthir (বয়োজ্যেষ্ঠ)ও Hrangchal (কনিষ্ঠ), আর তারা ছিলো একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। যারা এই মনোরম জীবজগৎকে পুর্নজীবিত করলো, আর তখন থেকেই রাঙ্খলদের শুরু হলো বির্বতনের সঙ্গে দেশান্তরি হবার অভিযান।

গান যখন দুঃখ লাঘবের ভাষা

ঐতিহ্য পরম্পরাগতভাবে রাঙ্খলদের গান হলো খুব প্রিয়। জীবিকার্জনের সাথে এই গান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সংগ্রামী জীবনে অপ্রাচুর্যতার গ্লানি ভুলতে সঙ্গী ছিলো এই গান। যা দিয়ে ভালোবাসার মানুষের কাছে যাওয়া যেতো। রাজারাও তাদেরকে চোখে চোখে রাখতেন। তাদের গঠনমূলক কাজ রাজারা পছন্দ করতেন না। এমন কি এই জনগোষ্ঠীর লোকেদের সংঘবদ্ধ হবার ঘটনাকে রাজবিরোধী ও সমাজ বিরোধী হিসেবে গণ্য করা হতো। তখন গানের মাধ্যমে বার্তা

পাঠানো হতো।

রাখ্খলদের ভাষা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য ঃ

আমরা যখন শিশুর ভাষার বিকাশ লক্ষ্য করি তখন দেখতে পাই ভাষা শেখার পরে সে বিভিন্ন ঘটনায় তার ভাষার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। আস্তে আস্তে ঘটনার ভিন্নতা অনুসারে সে ভাষা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রাখ্খল জনগোষ্ঠীর ভাষাও বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হচ্ছে এবং সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে। এই জনগোষ্ঠীর ভাষা যথেষ্ট সাবলীল ও নমনীয়। এই ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই ভাষায় কম লোক কথা বলে, আর যার জন্যে এই ভাষা এখনও অক্ষতযোনী ও মিশ্রণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই ভাষার নেতিবাচক দিক হলো বিকাশের পথে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। অথচ ভাষাটি সাবলীল ও সম্ভাবনাপূর্ণ। যদিও ভাষাটি কুকী - হ্লাম ভাষার সমগোষ্ঠীয়, তা সত্ত্বেও আন্তর বাক্-বিনিময়ের অভাব রয়েছে যথেষ্ট। কাজেই রাখ্খলদের ভাষা একটি ক্ষয়িষ্ণু জনগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে - বিকাশের পথ পাচ্ছে না।

রাখ্খলদের শিক্ষা ঃ

মানুষ যখন লেখাপড়া শেখে সে তখন অন্যদের কাছ থেকে অনেককিছু নেয়। শিক্ষা মানুষকে সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করে। রাখ্খলরা এই শিক্ষার ঘোড় দৌড়ে অনেক

রাখ্খল রমণীর অলঙ্কার প্রিয়তা
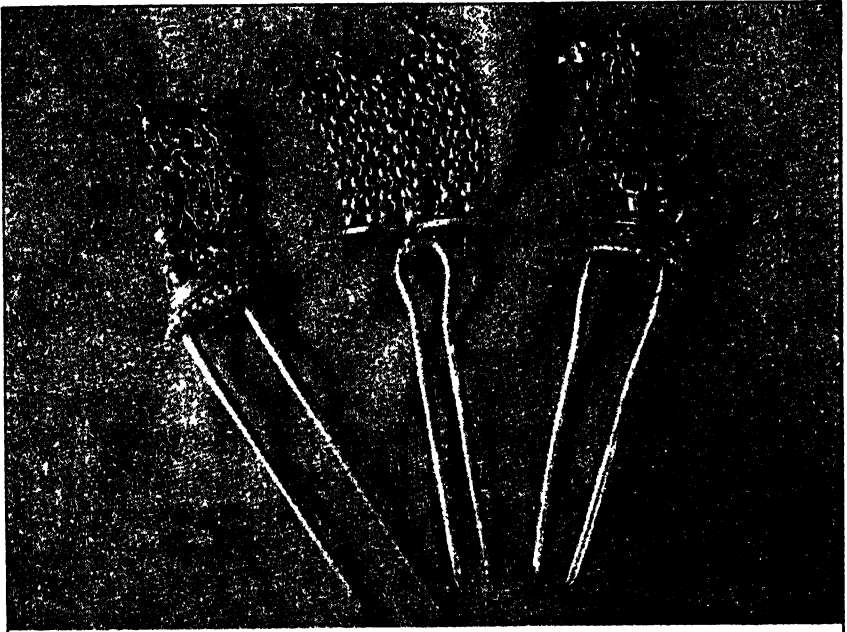
রাঙ্খল রমণীর খোঁপার কাঁ

পিছিয়ে রয়েছে। তবু বলা যেতে পারে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এটি মোটেই নৈরাশ্যজনক নয়।

জুম কৃষি সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

অতীতে জুম কৃষি ছিলো রাঙ্খলদের জীবিকার প্রাথমিক উৎস। তাই তাদের সমাজ জীবনে ছিলো যাযাবর-বৃত্তি। প্রকৃতির নিয়মের ওপর ছিলো তাদের অগাধ বিশ্বাস। প্রকৃতির কোলে থেকে সংগ্রাম করতে করতে তাদেরকে এগোতে হতো। সেই কঠোর জীবন পদ্ধতি এখনও তাদের রয়েছে, জুম চাষের অভ্যাস এখনও তারা ছাড়তে পারে নি। কিন্তু জুমচাষ করার উপযুক্ত জমির আকাল দেখা দেয়ায় জীবনের গতি পাল্টে যাচ্ছে। সংঘবদ্ধ জুমচাষ এখন ব্যক্তিগত কৃষিতে পরিণত হয়েছে। তাই সংঘবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে এসেছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি। এবং পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাকে তাল মিলিয়ে চলতে হচ্ছে।

রাঙ্খলদের সমতল কৃষিতে আগমন ঃ

পরিবর্তনের ধাক্কা সামলাতে রাঙ্খলদের এখন জুম কৃষির পাশাপাশি সমতল কৃষিতেও আত্মনিয়োগ করতে হচ্ছে। তবে সমতল কৃষিতেও দেখা দিচ্ছে নানাহ সমস্যা। তবু যাযাবর জুম চাষ বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী কৃষিতে আসতে হচ্ছে জীবনে টিকে থাকার খাতিরে।

আধুনিক অর্থনীতি ঃ

রাঙ্খলরা আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এখনও তেমনভাবে অংশ নিতে পারছে না। বাইরের সমাজের সঙ্গে এখনও পণ্যবিনিময় অর্থনীতি বজায় আছে। তাই উন্নত জীবন ধারণের জন্যে তাকে অন্য বৃত্তিতে যেতে হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে রাঙ্খলরা কঠোর পরিশ্রমী এবং আধুনিক জীবনযাত্রার চাহিদা অনুসারে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি হলো হয়তো বাঁচার জন্যে প্রাণপন সংগ্রাম করো, না হয় পরাজয় অথবা মৃত্যু বরণ করো, তাই চরিত্রগতভাবে সাহসী ও দৃঢ়চেতা হওয়ায় সামরিক বিভাগে চাকরি গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। তাই ইতিমধ্যে অনেকে ভারত সরকারের জাতীয় সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

রাঙ্খলদের ঐতিহ্যগত খেলা-ধূলা ঃ

ঐতিহ্যগতভাবে রাঙ্খলরা বাঁশ-বেতের ডালা-কুলো ইত্যাদি তৈরির কাজে নিপুণ শিল্পী। সুদক্ষ শিকারীও তারা। রাঙ্খল সমাজের প্রাচীনতম খেলা-ধূলায়ও তারা খুব পটু। তাদের প্রিয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় বর্শাছোঁড়া, শরনিক্ষেপ ও পারস্পরিক তরবারি -যুদ্ধ প্রতিযোগিতায়। বাসকেট বল খেলার প্রতিযোগিতায়ও তারা অংশ নেয়।

রাঙ্খল রমণীদের ব্যবহৃত অলঙ্কার।
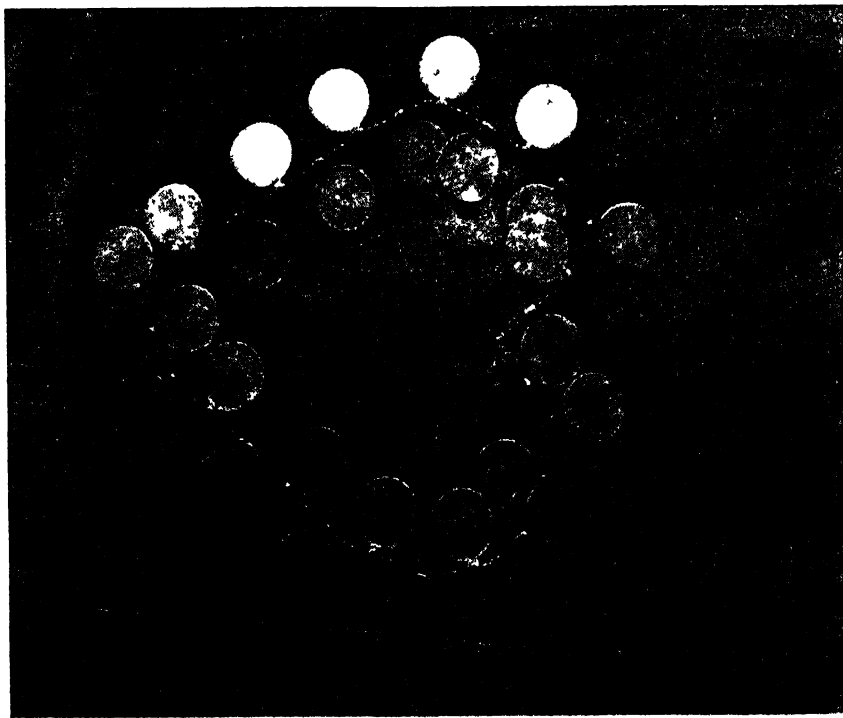
রাখাইন মহিলাদের হস্তশিল্প ঃ

রাখাইন জনগোষ্ঠীর মহিলরা দক্ষ তাঁতশিল্পী হিসেবে পরিচিত।তারা তাদের ঐতিহ্যমন্ডিত উপজাতীয় তাঁতে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র তৈরী করে। তাদের পরিধেয় 'পাছড়া' দুখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড দিয়ে তৈরী। বুকে জড়ানো বস্ত্র ও নয়নমনোহর বক্ষবন্ধনী তৈরীতেও তারা অত্যন্ত দক্ষ। তাঁত বস্ত্র নির্মাণ ছাড়া রাখাইন মহিলারা রান্না-বান্না, উদুখলে ধান ভানা প্রভৃতি গৃহকর্ম সম্পাদন করে থাকে। পুরুষদের সঙ্গে কৃষিকাজ করাও তাদের কাজ। হস্তশিল্পের বাজারজাত করাও তাদের কাজ।

রাখাইন রমণীর খোঁপার কাঁটা

জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে কিছু তথ্য ঃ

কোনো সন্তানের জন্ম রাখাইন সমাজে এক মঙ্গলজনক ঘটনা। পুরুষ সন্তান ও কন্যা সন্তানের মধ্যে কোনো বিভাজন রেখা টানা হয় না। তাদের কাছে স্ত্রী প্রজাতি সৃষ্টি, প্রেম ও ধ্বংসের প্রতীক। মাতৃজাতি তাদের কাছে ভালবাসা ও সন্তান ধারণের ঝর্ণা। কিন্তু মাতৃজাতিকে ভুলভাবে পরিচালিত বা ব্যবহার করলে ধ্বংস অনিবার্য। কন্যা সন্তান রাখাইন সমাজে বিশেষ মর্যাদা পায় ঠিক যখন বিবাহযোগ্য বয়সের আগে তাদেরকে ঋতুমতী হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং ঋতুমতী হওয়ার কারণে এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন করা হয়। সমাজের নির্বাচিত দলপতির উপস্থিতিতে কোনো মৃতকে শ্মশানে শেষ বিদায় জানানো হয়। রাখাইন সমাজে মৃতদেহ আত্মীয়-স্বজনদের ইচ্ছা অনুসারে পুড়ানো অথবা কবর দেওয়া হয়।

বিবাহ সম্পর্কে তথ্য ঃ

রাঙ্খল সমাজের সনাতন রীতি অনুসারে সমাজের মধ্যেই বিবাহ সাধিত হয়ে থাকে রক্তের সম্পর্ক পবিত্র রাখার জন্যে। সমাজের মধ্যে কোনো Class marriage বা Caste marriage নেই। তবে ব্যক্তিবিশেষ সমাজের বাইরে বিয়ে করতে চাইলে করতে পারে, তবে ওই বিয়েতে সামাজিক কোনো পৃষ্ঠপোষকতা থাকে না।

রাঙ্খল সমাজের বিয়ের কনে ত্রিপুরার অন্যান্য উপজাতি সমাজের বিয়ের কনে থেকে একটু পৃথক মর্যাদা পায়। বিয়ের সময় বরকে কনের বাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। ভাবী শ্বশুর সম্মত হলে বরকে প্রাক-বিবাহ পর্বে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে দু'থেকে সাত বছর জামাই খাটতে হয়। এর মধ্যে বর ও কনের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা হলে অথবা প্রাক্-বিবাহ পর্বে মেলা-মেশার ফলে সন্তান-সন্ততি হলে তাদেরকে তখন বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। আর 'জামাই খাটা' পর্বে বর যদি ভাবী স্ত্রী, শ্বশুর -শাশুড়ীকে তার কাজের মাধ্যমে খুশী করতে না পাবে, তাহলে তাকে বিফল মনোরথ হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। সমাজের লোকজনকে একটা ভোজ দিয়ে খুব সাধারণভাবে বিয়ের কাজ শেষ হয়।

রাঙ্খল সমাজে সংস্কৃতির বিবর্তন ঃ

সংস্কৃতিগতভাবে রাঙ্খল সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। আব বর্তমান কালেব নানান পরির্বতনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংস্কৃতিক এই পরিবর্তন অপরিহার্য ছিলো। কাজেই বলা যেতে পারে রাঙ্খল জনসমাজের সংস্কৃতি এখন এক পরিবর্তনের চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে। তবু তারা

রাঙ্খলদের নৃত্য

তাদের বংশ পরম্পরায় পালিত সংস্কৃতি ধরে রাখতে চায়। তবে তাদের সনাতনী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে খুব বড়ো থাবা বসিয়েছে সংবাদ মাধ্যম। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসছে ধর্মীয় পরিবর্তনও। ধর্মীয় পরিবর্তন তাদের চিন্তাধারায় অন্য এক মাত্রা এনে দিয়েছে। এই পরিবর্তন পূর্ববর্তী সনাতন ধর্ম থেকে অনেক বেশী গঠনধর্মী। তবে ধর্মীয় পরিবর্তনের সংঘাতের মধ্যে পড়ে নতুন ধর্মের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সমাজের কিছু অংশ লোকের বাস্তবিকই সমস্যা হচ্ছে।

যেমন প্রবাদ আছে — সময় ও জোয়ার-ভাঁটা কারোর জন্যে অপেক্ষা করে না, তেমনি কারোর অপেক্ষা না করেই রাঙ্খল সমাজে সনাতনী দেব-দেবীর আরাধনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে খুবই স্বাভাবিকভাবে। ছোট ছোট জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সংমিশ্রণের এই সম্পর্কগত পরিবর্তন যুগের চাহিদা অনুসারে প্রয়োজনই। তবে এখনও ঐতিহ্যবাহী লোকায়ত বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাঙ্খলরা সরে আসতে পারছে না।

উৎসব মুখরিত রাঙ্খল সমাজ

বিভিন্ন সামাজিক উৎসব মনোরম চিত্তবিনোদন রাঙ্খল সমাজের অঙ্গ। এই সমাজের মানুষদের বিশ্বাস যেকোনো চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত উত্তরণের ক্ষেত্রে সামাজিক উৎসব অতীব প্রয়োজন। এই উৎসব মুখর জীবন আত্মাকে শান্তি দিয়ে দেহ ও মনকে আরও বেশী সতেজ করে তোলে।

রাঙ্খল জীবনের স্মরণীয় ঘটনা ঃ

রাঙ্খল জনজাতির জীবনে সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা হলো তাদের চীনদেশের হাচেকতাঙ (Hachek tang – Hills of the white teeth) এলাকায় অবস্থান। এই এলাকা থেকেই তারা ত্রিপুরায় এসেছিলো এবং ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের পূর্বে যাযাবর আরণ্যক জীবন কাটিয়েছিলো।

টিকে থাকার প্রশ্ন ও রাজনীতি

রাঙ্খলদের মতো ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের টিকে থাকতে হলে স্থানীয় ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রেও ওই একই কথা খাটে। রাজনীতির ব্যাপারেও এই সমাজ বিভাজিত। ব্যক্তি বিশেষের পারঙ্গমতার প্রয়োজন হয় বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলে অর্ন্তভুক্ত হতে। রাঙ্খলদের মধ্য থেকে যারা রাজনীতির জাগতে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন — প্রয়াত রবি রাঙ্খল (প্রাক্তন বিধায়ক), প্রয়াত পদ্ম রাঙ্খল (প্রাক্তন বিধায়ক), শ্রীযুক্ত ডি. সি. রাঙ্খল (প্রাক্তন বিধায়ক) এবং বর্তমান বিধায়ক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রাঙ্খল।

বিবর্তনের পথে রাঙ্খল জনগোষ্ঠী

অতীতের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে রাঙ্খলরা পরিবর্তনশীল চলমান জগতের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাই বহিরাগত প্রতিবেশীর সঙ্গে সহাবস্থান করা তাদের পক্ষে খুব একটা সমস্যা নয়। বর্তমান উন্নতমানের তথ্য-প্রযুক্তির যুগে রাঙ্খলরা অগ্রগমনের চৌমাথার সংযোগস্থলে একে দাঁড়িয়েছে। রাঙ্খলরা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হয়ে এতদিন প্রকৃতির কোলে থেকে জীবন সংগ্রম করে এসেছে। তাদের উচিত হবে না বর্তমানের চোখ বাঁধানো পরিবর্তনের কাছে সম্পূর্ণ রূপে বশীভূত হওয়া। ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট তাদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে

গেছে স্বাধীন ভারতবাসী হিসেবে। তারা গণতান্ত্রিকভাবে বিধানসভার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। রাঙ্খলদের শান্ত সমাহিত জীবন থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে অনাগত ভবিষ্যতের লড়াইয়ের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

ফ্রান্সিস্ ইউ. এল রাঙ্খল
ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রীরাঙ্খলের জন্ম ১৯৬৯ সনে তেলিয়ামুড়ার বাবুমণিপাড়ায়। বিদ্যালয় শিক্ষা তেলিয়ামুড়া থেকে। উচ্চশিক্ষা শিলং-এ।

হালাম

সুদীর্ঘ অতীত থেকেই হালামরা ত্রিপুরার সুপরিচিত উপজাতি গোষ্ঠী। তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আজ খুব কম লোকেরই প্রকৃত ধারণা রয়েছে। এমনকি হালামদের উৎপত্তি নিয়ে তথ্যাদি যোগানোর মতো কোন ঐতিহাসিক দলিলও পাওয়া যায় নি। এই অবস্থার জন্য মূলতঃ যে কারনটি দায়ী, তা হলো 'রাজমালা' নামক ত্রিপুরার রাজবংশের নিজস্ব ঘটনা... হালামদের উল্লেখ করা হয়েছে 'কুকি' হিসেবে, অহম পান্ডুলিপিতে হালাম গোষ্ঠীপ্রধান 'হালামসা'-র বিষয়ে কিছু উল্লেখ আছে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অহমরাজ স্বর্গদোবা রুদ্র সিং উদয়পুরে অবস্থিত ত্রিপুরারাজ রত্ন মানিক্যের দরবারে রত্নকুন্ডলী এবং অর্জুন দাস বৈষ্ণব নামে দুইজন পাঠিয়েছিলেন। ঐ দুই অহম দূতকে হালাম কুকিরাই স্বাগত জানিয়েছিলেন বলে জানা যায় কুকি রাজপ্রতিনিধির। সেদিন অহম দূতদের যথোপযুক্তভাবেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। অতীতে ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের সাথে কাছাড়ে অবস্থানকারী কুকিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সম্পর্কেও উল্লেখ রয়েছে অহম পান্ডুলিপিতে। তাদের দখলে তীর, ধনুক, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি যুদ্ধাস্ত্র ছিল বলেও জানা যায়। কুকিদের গোষ্ঠীপ্রধানকে 'হালামসা' বলা হত। তাঁর অধীনে থাকত গাবোর, গালিম, ছাপিয়া এবং দোলোইরা। পোষাক্-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে কুকিদের অনেকটা কাবুই নাগাদের মতো দেখাত; তবে তাদের খাদ্যাভ্যাসে কিন্তু নাগাদের চাইতে পৃথক ছিল। 'লোসকার' নামে ত্রিপুরার একজন রাজপ্রতিনিধি কুকিদের মাঝে থাকতেন। ফি-বছর ত্রিপুরার রাজাদের কাছে বাৎসরিক রাজস্ব প্রদান করতেন কুকিরা। রাজস্ব হিসেবে ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন রাজার কাছে কুকিদের প্রদত্ত উপহারের মধ্যে ছিল ঘোড়া, স্বর্ণ, হাতির দাঁত, রেশম বস্ত্রাদি, সুতো মিথুন ইত্যাদি। বর্তমানে হালাম বলে আত্মপরিচয় দেওয়া কুকিদের রাংলঙ উপজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিল বলে জানা যায়।

হালাম অর্থাৎ কুকি-গোষ্ঠীপ্রধানের অধীনে থাকার কারণে কুকিদের হালাম বলা হয়ে থাকে। এটি একটি কাছাড়ী বা ত্রিপুরী শব্দ। ককবরক হালাম ভাষায় উঁচু পর্বতকে 'হালাম' বলা হয় এবং 'সা' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয় সন্তান। এই দুটি শব্দ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে 'হালাম-সা' তৈরী করেছে। 'হালাম-সা' কথাটির অর্থ হল পর্বতের সন্তান, একইভাবে পার্বত্য বোরো উপজাতিদের 'দিমাসা' বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করলে দেখা যায় 'দিমা' এবং 'সা'- এই দুটি শব্দ বেরিয়ে এসেছে। 'দি' কথাটির অর্থ হল জল; 'দিমা' কথাটির অর্থ বৃহৎ জলাশয়। অন্যদিকে 'সা' কথাটির অর্থ যথারীতি 'সন্তান'। তাই 'দিমা' ও 'সা' মিলে তৈরী হয় বৃহৎ জলাশয়ের সন্তান বা 'দিমাসা'। ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে বসবাসকারী বিচ্ছিন্ন বোরোরা এই নামে সুপরিচিত ছিল। এক্ষেত্রে 'বৃহৎ জলাশয়' বলতে ব্রহ্মপুত্রকে বোঝানো হয়েছে। ত্রিপুরীরা পরিচিত ছিল 'ত্রিপ্রাসা' নামে। এই কথাটির অর্থ হল নদীর অববাহিকা। একসময় 'ত্রিপুরীরা' আসামের কাছাড় এলাকার বরাক এবং কুশিয়ারা নদীর সঙ্গমস্থলে বসবাস করত। এই কারনেই 'ত্রিপুরীরা' 'তিপ্রা' বলে আত্মপরিচয় দেয়। এক্ষেত্রে 'তি' কথার অর্থ হল জল এবং 'প্রা' শব্দটির অর্থ সঙ্গমস্থল। সুতরাং

তিপ্রা' কথাটির সম্মিলিত অর্থ দাঁড়াচ্ছে নদীর সঙ্গমস্থল। এই তাত্ত্বিক যুক্তিপ্রণালীতে অনেকেই সম্মত নাও হতে পারেন। তবে এটিই হালামদের মধ্যে প্রচলিত বহু জন্মের পুরানো প্রবাদ। 'হালাম' শব্দটির ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। 'হালাম-সা' নামক প্রধানের অধীনে কুকি উপজাতি গোষ্ঠীরা অবস্থান করলেও ত্রিপুরার রাজাদের কাছে আনুগত্য প্রকাশ্য করত তারা। ফলে কালক্রমে তাদের পরিচিতি হয়ে যায় 'হালাম'।

কুকি গোষ্ঠীর গঠন বিষয়ে বিশদ বিবরণ সমৃদ্ধ অপর একটি ঐতিহাসিক দিলল হল 'কৃষ্ণ মালা'। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানে হালাম হিসেবে আত্ম পরিচয় দেওয়া কুকি গোষ্ঠী সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে এই দলিলটিতে। এই ঐতিহাসিক গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠী বিষয়েও উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যের পূর্বপ্রান্ত নির্বাসনে থাকাকালীন একাছেপ, থাঙ্গাছেপ, ছোরাই, এহিমার, বাউঙ, কারবোঙ, রেংলঙ, সিয়ামবে, রাঙ্খল ইত্যাদি হালাম গোষ্ঠী এবং উপগোষ্ঠীর সাথে সংস্পর্শে আসে রাজপুত্র কৃষ্ণমণি। এই কুকি গোষ্ঠীগুলোকেই আজ 'হালাম' বলে জানা যায়। সুতরাং এই বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ত্রিপুরাতে অষ্টাদশ শতকের সময় থেকেই 'হালাম' শব্দটি সুপরিচিত ছিল। তাই 'প্রাচীন কুকি উপজাতি গোষ্ঠী' হিসাবে "লিঙ্গুইষ্টীক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া" নামক গ্রন্থে হালামদের চিহ্নিত করেন লেখক জি.এ. গ্রিয়ারসন। তবে গ্রিয়ারসনের বইতে রাংলঙ এবং রাঙ্খলদের পৃথক উপজাতি গোষ্ঠী হিসেবে বলা হয়েছে। তবে 'প্রাচীন কুকি গোষ্ঠী-র' তাদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল গ্রিয়ারসনের বইতে।

ত্রিপুরার রাজাদের শাসনকালেই হালামদের নিয়ে সম্প্রদায়-সচেতনতা বেশ প্রবল ছিল। বস্তুতঃ অপর যে কোন কুকি গোষ্ঠীর মতই হালামদের বিভিন্ন অংশগুলি মূলতঃ গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত ছিল। রাজ্যের শাসনাধীন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই একটি সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠে হালামরা। এই কারণেই রাঙ্খল, মলসুম, কাইপেঙ, রাংলঙ, রাউঙ, ছোরি, লংকাই ইত্যাদি গোষ্ঠীরা পৃথক গোষ্ঠীগত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও নিজেদের আজ হালাম বলে পরিচয় দেয়। হালামদের মধ্যে বৃহত্তর গোষ্ঠী, যেমন কাইফেঙ, মলসুম, রাঙ্খল, রাংলঙ নিজেদের পৃথক উপজাতি গোষ্ঠীপরিচয় সম্পর্কে প্রচন্ড গুরুত্বের ভাব পোষণ করে। কোন একজন মলসুম, রাঙ্খলরা কাইফেঙ গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে নিশ্চিত নিজেকে মলসুম, রাঙ্খল বা কাইপেঙ গোষ্ঠীর বলে উল্লেখ করবে। কিন্তু তার সম্প্রদায় নিয়ে প্রশ্ন করলে অবশ্যই উত্তর আসবে হালাম সম্প্রদায়। আসলে শাসনব্যবস্থা থেকে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে গণতন্ত্রের কারণে হালাম সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত প্রত্যেক কুকি উপজাতিই স্ব-স্ব সামাজিক উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল উপজাতি পরিচিতি ধারণ করেছে। ফলে একমাত্র ছোরাই, সহিমার, সাকাছেপ, দাপ, মার্চাফেঙ, লংকাই, তাঙ্গাছেপএবং রাংলঙরাই আজও এই উপাধিতে নিজেদের চিহ্নিত করে। অন্যদিকে মলসুম, রাঙ্খল, কাইপেঙ এবং রাংলঙরাও এখন হালাম পরিচিতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়ে পৃথক অস্তিত্ব পরিগ্রহ করছে।

প্রাচীনকালে বর্তমান ত্রিপুরার সীমান্তের বাইরে অবস্থিত বহু কুকি গোষ্ঠীকে নিজেদের মধ্যে স্থান দিয়েছে হালাম উপজাতি গোষ্ঠী। মেঘালয় এবং মিজোরামের বিটে, কোম, চিরু এবং মণিপুরের

আইমল গোষ্ঠী বৃহত্তর ত্রিপুরা থেকে মণিপুরে স্থানান্তরিত হবার আগে হালাম গোষ্ঠীর অর্ন্তগত ছিল। বহু শতাব্দী পূর্বে স্থানান্তরিত হওয়া এই গোষ্ঠীগুলির বর্ষীয়ান সদস্যরা আজও এই সত্যটি স্বীকার করে। তবে এই গোষ্ঠীসমূহের বর্তমান প্রজন্ম মলসুম, রাঙ্খল, কাইপেঙদের মত নিজেদের পৃথক গোষ্ঠীগত পরিচিতি দাবী করছে। কোন প্রকার সংযোগশীল সূত্র না থাকার ফলেই এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভূতাত্ত্বিক বিচ্ছিন্নতা এবং সাহিত্যকৃতির অভাব।

হালাম যুবতী

বাসস্থান এবং প্রব্রজন

হালামরা বিশেষতঃ রাংলঙ, ছোরাই, বাউঙ, মোর্চাফঙ, লংলই, সাকাছেপ, থাঙ্গাছেপ, দাপ এবং সাইমার উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর বিশ্বাস, খুরপুইতাবুম নামে একটি স্থান থেকে আগমন ঘটেছে তাদের। একইভাবে মণিপুরের আইমাল, চিরু, কোম এবং অনল উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর বিশ্বাস, তাদের আগমনও ঘটেছে খুরপুইতাবুম থেকেই। নাগাল্যান্ডের খেলমা, উত্তর কাছাড় এবং মেঘালয়ের বিটে, মেঘালয়ের (জয়ন্তিয়া পর্বতাঞ্চল) সাকছেপ এবং উত্তর কাছাড় পার্বত্য এলাকার রাঙ্খলরাও খুরপুইতাবুমকেই নিজেদের আদি বাসস্থান হিসেবে গণ্য করে থাকে এবং সেখান থেকেই তাদের বর্তমান স্ব-স্ব বাসস্থানে আগমন ঘটেছে বলে দাবী করে। এদিকে মুলসুম এবং কাইপেঙদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে অন্য কাহিনী। তাদের উৎপত্তি বিষয়ে ত্রিপুরার রাজকীয় ঘটনাপঞ্জী, রাজমালাতে বলা হয়েছে –

লাঙ্গরোঙ্গ আদি প্রজা কুকি তথা বৈসে
দিলেক হেড়ম্বেশ্বরে সীমানা যে শেষে।।

কাছাড়ী (হেড়ম্ব) এবং ত্রিপুরার শাসনাধীন অঞ্চলের মধ্যে সীমান্ত হিসেবে অবস্থান করত

বরাক নদী। এখানেই রাংলঙ কুকিরা বাসস্থানের পত্তন করেছিল এবং এই স্থানেই একদা মহারাজ দক্ষিণ খোলোঙমা নামে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাংলঙ কুকিরা কে ছিল? ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর এবং আমবাসা মহকুমার হালামরাই কিন্তু বরাক তীরবর্তী রাংলঙ কুকি হিসেবে পরিচিত ছিল। অপর রাজকীয় ঘটনাপঞ্জী ''কৃষ্ণমালাতে' বলা হয়েছে বরাক নদীর দক্ষিণ তীরে বাস করত কুকিরা। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে --

বরবক্র (বাড়াক) নদী রাজ উত্তর কুলেতে।

হিড়িম্ব রাজার অধিকার রাজ্য তাতে।।

তার দক্ষিণে ত্রিপুর রাজ অধিকার।

কুকিগণ বৈসে যত সে পর্ব্বত ...।।

মোট কুকি সব প্রজা ত্রিপুরা রাজার।

ছাকাছেপ, খামাচো চরাই রাঙ্গরুঙ্গ

রাংখল ছাইবেম ছাতে ছাইমার বঙ্গ।।

লাঙ্গাই রুপিনি এলপুই কুঙ্গ জন।

প্রধান গণনা জান এই কুকিগণ।।

''কৃষ্ণমালাতে' তৎকালীন ত্রিপুরা-শাসনাধীন বরাক নদীর দক্ষিণাংশের অঁধিবাসী বলে সাকাছেপ, খাঁমাচেব, ছোরাই, রাংলঙ, রাঙ্খল, সাইবেম সাইমার, বাউঙ, লংকাই এবং রুপিনী উপজাতিদের বর্ণনা করা হয়েছে। রুপিনী ব্যাতীত অপর সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলোই আজ নিজেদের হালাম বলে পরিচয় দেয়। জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাদ্যভ্যাসের দিক দিয়ে এই গোষ্ঠীগুলো এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যে তাদের পৃথক করে দেখা সম্ভবপর নয়। পারিবারিক গোষ্ঠীগত আভ্যন্তরীণ বিভাজন থাকলেও বহিরাগতদের কাছে এই সমস্ত উপজাতি গোষ্ঠীগুলি নিজেদের হালাম বলেই পরিচিত করে। এখন ত্রিপুরা এবং আসামের মূল হালাম গোষ্ঠী এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে নিয়েই তৈরী। ত্রিপুরার মলসুম, রাঙ্খল এবং কাইপেঙরা নিজেদের হালাম বলে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অপর হালাম উপজাতিদের সাথে নিজের ভাষাগত প্রাযুজ্যের বাইরে গিয়ে সামাজিক উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল তাদের পৃথক অস্তিত্ব এবং পরিচিতিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তবে মূল সত্য এই বিষয়টিই থাকছে, যে হালাম সম্প্রদায়ের সমস্ত অঙ্গ-গোষ্ঠীই এক সময় বর্তমান মিজোরামের অধিবাসী ছিল। দক্ষিণ মিজোরাম থেকে উত্তর মিজোরামে লুসাই পরিব্রজের পূর্বেই মিজোরামের বাসিন্দা ছিল হালামরা। এই পরিব্রজন সম্বন্ধে হালামদের মধ্যে খুব সুন্দর লোক-কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাতে সেই সম্পূর্ণ বিষয়টি বিবৃত করা সম্ভব নয়। জনশ্রুতিতে বলা হয়েছে, খুরপুইতাবুম, মাইরিং পুয়ানসেন, অরিতা লাউনুলাঙ, ওয়ারি, লোতাঙ, দানিয়াংখার, শালওয়ানখার, জৈসেনাশিব, কোলাশিব, রিল্লি

চাম্পাই ইত্যাদি অঞ্চলে একসময় বসবাস করতেন এই উপজাতি গোষ্ঠীগুলির পূর্বসূরীরা। বর্মীর কাচিনরা পর্বতকে 'বুম' বলে থাকে। বর্মীর কাচিন রাজ্যের বিখ্যাত পর্বতগুলির মধ্যে রয়েছে ... বুম, লৈম্যে বুম তাওয়াই বুম ইত্যাদি। মজার কথা হল হালামদের আদি বাসস্থান, খুরপুইতা-বুম কোথায় অবস্থিত, বর্তমান হালাম প্রজা নিজেরাই তা জানে না। তবে উত্তর মায়ানমার (বর্মা)'-র কাচিন রাজ্যের মধ্যেই কোথাও খুরপুইতা বুম পর্বত অবস্থিত, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এই স্থানেই কুকি গোষ্ঠীসমূহ আগে বাসস্থানের পত্তন করেছিল। মণিপুরের মৌহরাঙ হল 'মাইরিং পুয়ানসেন' এবং মায়ানমারের চিন পার্বত্য রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ভিক্টোরিয়া হল আরেতলালউস্তলাঙ। হালামদের একটি লোকগীতিতে বলা হয়েছে, 'চিন'রা তাদের (হালামদের) ভাই এবং তারা "চিন্তলাঙ" অর্থাৎ উত্তর মিজোরামের চীন পর্বত কোলসিপ থেকে আগত। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলটিতে বর্তমানে প্রধান জেলা কার্যালয় অবস্থিত রয়েছে। এভাবেই আমরা উচ্চ বর্মা থেকে ইরাবতী নদীর বরাবর হালাম পরিব্রজনের চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পারি। ইরাবতী নদী পেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ঘুরে যায় পরিব্রাজনকারীরা। তারপর চীন পর্বতের গিরিশ্রেণী শুদ্ধ চিন্দুইন নদী বরাবর ...-পরিব্যাপ্ত হয়ে চলতে চলতে অবশেষে চীন পর্বতের লেখা গিরিশ্রেণীর দিকে এসে রিল্লি-চাম্পাই করিডর দিয়ে বর্তমান মিজোরামে প্রবেশ করে পরিব্রাজকের দল। এখানেই রি হ্রদকে দেখে তারা। বর্তমান মিজোরামের পূর্ব সীমান্ত পেরিয়ে এখন মায়ানমারের ভেতর অবস্থান করছে এই হ্রদ। এই জন্যেই হালামরা বলে ঃ-

"তুই নি তাঙ না

রি লি চাম্পাই"

অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায় --

"আমরা রিলি (হ্রদ) ছাম্পাইতে

জল দেখেছিলাম"

এই ছাম্পাই অঞ্চল দিয়েই উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছিল সব কুকি-চীন উপজাতিরা। হালামরা যে প্রাচীন কুকিদের অন্তর্ভুক্ত, তারই প্রথম ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আশা অগ্রগামী রক্ষী। চাম্পাই অঞ্চল থেকে প্রাচীন কুকী উপজাতি গোষ্ঠীর একটি দল পরিব্রজন শুরু করে। রাঙ্খলরা উত্তর কাছাড় এবং বর্তমান ত্রিপুরার দিকে চলে আসে; থাডো, আইমাল, চিরু, ভাইফেই, অনল, লাঙ্গেঙ এবং রাংলঙ কুকিরা মণিপুরের দিকে যাত্রা করে। দক্ষিণ-পশ্চিম মিজোরাম দিয়ে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করে মলসুম এবং কাইপেঙরা দীর্ঘ সময়কাল যাবৎ রিয়াং এবং ত্রিপুরাদের সাথে চিটাগাংয়ের মিয়ামিয়া পর্বতে বসবাস করেন। মলসুমদের বাদ দিলে অন্য সমস্ত হালাম উপজাতিরা বর্তমান কাছাড়ে, উত্তর মিজোরাম এবং দক্ষিণ মণিপুরে বরাক ও তুইভাই নদীর তীরে বসবাস করত। এই কারণেই একটি হালাম লোকগীতিতে বলা হয়েছে --

"রুঙ লেহ্ ভাইসুয়ো কাতিবা
ওইখাত্ চিন সাই ইন হুঙাক রেই"

অনূদিত অর্থটি এইরকম ঃ-

"রুঙ এবং ভাইসুয়া স্নানঘাটে

চীন (উপজাতি)-এর সন্তান, একে অপরের জন্য অপেক্ষা করে থাক'

হালামরা বরাক নদীতে 'তুইরুং' বলে থাকে এবং মায়ানমারের চীন পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ মণিপুর এবং উত্তর-পূর্ব মিজোরামের মধ্যে সীমান্তের ভূমিকায় অবস্থানকারী তুইভাই নদীকে বলে 'ভাই'। বরাক এবং তুইভাই নদীর সঙ্গম তুইপাইমুখ হালামদের কাছে "রুঙলেহ্ ভাইসুয়া" বলে পরিচিত। এই অববাহিকার চারদিকে হালাম এবং অন্যান্য কুকি চীন উপজাতিগোষ্ঠীরা বসবাস করত যখন তারা "তিপ্রা" অথবা ত্রিপুরীদের সংস্পর্শে আসে। এই জন্যে হালামরা ত্রিপুরীদের "এই" অর্থাৎ 'বহিরাগত' বলে থাকে। 'লুসাই' অথবা 'মাব'রা সমতলের লোকেদেব "ভাই" বলে কারণ যে সময়েব মধ্যে তারা কাছাড়ের সমতল অঞ্চলের লোকেদের সংস্পর্শে আসে, ততদিনে 'তিপ্রা'রা তিপ্লোরাহ্ পর্বতে গমন করে সেখানের অধিবাসী সমতলবাসী লোকদেব সাথে সাক্ষাৎ করে ফেলেছে। অন্যদিকে বহিবাগতদের সাথে যখন হালামবা প্রথম সংস্পর্শে আসে, তখন প্রথমবারের মতো 'তিপ্রা'দের সাথেই তাদের (হালাম) সাক্ষাৎ হয এবং তিপ্রাদের "ভাই" বা বহিরাগত বলে উল্লেখ করে তারা।

হালাম নারী-পুরুষ

জাতিতত্ত্বমূলক পরিচয় ঃ

কুকি-চীন উপজাতিগোষ্ঠীটি আসাম-বর্মা উপগোষ্ঠীর অন্তর্গত। এই উপগোষ্ঠীটি আবার মূল তিব্বত-চীনা জাতির তিব্বত-বর্মা গোষ্ঠী নামক অংশ থেকে উদ্ভূত। যেহেতু হালামরা কুকি-চীন উপজাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাই জাতিগতভাবে তিব্বত-বর্মা গোষ্ঠীরও অংশ। এই জন্যেই 'থাডোউ কুকিস'-এ টীকা লেখবার সময় উইলিয়াম শ' লিখেছিলেন, "কোম, আইমাল, খোথাঙ,

থাডোউ, লাসাই, চীন, পোইস্, শুকতেস্, পাইতেস্, গাঙতেস ইত্যাদি সবাই সন্দেহাতীতভাবে পরস্পর সংযুক্ত।" এই কুকি-চীন উপজাতিরা কারা এবং এদের সাথে কিভাবে বিভিন্ন হালাম উপজাতিগোষ্ঠীরা সংযুক্ত? এই গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কে অধিকাংশ সমতলবাসীদেরই স্বল্প ধারণা আছে। বর্মাতে কুকীদের 'চীন' বলা হয়ে থাকে, ভারতে তারা পরিচিত 'কুকি' নামেই। মজার কথা হল, বিশেষজ্ঞরা 'কুকি-চীন' শব্দটির প্রচলন করলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই (কুকি-চীন) এই শব্দটি স্বীকার করে না। আজ সুলাই-কুকিরা নিজেদের মিজো বলে পরিচয় দেয়; ত্রিপুরাতে তাদের বলা হয় হালাম, ডার্লং, মলসুম, রাঙ্খল এবং কাইপেঙ।

হালামরা লুসাইদের "খাউসাক' বলে ডাকে। এই শব্দটির অর্থ "উজানের অধিবাসী"। এদিকে হালাম এবং অন্যান্য প্রতিবেশী জ্ঞাতিদের "খাউৎলাঙ" বলে সম্বোধন করে লুসাইরা। এই শব্দটির অর্থ "ভাটির অধিবাসী"। ত্রিপুরার রাজাদের শাসনাধীন থাকাকালে এই রাজ্যের কুকি-চীন উপজাতিরা হালাম সম্প্রদায় হিসেবে একটি স্পষ্ট পরিচিতি গড়ে তুলেছিল। যাহোক, হালাম, ডার্লং, মলসুম, থাডোউ, মার, পাইতে, লুসাইরা যে একই জাতির অন্তর্গত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বহু ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন কুকি-চীন উপজাতিগোষ্ঠীর পরিচিতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। সি. এ. সোপ্পিট, উইলিয়াম শ', লেঃ কর্ণেল জে. শেক্সপিয়ার এবং আরো অনেক লেখকেরাই কুকি-চীন উপজাতিদের উপর লিখতে প্রয়াস নিয়েছেন, কিন্তু কেউই সমস্ত কুকি-চীন উপজাতিদের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে পারেননি। উল্লেখ্য, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের একটি অংশ ও বাংলাদেশের চিটাগাং-এর বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস রয়েছে এদের। বস্তুতঃ বর্ষাবিধৌত ঘন বনাঞ্চল আচ্ছাদিত এই পার্বত্য এলাকার গভীর অরণ্যাঞ্চলে প্রতিনিয়ত বাঁচার লড়াই করে, বহু প্রজন্ম ধরে জুম চাষ করে বাস করে আসছে কুকি-চীন উপজাতিরা। সুদীর্ঘকাল ধরে জনবিচ্ছিন্ন এই গ্রাম্যজীবন গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বাধীন প্রত্যেক গ্রাম্য উপজাতি সম্প্রদায়কে সুস্পষ্ট সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার পন্থা উদ্ভাবন করতে সাহায্য করেছে। গ্রামপ্রধানের নেতৃত্বে পরিচালিত এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে উঠে গোষ্ঠীগত এবং সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এভাবেই অধিকাংশ কুকি-চীন উপজাতিরা অধিকতর গোষ্ঠী সচেতন হয়ে উঠে এবং তাদের জাতিগত পরিচয়ের চাইতে গোষ্ঠী জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়কে বেশী মূল্য দিতে শুরু করে। প্রতিনিয়ত আন্তঃগোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণ এটিই ছিল। যে কোন বিষয়ের বিতর্ক পরিবর্তিত হত আন্তঃগোষ্ঠী কলহে, পুরো ঘটনার শেষদিকে দেখা দিত ধ্বংসাত্মক হানা, লুঠপাঠ। তাই কুকি উপজাতিদের মধ্যে জাতিতাত্ত্বিক পরিচয়ের চাইতে গোষ্ঠী অধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। ফলতঃ জাতিতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো বৃহত্তর এবং সংযোগশীল সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। জ্ঞাতিদের মতোই হালামদের ক্ষেত্রেও এই অবস্থাই পরিলক্ষিত ছিল। ভাষা-রীতিনীত, পরম্পরা এবং জীবনযাত্রার বিবর্তন সত্ত্বেও কুকি-চীন উপজাতিরা একই জাতিগত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রয়েগেছে। "ল্যাঙ্গুয়েজেস্ অফ নর্থ-ইস্টার্ন ইন্ডিয়া" বইতে জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন হালামদের তিব্বত-বর্মী জাতিগত গোষ্ঠী হিসেবে দেখিয়েছেন, "দ্য পিপল্ অফ এশিয়া" বইটিতেও লেখক অধ্যাপক গর্ডন জি. বাউল্স্ কুকি-চীন উপজাতিদের তিব্বত-বর্মী জাতিগতগোষ্ঠী হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন এবং তাঁর এই সিদ্ধান্তের অবতারণা অঙ্গসংস্থানগত পরীক্ষা বা মর্ফোলজিক্যাল

টেস্ট-এর উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে। ক্যামব্রিজের বর্মী অধ্যাপক তাও – সেইন খো লিখেছেন, "জাতিগতভাবে এই উপজাতিরা চীনা, তিব্বতী, মাঞ্চু, জাপানী, আন্নামীজ, সিয়ামীজ, বর্মী এবং তুর্কীদের নিয়ে গঠিত, অতিস্বল্প বর্ণিত এবং স্বল্প উপলব্ধ তুরানিয়ান জাতির অন্তর্ভুক্ত। অদ্যাবধি চর্চিত ভাষাগত প্রমাণাদি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়, বহু যুগ আগে আর্য আক্রমণের পূর্ববর্তী উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত এলাকায় বসবাসকারী তুরানিয়ানদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছিল চীন।" আসাম কমিশনের ম্যাক ক্যাবে আবার কুকি-চীন উপজাতিদের ভারত-চীন গোষ্ঠী বলে বর্ণনা করেছেন। ক্যাপ্টেন ফোর্বস জাতিটিকে তিব্বত-বর্মী বলে উল্লেখ করেছেন। এখন চূড়ান্তভাবেই এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে হালামরা তিব্বত-বর্মী জাতিগতগোষ্ঠী।

হালাম রমণী

ভাষা

আজ পর্যন্ত হালামদের কোন লিখিত ভাষা নেই। অনেক কুকি-চীন উপজাতিগোষ্ঠী, বিশেষতঃ লুসাই, মার, থাডো, মারা, পাইতে ইত্যাদি ভাষাগত মাধ্যম হিসাবে বোমান লিপি নিয়ে লিখিত ভাষা-রূপ উদ্ভাবন করেছে। অন্যদের মধ্যে বিশেষভাবে লুসাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের স্বীকৃত রেডিয়ামে পরিণত হয়েছে। তবে এখনো সংবিধানের অষ্টম অনুসূচীতে স্থান পায়নি তা। অন্যদিকে হালামরা কিন্তু এখনো তাদের ভাষাব কোন লেখ্যরূপ উদ্‌ভাবন করতে পারেনি যদিও হালাম সম্প্রদায়ভুক্ত রাঙলঙ উপজাতিরা ইতিমধ্যে বাইবেলের নিউ টেষ্টামেন্ট প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। হালামদের স্বল্প জনসংখ্যার দিকে লক্ষ্য কবে অনেকেই ধারণা করেন, রাজ্যের হালাম-কুকি জনবসতির এলাকায় লুসাই ভাষারই নির্দেশ প্রদানের মাধ্যম হওয়া উচিৎ। তবে জনসংখ্যার একটি অংশ আবার এই মতটির বিরোধিতাও করে থাকেন। এখন ত্রিপুরার ডার্লং, মলসুম, রাংলঙরা নিজস্ব উপভাষাতেই ভাষার লেখ্যরূপ উদ্‌ভাবন করতে পেরেছেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রশ্নে ভাষার সৃষ্টি তথা উন্নতি নির্ভর করে জনসংখ্যার আকারের উপর, যা এখনো এই উপজাতিগুলোর মধ্যে তেমনভাবে নেই। স্পষ্টতঃই একটি উপভাষাকে একটি সম্প্রদায়ের ভাষাতে রূপান্তরিত করা সহজ কাজ নয়।

হালাম এবং লুসাই (মিজো) অথবা কুকি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ তালিকা নিম্নে দেওয়া হলঃ

	হালাম	মলসুম	রাঙ্খল	ডার্লং	কাইপেঙ	লুসাই
বাতাস	থির থি	থির থি	থির থি		থির থি	লি
পিঁপড়ে	সাহ্গির	সিঙমির	সিগমির			লঙ্মির
পাখী	ওয়া	ওয়া	ওয়া	ওয়া	ওয়া	সা-ওয়া
রক্ত	থি	থি	থি	থি	থি	থি
অস্থি	রু	রু	রু	রু	রু	রু
বিড়াল	মেঙ্	মেঙ্	মেঙ্	মেঙ্	মেঙ্	ঝাউহ্তা
গরু	সারাত	সিরাত	সিরাত	সিরাত	সিরাত	সা-বোঙ্
কাক	ওয়া-আক	ওয়া-আক	ওয়া-আক	ওয়া-আক	ওয়া-আক	চৌ-আক
কুকুর	উই	উই	উই	উই	উই	উই
দরজা	কোঁট	মো-কোট	কোট	কোট	কোট	কোট
কান	কুয়ার	কুয়ার	কুয়ার	কুয়ার	কুয়ার	বেঙ্
চোখ	মিথ্	মিথ্	মিথ্	মিথ্	মিথ্	মিথ্
ডিম	আতৌই	আতৌই	আতৌই	আতৌই	আতৌই	আতৌই
হাতি	সাই-পুই	সাই-পুই	সাই-পুই	সাই	সাইপুই	সাই
পিতা	পা	পা	পা	পা	পা	পা
মুখ	মুঃ	মুং	মুং	মুর্	মুর্	মেল্
নাম	রিহ্মিঙ্	রিহ্মিঙ্	রিথ্মিঙ্	হিহ্মিঙ্	রিহ্মিঙ্	মিঙ্
রাত্রি	জান	জান	জান	জান	জান	জান
তেল	সিরিয়াক	সিরিয়াক	সিরিয়াক	সিরিয়াক	সিরিয়াক	
নদী	তুইপুই	তুইপুই	তুইপুই	তুইপুই	তুইপুই	তুইপুই
পথ	লোমপুই	সম্পুই	লাম্পুই	লাম্পুই	লাম্পুই	কেঙ্
চর্ম	ভুন	বেন	বান	বান	বান	বান
দাঁত	হা	হা	হা	হা	হা	হা

হালাম উপভাষা শুধুমাত্র লুসাই ভাষার নিকটাত্মীয় নয়, মার্ এবং অন্যান্য কুকি-চিন উপভাষার সাথেও তার সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি মনিপুর (মৈইতেই) ভাষার সাথেও নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে হালাম উপভাষার মিল দেখা যায়। প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদিতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হালাম উপভাষা। এই ভাষাভাষী লোকেরা প্রবাদ-প্রবচনকে "চাংথুরচি' বলে থাকে।

১) চোংসিয়া বোংলাই কাই
কুমসিয়া মাইতন আজুই,
২) চাঙখিত রুই মান মাক
নাঙ্খিত রুই আমন আসিস্,
৩) সিয়া রাউহ্ নাতি খাতাল নাদুঙ্
আউম্-রুউহ্ নাতি রাইমো না-লেক
৪) নুপা বোই-ইন ওয়াই আজার
রামচাল আবোই ফাই হোই অলক
৫) সাল-লেঙ্ কামি তির রাউহ্
ছোঙ্ আহোই-লে লাম আহোই।

এই কয়েকটি প্রবাদ হালাম জীবনযাত্রার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। এমন আরও অনেক সুন্দর, মধুর এবং আত্মার অভ্যন্তরে বিচরনকারী গভীর অর্থবোধক প্রবাদ রয়েছে।

এলাকা বিশেষে বিভিন্ন হালাম উপগোষ্ঠীর উপভাষাসমূহের মধ্যে সামান্য তারতম্য দেখা যায়। ধর্মনগরের হালাম উপভাষা কমলপুর অথবা আমবাসার হালাম উপভাষা থেকে পৃথক। আবার কৈলাশহরের হালাম উপভাষার আসামের হালাম উপভাষার সাথে বৈশাদৃশ্যের চাইতে সাদৃশ্যই বেশী দেখা যায়। তবে ভাষাগত বিভিন্নতার উর্ধে সমস্ত হালাম উপজাতিদের সাংস্কৃতিক পরম্পরা কিন্তু এক। বস্তুতঃ কোন লিখিত সাহিত্যিকৃতি না থাকলে এই অবস্থানটি তৈরী হতে বাধ্য। বরং লিখিত সাহিত্যকৃতি না থাকায় অবস্থা এখন আরো ব্যাপকভাবে হালামদের প্রতিকূলে। কারণ পাশ্ববর্তী জনসংখ্যার দ্বারা শোষিত হবার পথ হালামদের ক্ষেত্রে প্রায় উন্মুক্ত।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান

অন্যান্য কুকি-চিন উপজাতিদের তুলনায় হালামদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি বেশ ভিন্ন ধরনের। লুসাই, ডার্লং, থাডোউ ইত্যাদি উপজাতিদের সামন্ত রাজারা শাসন করতেন। এদিকে প্রাচীন কুকি উপজাতিরা বিশেষতঃ রাঙ্খল, মলসুম, কাইপেঙ সহ হালামরা গ্রামের বর্ষীয়ান সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতেন। হালামদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে জানতে পেরে ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে যান কারণ গ্রাম প্রধানকে একমাত্র গ্রামের বর্ষীয়ান সদস্যরাই নির্বাচিত করতেন। ত্রিপুরার রাজাদের সাথে দীর্ঘ সম্পর্কের কালে হালামরা একপ্রকার গ্রাম সরকার তৈরি করেছিল। এই সরকার রাজ্যের স্বার্থরক্ষার্থে যে সমস্ত স্বশাসিত গ্রামে প্রধান স্বেচ্ছাচারী শাসক হয়ে উঠতে পারতো না। হালামদের প্রধানকে "হালাম-সা" বলা হত। অন্যান্য হালাম প্রধানকে কালিম বা গালিম, কাবুর, ছাপিয়া কাইম বা ছাপিয়া কাবুর, তাংওয়া ইত্যাদি বলা হত। অহম পান্ডুলিপি মোতাবেক অষ্টাদশ শতক থেকেই এই প্রধানদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ডব্ল্যু. ডব্ল্যু. হান্টারের লেখা কাছাড়ের পরিসংখ্যানগত বিবরণে পাওয়া যায়, কুকি নামটি একটি গ্রামীন সরকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই সরকারটি তৎকালীন অন্য সমস্ত গোষ্ঠীর তুলনায় বিপরীতমুখী এবং চারিত্রিকভাবে গণতান্ত্রিক ছিল। উত্তর কাছাড়ের বিটে, রাঙ্খল এবং সাকাছেপদের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সি. এ. স্কোপিট লিখেছেন, রাঙ্খল এবং রাঙ্খলদের সাথে

সম্পর্কিত শ্রেণীগুলি কোন রাজাকে স্বীকার করত না। এদের প্রতিটি গ্রাম 'গালিম'দের দ্বারা শাসিত হত। গাবুর এবং ছাপিয়া গালিম এবং ছাপিয়া গাবুর নামক দুইজন অধঃস্তন কর্মচারী তাকে সাহায্য করত। "তাদের উপাধিগুলি বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্য ছিল না," লিখেছেন তিনি। স্কোপিট আরও লিখেছেন "গ্রামীণ সংসদের সভাপতি হচ্ছেন গালিম এবং সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তারকারী যে কোন বিষয় সম্পর্কে তিনি তাঁর অধঃস্তনদের সাথে মিলে অনেক সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন।"

ত্রিপুরার হালামদের সম্পর্কে আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি লিখেছেন, "কুকিদের প্রধানদের রায়, গালিম, ছাপ্পিয়া এবং গাবুর বলা হয়।" এই কুকিরা কোনমতেই লুসাই বা ডার্লং নয়; এরা হালামদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ডার্লং অথবা লুসাইরা "লাল" নামে পরিচিত প্রধানের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হত তারা। জে. বি. মিল্‌স্‌, আই. সি. এস., বিটে এবং খেল্‌মী উপজাতিদের বিষয়ে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মীমাংশা করতেন "গালিম" নামক প্রধান। এছাড়াও গ্রামীণ সংগঠনটি গণতান্ত্রিক ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। এই সমস্ত তথ্যগুলি মিল্‌স্‌ এ. এইচ্‌. ফ্রেচার্‌, আই. সি. এস,- এব কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এভাবেই দেখা যায়, হালামদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচন্ডভাবে স্পন্দনশীল, জীবন্ত এবং একইসাথে গণতান্ত্রিক ছিল। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে জানতে পেরে ইংরেজ বিশেষজ্ঞরা রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। হালামদের অর্ধসভ্য সমাজে এমন জীবন্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকতে পারে, একথা তাঁরা ভাবতেই পারেন নি। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটিই বহু শতাব্দী ধরে হালাম সমাজে টিকে ছিল। শুধু তাই নয়, তাদের সংস্কৃতি এবং পরম্পরকে বজায় রাখতে বিশেষভাবে উপযোগী হিসেবে দেখা দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান। হালামদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ-

হালাম-সা/রাই

গালিম

গাবুর

ছাপিয়া

সেডেজা / জাকসুঙ্‌ তাংওয়া

গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন হালাম-সা এবং গালিম গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন হালাম-সা এবং গ্রামপ্রধান হিসেবে কাজ করতেন গালিম। গ্রামের সংখ্যার উপর নির্ভর করে গালিমের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেত। গাবুর এবং ছাপিয়ারা গালিমের সহায়ক ছিলেন। তাংওয়ার ঘোযণা বৃত্তি ছিল; তিনি সারা গ্রামে গ্রামে সংসদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বেড়াতেন। গ্রাম সংসদের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতে সংসদের অধিবেশনে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য হাজির করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বলা হত সেডেজা বা জাকসুঙ্‌।

গ্রামের বর্ষীয়ান সদস্যদের দ্বারা হালামসা অথবা গালিমরা নির্বাচিত হতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তারা সেই পদ অধিকার করে থাকতেন। হালামসা মারা গেলে গালিম কিংবা সদর গালিমকে সেই পদ অধিকার করার জন্য নির্বাচিত করা হত। এদিকে গালিমের পদ অধিকার করার জন্য নির্বাচিত

করা হত কোন একজন গাবুরকে। হালামসা বা গালিমের অভিষেকপর্বের অব্যবহিত পরই একটি সামাজিক জনসভা অনুষ্ঠিত হত। সেখানে দিনরাত ভাত, মদ্যপানীয়ের সাথে লোকগীতির চর্চা চলত। অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যার জন্য এখানে লোকগীতিগুলো উল্লেখ করা গেল না।

ত্রিপুরার রাজাদের শাসনকালে ওই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ গুরুত্বের আসন অধিকার করেছিল। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সম্পত্তিবিষয়ক বিপদ, অপরাধ, চুরি ইত্যাদির সমস্যার নিষ্পত্তি করার অধিকার একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেই ছিল। এদের ক্ষমতা এত গভীর ছিল যে কয়েকটি বিবাহবিচ্ছেদ এবং সামান্য কিছু সমস্যা ছাড়া তৎকালীন সমাজে অন্য কোন অপরাধের অস্তিত্বই ছিল না। এমনকি ১৯৪৯ সালে স্বাধীন ভারতের সাথে রাজন্যনিয়ন্ত্রিত ত্রিপুরার অর্ন্তভুক্তির পরও এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকর ছিল; পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রচলন হওয়া পর্যন্ত এরা ক্ষমতায় ছিল। আজ এই প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। তবে রাংলঙ, রাঙ্খল, মলসুম, লংকাই, সাকাছেপ, রাউঙ্ এবং থাঙ্গাছেপ গ্রামে এখনো 'হালাম-সা' বা 'রাই'দের খুঁজে পাওয়া যায়। এঁরা গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ ছোটখাট সমস্যা নিরসন করতে এখনো নিয়োজিত আছেন।

ধর্ম

ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার আগে উপজাতিরা সম্মিলিতভাবেই সর্বপ্রানবাদী বা অধ্যাত্মবাদী ছিল। মুঘল এবং ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে ত্রিপুরা ছিল প্রাচ্যের একটি প্রভাবশালী রাজ্য। উত্তর-পূর্ব দিকে কুশিয়ারা থেকে বরাক নদী পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন রাজারা। এই রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পূর্বদিকে বর্তমান মিজোরামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বদিকে তুইপাইমুন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাই এই রাজ্যের জনসংখ্যার সিংহভাগ গঠনকারী উপজাতিরা বিভিন্নভাবে রাজ পরিবারের অনুসৃত রীতিনীতি, বিশ্বাস, প্রথা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তবে রাজা উপদেষ্টা পদটি সর্বদা ব্রাহ্মণদেরই প্রাপ্য ছিল। এই কারণেই বর্তমান কাছাড়ের সিলেট এলাকায় পঞ্চ খাদ যজ্ঞ করতে কনৌজ থেকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনয়ন করেছিলেন রাজা স্বধর্মফা। এভাবে প্রাচীনকালে সর্বপ্রানবাদী উপজাতিদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল খোদ রাজারাই। তবে হিন্দু ধর্মের মহত্বের মূল যে বিষয়টিতে নিহিত, সেটি হল অপর যে কোন ধর্মবিশ্বাস এবং প্রথাকে নিজের মধ্যে আত্মস্থ করতে পারে হিন্দু ধর্ম। তাই উপজাতিদের সর্বপ্রাণবাদী রীতিনীতিকে আত্মস্থ করতে হিন্দু ধর্মের কোন সমস্যাই হয়নি। ফলতঃ ত্রিপুরার উপজাতিদের একটি মিশ্র ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি গড়ে উঠে। এই প্রক্রিয়া থেকে বাদ যায়নি হালামরাও। একদিকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীকে দেবত্বে বরণ করে নেয় তারা; অন্যদিকে ব্রাহ্মণ পক্ষেও ত্রিপুরার পরম্পরাগত ঈশ্বরদের স্বীকার করে নেওয়া হয়। এভাবে উপজাতি এবং হিন্দু দেবদেবীরা উভয় জনগোষ্ঠীর দ্বারাই পূজিত হতে থাকেন। দেবী দুর্গা হয়ে উঠেন "ওসা মাতাই," গনেশ পরিনত হন "সংরাঙে," শিব হয়ে যান "সুব্রাই," লক্ষ্মীদেবী হন "মাইলুংমা," এবং গঙ্গার নাম হয় "তুইমা"। অনুরূপভাবে এই দেবদেবীদের অধিকাংশকে হালামরাও গ্রহন করে নেয়। কিন্তু ত্রিপুরীদের সাথে দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্পর্শে থাকার ফলে 'তিপ্রাদের' বেশ কিছু রীতিনীতিও ধার করে নেয় তারা। হালামদের অধিকাংশ মন্ত্র ত্রিপুরী ভাষায় উচ্চারিত হয়। খার্চি পূজা এবং কের

পূজা এই ভাষাতেই অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাত্মবাদী বিশ্বাসমূলে হালামরা নবান্নের সময় পূজা করত। শিশু জন্মগ্রহন করলে অথবা কেউ অসুস্থ হলে দেবদেবীদের কাছে বলি দিত তারা। উত্তরে বসবাসকারী দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্ল্যের জন্যও বলি দিত তারা। মাঝেমাঝে অসুস্থতার জন্যে বনের দেবদেবীদের কাছে পূজা দিত হালামরা। সাধারণ হালামরা 'বুদা দেবতা'-কে খুব ভয়ের চোখে দেখে। কারণ মহাদেবকে তারা 'বুদা দেবতা' হিসেবে গণ্য করে। পুরোহিতের উপদেশ অনুসারে মদ, মাংস, ভাত ইত্যাদি নিবেদন করা হত 'শিব ' অথবা 'তরপা'-কে। হালামদের 'সেপিত্' দেবীর অনুরূপভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে দেবী লক্ষ্মীকে।

(আজ প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশী হালাম জনসংখ্যা খ্রীষ্টানে পরিনত হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদের প্রচলন দ্রুতগতিতে অবলুপ্ত হচ্ছে। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টান প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদি অবলম্বন করে এবং শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে হিন্দুরাও সর্বপ্রাণবাদী চর্চা এবং হিন্দু সংস্কৃতির বিশ্বাস ও পরম্পরা পরিহার করছে।)

হালাম সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষাগত অবস্থা ঃ অন্যান্য পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে হালামরাও মূলতঃ অস্থায়ী চাষবাদের উপর নির্ভরশীল। ১৯৬০ থেকেই তাদের সমতলে স্থায়ীভাবে কৃষি কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছিল। ফলে অনেক হালাম পরিবারই পার্বত্য এলাকা থেকে সমতল ভূমিতে নেমে আসে, গ্রহণ করে সমতলের কৃষিপদ্ধতি। তবে মুল বিষয়টি হল হালাম সম্প্রদায়ের লোকের। এমন পার্বত্য ও প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করে, যেখানে সমতল ভূমি খুব কমই পাওয়া যায়। তাই একদা সমতলে নেমে আসা হালাম পরিবারের অনেকগুলিই সমতলের প্রতিবেশীদের কাছে তাদের অধিকৃত সামান্য চাষযোগ্য এলাকা বিক্রি করে আবার ফিরে গেছে পাহাড়ে, টিলাভূমিতে। কয়েকজন সমতলে কৃষিকাজ চালিয়ে গেলেও তাদের আয়ত্বাধীন এলাকা এত স্বল্প ছিল যে তা থেকে জীবিকা নির্বাহ করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে দেখা দেয়। হালাম পরিবারগুলি মূলতঃ লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে কমলপুর ও আমবাসা মহকুমায় এবং কৈলাশহর, ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমায় বাস করত। মজার কথা হল, এই এলাকাগুলিতে সমতল ভূমি খুব কমই আছে। যে মাটির উপর তারা কৃষি কাজ করে, সেগুলো মূলতঃ লুঙ্গা জমি। এই সমস্ত কারণের ফলে হালামরা অস্থায়ী কৃষি কাজের উপরই নির্ভর করে, সামান্য কিছু বনজ সম্পদ বিক্রি করেই তাদের জীবিকা চলে। ২০০৭ সালে ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হালামদের উপর একটি আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় দেখা যায় রাজ্যের মোট ১৪০৭০ সংখ্যক হালাম জনসংখ্যা রয়েছে; ৩৬১২টি পরিবারে এঁরা বাস করছেন। মজার কথা হচ্ছে এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ৩৮৪টি পরিবার সরকারী চাকুরীর উপর নির্ভরশীল এবং ৫৮টি পরিবার ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মোট শিক্ষিত জনসংখ্যার অঙ্গটি হল ৮১৭০ অর্থাৎ ৫৮.০৬ শতাংশ স্বাক্ষরতা রয়েছে রাজ্যের হালামদের মধ্যে। এঁদের মধ্যে আবার ১৬জন স্নাতক এবং ৫জন স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী। হালামদের উপর চালানো এই আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় দেখা যায় হালাম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্যেরাই কোনমতে জীবন-যাপন করছেন; দিন এনে দিন খেতে হয় তাঁদের। তবে উৎসাহজনক কথাটি হল হালাম সম্প্রদায়ের লোকেরা কঠোর পরিশ্রমী। তারা সরকারী সহায়তার উপর খুব কমই নির্ভর করে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে

কোন ভিক্ষুক খুঁজে পাওয়া যায়নি। এঁদের মধ্যে দরিদ্রতম লোকটিও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করার চাইতে নিজের গ্রামে অবস্থান করে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র যাওয়া পছন্দ করে।

রীতিনীতি এবং পরম্পরা ঃ ভারতের সমস্ত কুকি-চীন উপজাতিদের মধ্যে আসাম এবং ত্রিপুরার হালামদের সংস্কৃতি বিশেষভাবে তাঁদের প্রভাবশালী প্রতিবেশীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ত্রিপুরায় ভূতপূর্ব পূর্ব পাকিস্তানের সমতলবাসীদের ব্যাপক বসতিস্থাপনের আগে হালামদের সাক্ষাৎ প্রতিবেশী ছিল ত্রিপুরীরাই। কিন্তু এই প্রভাবের উপস্থিতি সত্ত্বেও হালামরা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাদের সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের গ্রামগুলি মূলতঃ পাহাড়ের চূড়ায় অথবা অনুরূপ বিচ্ছিন্ন এলাকায় অবস্থিত হওয়ার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছিল। এছাড়াও হালামরা স্বভাবতই অন্তর্মুখী। এই কারণেও তাদের বহুযুগ পুরনো প্রথা এবং পবম্পরাকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

বিবাহ ঃ হালাম যুবকেরা সাধরাণতঃ সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ যুবতী মেয়েদের বাড়িতে যায়; মেযেরা খাবার খেতে অনুরোধ করে তাদের। যুবতীরা সুতো কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; ফাঁকতালে যুবকেরা তাদের ... নারীর সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যায়। যুবক-যুবতীব মধ্যে প্রেম জমে উঠলে কোন-একজন নিকটাত্মীয় অথবা বন্ধুর মাধ্যমে তার পিতামাতাকে যুবকটি অনুরোধ করে পাঠায় যাতে কন্যার পিতামাতার কাছে তার বিবাহের ইচ্ছা জানানো হয়। পাত্রের পিতামাতার তখন পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব পাঠায় কন্যাপক্ষের কাছে। এক্ষেত্রে রাজি হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণই নির্ভর করে কন্যার জন্মদাতাদের উপর। তবে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা সম্মত হন। কন্যাব পিতামাতা প্রস্তাবে সম্মতি দিলে পাত্রের পিতামাতা আনুষ্ঠানিকভাবে কন্যার বাড়িতে গিযে বিবাবে দিনক্ষণ স্থির করে আসেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা বা পাত্রের পিতামাতা প্রস্তাবে অসম্মত হলে প্রেমিকযুগল পালিয়ে যায়। এইসব ক্ষেত্রে গালিম পরিচালিত গ্রাম সংসদ বিবাহে অসম্মত পিতামাতাকে প্রেমিক যুগলের মিলনে সম্মতি দিতে রাজি করায়। প্রাচীনকালে আমাদের মধ্যে 'ঘব-জামাই' প্রথার বেশ প্রচলন ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী গৃহস্থালীর কাজকর্ম করে স্ত্রীর কাছে নিজের ক্ষমতা এবং পরিবার প্রতিপালনের দক্ষতা প্রমাণ করতে হত স্বামীকে। শিক্ষার বিস্তারের সাথে সাথে এখন এই 'ঘর-জামাই' প্রথা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে এসেছে। তরুণ দম্পতি বিবাহিত হলে দিনরাত ভাত, মদ ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়; সারা গ্রামে সম্পূর্ণ সম্প্রদায়কে ভোজ দেওয়া হয়। এই ভোজে নব্য দম্পতির আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করা হয়। গ্রামের বর্ষীয়ান সদস্যদের উপস্থিতিতে পাত্রের পিতামাতা পুত্রবধূর পিতামাতার কাছে প্রথাগত মূল্য উপহার দিতেন। তবে এই মূল্য কখনোই কন্যার পিতামাতা গ্রহণ করতেন না; এগুলি দিয়ে দেয়া হয় মায়ের আত্মীয়দের।

বিবাহবিচ্ছেদ ঃ হালামদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা নগণ্য হলেও রয়েছে। স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত। স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে যে কোন ব্যক্তির পরকীয়া প্রেমে জড়িত থাকার ঘটনাই সাধারণতঃ বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হত। স্বামী বিবাহবিচ্ছেদ চাইলে স্ত্রীকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলে; স্ত্রী গৃহত্যাগ করলে পিতা অথবা ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠে। সে পিতা কিম্বা ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলেই তার পক্ষ হয়ে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে গ্রামপ্রধান। স্ত্রীর কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ করে গ্রাম-প্রধান গালিম গ্রামের বর্ষীয়ান সদস্যদের

নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করে। সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের কাছেই ... পাঠানো হয়। এই বৈঠকের পরিচালনায় গালিমকে গাবুর এবং অন্যান্যরা সহায়তা করে। গ্রামের বর্ষীয়ান সদস্যদের ভাত এবং মদ পরিবেশন করা হয়। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই তাদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। যদি স্বামী সংসদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত হয়, তাকে জরিমানা করা হয়। বয়োজ্যেষ্ঠদের আদেশ অমান্য করলে কখনো কখনো গ্রাম সংসদের আদেশানুযায়ী তাকে মারধোরও করা হয়। স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মিল না হলে স্থায়ীভাবে স্বামীর ঘর থেকে সমস্ত নিজস্ব অস্থাবর মালপত্র নিয়ে গৃহত্যাগ করে স্ত্রী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ পিতার ঘর ত্যাগ করে মায়ের গ্রামে চলে আসে; তাকে পারিবারিক সদস্য বলে বিবিহাবিচ্ছিন্না কন্যার পিতামাতা বা ভাইয়েরা স্বীকার করে নেন। বিবাহবিচ্ছেদের পর স্বামী অন্য কোন নারীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া : হালাম সমাজের বৃহত্তম শোকাবহ ঘটনা হিসাবে দেখা হয় মৃত্যুকে। কোন একজন ব্যক্তি মারা গেলে শোকস্তব্ধ পরিবারকে সান্ত্বনা দেবে সকল গ্রামবাসী, এমনটাই তাদের প্রথা। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার জন্য মদ এবং পয়সা নিয়ে যায় বয়োজ্যেষ্ঠরা। মৃতদেহের বুকে পয়সা রাখা হয়, মৃতদেহটিকে রাখা হয় ঘরের মেঝেতে। তারপর দেহটিকে স্নান করিয়ে তাতে পরম্পরাগত পোষাক চাপানো হয়। হালামরা মৃতদেহ দাহ করলেও কয়েকটি গোষ্ঠী দাহকার্য্য সমর্থন করে না। মৃতদেহকে দাহ অথবা সমাহিত করার পর মৃতের পরিবারের সদস্যরা সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করে দেহাতীত আমার উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করে। মৃত্যুর এক বছর পর স্মরণ অনুষ্ঠান বা শ্রাদ্ধ করা হয়। হালামদের প্রথা অনুযায়ী একমাত্র মৃত ব্যক্তির পুত্রই শ্রাদ্ধ করার অধিকারী, অপর কেউ নয়। তবে কোন পুত্র বা কন্যা না থাকলে আত্মীয়েরা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে।

শ্রাদ্ধ : কোন ব্যক্তির মৃত্যু হবার পর তার ঘরে পূজা, আচার-অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে গৃহশুদ্ধি করে পুরোহিত। আকাশে গান গাইতে গাইতে কোন চাতক উড়তে দেখলে হালামরা মনে করে মৃত ব্যক্তির আত্মা তৃষ্ণার্ত বোধ করে। এই তৃষ্ণা মেটাবার জন্য কেউ কেউ এক বোতল মদ ঢেলে দেয়, কেউ বা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মৃতদেহের হাতে লাঠি ধরিয়ে দেওয়া হয়। হালাম সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, মৃতদেহের অন্তিম শয্যার রাস্তায় তার আত্মা বিচরণ করলে পথে বাধা সৃষ্টিকারী বাঁদরদের লাঠি ছুঁড়ে দিতে পারবে বিদেহী আত্মা।

পিতৃপুরুষের প্রতি প্রার্থনা : হালামদের মধ্যে এই প্রথাটি বেশ প্রচলিত। যেহেতু পূর্বসূরীদের আত্মা জীবিত আছে বলে হালামরা বিশ্বাস করে, তাই নূতন ধান ঘরে উঠলে সেই শস্য উৎসর্গ করে পূর্বপুরুষদের আত্মাকে স্মরণ করে তারা। পূর্বপুরুষের বিদেহী আত্মাকে উৎসর্গ না নূতন চাল বা জুমের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে না হালামরা। ভুট্টা, চালের তৈরি পিঠে, মদ ইত্যাদি পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেই গ্রহণ করা হয় নূতন খাদ্যদ্রব্য। এমনকি শশা, তরমুজ ইত্যাদি ফলাদিও পূর্বপুরুষের আত্মাকে উৎসর্গ না করে গ্রহণ করা হয় না।

পৌরানিক গল্প : হালামদের পৌরানিক গল্পের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হল "রাল্ঙাম্" এর গল্প। রালঙাম্ নামে এক ব্যক্তির ছিলেন যাহার স্ত্রী প্রথম গর্ভবী হয়। রালঙাম্ মেয়ে সন্তানের আশায় একদিন অজানা দেশে পূর্বদিকে দুষ্প্রাপ্য এক ধরণের বট গাছের বিচি যাহা দেখতে খুব

সুন্দর সেই বিচি সংগ্রহের জন্য পারি দেয়। সেই বট গাছের বিচি দিয়ে গলার হার তৈরী হয়ে থাকে এবং তার মেয়ের জন্য রালঙাম্ সেই মূল্যবান হার দিতে চেয়েছিল। সেই অজানা দেশে অনেক বৎসর সেই বিচি সংগ্রহের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে গভীর জঙ্গলে কাটায় এবং সেই গাছের সন্ধান পায়। কিন্তু রালঙাম্‌কে সেই অজানা দেশে রাক্ষস ও বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সেই বিশেষ বট গাছের বিচি সংগ্রহ করে নিজ দেশে ফিরে। বাড়ি ফিরতে জুমের রাস্তায় এক খুব সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে দেখা হয় এবং সেই যুবতীর প্রেমে পড়ে যায়। সে বাড়ীতে ফিরে জানতে পারে সে সেই যুবতী আসলে তাহার মেয়ে সাহরি নাম হোমরিল যার জন্য সে অনেক বৎসর সেই অজানা পূর্ব দেশে সেই সোনরূপ গাছের বিচি যাহা হালামরা "ঠেইবোঙ্" বলে তাহা সংগ্রহের জন্য দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাহার যুবতী মেয়ে মারা যায়। এবং নিজেও লজ্জায় দিন কাটায়। এই উপকথা অনেক লজ্জা ও অনেক ঘটনাগুলি কবিতায় ও গানে হালামরা বর্ণনা দিয়ে থাকে। এখানে "রালঙাম্" এর অর্থ হল "বীরপুরুষ"। সে রাক্ষসের দেশে গিয়েছিল তাই এই নামে তারার পরিচয়।

হালামদের অনেক পৌরানিক কাহিনী রয়েছে যেগুলি সঙ্কলন করলে একটি বই তৈরী করা যাবে। কাহিনীগুলি অত্যন্ত মধুর ও অনেকটি লোমহর্ষকও বটে।

পোষাক পরিচ্ছদ ঃ হালামদের নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদ বলতে এখন তেমন নেই যারা শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক মধ্যে পোশাক পরিচ্ছদ এখনও অনেকটা বজায় রয়েছে। মেয়েরা ঘার নীল রঙের পাছড়া ও তারা খচিত সার্ট পরে থাকে। তাছাড়া কান বড় ছিদ্র করে কানের দোল দেওয়া গলায় রৌপ তৈরী অলংকার পড়া — এখনও দেখা যায়। এই গয়না ও অলংকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য বলা যায়। বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা উন্নত পোষাক পরিচ্ছদ পরতে পছন্দ করে। আগেকার দিনে প্রতিটি হালাম্ পরিবার জুমে নীল চাষ করত। নীল গাছের পাতাকে বড় ফলনে পরিচয় রং তৈরী করত। হাতে বোনা পাহড়া — নীল রংঙে কয়েক রাত ভিজিয়ে রং দিয়ে থাকে। তবে এখন এইভাবে রং দেওয়া খুব কম হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে হালান তরুণীরা উন্নত ধরনের পাছড়া পরতে ছন্দ করে। তবে ভারতীয় পোশাকের প্রভাব খুবই প্রবল। তাই ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না।

অভিনয় হালাম

পিতার নাম নিধানজয় হালাম। জন্ম ১৯৫৫ সনে ধলাই জেলা নেপালটিলার কুকিছড়া গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষা লংথরাই-এর কুকিছড়া গ্রামে। আগরতলা সেন্টপলস্ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা শেষ করে মেঘালয়ের বড়পানি ইউ. সি কলেজ থেকে স্নাতক। টি. সি. এস, সিলেকশন গ্রেডের অভিনয়বাবু বর্তমানে যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রাজ্যে সড়ক পরিবহণ সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদ ও সামলাচ্ছেন।